মা'রিফাত ও দীদার-এ-ইলাহী

শায়েখ আলাউদ্দীন খান আল কুদমী

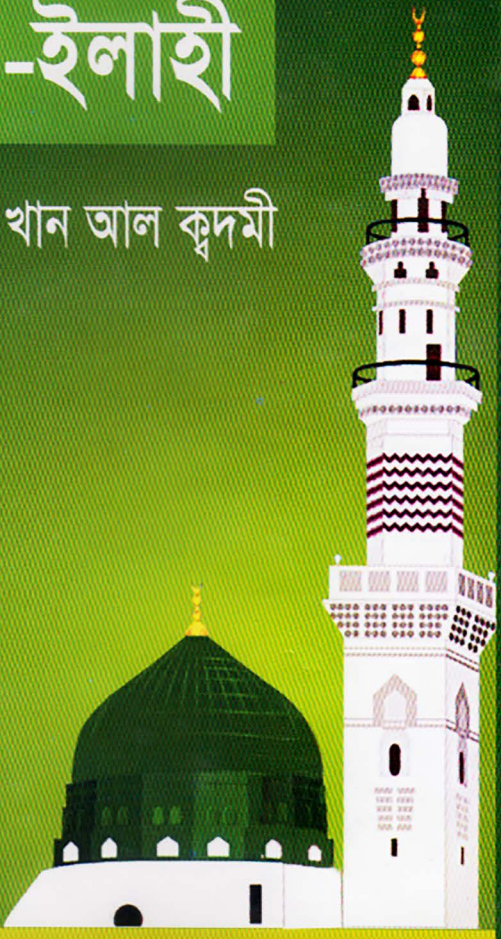

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা - চট্টগ্রাম

BCBS
Estd-1949

মা'রিফাত ও দীদার-এ-ইলাহী

শায়েখ আলাউদ্দীন খান আল ক্বদমী

Estd- 1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.pathagar.org

মা'রিফাত ও দীদার-এ-ইলাহী

শায়েখ আলাউদ্দীন খান আল কুদমী

প্রকাশক
এস. এম. রইসউদ্দিন
পরিচালক প্রকাশনা
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশঃ রবিউল আওয়াল, ১৪১৭ হিজ্‌রী; শ্রাবণ, ১৪০৩ বাং; ১৯৯৬ ইং
দ্বিতীয় সংস্করণঃ সেপ্টেম্বর ২০১১

মুদ্রাকর
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
পিএবিএক্স ঃ ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

প্রচ্ছদ ঃ
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

মূল্য ঃ ২১০/- টাকা

প্রাপ্তিস্থান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা
৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

হাজী সফিউল্যাহ্ ফাউন্ডেশন
কার্তিকপুর, ভেদরগঞ্জ, শরীয়তপুর,
মোবাইলঃ ০১৭১১০০৫১৫১

MA-RIFAT-O-DEEDAR-E-ILAHEE: Published by: S.M. RAISUDDIN, Director Publication, Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000. Price: Tk. 110/-U$: 7/-(seven)

ISBN984-70241-0022-9.

www.pathagar.org

প্রকাশকের কথা

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারিম। সুন্নাতুল জামায়াতের অনুগামী ক্বদমীয়া তরীকার একজন উন্নত স্তরের সাধক মুহতারাম শাহ সূফী আলাউদ্দিন খান আল ক্বদমী কর্তৃক লিখিত "মা'রিফাত ও দীদার-এ-ইলাহী" বইটি আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরে অত্যন্ত আনন্দ বোধ করছি। পরিপূর্ণ ঈমান অর্জনের পথ- নির্দেশনা তথা তরীকতের উপর বাংলা ভাষায় রচিত এমন একটি সুন্দর ও মৌলিক পুস্তক বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ-এর পক্ষ থেকে প্রকাশ করতে পেরেও আমি আনন্দিত। বাস্তবে পৃথক অথচ প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী অভিন্ন তাসাওউফ ও তরীকতের জটিল, দুর্বোধ্য ও সূক্ষ্ম পার্থক্যকে লেখক কোরআন ও সুন্নাহ্ ভিত্তিক প্রমাণাদির মাধ্যমে যে রকম সহজ সরলভাবে উপস্থাপন করেছেন, তা এই পুস্তকের অন্যতম বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয় এবং যা এই বিষয়ের উপর প্রচলিত পুস্তকগুলোতে অনুপস্থিতও বটে। তিনি তরীকতের তথা আধ্যাত্মিক জগতের অনেক সূক্ষ্ম বিষয়ের পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ করেছেন এবং অনেক দ্বান্দ্বিক ও বিতর্কিত বিষয়ের সুষ্ঠু সমাধান দিয়েছেন। তাত্ত্বিক বিষয়ের বিশ্লেষণগুলো বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে ব্যক্ত করেছেন। তরীকতের উৎপত্তি, উচ্চতর মাকামাত বা শ্রেণীসমূহের বর্ণনা ও বিলায়েত এবং তৎসংলগ্ন অভিজ্ঞতা, নূর ও নূরের প্রকার, পর্দা ও তার সংখ্যা, বরযখ বা সূক্ষ্ম নূরী দেহ, তাওয়াজ্জুহ বা মনোনিবেশ, মুহব্বত ও ইরাদত ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের উপর সবিস্তার আলোচনা সত্যিকার অর্থেই দুর্লভ এবং একজন আল্লাহ্র পথের পথিকের গন্তব্যে পৌছার অমূল্য পাথেয়। আল্লাহ্র দীদার তথা দর্শন লাভ যা আমাদের চরম পাওয়া এবং সৃষ্টির প্রতি স্রষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত, তা শুধুমাত্র তাঁর মা'রিফাত বা পরিচয় লাভের মাধ্যমেই সম্ভব এবং এক্ষেত্রে তরীকতের সাধনার অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। আল্লাহ্তায়ালার পরিচয় তাঁর গুণাবলীতে প্রকাশিত। সকল ধর্মের মানুষ স্রষ্টার অস্তিত্ব ও তাঁর আংশিক গুণাবলীতে বিশ্বাসী, বিপরীতপক্ষে একজন মুসলমান তাঁর অস্তিত্বসহ যাবতীয় গুণাবলীতে বিশ্বাসী। আল্লাহ্তায়ালার এসকল জ্ঞান ও গুণাবলী যে স্তরে স্তরে আকৃতি ধারণ করে আছে, তা তরীকতের সাধনার স্তরে স্তরে সাধকের অন্তর্চোখে ধরা দিয়ে তাঁর ওসল বা মিলন ও দীদার লাভের উপযুক্ত করে।

www.pathagar.org

উপরন্তু জাগতিক যে কোন বস্তুর চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য যেমন চোখ ও আলো প্রয়োজনীয়, তেমনি কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত যাবতীয় অদৃশ্য বিষয়ের বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের জন্যও তরীকতের সাধনা ও নূর অর্জন অপরিহার্য।

যারা তরীকতসহ ইসলামকে ভালবাসেন তাদের জন্য এ পুস্তক যেমন অত্যাবশ্যক, তেমন যারা শুধু ইসলামকে মানেন, কিন্তু তরীকতে বিশ্বাসী নন তাদের জন্যও এ পুস্তক পাঠ জরুরী বলে মনে করি। আল্লাহ্তায়ালার সত্যিকার পরিচয় না পেলে ঈমান এবং ইখলাস মজবুত ও সঠিক হয় না। বইটির প্রথম সংস্করণ শেষ হওয়ায় পাঠক-পাঠিকার অনুরোধে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আশা করি সকল মহলে সে অভাব পূরণ করতে সাহায্য করবে। তাহলেই সোসাইটির উদ্দেশ্য উত্তরোত্তর সফল হবে।
প্রথম সংস্করণ শেষ হওয়ায় এবং পাঠক মহলে বইটির চাহিদা থাকায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হল।

এই পুস্তকে বর্ণিত শিক্ষার বহুল প্রচার ও প্রসার কামনা করে পরিশেষে বলতে চাই যে, কা'বা গাত্রে স্থাপিত বেহেশতী পাথর হজরে আসওয়াদ যেমন অদৃশ্য জগতের বাস্তব অস্তিত্ব ঘোষণা করছে, তেমনি আল্লাহ্তায়ালা এই পুস্তককেও তাঁর মা'রিফাত ও দীদার লাভে ইচ্ছুক সাধকের চলার পথে আলোকবর্তিকা হিসাবে কবুল করুন। আমিন।

(এস. এম. রইসউদ্দিন)
পরিচালক ইনচার্জ ঢাকা
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.org

শোকর গোজার

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সকল প্রসংশা ও শোকরিয়া একমাত্র আল্লাহ্তায়ালার প্রতি-যিনি সৃষ্টির সেরা ও সর্বপ্রথম সৃষ্টি তাঁর মাহবুবকে মানবমন্ডলীর নেতা ও সর্বশেষ রাসূল হিসাবে মানবকূলে পাঠান, - যার খাতিরে তিনি আসমান- যমিন এবং এ দু'য়ের অন্তর্গত সব কিছু সৃষ্টি করেন। সেই রাসূল মকবুল (সাঃ) এর উম্মতকূলে আমাকে পয়দা করেন। ফলে তাঁর মাহবুবের উম্মত হয়ে নিজে ধন্য হয়েছি, সত্যের সন্ধান পেয়ে। এ জন্য তাঁর উদ্দেশ্যে লাখ লাখ শোকরিয়া জানাই। পূণ্যভূমি আরবের হাজার হাজার আউলিয়া দরবেশ পাঠিয়ে বাংলাদেশকে ধন্য করেছেন, যে দেশের মাটিতে এখন শুয়ে আছেন আরব আযমের অসংখ্য আউলিয়া কেরাম। বাংলাদেশের পূণ্য ভূমিতে ক্বদমীয়া তরীকা নায়িল করে এদেশকে ধন্য করেছেন এবং এই তরীকায় দাখিল হওয়ার সৌভাগ্য দান করে আমাকে ধন্য করেছেন। সেই মহান দাতার নিয়ামতরাজির শোকরিয়া আদায় করতে আমি অক্ষম, অসহায় এবং আমার ভাষা স্তব্ধ। যৌবনে কোন দিন কি কল্পনা করতে পেরেছি যে, "মা'রিফাত ও দীদার-এ-ইলাহীর" মত বই লিখে আল্লাহ্তায়ালার মহিমা ও তাঁর মা'রিফাতের কথা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রেখে যেতে পারব, যাতে তারা এ সত্যের সন্ধান লাভ করতে পারে। সবই মহান প্রতিপালকের মহান দান, এজন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা ও ক্ষমতা আমার নেই।

লাখ লাখ দরূদ ও সালাম সেই মহান সত্তার প্রতি যিনি সমগ্র সৃষ্টির কারণ এবং মহানরাব্বুল "আলামিনের প্রেমাস্পদ ও তাঁর রাসূল। তাঁর পায়ের জুতার একটি রেণু হওয়ার জন্য আমার দেহ মন প্রাণ ব্যাকুল, যদিও সে যোগ্যতা আমার নেই। বিশ্বপ্রতিপালকের ও বিচার দিবসের মালিকের দরবারে এই আমার দরখাস্ত ও আবেদন। তার অসীম রহমত ও দয়ার কারণে এই আশা হৃদয়ে পোষণ করি যেন তার হাবীবের জুতার একটি ধূলিকণা হতে পারি। এই পুস্তকখানি দিনের আলোতে আনার জন্য বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেডের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব এ.জেড. এম. শামছুল আলম সি. এস.পি. সাহেব, ইসলামী ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক জনাব আবদুল ওয়াদুদ, পরিচালনা বোর্ডের সদস্য জনাব আ.ক.ম. রফিকুল ইসলাম এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দকে জানাই কৃতজ্ঞতা। শত ব্যস্ততার মধ্যেও

www.pathagar.org

ইসলামী ফাউন্ডেশনের বিশ্বকোষ প্রকল্পের পরিচালক ও ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী সাহেব এর পাণ্ডুলিপি সংশোধন করে দিয়ে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। আমার পরম স্নেহভাজন অনুজপ্রতিম জনাব ফজলুল হাই চৌধুরী (সোহান) কম্পিউটার কম্পোজ তদারকি, সংশোধন ও প্রুফ রিডিং করে যে শ্রম দিয়েছেন, সেজন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারছিনা। এসব দ্বীনদার বুদ্ধিজীবী ও ইসলামী চিন্তাবিদদের আল্লাহ্তায়ালা দুনিয়া ও আখিরাতে এর পুরস্কার দিন, তাদের দোষ ত্রুটি ক্ষমা করে এ পুস্তকের উসিলায় তাদের জান্নাতুল ফিরদাউসে দাখিল হওয়ার তওফিক দান করুন, এ দোয়া করি। ইতি

তারিখঃ

ঢাকা, ১০ই জৈষ্ঠ ১৪০৩ বাংলা
৫ই মহররম ১৪১৭ হিজরী, ইং ২৪/০৫/৯৬

শায়েখ আলাউদ্দীন খান আল ক্বদমী
১৬/এ/বি, ১ম কলোনী
গাবতলী, মীরপুর, ঢাকা।
পোঃ জাহাঙ্গীরপুর, থানাঃ নান্দাইল
ভায়াঃ কিশোরগঞ্জঃ জিঃ ময়মনসিংহ।

www.pathagar.org

আরজী

সকল প্রসংশা আল্লাহ্তায়ালার। রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অজস্র দরূদ ও সালাম। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর এ অধম বান্দাকে তাঁর প্রিয় বান্দাদের ইবাদত পদ্ধতি, তাঁর প্রতি ইশ্ক ও তাঁর সাথে মিলনের ভিত্তি স্বরূপ তরীকতের বিষয়সমূহ পুস্তকাকারে প্রকাশ করার তওফীক দিয়েছেন এজন্য তাঁর মহান দরবারে কোটি হাম্দ ও শোকরিয়া জানাচ্ছি।

আউলিয়াগণের জীবন পদ্ধতিতে ব্যক্তি বিশেষে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকলেও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জাহেরী- বাতেনী স্বভাব চরিত্রের ছাঁচে গড়া। তাঁদের কারো দু'চারটে বিশেষ গুণ বেশী আছে কারো কিছু কম আছে, কেউবা সমস্ত গুণের কমবেশী অধিকারী। এ পুস্তকে সূফীগণের তাসাওউফ ও তরীকতের সাধনা পদ্ধতি এবং পার্থিব দুনিয়াতে এর ফলাফল হিসাবে নূরে ইলাহীর দ্বারা আল্লাহ্তায়ালা তাঁর নৈকট্য ও ঈমানের ব্যাপারে যে অদৃশ্য সত্যের জ্ঞান দান করেন, তার একটা মোটামুটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি যা সম্পূর্ণভাবে কোরআন ও সুন্নাত মুতাবিক। তরীকত ও শরীয়ত মোটেই আলাদা নয় বরং সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন একই দেহের একটি দীল ও দেমাগ, অন্যটি শরীরের অন্যান্য অংগ-প্রত্যংগ

তাসাওউফ ও তরীকতের সত্য আমার নিকট উদ-ঘাটিত হওয়ার পর আজ প্রায় বিশ বছর যাবত তরীকতের উপর একটি পুস্তক লিখার ইচ্ছা মনে মনে পোষণ করে আসছিলাম। কিন্তু আমি নিজেকে এর যোগ্য মনে না করায় চুপ থেকেছি। ভেবেছি যে, যেসব আউলিয়া অংশকে সমগ্র মনে করে নূরে ইলাহীর বিশ্লেষণ করেছেন তাঁদের থেকে আমার বর্ণনা কিছুটা পৃথক হতে বাধ্য। এতে হয়ত তাঁদের প্রতি আমার বেআদবি হতে পারে। কারণ তারাতো মিথ্যা বলেননি, বুঝতে গিয়ে ইজতিহাদে ভুল করেছেন, অংশকে সমগ্র মনে করেছেন। কিন্তু তাঁদের ত্যাগ-তিতীক্ষা অনেক বেশী। দ্বিতীয়তঃ ফায়েজসমূহ ও তরীকত বর্ণনা করলে লোকে হয়ত আমাকে বুযুর্গ মনে করবে, যা আমার জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে; আসলে আমিতো বুযুর্গদের পায়ের ধূলার সমানও নই, তাঁদের

www.pathagar.org

অনুসারী হওয়ার জন্য চেষ্টারত আছি মাত্র। এ দু'টো বিষয় ভেবে তরীকতের উপর লিখা থেকে বিরত ছিলাম। তথাপি জনসাধারণের মধ্যে তরীকত সম্মন্ধে অস্পষ্টতা ও রহস্যাবৃত্ততা দেখে মর্মাহত ছিলাম।

ইদানিং দেখতে পাচ্ছি তরীকতের অস্পষ্টতার সুযোগে একশ্রেণীর বিভ্রান্ত লোক তরীকতপন্থী পরিচয় দিয়ে তরীকতের নামে এমন সব পুঁথি-পুস্তক প্রকাশ করছে, যা শুধু তরীকত নয়, সুমহান ইসলামের ঈমান ও আকীদার উপর আঘাত হানছে এবং তা করা হচ্ছে তরীকত ও ইসলামের নামে। এরা শরীয়ত বিরোধী তথাকথিত মা'রিফাতপন্থী। মযযুব ও বিকৃত মস্তিষ্ক পাগলের মধ্যে পার্থক্য করার জ্ঞান পর্যন্ত এদের নেই অথচ তারা তরীকতপন্থী বলে পরিচয় দেয়। মযযুবের কারামত জাহির হয়। তাই দেখে মযযুবকে অনুসরণ করে এরা বিভ্রান্ত হয়। অথচ তরীকতের নিয়ম অনুযায়ী মযযুব অনুসরণীয় হতে পারে না। কারণ আল্লাহ্‌র প্রেম ছাড়া তাঁর সমস্ত জ্ঞান আল্লাহ্ ছিনিয়ে নেন।

আরেক দল আছে যারা প্রকাশ্যে নিজেদেরকে শরীয়ত বিরোধী নন বলে প্রচার করেন, পীর হিসাবে এরা ত্রাণকর্তা রূপে আবির্ভূত হয়ে প্রচার করেন, লোক জমায়েত করে দুনিয়াদার মানুষের দুনিয়ার সমস্যা, দোয়া ও তাবিজ-কবচ দ্বারা সমাধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যারা আল্লাহ্ পিপাসু হয়ে তাঁদের কাছে যান, তাঁদের শুধু সীমিত যিকির, তসবিহ- তাহলীল ও দোয়া-কালাম পড়তে দেন- যা হাদীস মুতাবিক যে কোন আলিম দিতে পারেন। এতে মুরীদগণ আল্লাহ্‌তায়ালার সাক্ষাত পান না এবং এর কারণও জানেন না। এভাবে তরীকতও শিক্ষা হয় না, আল্লাহ্‌তায়ালাকেও পাওয়া যায় না। স্বভাব চরিত্র বদল হয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর চরিত্র গুণ অর্জিত হয় না। পীর সাহেবের যদি আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছার ফায়েজ না থাকে এবং তরীকতের শিক্ষা না থাকে তবে তিনি কি ভাবে মুরিদগণকে তরীকত শিক্ষা দেবেন এবং আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছাবেন।

তরীকতের অতি আবশ্যকীয় জিনিস হল, শরীয়ত পালন ছাড়াও যিকির, মুহব্বত, ইরাদত ও তওহীদ। এগুলি শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি জানা এবং এর ফায়েজ অবশ্যই থাকতে হবে এবং ইরাদত সঠিক করার জন্য নাফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা অপরিহার্য। আল্লাহ্ পিপাসুগণ রিয়াযত ও মেহনত বরদাশত করতে রাজী, কিন্তু তারা তা না জানলে কিভাবে রিয়াযত-মেহনত করবেন? পীর

www.pathagar.org

সাহেবদের প্রতি লোকজনের ঝোঁক ও ভীড় দেখে মনে হয় এদেশের লোক ঈমানদার ও আল্লাহ্ পিপাসু।

তরীকতের নাম নানারূপ প্রতারনামূলক কার্যাবলী দেখে আরেক দল লোক তরীকত বা মা'রিফাত সম্পূর্ণ অস্বীকার করে শুধু জাহেরী শরীয়ত পালনের কথা বলেন। ইখলাস অর্জনের জন্য তরীকত অপরিহার্য, না হলে রিয়া ও ফাসেকি থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। শরীয়ত পালনের জন্যই তরীকত আবশ্যক।

তরীকতের উপর অস্পষ্টতা ও রহস্য যবনিকার আবরণ থাকার কারণে এ সব বিভ্রান্তি এসেছে, দিন দিন আসতে থাকবে। তাই আমার অযোগ্যতা ও অধমত্ব থাকা সত্ত্বেও লোকজনকে তরীকতের অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তি মুক্ত হয়ে মহৎ হওয়ার আহ্বান জানালাম। কারণ নিজে নিকৃষ্ট হলেও মহত্ত্বকে ভালবাসি। নিজে সত্যপরায়ণ না হলেও সত্যপরায়ণতাকে ভালবাসি। দ্বিতীয়তঃ এ আশায় এ পুস্তক লিখিত হল যে এ পুস্তকের উসিলায় আল্লাহ্তায়ালা হয়ত আমাকে মাফ করবেন। একজন লোকও যদি এ পুস্তকের অনুসরণ দ্বারা রিয়াযত ও মেহনত করে আল্লাহ্র ওলী হতে পারেন তবে আমার শ্রম সার্থক হবে, আশা পূরণ হবে।

আরেকটা উদ্দেশ্য এ পুস্তক রচনায় কাজ করেছে তা হল, জাগ্রত আলেমগণ ইসলামের সংকটে অথবা এতে বিকৃতি বা মিশ্রণ দেখলে সব সময় এগিয়ে এসেছেন। তরীকত রহস্যাবৃত থাকায় এ বিষয়বস্তুতে তাঁরা দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে পারছেন না। তাই অস্পষ্টতা দূর করে তাদের সমীপে বিষয়বস্তু প্রকাশ অপরিহার্য বিবেচিত হওয়ায় এ পুস্তক লিখিত হল।

আশা করি কোরআন- সুন্নাহ্র অনুগামী বলে এ পুস্তক পাঠেও ঈমানদার পাঠকগণের কিছুটা ফায়দা হবে, যদি এতে বিশ্বাস করা হয়। কারণ এ পুস্তকের বর্ণনার সাথে নূরে ইলাহী সংশ্লিষ্ট, এর পেছনে তা সত্য সাক্ষ্য স্বরূপ আছে। যা করতে বলা হয়েছে তা করলে নূর আসবে, যা করতে নিষেধ করা হয়েছে তা করলে অন্ধকার আসবে এবং অন্ধকারের পরিমাণ অনুযায়ী নূর ঢেকে দেবে বা খেয়ে ফেলবে। বিশ্বাস করলে ফায়দা হবে, যদি এ পুস্তকের যত জায়গায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নামের পর সংক্ষেপে (সাঃ) বলে দরূদ পড়তে বলা হয়েছে সেখানে যদি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দরূদ পড়া হয় এবং আমি অধম হিসাবে দোয়া প্রার্থী বলে যতবার পুস্তক পাঠ করা শেষ হবে তত বার আমার জন্য যদি এই দোয়া করা হয়, যাতে আল্লাহ্তায়ালা আমাকে মাফ করে

www.pathagar.org

হুজুর (সাঃ) এর কদম মুবারকের নীচে স্থান দেন। এতে আমার রূহের সাথে দোয়াকারীর রূহের একটা সংযোগ হবে। আমি এরূপ দোয়াকারীর জন্য রাব্বুল আলামীনের মহান দরবারে দোয়া করছি, আল্লাহ্তায়ালা যেন মেহেরবানী করে তাঁকে মাফ করেন এবং এ পুস্তকের ফায়েজসমূহ যেন অল্প পরিশ্রমে বখশিশ করেন এবং তাঁর উপর রহমত ও বরকত বর্ষণ করেন।

এ পুস্তক রচনায় আমার কোন কৃতিত্ব নেই। এ জন্য ক্বদমীয়া তরীকার ইমাম হযরত সূফী আমজাদ আলী শাহ্ (রহঃ) সাহেবের কাছে ও আমার শায়েখ হযরত আবদুল মুনঈম আনসারী (রহঃ) সাহেবের কাছে চিরঋণী; কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের উপর সালাম। ইচ্ছা ছিল এ পুস্তক সমাপ্ত করে সাহেবে বিলায়েত হযরত আবদুল মুনঈম আনসারী (রহঃ) সাহেব কেবলার অনুমোদনের জন্য পেশ করবো কিন্তু অর্ধেক পাণ্ডুলিপি লিখতেই তিনি ইন্তিকাল ফরমান, যার জন্য সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। তাঁর একজন অযোগ্য অনুসারী হিসাবে তরীকতের ব্যাপারে তাঁর শিক্ষা-দীক্ষাই এতে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেছি; আল্লাহ্তায়ালাই জানেন সফল হয়েছি কিনা? তাঁর উপরস্থ শিক্ষকদ্বয়ের শিক্ষক হলেন হযরত সৈয়দ আমজাদ আলী শাহ (রহঃ), তাঁর শিক্ষক স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর শিক্ষক স্বয়ং আল্লাহ্তায়ালা।

আলাউদ্দীন খান আল ক্বদমী
১৭ই সফর ১৪১১ হিজরী
২৩ শে ভাদ্র, ১৩৯৭ বাংলা
৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৯০ইং

www.pathagar.org

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
জ্ঞান ও ঈমান আকীদা	১৩
জ্ঞান	১৫
ঈমান	১৮
ইসলাম	২৮
আকল	৩৭
স্রষ্টার প্রেমিক	৪৫
তাসাওউফ	৬৫
তাসাওউফ ও তরীকত	৬৬
নাফসের পরিচয়	৬৯
অসৎ চরিত্রের পরিবর্তন	৭৯
মৃত্যু চিন্তা	৮৫
তওবাহ্	৮৮
যুহদ	৯১
সবর	১০৭
আলাহ্-ভীতি	১২০
ক্ষমা ও রহমতের আশা	১২৫
শোকর	১২৮
ইখলাস	১৩৮
তাওয়াক্কুল	১৪৭
প্রবৃত্তির হিসাব নেওয়া	১৫৪
সূফী	১৫৯

www.pathagar.org

বিষয় পৃষ্ঠা নম্বর

তরীকত ১৭১

যিকির ও তরীকত ১৭২

নবুয়ত ও তরীকতের ধারাবাহিকতা..... ১৮৯

তরীকা নাযিল ১৯৪

তরীকতের মাকামসমূহ ২০৬

(ফানাফিশ শায়েখ, ফানা ফিররাসূল, ফানা ফিল্লাহ, বাকা বিল্লাহ, আবদিয়াত ও মা'বুদিয়াত, নবুয়ত, মাহবুবিয়াতে মুহাম্মদী, হাকীকতে মুহাম্মদ ও হাকীকতে আলাহ্ জালা শানুহু)

তরীকতের শায়েখ ২৩০

অন্ধকার ও নূরের পর্দা ২৩৫

দীদার-এ-ইলাহী ২৪১

বিলায়েত ২৫৭

মুহব্বত ২৭১

ইরাদত ২৮১

www.pathagar.org

জ্ঞান ও ঈমান- আকীদা

www.pathagar.org

www.pathagar.org

জ্ঞান

অবিনশ্বর সত্যে বিশ্বাস এবং বিষয়কে সঠিক ও যথাযথভাবে জানার নাম জ্ঞান। জ্ঞান সৃষ্ট নয়, কারণ অবিনশ্বর সত্য সৃষ্ট হতে পারে না, যা জানার নাম জ্ঞান। আল্লাহ্তায়ালা অবিনশ্বর সত্য। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর বাক্যাবলী বা আয়াতসমূহ হতে পৃথক নন। তাই কোরআনও অবিনশ্বর সত্য-যা সৃষ্ট নয়। কোরআন হল স্রষ্টা ও সৃষ্টির অভিব্যক্তি আর বিশ্ব প্রকৃতি কোরআনের অভিব্যক্তি। কোরআন ও বিশ্ব প্রকৃতি আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞান ও গুণের প্রকাশ। কোরআনের সাথে সৃষ্টির সম্মন্ধ আছে, এই সম্মন্ধ থাকাতে আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞান ও গুণ সৃষ্ট হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সৃষ্ট হলেও আল্লাহ্র রাসূল, তাই তাঁর বাণীও অবিনশ্বর সত্য, যা জানার নাম জ্ঞান।

আল্লাহ্তায়ালা প্রকাশ্য ও গুপ্ত। এক দিকে তিনি যেমন দৃশ্যমান জড় জগতে প্রকাশিত, তেমনি অদৃশ্যমান নূরী জগতে ব্যাপ্ত। অর্থাৎ সমগ্র দৃশ্যমান জড় ও অদৃশ্য নূরী জগতে স্তরে স্তরে তাঁর জ্ঞান ও গুণরাজী প্রকাশিত করে তাঁর নিরাকার অস্তিত্ব ঘোষণা করছেন। দৃশ্যমান জড়জগতে তেমন তিনি তাঁর জ্ঞান ও গুণকে প্রকাশ করে তাঁর নিরাকার সত্তার প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন, তেমনি অদৃশ্য নূরীজগতেও তাঁর উপস্থিতি প্রকট করে তাঁর নিরাকার সত্তা যে দেহধারী নয়, অথচ অস্তিত্ব সর্বত্র বিরাজমান, এসত্যই পেশ করেছেন। দৃশ্যমান জড় ও অদৃশ্যমান নূরী জগতে মানুষ, ফিরিশতা ও জিনদের সৃষ্টি করে তাঁর জ্ঞান, গুণ ও ক্ষমতার দ্বারা তাঁর কার্যাবলী মারফত প্রমাণ করছেন যে, দেহধারী না হলেও তাঁর নিরাকার অস্তিত্বই সকল জ্ঞান, গুণ ও ক্ষমতার একমাত্র আধার ও উৎস। জড়জগত জড়ের দ্বারা, নূরী জগত নূরের দ্বারা অস্তিত্ববান হয়েও তাঁর একমাত্র নিরাকার, চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তশীল সত্তায় বিলীন।

দৃশ্যমান বিশ্ব প্রকৃতিতে যেহেতু তাঁর জ্ঞান ও গুণরাজী প্রকাশিত, তাই বিশ্বপ্রকৃতির নিদর্শনাবলীর সাহায্যে আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্ব ধরা যায়। জড়জগতে বস্তুগুলো যে বস্তু হয়েছে তা অন্য বস্তুর সাহায্যে। একটির অস্তিত্ব অন্যটির ওপর নির্ভরশীল করা হয়েছে, একটির সাহায্যে অন্যটিকে যেমন অস্তিত্ববান করা হয়েছে, তেমনি প্রতিটি বস্তুকে পরস্পর সম্মন্ধযুক্ত করে এবং কার্যকারণ সম্মন্ধের শৃংখলে আবদ্ধ করে তাঁর একত্বের তথা তওহীদের প্রমাণ দিয়েছেন।

www.pathagar.org

দৃশ্যমান জড়জগতের প্রতিটি দ্রব্য ও পদার্থ আল্লাহ্তায়ালার সৃষ্ট, সেগুলোকে সঠিকভাবে জানা মানে আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞান লাভ করা। তাই সমগ্র জ্ঞান স্রষ্টার। স্রষ্টার জ্ঞানের বাইরে কোন জ্ঞান নেই। মানুষ এতে ভুল ও মিথ্যা মিশিয়েছে। বৈজ্ঞানিকগণ প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয় আবিষ্কার করে যে জ্ঞানের পরিধি বাড়ায়, সে জ্ঞানে ভুল ও মিথ্যা না থাকলে সেসব জ্ঞানও আল্লাহ্তায়ালার।

সৃষ্টিরাজীর অনুধাবন ও বিশ্ব প্রকৃতির নির্দশনাদির দ্বারা আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞান, ক্ষমতা ও একত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়, সে সবের সাহায্যে স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে জ্ঞান লাভও করা যায়। এ জাতীয় দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। এরূপ জ্ঞান দ্বারা নিম্ন জগত হতে উর্ধ্ব জগতে উন্নীত হওয়া যায়। শক্তি জগত পর্যন্ত এ জাতীয় জ্ঞানের পরিধি। ইচ্ছা করলে বৈজ্ঞানিকগণ ও বিজ্ঞান নির্ভর দার্শনিকগণ এ জ্ঞান লাভ করতে পারেন যা আংশিক ও খন্ডিত জ্ঞান, সামগ্রিক নয়।

বস্তুর সাহায্যে নিদর্শনাদি দেখে ও নূরের পরিচয় লাভ করে, নূরে ইলাহীর মাধ্যমে দর্শন ও পর্যবেক্ষণ করে যে জ্ঞান লাভ করা হয় তা উর্ধ্ব হতে নিম্নে আগমণ করে এবং নিম্নের জ্ঞানকে উর্ধ্বের জ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্য ঘটায়। এ জ্ঞান যুক্তি-প্রমাণের চেয়েও এমনকি প্রত্যক্ষ দর্শনের চেয়েও অগ্রবর্তি ও নিশ্চয়াত্মক। নবী-রাসূল ও আউলিয়া-ই-কেরাম নূরে ইলাহীর দ্বারাই আল্লাহ্তায়ালার অখন্ড জ্ঞান লাভ করেন। যে কেউ নূরে ইলাহীর দ্বারা জড় ও নূরী জগতের জ্ঞান লাভ করে আল্লাহ্তায়ালার নিরাকার সত্তার পরিচয় লাভ করতে পারেন, যদি তিনি স্রষ্টার ভালবাসা লাভে সক্ষম হন। সে ভালবাসা লাভ করতে হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণে নিজেকে গুণান্বিত করতে হবে।

সৃষ্টির আদি উৎসে হাকীকতে মুহাম্মদীর প্রতি আল্লাহ্তায়ালা তাঁর মুহব্বত এলকা (নিক্ষেপ) করেছিলেন, যা ছিল নূরে মুহাম্মদী ও নূরে আহমদীর মিলিত প্রকাশ। আদেশ মারফত সৃষ্টির এ আদি উৎস সৃষ্টি করে পরবর্তীতে এর মাধ্যমে অদৃশ্য নূরী জগত এবং নূরকে যৌগিক করে দৃশ্যমান জড় জগত সৃষ্টি করেন, ফলে সে মুহব্বত তামাম সৃষ্টিতে ব্যাপ্ত হয়ে যায়। তাই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সৃষ্টিকে ভালবাসলে আল্লাহ্তায়ালার ভালবাসা পাওয়া যায়। সৃষ্টিসহ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আল্লাহ্ নির্দেশিত আনুগত্যের মাধ্যমে ভালবাসতে হবে। পরে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ভালবাসা স্রষ্টার প্রতি ভালবাসায় রূপান্তরিত হবে।

দৃশ্যমান জড় প্রকৃতির নিদর্শনাদি, সৃষ্টি ও প্রতিপালন কৌশলের জ্ঞান দ্বারা আল্লাহ্তায়ালা প্রচ্ছন্ন থেকেও মহাশক্তির দ্বারা যে এ জড়জগত পরিচালিত, তা

www.pathagar.org

প্রকাশিত হয়ে পড়েছে, বহু বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যেই তাঁর একত্ব প্রমাণিত হচ্ছে। জড় বস্তু নূরী স্তরের দ্বারা যৌগিকত্বের মাধ্যমে সৃষ্ট হয়েছে। নূরী স্তর চর্ম চোখে দেখা যায় না। তিনি যে জাহের ও বাতেনে বা অদৃশ্য জগতে আছেন বুঝা যায়।

জড়জ্ঞান খন্ডিত জ্ঞান। খন্ডিত জ্ঞান দ্বারা অখন্ড জ্ঞান আয়ত্ত্বে আসতে পারে না। কারণ খন্ড, অখন্ডকে পরিবেষ্টন করতে পারে না। ফলে জড় জ্ঞানীদের কাছে এক মহাশক্তি রূপে আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্ব আবিষ্কৃত ও প্রমাণিত হলেও তাঁর আসল স্বরূপ বুঝতে ও জানতে পারে না। অবশ্য জড় জগতের বস্তু বা বিষয় গুলিকে সঠিকভাবে জানলে তা কোরআনের অনুগামী হয়। এর কারণ বিশ্ব প্রকৃতি আল্লাহ্তায়ালার কার্য, তাঁর কার্যাবলী নিঃসন্দেহে তাঁর বাক্যাবলীর অনুগামী হবে।

অখন্ড সামগ্রিক জ্ঞান অর্জন করতে হলে পঞ্চমইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের বাইরে অদৃশ্য জগতকে বিশ্বাস করতে হবে। আর অদৃশ্যে বিশ্বাসের নামই ঈমান।

"যারা শাশ্বতবাণীতে বিশ্বাসী, তাদের আল্লাহ্ ইহজীবনে ও পরজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং যারা জালিম আল্লাহ্ তাদের বিভ্রান্তিতে রাখবেন।"১৪ঃ২৭।

আল্লাহ্তায়ালার বাণী কোরআন আর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বাণী হাদীস শাশ্বতবাণী। এ বাণী বা বাক্যাবলীতে বিশ্বাসীগণকে ঈমানদার বলে। কেবলমাত্র ঈমানদারগণই আল্লাহ্তায়ালার জড়জগতের প্রকৃতিপুঞ্জ দেখে সেগুলির আদি ও অন্ত জেনে এবং অদৃশ্যে না দেখেও বিশ্বাস করে অখন্ড জ্ঞান লাভ করতে পারে। কারণ তারা বিষয়কে যথাযথভাবে জানতে পারে।

"যারা কুফরী করে তারা মিথ্যার অনুসরণ করে এবং যারা ঈমান আনে তারা তাদের প্রতিপালক প্রেরিত সত্যের অনুসরণ করে।" ৪৭ঃ৩

জগতে সত্য একমাত্র আল্লাহ্তায়ালা কর্তৃক নাযিলকৃত আর সব মিথ্যা বা সত্য মিশ্রিত মিথ্যা-যা অসত্য। যারা সাকুল্য সত্য বা তার সামান্য অংশ-বিশেষ অস্বীকার করে বা স্রষ্টার বিরোধিতা করে তারাই কাফির। যারা সাকুল্য সত্য মেনে নেয় ও সে অনুযায়ী সৎকাজ করে তারা ঈমানদার। "সত্য উহাই যা তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে প্রাপ্ত। সুতরাং তুমি সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।" ২ঃ১৪৭

www.pathagar.org

ঈমান

আল্লাহ্তায়ালা ও তদীয় রাসূল (সাঃ)-এর কথা বিশ্বস্ততার নিরিখে মনে-প্রাণে মেনে নেওয়া ও অদৃশ্য সত্যে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করার নাম ঈমান।

আল্লাহ্তায়ালা পাক কোরআনে ঈমানদারগণের পরিচয় এভাবে দিয়েছেন- "যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে এবং সালাত কায়েম করে, আর আমি তাদের যে রুযী দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে। এরা যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সে সব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং সে সব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখিরাতে যারা নিশ্চিত বিশ্বাস করে। তারাই তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে হেদায়েত প্রাপ্ত, আর তারাই যথার্থ সফলকাম।" ২ঃ৩-৫।

সালাত বা নামায

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্পাকের সংজ্ঞা অনুযায়ী নামায কায়েমকে অত্যন্ত জরুরী ভিত্তিতে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যারা নামায কায়েম করবে না, তারা নিঃসন্দেহে ঈমানদার নয়। সূফী দরবেশদের মধ্যে যারা নামায কায়েম করবে না তারা নিঃসন্দেহে ঈমানদার নয়। এ হিসাবে তারা নিজেদের সূফী বলে দাবী করতে পারে না, দাবী করলেও তা অসার হবে। যারা তাদের সূফী বলে মনে করবে তারাও পথভ্রষ্ট।

কাফেরকেও আল্লাহ্তায়ালা দুনিয়াতে ধন-দওলত দান করেন। তার ভাল কাজের পুরস্কার ইহকালেই দান করেন। সেরূপ কোন বেনামাযী সূফী নামধারী ব্যক্তি যদি তরকে দুনিয়া হয়ে সব সময় আল্লাহ্তায়ালার যিকির করে তবে আল্লাহ্তায়ালার আইন অনুযায়ী তার অন্তরচোখ হয়ত খুলতে পারে, ইস্তিদরাজও হয়ত জাহির হতে পারে, তবে তা হবে তার দুনিয়ার প্রাপ্য। আখিরাতে তার শাস্তি পাওয়ার আশংকাই বেশী। দুনিয়াতে সে প্রথমে হেদায়েতের নূর পাবে, তাতে হেদায়েত না হলে সে নূরও ছিনিয়ে নেবার আশংকা আছে, শয়তানকে তার সাথী করে দেওয়া হবে। সে নেককার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। আগুন, বাতাস, মাটি ও পানির দ্বারা যেসব কালের গঠিত, অন্তরচোখ দ্বারা সেগুলোতেই ঘুরপাক খাবে। শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপের দরুণ, নাফ্স শয়তান তার নূরকে ঢেকে দেবে এবং সে অন্ধকারে নিমজ্জিত

www.pathagar.org

হবে। সাবধান! বেনামাযী সূফীর অনুসারী সেজে জাহান্নাম অর্জনের দিকে অগ্রসর হওয়া কারও উচিত নয়। সে যত ইসতিদরাজই দেখাক না কেন? দজ্জালের কাছে কম ইসতিদরাজ থাকবে না। আল্লাহ্তায়ালার শত্রু বা শরীয়ত বিরোধী ব্যক্তি হতে যে অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ হয় তাকে ইসতিদরজা বলে। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর দুশমনকে ইহকালে সম্ভ্রান্ত ও পরকালে লাঞ্ছিত করার জন্য তার মনোবাসনা পূর্ণ করে দেন। এতে তাদের অবাধ্যতা, অহংকার ও পাপ বৃদ্ধি পায়। বেনামাযী বেআমল শুধু যিকিরকারী ইসতিদরাজওয়ালা সূফী নামধারী ও তার অনুসারীরা বিভ্রান্ত।

আল্লাহ্তায়ালা আর এক আয়াতে বলছেন- "যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, আর তারাই আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী" ৩১ঃ৪।

অদৃশ্যে বিশ্বাস

ঈমানের সাথে সর্ব প্রথম অদৃশ্যে বিশ্বাসকে শর্ত করা হয়েছে। অদৃশ্য সে সকল বিষয় যা কোরআন-সুন্নাহতে আছে। আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্ব, সত্তা, তাঁর স্বরূপ, গুণাবলী ও তকদীর সংক্রান্ত বিষয়াবলী, বেহেশত, দোযখ, কিয়ামত, হাশর ও হাশরের ঘটনাসমূহ ইত্যাদি যে সকল ঘটনা কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, যার ব্যাখ্যা হিসাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করে গেছেন, যা গায়েবের অন্তর্গত। সেগুলোকে বিশ্বাস ও মান্য করার নাম ঈমান।

কেবল জানার নাম ঈমান নয়। ইবলিস শয়তান এ সব বিষয় জানে, কিন্তু না মানার কারণে বেঈমান। এসব বিষয়গুলোকে বিশ্বাস করে যখন আল্লাহ্র ভয়ে তাঁর আদেশ-নিষেধ মানবে তখনই তাকে ঈমানদার বলা হবে। সে ঈমানদার কিনা তা পরীক্ষার জন্য অদৃশ্য বিশ্বাসের সাথে শারীরীক ইবাদত নামায ও আর্থিক ইবাদত যাকাত ও দান-খয়রাতকে ঈমানের অপরিহার্য বিষয় হিসাবে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। ঈমান বজায় রাখার জন্য নামায কায়েমের পর যাকাত ও দান খয়রাত করতে হবে। আরেক আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, "তোমরা যা ভালবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত কখনও পূণ্য লাভ করতে পারবে না।" ৩ঃ৯২।

নামায, যাকাত ও দান-খয়রাত ঈমানের অংগ হওয়ায় এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, ইসলামতো নয়ই, ঈমানও পাশ্চাত্যের ভাববাদ নয়। মনের ভক্তিমূলক অনুভূতিকেই তারা ধর্ম বলে। আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্বে বিশ্বাসকে ভাববাদ বলে- স্রষ্টার স্বরূপ যাই হউক। ঈমান ও ইসলাম দু'টোতেই আল্লাহ্ নির্দেশিত কর্মবাদ আছে। তেমনি আছে স্রষ্টার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস।

www.pathagar.org

পরের আয়াতে অদৃশ্যে বিশ্বাসের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি যা নাযিল হয়েছে অর্থাৎ পাক কোরআনের সাকুল্য আয়াত এবং পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের নিকট যে সব কিতাব নাযিল হয়েছে তাতেও বিশ্বাস করা ঈমানের অংগ।

কোরআনে যেসব অদৃশ্যের কথা আছে, তার মধ্যে প্রধানত আছে, আল্লাহ্তায়ালার নিরাকার অস্তিত্বের কথা। তিনিই একমাত্র সৃষ্টি কর্তা ও উপাস্য, তাঁর কোন শরীক নেই, একমাত্র তিনিই একক অবিভাজ্য সার্বভৌমত্বের অধিকারী বলে ঘোষণা করে তাঁর স্বরূপ, গুণরাজি ও সর্বব্যাপী ক্ষমতার কথা কোরআনে জানিয়েছেন। তাঁর কোন শরীক থাকলে মতানৈক্যের কারণে সৃষ্টিতে বিশৃংখলা দেখা দিয়ে সব ধ্বংস হয়ে যেত।

আল্লাহ্তায়ালা অনাদি, অনন্ত, চিরস্থায়ী। তিনি তাঁর গুণে, নামে ও কাজে প্রসংশিত। তিনি সৃষ্টি করেন, প্রতিপালন করেন, রিযিক দেন, আবার তিনিই মৃত্যু ঘটান, সমগ্র সৃষ্টি তাঁর মুখাপেক্ষী, কিন্তু তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তাঁর সমকক্ষ কিছুই নেই।

কোরআনে যেখানে আল্লাহ্তায়ালার হাত, মুখ, শরীর এবং আরশে স্থিত হওয়ার কথা আছে, সেগুলি তাঁর গুণ, কোন কিছুর সাথে তাঁর তুলনা বা উপমা হতে পারে না। মানুষের মত তাঁর অংগ নেই- তিনি নিরাকার। আল্লাহ্তায়ালা বলেন, "যাদের অন্তরে সত্য লংঘনের প্রবণতা রয়েছে শুধু তারাই ফিতনা এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে।" ৩ঃ৭। আল্লাহ্তায়ালার হাত, পা, মুখ ও আরশে বিরাজমান কোরআনে থাকার কারণে এতে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে, এগুলোকে গুণ বলে জানতে হবে, কিন্তু এর ব্যাখ্যা আল্লাহ্তায়ালাই জানেন।

কোন জিনিস কিভাবে সৃষ্টি করবেন তা প্রথমে লওহে মাহ্ফুযে লিখেছেন, পরে তাঁর আদেশ ও ইচ্ছায় সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে।

মানুষ ও জিনকে ঈমান ও কুফর হতে পৃথক রেখে সৃষ্টি করেছেন। নবী-রাসূল মারফত ইবাদত করার এবং পাপ থেকে বেঁচে থাকার আদেশ-নিষেধ করেছেন। তিনি ভালমন্দ সৃষ্টি করে মন্দ পরিহার করে ভাল গ্রহণ করতে আদেশ দিয়েছেন। যারা তাঁর আদেশ অমান্য করে মন্দকে গ্রহণ করবে- পরীক্ষাক্ষেত্র হিসাবে দুনিয়াতে আল্লাহ্ তাদের মন্দ কাজ করতে বাধা দিবেন না। যে সব ভাল ও মন্দ কাজ সংগঠিত হয় তা তার অনুমতি ক্রমেই সংগঠিত হয়। তবে ভাল ও মন্দের পরিণাম ভাল ও মন্দ হবে। তওবাহ্ করে মাফ না চাইলে আখিরাতে মন্দ

www.pathagar.org

কাজ জাহান্নামে নিয়ে যাবে। ভাল কাজ করলে আল্লাহ্পাক মদদ দিবেন এবং ভাল আমলের জন্য তাকে জান্নাত নিয়ে যাবেন। আল্লাহ্ পাক অত্যাচারী শাসকদের মত নন যে, কারো উপর জুলুম করবেন। প্রত্যেকের ভাল-মন্দ আমল তাকে জান্নাত ও জাহান্নামে নিয়ে যাবে।

আখিরাতে বিশ্বাস

আখিরাতে বিশ্বাস ঈমানের অংগ। দুনিয়াতে আমরা যা করি পরকালে তার কর্মফল পাব। হাশর বা কর্মফল দিবসে মানুষ ও জিনদের দুনিয়ার কার্যাবলীর মূল্যায়ন হয়ে যে যা অর্জন করেছে, সে অনুযায়ী জান্নাত ও জাহান্নামে যাবে। মৃত্যুর পর নেককারদের আত্মা আমলনামাসহ পুনরুত্থান পর্যন্ত ইল্লিয়্যীনে থাকবে আর পাপীদের আত্ম্য তার আমলনামাসহ সিজ্জীনে থাকবে।

আল্লাহ্ পাক বলেছেন-"অবশ্যই নেককারদের আমলনামা ইল্লিয়্যীনে" ৮৩ঃ১৮।

"পাপীদের আমলনামা তো সিজ্জীনে।" ৮৩ঃ৭।

ঈমানদার হতে হলে অবশ্যই আত্মার অমরতা স্বীকার করতে হবে। দুনিয়ার ভাল-মন্দ কার্যাবলীর পুরস্কার ও শাস্তি হাশরে স্থির হবে, তাতে নেককারগণ বেহেশতে ও গুনাহগারগণ দোযখে যাবে এবং কিয়ামতের পর পুনরুত্থানের পূর্বে বরযখে ইল্লিয়্যীনে বা সিজ্জীনে থাকবে-এ কথা বিনা যুক্তি-প্রমাণে বিশ্বাস করে দুনিয়াতে ইবাদত ও জীববৃত্তি চালাতে হবে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের যুক্তি-প্রমাণ দৃশ্যমান জগত পর্যন্ত-অদৃশ্য জগতে তা অচল, যতক্ষণ না অদৃশ্য জগত তার সামনে উদ্ভাসিত হবে।

এই দুনিয়াতেও অদৃশ্য সত্য তার সামনে উদ্ঘাটিত হতে পারে, যদি সে অদৃশ্য সত্যে বিশ্বাস করে আল্লাহ্ ভিন্ন সমস্ত পদার্থ, চিন্তা-ভাবনা মন থেকে দূর করে দিতে পারে। কি ভাবে এটা সম্ভাবপর তার নিয়ম-পদ্ধতি রাসূল মকবুল (সাঃ) নিজের জীবন ও বাণীর দ্বারা স্থির করে দিয়ে গেছেন। সেটাই আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছার পদ্ধতি। অদৃশ্যে বিশ্বাস করে ঈমান-আকীদা সঠিক করে ইসলামে পরিপূর্ণ দাখিল হয়ে ইসলামের রোকনসমূহ পালন করে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছার নিয়ম-কানুন শিক্ষা ও পালনের জন্য তরীকতে দাখিল হতে হয়।

ঈমানের মূলমন্ত্র

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্" হলো ঈমানের মূলমন্ত্র। এতে আন্তরিক বিশ্বাস এবং মুখ ও কাজের ভিতর দিয়ে তা প্রকাশ করার নাম ঈমান।

www.pathagar.org

লা ইলাহার দ্বারা সমস্ত উপাস্য যথা-মূর্তি, প্রকৃতি, প্রভাবশালী ব্যক্তি ও নিজ প্রবৃত্তি ইত্যাদি- যে গুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও তাগুত সংগঠিত হয়ে ইসলাম বিরোধী ও পরিপন্থী জীবন পদ্ধতি এবং মতবাদ গঠন করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ অস্বীকার ও অমান্য করতে হবে। এগুলো ইলাহ নয় বলে জানতে হবে, তেমনি জানতে হবে যে বিভিন্ন উপায় ও জীবন উপকরণও ইলাহ নয়। সমস্ত উপায়-উপকরণ ও মানুষের কর্মক্ষমতা আল্লাহ্তায়ালাই সৃষ্টি করেছেন।

উপাস্য হলো, একমাত্র আল্লাহ্তায়ালা। অতঃপর তাঁর বাক্যাবলীর সাহায্যে কোরআনে যা ব্যক্ত হয়েছে সেসবে বিশাস এবং কোরআনে ব্যক্ত সব আদেশ-নিষেধ মানার নাম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্তে বিশ্বাস। একমাত্র তিনিই আল্লাহ্তায়ালা, যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক, মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও পালন কর্তা। সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁরই, তিনিই একমাত্র আইনদাতা। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। সব সৃষ্টি তাঁর মূখাপেক্ষী, অথচ তিনি কারো মূখাপেক্ষী নন। ইচ্ছা করলে যে কোন অভাবীর প্রার্থনা মঞ্জুর করে অভাব পূরণ করতে পারেন।

এই মহামন্ত্রের শেষাংশ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহতে হুজুরের সমগ্র রিসালাত ও সুন্নাহকে ঈমানের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। ফলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্-আল্লাহ্তায়ালা সহ সমগ্র কোরআন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর রিসালাতসহ সমগ্র সুন্নাহ্তে বিশ্বাস ও মান্য করা বোঝাচ্ছে। কারণ আল্লাহ্পাক তাঁর বাক্যাবলী হতে পৃথক নন। তেমনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ও সুন্নাহ্ হতে পৃথক নন, নইলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্তে বিশাস ও মান্য করা হলো না। যদি এ কালেমাতে বিশ্বাস করে এতে অন্য কিছু মিশ্রিত না করে কেউ মৃত্যু মুখে পতিত হয়-তবে সে বেহেশতে যাবে বলে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলে গেছেন। শর্ত হলো কালেমার প্রথম অংশ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহতে যদি শির্ক ও কুফর মিশ্রিত না করে। কোরআনের একটা আয়াত ও অস্বীকার করলে ঈমান থাকবে না।

তাই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনার ফলে কোরআন ও সুন্নাহ্র উপর আল্লাহ্ নির্দেশিত ইসলামী জীবন পদ্ধতি গড়ে উঠেছে।

আল্লাহ্তায়ালা, কোরআন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর সুন্নাহ বা জীবন পদ্ধতিকে বিশ্বাস করে যে মানবে সেই ঈমানদার হবে।

কেউ ঈমানের সাথে অন্য কিছু মিশ্রিত করলেই তাঁর ঈমানের উপর জুলুম করা হলো আর ঈমানের উপর জুলুম করার অর্থ হলো নিজ আত্মার উপর জুলুম করা, কারণ বেহেশ্তে যাওয়ার একমাত্র শর্ত ঈমান। যার ঈমান নেই তাকে আল্লাহ্তায়ালা মাফ করবেন না। ঈমানের সাথে মরলেও যতটুকু অন্য কিছু

www.pathagar.org

মিশ্রিত করবে, আখিরাতে হাশরে ও দোষখে ততটুকু শাস্তি ভোগ করবে, যদি আল্লাহ্তায়ালা মাফ না করেন। তাই ঈমানের উপর জুলুম করার অর্থই হল নিজ আত্মার উপর জুলুম। কুফর নিয়ে মরলে আল্লাহ্পাক মাফ করবেন না বলে ওয়াদাবদ্ধ। কেউ শিরক-কুফর করে ফেললে তখনই তওবাহ্ করে ঈমানে প্রত্যাবর্তন করা দরকার।

যে কোন উপাস্যকে মনগড়া আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে সমাজের প্রভাবশালীরা সেই মনগড়া আদর্শকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগিয়ে আদেশ, নিষেধ বা আইন-কানুন তৈরী করে। অতঃপর আদর্শের প্রলেপে জনগোষ্ঠী দ্বারা তা মানাতে ও পালন করাতে পারলে একটা আল্লাহ্ ভিন্ন জীবন পদ্ধতি গঠন করা যায়। পূর্বকালে বিভিন্ন মূর্তিকে উপাস্য করে ক্ষমতাশালীরা তাদের স্বার্থানুযায়ী অসত্য-বিশ্বাসের চেতনার উপরে জীবন পদ্ধতি গঠন করতো। বর্তমান কালে মূর্তির বদলে জনগণকে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক ঘোষণা করে বিভিন্ন মতবাদ সৃষ্টি করেছে এবং আল্লাহ্তায়ালার একক অবিভাজ্য সার্বভৌমত্বের মুকাবিলায় দাঁড় করানো হয়েছে। পাশ্চাত্যের মুশরিক শক্তি যখন প্রাচ্য দখল করে নেয়, তখন জনগণের সার্বভৌমত্বের নামে শাসকদের সার্বভৌমত্বের আমদানী করে। মানবীয় সার্বভৌমত্বের উপর গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম মতবাদ দ্বারা দুনিয়া ব্যাপী কুফর ও শিরকের প্রবর্তন করা হয়েছে। গণতন্ত্রের সার্বভৌমত্ব জনগণের নামে শাসকদের আল্লাহ্তায়ালার সার্বভৌমত্ব না মানলে ঈমানদার হওয়া যায় না। গণতন্ত্রের আইনদাতা সার্বভৌম সংসদ। অথচ আল্লাহ্তায়ালাই একমাত্র আইনদাতা বলে পাক কোরআনে তিনি ঘোষণা করেছেন। এ কথা যে মানবে না সে ঈমানহারা হবে। ইসলামে সার্বভৌমত্ব ও আইন আল্লাহ্তায়ালার, কিন্তু আল্লাহ্তায়ালার আইন মুতাবিক শাসন হলো নিরপেক্ষ ও সাম্য ভিত্তিক। গণতন্ত্র সুদের কারবারের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুদের লগ্নীর জন্য এর জন্ম হয়েছে।

আদি যুগ হতেই দুনিয়াতে মুশরিকরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এর কারণ দু'টো, প্রথমটি হলো আকলকে আত্মার সহজাত করে দেওয়ায় আকল ও আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম আল্লাহ্তে আত্মসমর্পণ করা। নাফ্স সৃষ্টির সময়েই অবাধ্য ছিল, শাস্তি দিয়ে আল্লাহ্তায়ালা তাকে বাধ্য করেছিলেন। নাফ্স ঈমান প্রত্যাখ্যান করে কুফরীর দ্বারা ঈমান ঢেকে দেয়। আকল ও আত্মার স্রষ্টার প্রতি একটা আকর্ষণ থেকে যায়। দ্বিতীয়তঃ মুশরিকরা নিজেদের খুব চালাক বলে মনে করে। তারা মনে করে আল্লাহ্তায়ালাকেও বিশ্বাস করব নিজের ব্যক্তিস্বার্থের ক্ষতি না করে। যতদূর পারি তাঁর আদেশ-নিষেধ মানবো যাতে আখিরাতে শাস্তি না পাই। আর দুনিয়ার আয়-উন্নতি ও নাম যশের জন্য মানবীয় সার্বভৌমত্ব মানবো, যা

www.pathagar.org

মূর্তি বা বিভিন্ন মতবাদের প্রলেপে আসে। এতে দুনিয়া এবং আখিরাত দু'টোই পাওয়া যাবে। আদি কাল হতেই অধিকাংশ আদম সন্তান এ মনোভাবের জন্য মুশরিক রূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে, এই মুশরিকরাই যখন আল্লাহ্তায়ালার আইনের অথবা স্রষ্টার আইনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠাকারীদের সক্রিয় বিরোধীতায় লিপ্ত হয়, তখন কাফের বনে যায়। বিনা তওবায় শিরক ও কুফর নিয়ে মৃত্যু হলে আল্লাহ্তায়ালা তাদের মাফ না করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন বলে ওয়াদাবদ্ধ। আল্লাহ্তায়ালার সার্বভৌমত্বের সাথে মানবীয় সার্বভৌমত্ব মানা শিরক, শুধু মানবীয় সার্বভৌমত্ব মানা কুফর।

এ কথাগুলো এখানে এ কারণে বলা হলো যে, ঈমান নষ্ট করে তাসাওউফ ও তরীকত অবলম্বন করে কোন ফল হবে না- বরং এ লাইনে কোন অগ্রগতি না দেখে নিরাশ হবে। বর্তমানে চক্রবৃদ্ধি হারে এ বিষয়টা বেড়ে চলেছে যে, অর্থ ও ক্ষমতার লোভে ঈমানের মূলমন্ত্র কালেমা তাইয়্যেবাকে বাদ দিয়ে অনেকে পাশ্চাত্য মুশরিকদের দেওয়া মতবাদের পিছনে ছুটে পেরেশানীর মধ্যে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। আখিরাতের বদলে জাহান্নাম খরিদ করে প্রবৃত্তির খায়েশ পূরণ করছে। ঈমানদারগণের এর থেকে সতর্ক থাকতে হবে।

আল্লাহ্তায়ালা এদের সম্পর্কে বলেছেন- "তারা আল্লাহ্র সমকক্ষ উদ্ভাবন করে, তাঁর পথ হতে বিভ্রান্ত করার জন্য। বল, ভোগ করে নাও, পরিণামে অগ্নিই তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল।" ৪৪ঃ৩০।

যে ব্যক্তি এ সব মতবাদ এবং মতবাদের ইলাহ্দের অস্বীকার ও বর্জন করে রিযিকদাতা রূপে আল্লাহ্তায়ালাকে জেনে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে আন্তরিকভাবে বলে- "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্", সে সত্যিই ঈমানদার হলো। আর যারা আল্লাহ্কে ছাড়া মানবীয় সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের অধিকারী নেতাদের কাছে তাদের উপকারের জন্য আহবান জানায় বা উপকার আশা করে তাদের অনুসারী হয়। তাদের সম্মন্ধে আল্লাহ্তায়ালা বলেন-"সে ডাকে এমন কিছুকে যার ক্ষতিই উহার উপকার অপেক্ষা নিকটতর। কত নিকৃষ্ট এই অভিভাবক, কত নিকৃষ্ট এই সহচর।" ২২ঃ১৩।

"ওদের কি সার্বভৌমত্ব আছে, আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও তাদের অন্তবর্তী সমস্ত কিছুর উপর, থাকলে সিঁড়ি বেয়ে আরোহন করুক।" ৩৮ঃ১০

সার্বভৌমত্ব খন্ডিত হয় না, খন্ডিত হলে, অখন্ড না থাকলে তা আর যাই হউক সার্বভৌম হতে পারে না, যা তারা মানছে। যদি মানবীয় সার্বভৌমত্ব থেকে থাকে তবে মৃত্যুকে রোধ করুক। আল্লাহ্তায়ালার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুক। যারা মানবীয় সার্বভৌমত্ব না মানার জন্য অন্যকে শাস্তি দেয়, তারা আল্লাহ্তায়ালার সত্যিকার

www.pathagar.org

আসল সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ করে, না মানার কারণে কিরূপ শাস্তি পাবে তা সহজেই অনুমেয়। মানবীয় সার্বভৌমত্ব ঈমানের জন্য সব চেয়ে বড় পরীক্ষা স্বরূপ দেখা দিয়েছে।

যারা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" এ কালামের সাথে এ জাতীয় জঞ্জাল না মিশিয়ে আল্লাহ্তায়ালা, তাঁর একত্ব ও সার্বভৌমত্ব এবং কোরআন ও সুন্নাহ্কে মেনে এ কালেমার সাক্ষী দেয়, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ হযরত ওবাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন,- "যে কেহ সাক্ষ্য দেয়- আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল- আল্লাহ্ তাঁর জন্য দোযখ হারাম করবেন।" মুসলিম।

হযরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) বলেছেন,- 'দু'টি ঘটনা অবশ্যই ঘটবে। একজন লোক জিজ্ঞেস করলেন- 'সে দু'টি ঘটনা কি?' তিনি জওয়াব দিলেন,-"আল্লাহ্র নিকট নিকৃষ্ট জীব তারাই, যারা কুফরী করে এবং ঈমান আনে না।" ৮ঃ৫৫।

সব কিছুর সার হলো এ কালিমা, আর এ কালিমার সার হলো তওহীদ। অর্থাৎ সব কিছু আল্লাহ্পাক দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে, সব কিছু আল্লাহ্তায়ালার দ্বারা ঘটছে, সব কিছু পরিবর্তনের মাধ্যমে তাঁর একত্বে বিলীন হচ্ছে বা হবে। যার যা তকদীরে আছে তাই ঘটবে। মানুষসহ প্রাণীজগত, জড়জগত এবং নূরী জগতে যাকে যতটুকু কর্মক্ষম করেছেন, যে ততটুকু কর্মক্ষম হয়েছে। সবার কর্ম ও শক্তি আল্লাহ্তায়ালার দান। ভাল-মন্দ সব কিছু তিনিই সৃষ্টি করেছেন। সব কিছুর মূলে আল্লাহ্তায়ালা। সৃষ্টির প্রতি যা যা প্রত্যাদেশ করেছেন সব কিছু সে ভাবেই চলছে। মানুষ ও জিনের প্রতি ওহী পাঠিয়েছেন স্বেচ্ছায় মন্দকে পরিহার করে ভাল গ্রহণ করতে। সে স্বেচ্ছায় প্রত্যাদেশ মেনে চলবে আল্লাহ্ তাকে বেহেশতে সুখ স্বাচ্ছন্দে রাখবেন, যে তাঁর প্রত্যাদেশ বা ওহী অমান্য করবে তাকে দোযখে শাস্তি দেবেন।

অদৃশ্যে বিশ্বাসের নাম ঈমান। পাক কোরআনে যত অদৃশ্যের কথা বলা হয়েছে, যে গুলো পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুধাবন করা যায় না। যেমন আল্লাহ্তায়ালা, নবুয়ত-রিসালাত, ওহী, ফিরিশ্তা, কিয়ামত, হারাম-হালাল, বেহেশত, দোযখ, জিন ও শয়তান ইত্যাদি। এ সব অদৃশ্য সত্যে বিশ্বাস করার নাম ঈমান। অদৃশ্য সত্যে বিশ্বাস আবার তিন রকম, যথাঃ ১। ইলমুল ইয়াকীন। কোরআন, হাদীস ও ফিকাহ্ পড়ে বা কারো থেকে জেনে যে জ্ঞান লাভ হয় তাতে বিশ্বাস করার নাম ইলমুল ইয়াকীন। বর্তমান কালে অধিকাংশ আলেম সাহেবগণ ইলমুল য়াকীনের সাহায্যে ওয়াজ-নসিহত ও ইবাদত করেন।

www.pathagar.org

২। আয়নুল ইয়াকীন। ইলমুল য়াকীনের অদৃশ্য সত্যকে দেখা ও শোনার জন্য আল্লাহ্ বাহ্য পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সমন্বয়কারী যে কলব বা হৃদয় ইন্দ্রিয় দান করেছেন যিকির দ্বারা তা পরিষ্কার করে অন্তরচোখের সাহায্যে দেখে-শোনে স্রষ্টার প্রতি যে বিশ্বাস অর্জিত হয়। তাকে বলা হয় আয়নুল ইয়াকীন। যা ফানাফিল্লাহতে অর্জিত হয়।

৩। হাক্কুল ইয়াকীন। ইলমুল ইয়াকীন দ্বারা কোরআন, হাদীস ও ফিকাহ্ পড়ে অদৃশ্য সত্যে যে বিশ্বাস জন্মায় আয়নুল ইয়াকীন দ্বারা তা দেখে শোনে নূরে ইলাহীতে নিজকে ডুবিয়ে মিশিয়ে ও বিলীন করে অর্থাৎ ফানা হয়ে আল্লাহ্তায়ালার উপর তাঁর জ্ঞান ও গুণের উপর বাকাবিল্লাহতে যে বিশ্বাস জন্মে তাকে বলা হয় হাক্কুল ইয়াকীন। তরীকতে রিয়াযত ও মেহনত ছাড়া ফানাফিল্লাহ ও বাকাবিল্লাহ হাঁসিল না হলে আয়নুল ইয়াকীন ও হাক্কুল ইয়াকীন হাসিল হয় না। হাক্কুল ইয়াকীন দ্বারা ঈমান হাসিল না হলে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'কে পরিপূর্ণ উপলব্ধি করা যায় না এবং তওহীদ রূহতে পূর্ণভাবে মিশে না, যা বাকাবিল্লাহতে হাসিল হয়। এ কালিমার অপর অংশ "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্তে" নবুয়ত, রিসালাত ও তাঁকে পরিপূর্ণভাবে বুঝতে হলে আল্লাহু জাল্লা শানুহুর মাকামে আদিমত্বের নূরে ফানা-বাকা হতে হয়, যা তাঁর অপরিবর্তনীয় অসীম সত্তা। মাঝ পথে নবুওতের মোকামে নবুয়ত ও রিসালাত বুঝা যায়।

ঈমান হয়ত কারো পার্থিব জীবনের ধনসম্পদ এনে দিবে না, কিন্তু তা দুনিয়াতে চারিত্রিক ও মানসিক শক্তি ও ঐশ্বর্য দান করবে। আখিরাতে লাভ করবে সুখ -শান্তিময় বেহেশত। সংক্ষিপ্ত দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ্র জন্য বান্দার ত্যাগ-তিতীক্ষার বদলে দুনিয়াতে সে জানতে পারবে দৃশ্যমান জড় জগত, অদৃশ্য নূরী, রূহী ও স্রষ্টার স্বরূপ, কার্যাবলী এবং মানব জীবন ও সৃষ্টি সম্পর্কে এক অখন্ড ও সামগ্রিক জ্ঞান। মানব জীবনের স্বরূপ, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের কারণসমূহ, সত্য, মঙ্গল ও আদর্শকে উপলব্ধি করতে পারবে। যার ফলে অখন্ড মানব জীবনের সমস্যা, তার কারণ এবং জীবনের প্রয়োজন জানতে পারবে। ফলে সত্য ও আদর্শের উপর অমর জীবন সংগঠিত করতে পারবে। পূর্ণ ঈমাণের সাহায্যে যেমন আপন সত্তা ও সৃষ্টি রহস্য জানতে পারবে, তেমনি আত্মার অনাবিল আনন্দ ও ঐশী ক্ষমতার কিছু স্বাদও উপলব্ধি করতে পারবে। ফলে বান্দার অস্তিত্বের সত্তাসার আত্মাকে শক্তিশালী ও সৌন্দর্য্যমন্ডিত করতে পারবে।

অনেকে ঈমান আনে, কিন্তু দুনিয়ার লোভ-লালসায় আক্রান্ত হয়ে স্রষ্টার নিষিদ্ধ কাজ করে ঈমানকে কুলষিত করে এবং কলুষিত ঈমান মুতাবিক সৎ কাজ না করে পাপে লিপ্ত হয়। আল্লাহ্তায়ালা মাফ না করলে শিরক ও কুফর ছাড়া

www.pathagar.org

সেই কুলুষিত ঈমান নিয়ে মরলে দোষখে যাবে। অবশেষে শাফায়াতের মাধ্যমে মুক্তি পাবে।

আল্লাহ্তায়ালা বলেন, "যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে জুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদের জন্য, তারা সৎপথ প্রাপ্ত।"৬ঃ৮২।

যারা ঈমান এনেও শিরক ও কুফরী করবে এবং বিনা তওবায় মারা যাবে, তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে, এদের কোন নিরাপত্তা নেই। ঈমান এনে তা পাপ দ্বারা নষ্ট করতে নেই, আর শিরক ও কুফরী করে তা ধ্বংসও করতে নেই।

"যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহ্র যিকিরে যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়, জেনে রাখ আল্লাহ্র যিকিরেই চিত্ত প্রশান্ত হয়। যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে কল্যাণ ও শুভ পরিনাম তাদের জন্যই।" ১৩ঃ২৯।

যিকির দ্বারা ফানাফিল্লাহ্ ও বাকাবিল্লাহ্ অর্জন ছাড়া আয়নুল ইয়াকীন ও হাক্কুল ইয়াকীন হাসিল করা যায় না, আবার তরীকত ও তাসাওউফ ছাড়া ফানাফিল্লাহ্ ও বাকাবিল্লাহ হাসিল হয় না। শুধু ইলমুল ইয়াকীন ঈমান পরিপূর্ণ হয় না, যদি হতো তবে আল্লাহ্তায়ালা পাক কোরআনে আয়নুল ইয়াকীন ও হাক্কুল য়াকীনের কথা বলতেন না।

আয়নুল ইয়াকীন ও হাক্কুল ইয়াকীনের জন্য তাসাওউফ ও তরীকত অপরিহার্য। যারা তাসাওউফ বা তরীকতের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন, তারা প্রকারান্তরে আয়নুল ইয়াকীন ও হাক্কুল ইয়াকীন হাসিল থেকে লোকদের সরিয়ে রাখতে চান। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হাদীসে জিবরাঈল বা উম্মুল হাদীসে যে ইহসান সম্মন্ধে বলেছেন, সেই ইহসানও তরীকত ছাড়া অর্জন করা যায় না। সেই ইহসান হাঁসিল করার জন্য আমাদের তাসাওউফ ও তরীকত অনুযায়ী সাধনা করতে হবে। শুধু ইলমুল ইয়াকীন দ্বারা ইখলাসের সাথে ঈমান অর্জিত হয় না। ইলমুল ইয়াকীনে সঠিকভাবে নিষ্ঠা সহকারে বন্দেগী করা সম্ভব হয় না বলে রিয়ার কারণে ফাসেকে পরিণত হওয়ার আশংকা থেকে যায়।

ঈমানসহ পাঁচ রোকন আদায়, যিকির ও সৎকর্ম সৌভাগ্যের চাবিকাঠি।

"যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে এবং মুহাম্মদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে বিশ্বাস করে আর উহাই তাদের প্রতিপালক হতে প্রেরিত সত্য, তিনি তাদের মন্দ কাজগুলো ক্ষমা করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন।" ৪৭ঃ২।

"যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে না, আমি সেসব কাফিরদের জন্য জলন্ত অগ্নিপ্রস্তুত রেখেছি।" ৪৮ঃ১৩।

www.pathagar.org

ইসলাম

ঈমান ও ইসলামে কিছুটা পার্থক্য আছে। ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাস আর ইসলাম হলো সেই বিশ্বাস অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করা। ঈমান ছাড়া ইসলাম হয় না, আবার ইসলাম ছাড়া ঈমান নেই। ঈমান যত গভীর হয় ইসলামে নিষ্ঠা তত প্রবল হয়, ঈমান যত হালকা হয় ইসলাম অনুসরণে তত শৈথিল্য আসে, ফলে প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে পাপে লিপ্ত হয়।

আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) ইসলাম, ঈমান ও ইহসানের সংজ্ঞা দিয়ে গেছেন। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, -"একদিন আমরা আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন হঠাৎ একজন লোক আমাদের নিকট এল, তার সাদা পোশাক ছিল, ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ কেশরাজি ছিল, পথ ভ্রমণের ক্লেশ তার দেহে ছিল না, আমাদের মধ্যে কেউ তাকে চিনল না। সে হযরত (সাঃ)কে এসে সালাম করল। তারপর জানুদ্বয় হযরত (সাঃ)-এর জানুদ্বয়ের নিকটবর্তী করে তার হস্তদ্বয় তার জানুদ্বয়ের উপর রেখে জিজ্ঞেস করল-'হে মুহাম্মদ। ইসলাম কি? আমাকে বলুন।' তিনি বললেনঃ ইসলাম এই যে, আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল- এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রমযানের রোযা রাখা, পথ খরচের শক্তি-সামর্থ্য থাকলে কা'বা শরীফের হজ্ব করা। লোকটা বললঃ আপনি সত্য বলেছেন। এ প্রশ্নে ও সত্য সমর্থনে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

আবার লোকটা প্রশ্ন করল, ঈমান কি? তা আমাকে বলুন। তিনি বললেনঃ আল্লাহ্‌কে, তাঁর ফিরিশতাগণকে, তাঁর ধর্মগ্রন্থসমূহকে, তাঁর রাসূলগণকে এবং তকদীরের ভাল মন্দে বিশ্বাস করা।

সে বললঃ আপনি ঠিক বলেছেন। সে আবার জিজ্ঞেস করলঃ ইহসান কি? তা আমাকে বলুন।

হযরত (সাঃ) বললেনঃ তা এই যে, এরূপভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করা যেন তুমি তাঁকে দেখছ এবং তাঁকে না দেখলেও তিনি তোমাকে দেখছেন।" বুখারী ও মুসলিম।

এ হাদীসের প্রশ্নকারী জিবরাঈল (আঃ) ছিলেন বলে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উল্লেখ করে গেছেন। পূর্ণ হাদীসটিতে কিয়ামতের কথাও সত্য বলে উল্লেখ আছে। একে কেউ কেউ হাদীসে জিবরীল বলে থাকেন। সূরা ফাতেহাকে যেমন উম্মুল কোরআন বলা হয়, এ হাদীসটিকেও উম্মুল হাদীস বা হাদীসের মা বলা হয়।

www.pathagar.org

আল্লাহ্তায়ালা এবং তদীয় রাসূল (সাঃ) মানুষের উপর যে সব কর্তব্য ও দায়ত্ব নির্ধারণ করেছেন, ঈমানের সঙ্গে নিষ্ঠার সাথে তা পালন করার নাম ইসলাম। এর ফলে একটা পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্র ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে সংগঠিত হয়। কোন ব্যক্তি একটি পরিবারে জন্ম নেয়, সমাজে বাস করে, পরস্পর আদান প্রদানে লিপ্ত হয়। সবার নিরাপত্তা, পরস্পরের দ্বন্ধ- সংঘাত নিষ্পত্তি ও নিরাপত্তার জন্য তাকে আল্লাহ্ ও রাসূল নির্ধারিত আইনের ভিত্তিতে খিলাফত বা আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্বশীল শাসনসংস্থার নেতৃত্বাধীনে থাকতে হয়। এই শাসনসংস্থা, সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তিকে আল্লাহ্তায়ালার একক অবিভাজ্য সার্বভৌমত্বের অধীনে থেকে এ সব সুনির্দিষ্ট আইন-কানুন মেনে চলতে হয়। এর নামই ইসলাম। স্রষ্টা মানব স্বভাবের উপর বিধিবদ্ধ সার্বজনীন আদেশ-নিষেধ জারী করে মানব জাতিকে তাঁর স্বভাব ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করে তা মানে, তাদের মুশরিক বলে ঘোষণা করেছেন। কাফির ও মুশরিকদের ক্ষমা করবেন না বলে তিনি ওয়াদাবদ্ধ। কারণ তারা আল্লাহ্তায়ালার সার্বভৌমত্বের বিরোধী মানবীয় সার্বভৌমত্বের অনুসারী হয়েছে বলে বিদ্রোহী।

ব্যক্তিস্বার্থ ও সমাজ স্বার্থ চিরকালই পরস্পর বিরোধী। পরস্পর বিরোধী ব্যক্তি ও সমাজ স্বার্থ সংঘাতময় জীবনের সূচনা করে। আল্লাহ্ভীতি না থাকলে এ সবের মূলে কাজ করে ব্যক্তি স্বার্থ আর ব্যক্তির দ্বারা সমাজ শাসিত হয় বলে যত সবের মূলে কাজ করে ব্যক্তি স্বার্থ আর ব্যক্তির দ্বারা সমাজ শাসিত হয় বলে যত শক্তিশালীই হউক না কেন, মানব -সংঘ বা কোন মানুষের পক্ষে পরিপূর্ণ ইসলামে প্রবেশ না করে ব্যক্তি স্বার্থ উৎখাত করা সম্ভব নয়। কারণ মানবীয় সার্বভৌমত্বের অনুসারী এ সব ঘুষ, দুর্নীতি ও জুলুম উৎখাতকারীরাই এ দুষ্ট রোগে আক্রান্ত ও ভয়াবহভাবে জড়িত। মানুষ ও তার পশু প্রবৃত্তিকে আল্লাহ্তায়ালা এভাবে পয়দা করেছেন। ঈমান অনুযায়ী আল্লাহ্ ভীতি ও আল্লাহ্ প্রেমে নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত দ্বারা ইসলামে প্রবেশ লাভ ঘটে। সারা জীবন এগুলোর অনুশীলন করতে হয়। এগুলো ইসলামের রোকন বা স্তম্ভ। এর উপরই ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে ইসলামের সৌধ তৈরি করতে হয়। এগুলোর একটার ঘাটতি হলেই আল্লাহ্র শাস্তি অনিবার্য হয়ে পড়ে। তবে হজ্ব ও যাকাতে সামর্থহীনদের রেহাই আছে।

ইসলামের অর্থ আল্লাহ্তায়ালার সার্বভৌমত্বকে মাথা পেতে নিয়ে দাস হিসাবে তাঁর আদেশ ও নিষেধ আনুগত্যের সাথে নিষ্ঠা সহকারে পালন করা। তাঁর সার্বভৌমত্বে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা। যার সার্বভৌমত্ব মেনে আদেশ-নিষেধ পালন করে সেই দাসের প্রভূ, আনুগত্যকারী সেই প্রভূর দাস। আল্লাহ্তায়ালা

www.pathagar.org

মানুষকে শুধু তাঁর দাস হওয়ার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। অন্য শক্তির দাস হলে তাঁর প্রাপ্য প্রভূত্বে শরীক নিয়ে এল।

আল্লাহ্তায়ালার একক অবিভাজ্য সার্বভৌমত্ব না মেনে দার্শনিকদের কাল্পনিক মানবীয় সার্বভৌমত্বের আদেশ-নিষেধ মেনে আল্লাহ্তায়ালার দেওয়া আদেশ-নিষেধ অবহেলা করলে কাফির হয়। সুবিধা অনুযায়ী চালাকি করে দু'টোই মানলে মুশরিক হয়, ইসলামের প্রলেপ দিলেও মানবীয় সার্বভৌমত্ব বিন্দু মাত্র স্বেচ্ছায় মানলেও শিরক থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। মূর্তি, জনগণ বা দেশ যে নামের উপরই হউক সার্বভৌমত্বের মানবীয় রূপ হলেই তা স্বেচ্ছায় মানার কারণে ঈমান চলে যায়। যে উপাদান দ্বারা আল্লাহ্র পথ হতে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হয়, সেই দুষ্কৃতিকে বলা হয় তাগুত। মানবীয় সার্বভৌমত্ব হলো সেই তাগুত, যা আদি কাল হতে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। আল্লাহ্তায়ালা বলেন,- 'যে তাগুতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহ্তে বিশ্বাস করবে, সে এমন এক মজবুত হাতল ধরল যা কখনও ভাঙ্গবে না।'

মানবীয় সার্বভৌমত্ব সুদের লগ্নি কারবারের স্বার্থে চালু হয়েছে। এক তাগুত অন্য তাগুতের জন্ম দিয়েছে। যারা স্রষ্টার একক অবিভাজ্য সার্বভৌমত্বকে বিভক্ত করবে, তারা মুশরিক হয়ে যাবে এবং যারা আল্লাহ্তায়ালার অবিভাজ্য একক সার্বভৌমত্বের বিন্দু মাত্র বিরোধীতা করবে তারা কাফির হয়ে যাবে। মুখে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্-বলে ঈমান আনলেও ঈমানের সাথে কুফর ও শিরক মিশ্রিত করল। তারা বিনা তওবায় মরলে ঈমান কবুলযোগ্য না হওয়ার কারণে কাফির ও মুশরিক হয়েই মরবে-যাদের আল্লাহ্তায়ালা ক্ষমা করবেন না। যারা মানবীয় সার্বভৌমত্ব মেনে তাসাওউফ বা তরীকতে রিয়াযত ও মুজাহাদা করবে তাদের সকল প্রচেষ্টা বিফল হবে, তাদের ত্যাগও বিফল হবে। ত্যাগ ও পরিশ্রমে কোন ফায়দা হবে না। ঈমান ও আকীদা সঠিক না হলে সব শ্রম পন্ড হবে। এ নিয়তেই এ কথাগুলো বলা হল। মানবীয় সার্বভৌমত্ব মানা এবং কুফর ও শিরক গ্রহণ করা শুধু দুনিয়াদারীর জন্য, যা মানব প্রবৃত্তির অভিলাষ পুরণে সাহায্য করে। সে জন্য মানুষ তাগুতি শক্তি সৃষ্টি করে তা থেকে দুনিয়ার ফায়দা পেতে চায়।

আল্লাহ্তায়ালার সার্বভৌমত্বের শাসক নায়েবে রাসূল হিসেবে আল্লাহ্তায়ালার আদেশ-নিষেধ, যার ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীগণ দিয়ে গেছেন তাঁর অনুগামী ফিকাহ্র দ্বারা বিচার ও শাসন চালাবেন, সমাজ সংগঠন করবেন। আল্লাহ্তায়ালার আইন-কানুনকে তিনি প্রয়োগ করবেন মাত্র। শাসক হলেও তিনি আল্লাহ্তায়ালার তাবেদার দাস মাত্র এখানে শাসক প্রভূ নয়, বরং দাস,

www.pathagar.org

আল্লাহ্তায়ালা ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর প্রতিনিধি মাত্র। মানবীয় সার্বভৌমত্বের শাসক প্রভূ হয়, শাসিতরা তার দাস হয়। কাফির ও মুশরিকরা আল্লাহ্তায়ালার আইন অস্বীকার, অবহেলা ও পরিবর্তন করে আল্লাহ্তায়ালার দাসদের তাদের দাসে পরিণত করে তাগুতি শক্তির সাহায্যে। এ জন্য কুফর ও শিরককে ক্ষমাহীন অপরাধ বলে ঘোষণা করেছেন। জিহাদ পরিচালিত হয় কুফর, শিরক ও তাগুতি শক্তিকে নির্মূল করার জন্য। জিহাদে তাগুতি শক্তি নির্মূল হলে ও আল্লাহ্তায়ালার সার্বভৌমত্ব কায়েম হলে কাফির ও মুশরিকদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হয় না। তারা ইচ্ছা করলে কাফির বা মুশরিক থাকতে পারে অথবা ঈমান এনে ইসলাম গ্রহণ করতে পারে। জিহাদের লক্ষ্য কেবল তাগুতি শক্তি নির্মূল করা।

আল্লাহ্তায়ালা বলেন, -'আল্লাহ্তায়ালা যা অবতীর্ণ করেছেন, তদানুসারে যারা বিচার ফয়সালা না করে, তারা কাফির।'৫ঃ৩৩)

কুফরীর উৎস মূল বাঁধাবন্ধনহীন মানব প্রবৃত্তি, আর আল্লাহ্তায়ালার শাসন বা খিলাফতের উৎস মূল কোরআন ও হাদীস তথা আল্লাহ্তায়ালা। কিভাবে স্রষ্টার আনুগত্য করতে হবে তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) বলে দিয়েছেন। সে সব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার নাম ইসলাম। এর বিপরীত নয়।

আল্লাহ্তায়ালা বলেনঃ "হে মুমিনগণ! ইহুদী ও নাসারাগণ পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেহ তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদের একজন হবে। আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।" ৫ঃ৫১।

যারা ইসলামকে বাদ দিয়ে তাগুতকে গ্রহণ করতে চায়, তাদের সম্মন্ধে আল্লাহ্তায়ালা বলেন, "তুমি কি তাদের দেখনি যারা দাবী করে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাস করে, অথচ তারা তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থী হতে চায়, যদিও উহা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শয়তান তাদের ভীষণ ভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়। তাদের যখন বলা হয় আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে এসো, তখন মুনাফিকদেরকে তোমার নিকট হতে সম্পূর্ণভাবে মুখ ফিরিয়ে নিতে দেখবে।" ৪৪ঃ৬০-৬১।

"যারা মুমিন তারা আল্লাহ্তায়ালার পথে সংগ্রাম করে এবং যারা কাফির তারা তাগুতের পথে সংগ্রাম করে, সুতরাং তোমরা শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর, শয়তানের কৌশল অবশ্যই দুর্বল।"৪ঃ৭৬।

সুদের লগ্নী কারবারের জন্য পশ্চিম জগত মনগড়া ভাবে তাদের নিজ নিজ ধর্মকে সুসজ্জিত করেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য

www.pathagar.org

ধর্মনিরপেক্ষতা চালু করেছে, তাগুতি বিধিবিধান প্রবৃত্তির অনুকূলে চালু করে কুফরীর বিষাক্ত ও কদর্য্য লাভা স্রোত ঢেলে দিয়েছে। ইসলাম সম্প্রদায় নিরপেক্ষ, ধর্মনিরপেক্ষ নয়। আল্লাহ্‌র বাণী ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর সুন্নাহ্‌তে তথা আল্লাহ্‌তায়ালার সার্বভৌমত্বে আত্মসর্মপণই ইসলাম।

যারা যাদের বিধি-বিধান, আচার-আচরণের অনুসারী তারাই তাদের বন্ধু ও সম্প্রদায়ভুক্ত। যারা ইহুদী ও খৃষ্টানদের মানবীয় সার্বভৌমত্বের অধীনে মুক্ত প্রবৃত্তির অনুকূলে গড়া রীতিনীতি অনুসরণ করে তাদের সাথে মুহব্বতের বন্ধন গড়ছে, এরা তওবাহ্‌ করে না মরলে তাদের সাথে হাশর হবে ও জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। দুনিয়াদারীর জন্য, মানবীয় সার্বভৌমত্ব মানার জন্য তাদের মন্দ পরিণাম ফল ভুগতে হবে। মুসলমানদের উচিত নয় আল্লাহ্‌তায়ালার দেওয়া জীবন পদ্ধতি বিসর্জন দিয়ে মুশরিকদের দলভুক্ত হয়ে দুনিয়া ও আখিরাত ধ্বংস করা। আল্লাহ্‌তায়ালার দেওয়া জীবন বিধান কত না উৎকৃষ্ট! মানবীয় সার্বভৌমত্ব মেনে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত জীবন বিধানের সাথে অন্য বিধান মিশিয়ে নিলেও ঈমানহারা হবে, রোযা, নামায কোন কাজে আসবে না। ইসলাম অন্য ধর্মের মত শুধু হৃদয়ের অনুভূতি নয়, প্রকাশ্য কর্ম সম্পাদনের উপরও প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন- "প্রত্যেকের মর্যাদা তার কর্ম অনুযায়ী হবে, এটা এজন্য যে, আল্লাহ্‌ প্রত্যেক কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেবেন এবং তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না।" ৪৬ঃ১৯।

মুখে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌," বলে কর্মে স্বেচ্ছায় মানবীয় সার্বভৌমত্বের দাস হওয়া সন্দেহাতীতভাবে মুশরিকী ও মুনাফিকী হবে। আর ইসলামের বিরোধিতা করলে হবে কাফির।

আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন- "আল্লাহ্‌ ব্যতীত তোমরা যাদের আহ্বান কর, তারা তো তোমাদের মত বান্দা।" ৭ঃ১৯৪।

"আল্লাহ্‌ ব্যতীত তোমরা যাদের আহবান কর তারা তো তোমাদের সাহায্য করতে পারে না এবং তাদের নিজেদেরও নয়।" ৭ঃ১৯৭

দ্বীন বা জীবন পদ্ধতি, শরীয়ত ও তরীকত এই তিনটি মিলেই ইসলাম। এই তিনটি বিষয়ই আল্লাহ্‌তায়ালা নাযিল করেছেন। কোরআনের বহু আয়াত তরীকতের অনুকূলে নাযিল হয়েছে, হাদীসে কুদসীসহ বহু হাদীস তরীকতের উপর আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) বর্ণনা করেছেন।

দ্বীন হল জীবন পদ্ধতি। জন্ম হতে কবর পর্যন্ত এ জীবন পদ্ধতি নির্ধারিত। ব্যক্তির সাথে অন্য ব্যক্তি, সমাজ শাসন সংস্থা ও আন্তর্জাতিক ফয়সালাসমূহ

www.pathagar.org

কোরআন-হাদীসের অনুগামী শাখা- প্রশাখার হুকুম- আহকামকে শরীয়ত বলা হয়। দ্বীন ও শরীয়ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে পঞ্চইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হুকুম-আহকাম।

অদৃশ্য সত্য যা কোরআন-হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে তা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কলব বা হৃদয় দ্বারা দেখে-শুনে বোঝা ও উপলব্ধির নাম তরীকত। তরীকত হৃদয়ের তৎপরতা, শারীরিক ও মানসিক উপলব্ধি যা ঈমানকে সতেজ ও শক্তিশালী করে এবং ঈমানের ডিগ্রীকে স্তরে স্তরে বাড়িয়ে দেয়, যার ফলে বান্দা ইসলামের আদেশ-নিষেধের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করে এবং দুনিয়া ও আখিরাত নিয়ে যে সামগ্রীক জীবন ও সৃষ্টিরহস্য, তা অবহিত হয়। তাসাওউফ ও তরীকত মানুষকে আল্লাহ্তায়ালার দীদার অর্থাৎ স্রষ্টার জ্ঞান ও গুণের আকৃতি দর্শন ও তাতে মিলন ঘটায়। আল্লাহ্তায়ালার যাতী সত্তা নিরাকার ও অনন্ত বলে তাঁর দর্শন অসম্ভব। তরীকত দ্বারা অদৃশ্য সত্য দেখে-শুনে জ্ঞান অর্জন করা যায় বলে বিষয়টি ইসলামের পাঁচ রোকনের প্রথম রোকন ঈমানের অন্তর্গত।

দ্বীন, শরীয়ত ও নিষ্ঠা সহকারে ইবাদতের ও ঈমানের ব্যাপারটি, যা কোরআনে ও সুন্নাহতে সুস্থির করা হয়েছে তা সঠিক রেখে আল্লাহ্তায়ালা পর্যন্ত পৌছার পদ্ধতি অর্থাৎ তরীকতের যিকির, উরূয, নযুল, সয়ের ও সুলূকের পদ্ধতি যুগে যুগে বিভিন্ন তরীকার ইমামগণের উপর বিভিন্নভাবে যুগ অনুযায়ী বৈশিষ্ট্যপূর্ণভাবে সহজ করে আল্লাহ্তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মারফত নাযিল করেন। পূর্ববর্তী শ্রেষ্ঠ রাসূলগণের নিকট যেমন তওহীদ ঠিক রেখে বিভিন্ন শরীয়ত হযরত জিবরাঈল (আঃ) মারফত নাযিল করা হতো।

এ পুস্তকের তরীকত অধ্যায়ে কিভাবে তরীকত নাযিল করা হয় তার বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্। পূর্বকালে সুসংবাদ নিয়ে নবীগণের নিকট জিবরাঈল (আঃ) আসতেন। বর্তমানে ওলীগণের নিকট রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আসেন এবং তাঁর মারফত জগতের ভাল-মন্দ নাযিল হয়। সব কিছু তরীকত অধ্যায়ে বর্ণনা করা হবে। তাঁর পাক কদমে লাখ লাখ সালাম ও দরূদ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা নূরীকা ওয়া আলা আলীহি ওয়া আলা কাদামিহি ওয়া সাল্লিম।

www.pathagar.org

আক্‌ল

পূর্বেই বলা হয়েছে জ্ঞান সৃষ্ট নয়। সাকুল্য জ্ঞান আল্লাহ্‌তায়ালার। যেমন তামাম সৃষ্টি আল্লাহ্‌তায়ালার। মানুষ যখন কোন সৃষ্ট পদার্থকে বা বিষয়কে সত্যরূপে যথাযথভাবে জানতে পারে, তখন তার সে বিষয়ে জ্ঞান লাভ হয়। সে জ্ঞান হয় খন্ডিত জ্ঞান। অখন্ড ও সামগ্রিক জ্ঞান একমাত্র অদৃশ্যে বিশ্বাসের ভিত্তিতেই সম্ভব। কারণ কোন সৃষ্টির পক্ষে স্রষ্টার সাকুল্য সৃষ্টি দেখা বা সে বিষয়াদি জানা। [রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) ব্যতীত] সম্ভব নয়। সৃষ্টির বিশালত্ব, মহাকালের পরিধি ও সংগঠিত ঘটনাবলী মানব কল্পনার বাইরে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) মি'রাজে সশরীরে অদৃশ্য বিষয়াদি তথা আখিরাত নিজ চোখে দেখে-শোনে এসে আমাদের এ সত্য সম্বন্ধে জানিয়েছেন। ওলীগণ অন্তর চোখে তা দেখেন, জীবিত অবস্থায় তাদের বরযখের মি'রাজ হয়। নবীর গুণাবলী তাঁর উম্মাতগণ লাভ করতে পারেন। যারা নবুয়ত ও রিসালাত মানেন তাদের অবশ্যই এ সত্য বিশ্বাস করতে হবে। যারা এতে অবিশ্বাস করে রূপক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে, আল্লাহ্‌তায়ালা খাস ভাবে দয়া না করলে ও তওবাহ্‌ না করলে ঈমান নিয়ে তারা মরতে পারে না।

জ্ঞান সৃষ্ট নয়, কারণ আল্লাহ্‌তায়ালার জ্ঞান ও গুণের প্রকাশিত সৃষ্ট রূপ হল বিশ্ব প্রকৃতি। কিন্তু মানুষের আক্‌ল হল সৃষ্ট। হাদীস অনুযায়ী আমরা জানতে পারি আরশ, কুরসী ও লওহে মাহফুয সৃষ্টির পর আক্‌লকে সৃষ্টি করা হয়। আক্‌লকে বাংলা ভাষায় ধীশক্তি, উদ্‌ভাবনী শক্তি, সমন্বয় শক্তি বা বুদ্ধিমত্তা বলা হয়। এই শক্তির সাহায্যে মানুষ অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাস দ্বারা জ্ঞান লাভ করতে পারে। আকল চলমান জীবের নিজস্ব শক্তি, মানুষের নিজস্ব শক্তি। আক্‌ল সহজাত, জ্ঞান অর্জন সাপেক্ষ। জ্ঞান সার্বজনীন আর আকল ব্যক্তিগত। আক্‌ল দ্বারা সার্বজনীন জ্ঞান আহরণ করতে হয়। জ্ঞান আহরণে অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাস সাহায্য করে।

আল্লাহ্‌তায়ালা আক্‌ল সৃষ্টি করে বললেন, এসো। আক্‌ল এগিয়ে এল। বললেন- পিছিয়ে যাও, আক্‌ল পিছিয়ে গেল। এভাবে আক্‌ল দ্বারা আনুগত্য নেয়া হলো।

আবুবকর শিবলী (র) বলেছেনঃ আল্লাহ্‌তায়ালা আক্‌লকে সৃষ্টি করে জিজ্ঞেস করলেন- আমি কে? আক্‌ল চুপ করে থাকল। আল্লাহ্‌তায়ালা আক্‌লকে একত্ব

www.pathagar.org

শিক্ষা দিলেন এবং আক্‌লের চোখ মুখ খুলে দিলেন। তখন আক্‌ল বলতে থাকল- তুমিই আল্লাহ্‌। তুমি ব্যতীত উপাস্য নেই। এখনও তরীকতের বাকাবিল্লাহ্‌তে তওহীদ শিক্ষার পরই দাসত্বের মোকাম শুরু হয়।

এই জ্ঞানসহ আক্‌ল সহজাত হওয়ায় মানুষ উপাস্য ছাড়া থাকতে পারে না। ঈমান না আনলে শয়তান অবাধ্য নাফসের সাথে মিলে আক্‌লকে বিভ্রান্ত করে, নির্ভেজাল থাকতে দেয় না। নাফসের হঠকারিতার জন্য হয় নিজ প্রবৃত্তিকে উপাস্য করে নইলে মূর্তি বা মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে প্রভাবশালীদের উপাস্য করে এবং দেবতা জ্ঞানে পুজনীয় মনে করে থাকে।

শিশু সহজাত আক্‌ল নিয়ে জন্মায় বলে আল্লাহ্‌তায়ালার রাসূল (সাঃ) বলেছেন-মানব শিশু স্বভাব ধর্ম ইসলামের উপর জন্মায়। মা-বাবা তাকে অন্যদিকে নিয়ে যায় অর্থাৎ তাকে শিরক, কুফর শিক্ষা দেয়া। রূহের তথা আত্মার জগতে আল্লাহ্‌তায়ালা রূহসমূহকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আমি কি তোমাদের প্রভূ নই? তারা বলেছিল-হাঁ। আত্মার সাথে আক্‌ল মিশ্রিত থাকার কারণে এ স্বীকারোক্তি দেওয়া তাদের জন্য সম্ভবপর হয়েছিল।

জড়দেহ সৃষ্টির প্রথমে মানুষের নাফ্‌স সর্ব প্রথম জন্ম নেয়। শুক্র বিন্দুতে পিতার আকৃতি ও ডিম্বকোষে মায়ের আকৃতি অংকিত থাকে। এই দু'নাফসের মিলনে একটা স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নাফ্‌সের উদ্ভব হয়। এরপর আসে আত্মা। জড় দেহ সংগঠনে নাফ্‌স প্রবল থাকে, আত্মা তাকে চৈতন্যময় রাখে এবং আত্মা পরে আসার কারণে তার উন্নয়ন বিলম্বে ঘটে। নাফ্‌স তার চাহিদা তাড়াতাড়ি পূরণ করে নেয়, আত্মা ঈমানের মূখাপেক্ষী থাকে। ঈমান গ্রহণ না করলে বা ঈমান বিরোধী কাজ করলে বা আকীদা বিরোধী ধারণা পোষণ করলে আত্মার উপর খুবই জুলুম করা হয়, তার উন্নয়নে বাঁধার সৃষ্টি করে, অথচ সমস্ত দেহ আত্মার মুখাপেক্ষী। যদিও মানুষের ইচ্ছাশক্তি বলে কিছু নেই, তার অন্তরও আল্লাহ্‌তায়ালার দোয়াঙ্গুলের ইচ্ছাধীন বলে আল্লাহ্‌তায়ালার রাসূল (সাঃ) বলে গেছেন। কিন্তু সৃষ্টিতে স্তর ভেদ আছে, জড় স্তরে পরীক্ষা আছে, ঈমান গ্রহণ-বর্জনে তিনি সাধারণতঃ হস্তক্ষেপ করেন না। ঈমান ও কুফর হতে মুক্ত করেই নাফ্‌স সৃষ্টি করেছেন। জড় স্তরে ঈমান গ্রহণ-বর্জন স্বেচ্ছাধীন, নূরী স্তরে নয়। নাফ্‌স আত্মাকে সম্পূর্ণ পরাজিত না করে ঈমান প্রত্যাখ্যান করতে পারে না।

যে ব্যক্তি অদৃশ্যে বিশ্বাস করে আল্লাহ্‌র ভয়ে ঈমান গ্রহণ করে আক্‌লের সাথে মিশাবে, সে দৃশ্য ও অদৃশ্য সত্য জেনে কম-বেশী অখন্ড জ্ঞানের অধিকারী হবে। সে এক রকম বিবেক লাভ করবে, সামগ্রীক জীবনকে জানবে, তার দয়ালু

www.pathagar.org

স্রষ্টাকে জানবে। অদৃশ্য সত্যে বিশ্বাস যত প্রবল হবে পশু প্রবৃত্তিকে তত দমিয়ে সংযত রাখতে পারবে।

নাফ্সকে লোভ, লালসা, ক্রোধ, মোহ ও অহংকার দ্বারা সজ্জিত করে জড় দেহের সহজাত করে সেগুলোকে সংযত করে আত্মার চাহিদা পূরণের জন্য আল্লাহ্র ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর আদেশ- নিষেধ অনুযায়ী চলতে আদেশ করেছেন, তাহলে নাফ্স শয়তান তাকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। ঈমান অনুযায়ী আক্ল স্বচ্ছ থাকবে, জ্ঞানের পরিধী বাড়তে থাকবে, আমলের দ্বারা আকলে তা মিশে আক্ল ও আত্মার সমৃদ্ধি হতে থাকবে, উন্নয়ন লাভ করবে।

মানুষের জীবন পদ্ধতি ও কার্যকলাপ যদি আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)-এর অনুসরণে সাহাবীগণের ছাঁচে ফেলা যায় তবেই আল্লাহ্তায়ালার ভালবাসা লাভ করা যাবে যা বিশ্ব প্রকৃতি ও স্বভাব ধর্মের সাথে সামঞ্জস্য ও সংগতিপূর্ণ হবে, একত্বের মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালার পরিচয় লাভ হবে। ইসলাম হলো প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করে শরীয়তের অনুসরণ করা।

বিশ্ব প্রকৃতি ও মানবের কার্যাবলীর কর্মক্ষমতা আল্লাহ্ প্রদত্ত বলে এ সব কার্যাবলীর প্রকৃত কর্মকর্তা একমাত্র আল্লাহ্তায়ালা এবং তাঁকে ও তাঁর কার্যাবলীকে অতুলনীয় মনে করে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত ও গোলামী করতে হবে। সকল কথা-বার্তা, কাজ-কর্ম ও চিন্তা-ভাবনায় আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন এবং তাঁর ও তাঁর রাসূলের আদেশ, নিষেধ ও উপদেশের উপর কোন কিছুকে প্রধান্য না দিলে ঈমানের হক আদায় হয়, যার ফলে বুদ্ধিমত্তা বা আকলের উন্নয়ন ঘটে।

আক্ল আত্মার সাথে মিশ্রিত আছে। আল্লাহ্তায়ালার চিরন্তন অনাদি জ্ঞান কোরআন ও তার ব্যাখ্যাকারী রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কার্য ও আচরণ পালন করা হতে আক্ল সমৃদ্ধি বা বরকত লাভ করে আত্মাকে ঐশ্বর্যবান করে এবং আমল দ্বারা তা শক্তিশালী হতে থাকে, ফলে মানুষের হৃদয় আল্লাহ্তায়ালার গুপ্ত রহস্য ভান্ডারে পরিণত হয়।

আকলের সাথে ঈমান মিশ্রিত করলে দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের অখন্ড জ্ঞান লাভ করে অমর জীবন সংগঠিত করা যায়।

হযরত আলী (কা) বলেছেন,- "যে আক্ল ধর্মকে পরিবেষ্টন করে না তা আক্ল নয় এবং যে ধর্ম আক্লের উপর বিজয়ী হয় না তা ধর্ম নয়।" এর অর্থ হল যে দুনিয়া ও আখিরাত নিয়ে যে সামগ্রীক অখন্ড জীবন এবং সে জীবনের

www.pathagar.org

স্বার্থে কাজ করার নাম ধর্মকে আকল পরিবেষ্টন করা। আবার আক্‌লের উপর ধর্মের বিজয় হযরত আলী (রাঃ)-এর জীবনেই ঘটেছে। খলিফা হওয়ার পর একজন তাঁকে পরামর্শ দিল হযরত তালহা (রাঃ) ও হযরত যুবায়ের (রাঃ)কে এ মুহূর্তে গভর্নরের পদ হতে পদচ্যুত না করতে। কারণ স্বরূপ বললেন, প্রভাবশালী দু'জন গর্ভনরকে এ মুহূর্তে পদচ্যুত করলে তাঁরা তাঁর আনুগত্যের শপথ নিবেন না। আনুগত্যের শপথ নেওয়ার পর ক্ষমতা সুসংহত করে তাদের পদচ্যুত করলেই হবে। মুনাফিকি হবে, যা ধর্মে নিষিদ্ধ মনে করে, তিনি সেই ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করলেন না। পরদিন সেই লোকই এসে বলল, এখনই পদচ্যুত করতে। তখন তিনি বললেন, গতকাল তিনি যথার্থ পরামর্শ দিয়েছিলেন, আজ মুনাফিকি করে প্রতারণার উদ্দেশ্যে এরূপ পরামর্শ দিচ্ছেন। যা হউক, ধর্ম খলিফার আকলের উপর বিজয়ী হল, তিনি তাঁদের পদচ্যুত করে দিলেন। অনেক সময় সত্য কথা বললে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সত্য কথা বলা আক্‌লের উপর ব্যক্তির ধর্ম বিজয়ী হওয়া বুঝায়। আবার কোন কোন ধর্ম আছে যা আক্‌লের উপর বিজয়ী হতে পারে না।

যেমন-মূর্তিপূজা, মূর্তি নিজেই সৃষ্টি করে আনুগত্যকারী তার শক্তি আছে বলে ধারণা করে অথচ তা ভেঙ্গে ফেললে কোন ক্ষতি করতে পারে না। বহু ইশ্বরে বিশ্বাস করে অথচ ইশ্বরেরা একেক জন একেক মতে চললে সৃষ্টির পরিচালনা ভিন্ন মতের জন্য লন্ডভন্ড হয়ে যাবে। যেমন নবীদের স্বয়ং ইশ্বর বা তাঁর পুত্র মনে করা। নবীরা স্বয়ং ঈশ্বর হলে দুঃখ- কষ্ট ভোগ করতেন না, আগুন, পানি, মাটি ও বাতাসের মুখাপেক্ষী হতে হত না। আর পুত্র মনে করলেও পদার্থের মুখাপেক্ষী হতে হত না, চিরস্থায়ী থাকত, অপরিবর্তনশীল থাকত। মানবীয় সার্বভৌমত্ব বিপর্যস্ত হয় জেনেও তাকে সার্বভৌম শক্তি বলা মূর্খতা, আক্‌লের উপর এ সব মতবাদ বিজয়ী হতে পারে না। এই জাতীয় বিশ্বাসের উপর যেসব ধর্ম তা আক্‌লের উপর বিজয়ী হয় না।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "মানব কেবলই অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকবে, এমন কি সে বলবে, আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু আল্লাহ্‌কে কে সৃষ্টি করেছে? যার মনে এরূপ ভাব উদয় হয় সে যেন বলে , আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনলাম।"- বোখারী ও মুসলিম।

এ অনুসন্ধান আক্‌ল ও জ্ঞানের সীমার বাইরে, আল্লাহ্‌তায়ালা অসৃষ্ট ও অনাদি।

www.pathagar.org

সৃষ্টির মধ্যে যারা সৌভাগ্যবান, তারাই অদৃশ্য সত্যে দৃঢ় বিশ্বাস করে ঈমান গ্রহণ করে এবং আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) এর অনুসরণ করে। আক্‌ল মানুষের বিরাট সম্পদ, এই আক্‌ল বা উদ্ভাবনী ও সমন্বয় শক্তির দ্বারা বিরাট কাজ সম্পন্ন করতে পারে। যে ব্যক্তি আক্‌লকে যথাযথ ভাবে কাজে না লাগায়, সে দুনিয়া ও আখিরাতের বহু সম্পদ হতে বঞ্চিত থাকে, বহুভাবে অপমানিত হয়। যে ঈমান গ্রহণ করে আক্‌লকে সঠিক ভাবে কাজে লাগায়, আল্লাহ্‌ তাকে বহু কিছু দান করে সম্মানিত করেন।

জ্ঞান আল্লাহ্‌তায়ালার বলে সার্বজনীন, আক্‌ল দ্বারা সে জ্ঞান গ্রহণ ও সমন্বয় করে ব্যক্তি জীবনে তা অনুশীলন দ্বারা আত্মাতে মিশাতে হয়। আক্‌লের সাথে ঈমান মিশিয়ে তার অনুশীলনের বা আমলের অভ্যাস গড়ে তুললে দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতে আল্লাহ্‌তায়ালার অখন্ড জ্ঞান সে অর্জন করতে পারে, কোরআন ও হাদিস তাকে সাহায্য করে। এ জ্ঞান হবে শ্বাশত ও চিরন্তন।

যদি কেউ আক্‌লের সাথে ঈমান না মিশায়, তবে আল্লাহ্‌তায়ালার জ্ঞান-সমুদ্রে হাবুডুবু খাবে, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করতে পারবে না, যুক্তির মার প্যাঁচে ঘুরবে, পথ-ভ্রষ্ট হয়ে সত্য হতে দূরে পড়ে ধ্বংস হবে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে ধ্বংসশীল দেহ ও অসার অহমিকার মধ্যে জ্ঞান আবদ্ধ থাকবে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় সব সময় সব বিষয়ে জ্ঞান দিতে পারে না। সৃষ্টির বিশালত্ব, নিত্যতা, কার্যকারণ ও তওহীদ আক্‌ল দ্বারাই বুঝে আসে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বোঝা সম্ভব হয় না। আবার অভিজ্ঞতার সাহায্যে যে জ্ঞান পাওয়া যায় তা একেক জনের নিকট একেক রকম হয়। কারণ আক্‌ল দ্বারা অভিজ্ঞতাও যাচাই করে নিতে হয়। একেক জনের আক্‌ল ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় যাচাই-বাছাইও ভিন্ন ভিন্ন হয়।

যারা প্রভাবশালীদের স্বার্থে দেওয়া দার্শনিকদের মতবাদের অনুকূলে মানবীয় সার্বভৌমত্বের অনুসারী হয়েছে এবং তাদের মতবাদের অনুসারী নেতাদের বন্ধু হয়েছে এবং সে সব তাগুতের নেতাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে, তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন,-এরা আখিরাতে বলবে, "হায় দুর্ভোগ! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম, আমাকে সে বিভ্রান্ত করেছিল আমার নিকট উপদেশ (কোরআন) পৌঁছার পর। শয়তান তো মানুষের জন্য মহাপ্রতারক।" ২৫ঃ২৮, ২৯। "যারা ঈমান আনে না, শয়তানকে তাদের অভিভাবক করেছি।" ৭ঃ২৭।

www.pathagar.org

আক্‌ল ঈমান শূন্য হলে বিভ্রান্ত হয় ও অপূর্ণ আক্‌ল নাফ্‌সের অনুকূলে সিদ্ধান্ত নেয়। সব কিছু সঠিকভাবে বিচার-বিবেচনা করতে পারে না। মহাবিশ্ব এত বিশাল, মহাকাল এত ব্যাপ্ত, মানব দেহ-মন এত জটিল যে ইন্দ্রিয় ও অভিজ্ঞতা সেখানে খুবই অসহায়। এর উপর আছে পরস্পর সম্পূরক ও নির্ভরশীল দুটি জগত, একটি দৃশ্যমান বিশ্ব প্রাকৃতিক জড় জগত এবং অন্যটি অদৃশ্যমান নূরী জগত। তাই অদৃশ্যের স্বতঃসিদ্ধ সত্য বা ঈমানকে আক্‌লের সাথে না মিশালে অর্থাৎ অদৃশ্যে অবিশ্বাস করলে আমাদের মনে সঠিক ও পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ ধারণা আসতে পারে না, কারণ বিষয়ের সাথে ধারনা না মিললে ধারনা সত্য হতে পারেনা।

একটা উদাহরণ ধরা যাক, একটি অপরিচিত মানুষকে দেখলে আকৃতি দেখে সে সম্বন্ধে মনে ধারনা নিতে পারি। কিন্তু তার স্বভাব-চরিত্র, চিন্তাধারা, জ্ঞানী না মুর্খ, তার উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে সঠিক ধারনা করতে পারিনা, ফলে চোখে দেখলেও মানুষটা সম্বন্ধে সঠিক ধারনা হয় না। অথচ পাঁচশ বছর পূর্বে মরে গেছে, বা পৃথিবীর অন্য প্রান্তে জীবিত না থাকলেও, চোখে না দেখেও, তার ইতিহাস পাঠে, জীবন বৃত্তান্ত পড়ে বা তাঁর রচিত কোন পুস্তক পাঠে তাকে অধিক জানতে ও বুঝতে পারার জন্য তাঁর সম্বন্ধে মোটামুটি সঠিক ধারনা করতে পারি, না দেখেও। বিশাল জড় জগত তো সম্পূর্ণ দেখা সম্ভব নয়, অদৃশ্য জগত চোখে দেখা যায় না, তাঁর সৃষ্টি, কার্যক্ষমতা ও পরিমাণ সম্বন্ধে কোন ধারনা করা মানুষের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়, যেমন সম্ভব নয় ইহ-পরকাল ও দৃশ্য-অদৃশ্য নিয়ে জটিল মানবজীবন সম্বন্ধে ধারনা করা, যদি না অদৃশ্যে বিশ্বাস করে ঈমান আনি। মানুষের এ দুর্বলতার জন্য যুগে যুগে আল্লাহ্‌তায়ালা নবী-রাসূলদের পাঠিয়েছেন এবং তাঁদের দেওয়া সত্যে সাক্ষী দেওয়ার জন্য ওলী আল্লাহ্‌দের পাঠাচ্ছেন তাদের অনুসারী করে।

আমাদের দেহে রয়েছে পশু প্রবৃত্তি, যা যে কোন মূল্যে নিজের স্বার্থ তথা আরাম-আয়েশ, কামনা-বাসনা ও লোভ-লালসা পূরণ করে নিতে চায়। "তুমি কি দেখনা তাকে যে তার কামনা -বাসনাকে ইলাহ রূপে গ্রহণ করে? তুমি কি তাদের কর্মবিধায়ক হবে"? ২৫ঃ৪৩।

ঈমান অনুযায়ী না চললে বা না মানলে কামনা-বাসনা ব্যক্তি স্বার্থে ভিন্ন পথে আক্‌লকে চালিত করে। ফলে বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়। আর ইদ্রিয়জ অভিজ্ঞতার দ্বারা জড় জগতের আংশিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে, তা অবশ্য সত্য বা ভুল হতে পারে। ইদ্রিয়জ অভিজ্ঞতা লাভ হবে, যেমন বিজ্ঞানীরা লাভ করছে। এতে বিভিন্ন

www.pathagar.org

বস্তু সম্পর্কে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা হবে। সে জ্ঞান হবে খন্ডিত । সমগ্র সৃষ্টি কি জড়, কি নূরী সবই জড় বা নূরী কণিকার সমষ্টি, সবই যৌগিক, কেবল স্রষ্টাই অযৌগিক সত্তা। দৃশ্যমান জড়, অদৃশ্যমান নূরী ও রূহী জগত এবং স্রষ্টাকে তাঁর স্বরূপসহ জানা হল অখন্ড জ্ঞান। সংযত না করতে পারলে পশু শক্তির চিন্তা-ভাবনা, ইচ্ছা ও অনুভূতি আঁক্‌লে ও আত্মায় গিয়ে মিশবে যা ধ্বংসশীল ও কালিমাযুক্ত বলে নতুন সৃষ্টিতে সামঞ্জস্য করতে পারবে না। পশু প্রবৃত্তির চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা ঈমানহীন মানুষের মধ্যে জন্ম নেবে, আকলের উন্নয়ন নাফ্‌সের উপর ঘটবে। অখন্ড সামগ্রীক মানব জীবন ও জগতসমূহ সম্পর্কে কোন সঠিক ধারনাই করতে পারবে না। এ অবস্থায় পৌছাতেই আল্লাহ্‌তায়ালা দীল সীল করার কথা বলেছেন। তাঁর দেওয়া শক্তি ও কর্ম-ক্ষমতার অপব্যবহার করে পশু প্রবৃত্তি ও শয়তানী শক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে মানুষ নিজ নিজ আত্মার উপর জুলুম করছে। শয়তান আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে আদেশ অমান্য করে শয়তান হয়েছে, মানুষের মধ্যে যাদের নাফ্‌স অনুশীলন দ্বারা প্রবল করেছে, তারা শয়তানকেও ছাড়িয়ে গেছে। শুধু আদেশ অমান্য করছে না, তারা স্বার্থের জন্য আল্লাহ্‌কেই অস্বীকার করছে। সবার কাছে ঘৃণিত বলে শয়তানকেও অস্বীকার করে শয়তানীতে শয়তানের প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছে।

তারা আংশিক জ্ঞান আল্লাহ্‌তায়ালার সৃষ্টি বা জ্ঞান হতে যা লাভ করছে, তার সাথে অনুমান ও কল্পনা মিশিয়ে যুক্তি দ্বারা ভাল ভাল কথা জনগণের গ্রহণযোগ্য করে বলছে। তাদের মত প্রবৃত্তির উপাসকগণ তা গ্রহণ করে নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হচ্ছে। পশু কাউকে প্রতারণা ও বিভ্রান্ত করতে পারে না। কিন্তু তারা তা করে বলে পশুর চেয়েও নীচে নেমে যাচ্ছে। এরা জ্ঞানের ব্যাপারে দিশেহারা থাকার কারণ, কোন জ্ঞানে সুস্থির থাকতে পারবে না। স্বার্থ অনুযায়ী এক জ্ঞান থেকে প্রত্যাবর্তন করে অন্য জ্ঞানে গিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে, সুযোগ বুঝে পাল্টা সিদ্ধান্ত নেবে ও কাজ করবে। তাদের স্বভাব-জাত আক্‌ল তখন পরিপূর্ণভাবে শয়তানের চিন্তাধারা ও জ্ঞানের অনুগামী হবে। শয়তান আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করেও অহংকার ও প্রতারণাকে নিত্য সহচর করেছে, এরাও শয়তানের ছায়া হবে যদিও বাহ্যিকভাবে সে আল্লাহ্‌তায়ালার জ্ঞান ও গুণের ছায়ার আকৃতি। এ অবস্থা হতে আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ্‌চাই।

আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন,-"যারা ঈমান আনে না শয়তানকে তাদের অভিভাবক করেছি।" ৭ঃ২৭।

www.pathagar.org

" এরূপে মানব ও জিনের মধ্যে শয়তানদিগকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি, প্রতারণার উদ্দেশ্যে তাদের একে অন্যকে চমকপ্রদ বাক্যের দ্বারা প্ররোচিত করে। যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন তবে তারা এটা করত না। সুতরাং তাদেরকে ও তাদের মিথ্যা রচনাকে বর্জন কর। তারা এ উদ্দেশ্যে প্ররোচিত করে যে যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের মন যেন উহার প্রতি অনুরাগী হয়, এবং উহাতে তারা যেন পরিতুষ্ট হয় আর তারা যে অপকর্ম করে তারা যেন তাই করতে থাকে।" ৬ঃ১১২, ১১৩।

বেঈমানরা যখন নবী-রাসূলকে শত্রু জ্ঞানে মানে না, তখন নবী- রাসূলদের যারা মানা করে, তাঁদেরও শত্রু জ্ঞান করে। এভাবধারা হযরত নূহ (আঃ) এরও পূর্ব হতে নিয়ে নানা পত্র-পল্লবে বিকশিত হয়ে আধুনিক মানবীয় সার্বভৌমত্বের কাল পর্যন্ত চলছে। সত্যের সন্ধানে অখন্ড জ্ঞান লাভ করতে হলে ঈমানকে আক্‌লের সাথে মিশাতেই হবে।

ঈমান সত্য ও জ্ঞান লাভের অপরিহার্য শর্ত, যে জ্ঞান নূরে ইলাহীর সাহায্যে কল্‌বে ঢেলে দেওয়া হয়। ঈমান ছাড়া জ্ঞান হতে পারে না, কারণ সত্যে বিশ্বাসের নাম জ্ঞান। সাকুল্য জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্‌তায়ালার। আল্লাহ্‌তায়ালার বাক্যাবলীর সমষ্ঠি কোরআন, আর কোরআনের জীবন্ত ব্যাখ্যা তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর উক্তি ও আচরণ না মানা পর্যন্ত বিশুদ্ধ অখন্ড জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়, যেমন সম্ভব নয় আস্ত গরুকে সূইয়ের ছিদ্রপথ দিয়ে নেওয়া।

কিন্তু ঈমানহীন মানুষ যে জ্ঞানের কথা বলছে ও লিখছে, তা কি? সে সব ধোঁকা ও ভুল। এ সব শব্দ কতগুলো নাম মাত্র, যার দ্বারা অনুমান ও নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে জ্ঞানের আবরণে প্রকাশ করছে। ভাল মানুষ সাজার জন্য চটকদার ভাল কথা বলছে তাদের স্বার্থে মন্দ কাজ ঢাকার জন্য। এরা অনুমান, কল্পনা, শয়তান ও প্রবৃত্তির অনুসারী, সত্যপন্থিরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুসারী। "সত্যের মুকাবিলায় অনুমানের কোন স্থান নেই।" ৩৩ঃ২৮। আল্লাহ্‌তায়ালা সত্যকে সত্যের দ্বারাই প্রকাশ করেন যেমন করেছিলেন নবুয়ত ও খোলাফায়ে রাশেদায়। মিথ্যার দ্বারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার অনুমোদনক্রমে মানবীয় সার্বভৌমত্বের কুফল প্রকাশিত করছেন। ফলে রাষ্ট্রে, সমাজে, পরিবারে, ব্যক্তি জীবনে বিপর্যয় এসেছে। যেমন আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন,-"তিনি সত্যকে সত্য ও অসত্যকে অসত্য প্রতিপন্ন করেন যদিও অপরাধীরা তা পছন্দ করে না।" ৮ঃ৮।

বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার দ্বারা জড় জগতের খন্ডিত বিষয়সমূহের জ্ঞান দিতে পারবে, কিন্তু অখন্ড জ্ঞান দিতে গেলেই ভুল করবে। কারণ জড় স্তর নূরী

www.pathagar.org

স্তর দ্বারা প্রকাশ হয়েছে, জড় স্তরের উৎপত্তির উৎস নূরী স্তর। বিজ্ঞানীদের মহাবিশ্ব সৃষ্টি জাতীয় বিভ্রান্তিমূলক অখন্ড জ্ঞান মানা যাবে না, যতক্ষণ না তা কোরআন-সুন্নাহ্‌র অনুগামী হয়।

দার্শনিক মার্কস, বিজ্ঞানের আবিষ্কারের এক পর্যায়ে বিজ্ঞান নির্ভর হয়ে জড়কে সব কিছু মনে করে জড় বিজ্ঞানের সাহায্যে জড় দর্শনের প্রবর্তন করেছিলেন যা থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছিল, যদিও এ দু'টো বিষয় বিজ্ঞান হতে পারে না। কারণ বিষয়ের চেয়ে লেখকের স্বকর্তৃত্ব যে বিষয় বেশী থাকে তা বিজ্ঞান হতে পারে না। আল্লাহ্‌তায়ালা মানবীয় সার্বভৌমত্বের মার্কসবাদ শাখার কুফল দেখিয়ে শতাব্দীর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তা ধ্বংস করে ইতিহাসের বিষয় বস্তুতে পরিণত করেছেন। গণতন্ত্র নাফ্‌সের স্বার্থের বেসাতির তাগুতি শক্তি, যা প্রভাবশালী সংখ্যালঘুদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। আল্লাহ্‌আতালা ঈমানদারদের এর দ্বারা পরীক্ষা করছেন, একটা নির্দিষ্ট সময় পর এদের ধ্বংস করে দেবেন।

আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন, "কেহ আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করলে আল্লাহ্‌ শাস্তি দানে কঠোর। ৮ঃ১৩।

আল্লাহ্‌তায়ালার আইন ভঙ্গ করে কেউ পালাতে পারবে না, ফাঁকি দিতে পারবে না, শাস্তি হতে রেহাই পাবে না। আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন, "যারা তাগুতের পূজা হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহ্‌ অভিমুখী হয় তাদের জন্য আছে সুসংবাদ।" ৩৯ঃ১৭।

যা আল্লাহ্‌র পথ হতে মানুষকে বিভ্রান্ত করে তাই তাগুত, যেমন মূর্তি, মানবীয় সার্বভৌমত্ব, নাফ্‌স, শয়তান ও দুনিয়া ইত্যাদি। এগুলোর প্রতি মুহব্বত একনিষ্ঠভাবে এগুলোর খাদেমে পরিণত হওয়া, আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশ-নিষেধ অগ্রাহ্য করে, এ সবের প্রতি আন্তরিক সমর্থন ও এ সবের চাহিদা মুতাবিক চলার অর্থই হল তাগুতের পূজা করা। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বিশ্বাসের সাথে এসব মিশ্রিত হলে ভেজালের কারণে ঈমান চলে যায়। যেহেতু এরা কালিমার লা ইলাহা মানে না, এতে অবজ্ঞা ও অবিশ্বাস প্রকাশ পায়। ঈমান তো আর পৈত্রিক সম্পত্তির মত না যে মুসলমানের ঘরে জন্ম নিলেই পরিত্যক্ত সম্পত্তির মত ওয়ারিশদের মধ্যে ভাগ বন্টন হবে, যেমন কামেল না হয়ে পীরের সন্তানও পীর হতে পারে না। অবিমিশ্র ঈমান গ্রহণ না করলে নামে মুসলমান থাকলেও তওবাহ্‌ করে তার ঈমান অবিমিশ্র না করে মরলে এসব বিভ্রান্ত দলের শামিল হয়ে জাহান্নামে যাবে।

www.pathagar.org

আল্লাহ্তায়ালা বলেন যে, "জেনে রেখো অবিমিশ্র আনুগত্য কেবল আল্লাহ্রই প্রাপ্য।" ৩৯ঃ৩।

তাগুত বর্জন না করলে অবিমিশ্র আনুগত্য আসবে না, ইবাদত কবুল যোগ্য হবে না।

আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, "বল, আমি আদিষ্ট হয়েছি আল্লাহ্র আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর ইবাদত করতে।" ৩৯ঃ১১।

"হে মুমিনগণ তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" ২ঃ২০৮। "তোমাকে কি আমি জানাবো কাদের নিকট শয়তান অবতীর্ণ হয়? উহা ত অবতীর্ণ হয় প্রত্যেকটি ঘোর মিল্যাবাদী পাপীর নিকট। উহারা কান পেতে থাকে এবং ওদের অধিকাংশ মিথ্যাবাদী এবং কবিদের অনুসরণ করে তারা, যারা মিথ্যাবাদী। তুমি কি দেখ না ওরা উদ্ভ্রান্ত হয়ে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায় এবং যা করে না তা বলে।" ২৬ঃ২১১-২২৬।

"যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের দৃষ্টিতে তাদের কর্মকে সুশোভিত করেছি, ফলে বিভ্রান্তিতে ঘুরে বেড়ায়।' ২৭ঃ৪।

"তবে কি যারা ঈমান এনেছে তাদের কি প্রত্যয় হয়নি যে আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে নিশ্চয়ই সকলকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারতেন? যারা কুফুরি করছে, তাদের কর্মফলের জন্য বিপর্যয় ঘটতে থাকবে অথবা বিপর্যয় তাদের আপেপাশে আপতিত হতে থাকবে যতক্ষণ না আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি ঘটবে। আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।" ১৩ঃ৩১।

বর্তমানে মানবীয় সার্বভৌমত্বের গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের তাগুতি শক্তিত ও দুনিয়ার ধন-মানের লিপ্সায় আল্লাহ্র বিধান অস্বীকারকারীদের সুখী বলে মনে হতে পারে, কিন্তু স্রষ্টার বিধান অস্বীকার করে পুরুষ ও নারীদের যৌন স্বাধীনতা আইন সম্মত করে পরিবারে বিপর্যয় এনেছে। সূদ চালু করে সমাজ ও রাষ্ট্রে বিপর্যয় এনেছে। অশান্তি, জুলুম ও হত্যার শিকার হয়েছে। রাষ্ট্রপতি হতে সাধারণ নাগরিক পর্যন্ত সবার গর্দানে এ খড়্গ উদ্যত, এক জনের দ্বারা অন্যজন বিনাশ প্রাপ্ত হচ্ছে। একটা নির্দিষ্ট কাল অপেক্ষা করে আল্লাহ্ এদের ধ্বংস করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। বর্তমানে স্বার্থের জন্য এক শক্তি ও অন্যশক্তির, এক ব্যক্তি ও অন্য ব্যক্তির মধ্যে হিংস্র জন্তুর মত কামড়া-কামড়ি চলছে। নগ্ন যৌনতা, হিংস্রতা, জুলুম ও প্রতারণার ফলে সমাজে ও ব্যক্তিতে বিপর্যয় এসেছে। রাজনৈতিক ও রাষ্ট্র শক্তির জুলুম চলছে। সুদের লগ্নী সবার গর্দানে

www.pathagar.org

চাপছে, শোষণ চলছে শোষণের সব চেয়ে বড় হাতিয়ার সুদ মারফৎ। সুদের জন্য লগ্নিকারক দেশসমূহের ক্রীড়নক হয়ে যাচ্ছে শাসকগণ। সব বিপর্যস্ত অবস্থায় এসেছে।

"আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোন নির্দেশ দিলে কোন মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারীর ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধীকার থাকবে না, কেহ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে স্পষ্টই পথ ভ্রষ্ট হবে।" ৩৩ঃ৩৬।

"জ্ঞান (কোরআন) পাবার পর তুমি যদি তাদের খিয়াল খুশীর অনুসরণ কর তবে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে তোমার কোন অভিভাবক ও রক্ষক থাকবে না।" ১৩ঃ৩৭।

ইলাহী! তোমার একক অবিভাজ্য সার্বভৌমত্বের জ্ঞান যেদিন হতে দিয়েছ, সেদিন হতেই তা লোকদের বলছি, পার্থিব স্বার্থে গোপন করিনি। মানবীয় সার্বভৌমত্ব তোমার বান্দাগণ ও তোমার হাবীবের উম্মতদের ঈমানহারা করে কবরে নিচ্ছে। তোমার সার্বভৌমত্ব, নায়েবে রাসূল রাষ্ট্রপ্রধান ও আদালতে শরীয়তের আইন প্রয়োগের আন্দোলনই ইসলামী আন্দোলন, এ জন্য আন্দোলন না করে, ভাল ইসলামী শক্তি না করে নাফসের ধোঁকায় অনেকে হেকমতের কথা বলে মন্দ তাগুতি শক্তির দ্বারা তাগুতি শক্তিকে উৎখাত করতে চায়। তাগুতি শক্তিকে ইসলামী লেবাস দিতে গিয়ে, তারাও মুরতাদ হয়ে কবরে যাচ্ছে। মানবীয় সার্বভৌমত্ব ও সুদের লগ্নীর বিষবাষ্প আমাদের ঘিরে নিয়েছে। অনচ্ছিা সত্ত্বেও অনেককে তা পান করতে হচ্ছে। এ জন্য আমাদের পাকড়াও করো না। ক্ষমা করো, মুশরিক ও মুরতাদদের সাথে হাশর করিও না। ঈমানের সাথে দুনিয়া হতে উঠিয়ে নিও। আমীন! ছুম্মা আমানী!!

আল্লাহ্তায়ালা পথভ্রষ্টদের সম্পর্কে আখিরাতে তারা যা বলবে সে সম্মন্ধে বলেন- "তারা আরো বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও ধনীলোকদের আনুগত্য করেছিলাম এবং ওরা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের প্রতিপালক। ওদের দাও দ্বিগুণ শাস্তি, ওদের দাও মহা অভিসম্পাদ।" ৩৩ঃ৬৭-৬৮।

"ফিরিশতাগণকে বলা হবে- একত্র কর যালিম ও ওদের সহচরদের এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের ইবাদত করত তাদের এবং তাদের পরিচালিত করে জাহান্নামেরপথে " ৩৭ঃ২২-২৩।

www.pathagar.org

স্রষ্টার প্রেমিক

আল্লাহ্তায়ালা আদেশ করেছেন রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ করতে। তিনি আল্লাহ্র প্রেমাস্পদ, তাঁর প্রতিনিধি এবং তাঁর দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টির মাঝে সংযোগকারী। তাঁকে সৃষ্টি না করলে আসমান-জমিন, আরশ-কুরসী, লওহে মাহফুয, ফিরিশ্তা তথা তামাম মাখলুক সৃষ্টি করতেন না বলে স্রষ্টা তাঁকে হাদীসে কুদসীতে জানিয়েছেন। তা হলে সৃষ্টির আদি কারণ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)। সর্ব প্রথম সৃষ্টিই হল হাকীকতে মুহাম্মদী। হাকীকতে মুহাম্মদীর মাধ্যমেই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন ও পরিচালনা করছেন। জগতের ভাল-মন্দ হাকীকতে মুহাম্মদীর মাধ্যমে প্রকাশ হচ্ছে। হাশরে বা দ্বিতীয় স্থায়ী সৃষ্টিতে তিনিই মানবমন্ডলীর নেতা হবেন। স্বল্প ঈমানদার পাপীগণও তাঁর শাফায়াতে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করবে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পরিপূর্ণ আদর্শ মানব। তিনি আল্লাহ্তায়ালার প্রেমাস্পদ হওয়া সত্ত্বেও হাকীকতে মুহাম্মদীর নূররূপে আদম (আঃ)-এর বংশ ধারা মারফত আত্মা হিসাবে সৃষ্টির নিয়ম-কানুন মুতাবিক ধরার ধুলায় নেমে এসে আল্লাহ্তায়ালার বন্দেগী বা দাসত্ব কি ভাবে নিষ্ঠা সহকারে করা যায় নিজে দাস হয়ে তার আদর্শ স্থাপন করে গেছেন দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে। আল্লাহ্ ও তাঁর নীতি ছিল, "নিজে না করে অন্যকে তা করতে বলো না।" তিনি আল্লাহ্তায়ালার রাসূল ও শ্রেষ্ঠ দাস ছিলেন। নবুয়ত-রিসালাতের দায়িত্ব পালন মানে সুষ্ঠুভাবে আল্লাহ্তায়ালার দাসত্বের আদর্শ স্থাপন করা। আল্লাহ্তায়ালার দাসত্ব মানে স্রষ্টার আদেশ- নিষেধ তাঁর সন্তুষ্টির জন্য নিয়ত করে মনে-মুখে ও কাজে পালন করা। তাঁর প্রভূর ওয়াদার উপর নির্ভর করে জীবন যাপন করা। এগুলো দাস হিসাবে পালন করে আগে নবী-রাসূল হতেন, এখন রাসূলুল্লাহকে অনুসরণ করে এসব আদেশ-নিষেধ ও দায়িত্ব -কর্তব্য পালন করে আউলিয়া বা ওলী হন। শর্ত হল তাঁর সন্তুষ্টির নিয়তে কোন কিছু মিশ্রিত না করা।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) স্রষ্টা ও সৃষ্টির পার্থক্য নির্ণয়কারী, স্রষ্টা প্রভূ ও সৃষ্টি তাঁর দাস। ফিরিশতারা কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার মুকাবিলা না করেই এ আদেশ নিষেধ পালন করতে পারেন, কিন্তু তিনি প্রতিকূলতা ও বাধা-বিপত্তি মুকাবিলার দ্বার অতিক্রম করে এ আদেশ-নিষেধ বা দায়িত্ব -কর্তব্য পালন করেছেন বলে ফিরিশতাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাঁকে যারা প্রতিকুল বাঁধাবন্ধন অতিক্রম মারফত

www.pathagar.org

অনুসরণ করে তাঁরাও সষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হবেন, ফিরেশতাদের চেয়ে মর্যাদা পাবেন, ফিরিশতারা তাঁর খাদেম হবেন। অর্থাৎ তাঁর সাহায্যকারী হবেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জাহের-বাতেনে আল্লাহ্তায়ালার দিকে পথ প্রদর্শনকারী, তিনি আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য ও মিলনের পথ প্রদর্শনকারী ও দরজা স্বরূপ। তিনি চরম মুখাপেক্ষীহীন অসীম ক্ষমতাশালী আল্লাহ্তায়ালার দরবারে গমনের একমাত্র সহায়ক। তাঁকে ছাড়া স্রষ্টার নৈকট্য ও মিলন লাভ অসম্ভব। যে তাঁকে পেয়েছে সে আল্লাহ্তায়ালাকে পেয়েছে, যে তাঁর থেকে দূরে সরে গেছে সে আল্লাহ্তায়ালার থেকে বিছিন্ন হয়ে পড়েছে। যে তাঁর থেকে দূরে সরে গেছ সে আল্লাহ্তায়ালার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। যে তাঁর থেকে দূরে থাকে সে আল্লাহ্তায়ালার থেকে দূরবর্তী। যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সুন্নতের বিরোধিতা করে, দেড় হাজার বছর আগের চিন্তা-ধারা ও আচার-আচরণ বলে মনে, মুখে বলে অবহেলা করে, সে আল্লাহ্র শত্রুতে পরিণত হয়। তাঁর কথা-বার্তা, কাজ-কর্ম স্বভাব চরিত্র, সদাচরণ, জ্ঞান, গুণ, পবিত্রতা, আল্লাহ্ নির্ভরতা ও আল্লাহ্ প্রেম ইত্যাদি যা কিছু তাঁর থেকে প্রকাশ হয়েছে তা আল্লাহ্র কোরআন অনুযায়ী হয়েছে, এর ফলে দীন, শরীয়ত ও তরীকত এই তিনটি বিষয়ের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। যা পরবর্তী কালে শাস্ত্র আকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

যে ব্যক্তি হুজুর (সাঃ) কে অনসুরণ করবে সে মুক্তি পাবে, যে তাঁর মধ্যস্ততায় আল্লাহ্র দিকে অগ্রসর হবে সে কৃতকার্য হবে। যে তাঁর সাথে পরিপূর্ণ সম্পর্ক রাখবে আল্লাহ্র সাথেও তার পরিপূর্ণ সম্পর্ক থাকবে। যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ চিন্তা এবং আচরণ জ্ঞানে জ্ঞানী হতে চায় সে যেন পাক কোরআনে তাঁর খোঁজ করে কারণ কোরআন অনুযায়ী তাঁর স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণ, চিন্তাধারা বা সুন্নাহ ছিল। সমগ্র হাদীস কোরআনের ব্যাখ্যা স্বরূপ। যে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন ভাবে শরীয়তের অনুসারী নয় সে আল্লাহ্তায়ালা ও তাঁর রাসূলের অনুসারী নয়।

যে সূফী শরীয়তের অনুসারী নয় সে তাসওউফ বা তরীকতপন্থী নয়, কারণ শরীয়ত, তাসওউফ ও তরীকত পুরস্পর নির্ভরশীল। এরূপ ব্যক্তি মিথ্যা দাবীদার। শরীয়তের মাপকাঠিতে ওজন করলেই বোঝা যাবে এরূপ দাবীদার হালকা কি ভারী বা জ্ঞানী বা জাহেল। অলৌকিক কার্যাবলী দেখে বিচার করা অনুচিত, কারণ এটা কেরামত কি এসতেদরাজ? কেবলমাত্র শরীয়ত দ্বারা তা বিচার করা সম্ভব।

www.pathagar.org

যার হৃদয়ে আল্লাহ্‌র ভয় অধিক মাত্রায় নেই তার দ্বারা সঠিকভাবে আল্লাহ্‌র রাসূলের অনুসরণ সম্ভব নয়, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে অনুসরণ না করে আল্লাহ্‌র গোলামী বা বন্দেগী করা যায় না। এরূপ ব্যক্তির ইসতেজরাজ জাহির হতে পারে। আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত ব্যক্তি, যিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর অনুসরণে বন্দেগীতে লিপ্ত এবং শরীয়তের সীমার মধ্যে যার অবস্থান এরূপ ব্যক্তির কেরামত জাহির হয়। কেরামতে অহংকার এসে ইবাদত বরবাদ করে ফেলতে পারে ভেবে ভীত সন্ত্রস্ত ব্যক্তি আরো সন্ত্রস্থ হয়ে কেরামত গোপন করে ফেলেন। তবে হিদায়েতের জন্য মানসিক ভাবে শক্তিশালী ব্যক্তি তা প্রকাশ করতে পারেন। তাঁর লক্ষ্য আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে, কেরামতের দিকে নয়। কেরামত নিয়ামত আর দুনিয়াতে নিয়ামত মানেই পরীক্ষা।

আল্লাহ্‌র নিয়ামত যার উপর বর্ষিত হয় তার এতে কৃতিত্ব নেই, এর জন্য সকল কৃতিত্ব ও প্রশংসা নিয়ামত দাতা আল্লাহ্‌তায়ালার। নিয়ামত তাঁর কৃতিত্বে অর্জিত হয়নি, হয়েছে নিয়ামত দাতার দ্বারা। দুনিয়াতে যার কাছে যে জাতীয় নিয়ামতই আসে তখনই শোকর গোজারীর দায়িত্ব কর্তব্য এসে যায়। আর অকৃতজ্ঞরা ভাবে নিজ কৃতিত্বে এ নিয়ামত অর্জিত হয়েছে যা শিরক ও অহংকার। আর অহংকার করা ত আল্লাহ্‌র প্রভুত্বের দাবীদার হওয়া। আল্লাহ্‌ ছাড়া কেউ অহংকার করতে পারে না, ইহা প্রভুত্বের গুণ, বান্দার জন্য দোষ। দাস কখনও প্রভু হতে পারে না। দাসের কর্মক্ষমতা প্রভু প্রদত্ত।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একাধারে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রেমাস্পদ, রাসূল ও বান্দা ছিলেন, সর্বশ্রেষ্ঠ তাবেদার আদর্শ বান্দা ছিলেন। তাঁকে অনুসরণ করলে আল্লাহ্‌র তাবেদার বান্দা হওয়া যাবে। তাঁর আনুগত্যই আল্লাহ্‌তায়ালার আনুগত্য। আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন, "কেহ রাসূলের আনুগত্য করলে সেও আল্লাহ্‌তায়ালার আনুগত্য করল।" ৪ঃ৮০।

রাসূল (সাঃ) আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছাড়া তাঁর আলাদা ইচ্ছা নেই, তাকে মানার অর্থ আল্লাহ্‌তায়ালাকে মানা। তাই আল্লাহ্‌তায়ালা যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে তাদের এ সুসংবাদ দিতে বলেছেন যে, "বল, তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ্‌ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। ৩ঃ৩১।

তাই রসুলুল্লাহ্‌র অনুসরণ আল্লাহ্‌তায়ালার ভালবাসার পূর্বশর্ত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মুহববত ও ইচ্ছাতে ফানা না হয়ে কেউ আল্লাহ্‌তায়ালাতে ফানা হতে পারে না। আখিরাতে মাফ পেতে হলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুসরণ ছাড়া

www.pathagar.org

দ্বিতীয় কোন পথ নেই। মাহবুবুল্লাহ (সাঃ) এর অনুসরণ করতে হলে সমভাবে দীন, শরীয়ত ও তরীকতকে অনুসরণ করতে হবে। একটিকেও বাদ দেয়া যাবে না। কারণ এ তিনটি অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অনুসরণ পরিপূর্ণ হয়। ঈমান-ইসলামও পরিপূর্ণ হয়। এগুলির সারমর্ম হল আল্লাহ্তায়ালার একক অবিভাজ্য সার্বভৌমত্ব মেনে শরীয়তের অনুসরণ ও নিজ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচারণ। আল্লাহ্তায়ালা ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে ভালবাসা ও স্রষ্টার নৈকট্য লাভ করা, তাঁর ইচ্ছা ও মুহব্বতে নিজকে ফানা করে দেওয়া।

যারা বলে কোরআন মানি, হাদীস মানি না। তারাও বেঈমান। কারণ কোরআনই বলেছে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে মানতে। এতে তারা কোরআনও মানল না, রাসূলুল্লাহকেও (সাঃ) মানল না।

আল্লাহ্তায়ালা বলেন-"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো, তোমাদের কর্ম বিনষ্ট করো না।" ৪৭ঃ৩৩।

আল্লাহ্তায়ালাকে ভালবাসতে হলে মাহবুবের মাহবুব রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে ভালবাসতে হবে, অনুসরণ করতে হবে। তিনি যাদের ভালবাসেন, নবী-রাসূল, তাঁর সাহাবী, আহলে বাইত ও ওলীদের ভালবাসতে হবে।

আহলে বাইত হলেন হযরত আলী (কা), হযরত ফাতিমা (রাঃ), হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত হোসেন (রাঃ) এবং তাঁদের বংশের ঈমানদার ব্যক্তিবর্গ যারা তাঁকে অনুসরণ করে গেছেন বা করছেন। নবীর অনুসারী না হলে তাঁর পরিজন বলে বংশধর বা বিবি হলেও মানা হয় না। যেমন নূহ (আঃ)এর ছেলে ও লুত (আঃ) এর বিবিকে নবীদ্বয়ের পরিজন বলে আল্লাহ্তায়ালা স্বীকার করেননি।

নূহ (আঃ) এর অবাধ্য ছেলে সম্মন্ধে আল্লাহ্তায়ালা বলেন, "হে নূহ! সেতো তোমার পরিবার ভুক্ত নয়, সে অসত্য কর্মপরায়ণ"।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের ভালবাসতেন। তিনি তাঁদের অনুসরণ করতে বলেছেন। তাই সাহাবীদের ভালবাসতে হবে, শ্রেষ্ঠ সাহাবীদের কার্যাবলীকে সমর্থন করতে হবে, তাঁদের সমালোচনার উর্ধ্বে রাখতে হবে। তাঁদের অনুসরণ করতে হবে।

যারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে অনুসরণ করে ওলী-আল্লাহ্ হয়েছে তাঁদের এবং তাঁদের অনুসারী আলেম ও সূফীদের ভালবাসতে হবে।

আলেম বেআমল হলেও তিনি যদি নামায পড়েন, শরীয়ত মুতাবিক কথা বলেন, ওয়াজ-নসিহত করেন তবু তাকে ভালবাসতে হবে। কারণ তাঁর মুখ দিয়ে

www.pathagar.org

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কথা বের হয় এবং তাঁর কথা তাঁর থেকে পৃথক নয়। এ অধম সব রকম আলেমের হাত-পা চুম্বন করতে রাজী। বেআমল আলেমের বিচার আল্লাহ্তায়ালা করবেন, সাধারণ মুসলমান নয়। বেআমল আলেম থেকে উপদেশ নেওয়া যাবে, তাঁর শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ অনুসরণ করা যাবে না। বেআমল সূফী যদি আলেম না হয় তবে তাকে ভালবাসা যাবে না বা অনুসরণ করা যাবে না, কারণ সে ভন্ড ও পথভ্রষ্ট। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর অনুসারী সূফী অনুকরণযোগ্য ও ভালবাসার পাত্র। খাঁটি সূফী যেমন আল্লাহ্র ওলী, তেমনি আমলদার আলেমও আল্লাহ্র ওলী। আলেমও খাঁটি সূফীদের উসিলায় এত ঝড় -ঝঞ্জার মাঝে ইসলামের দীপ শিখা প্রজ্জ্বলিত আছে।

আল্লাহ্তায়ালাকে ভালবাসতে হলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে ভালবাসতে হবে। আর রসুলুল্লাহর ভালবাসা পেতে হলে আহলে বাইত ও সাহাবগণসহ তাঁকে যারা অনুসরণ করে গেছেন বা অনুসরণ করছেন তাঁদের ভালবাসতে হবে এবং নিজে তাঁর নিষ্ঠাবান অনুসারী হতে হবে। তবেই আল্লাহ্তায়ালার ভালবাসা পাওয়া যাবে।

মুহব্বত একমাত্র আল্লাহ্তায়ালাকেই করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে ভালবাসা মানে মাহবুবের মাহবুবকে ভালবাসা। মাহবুবের মাহবুবকে ভালবাসার উপলক্ষ্য হল তাঁর সাহাবী, তাঁর পরিজন ও তাঁর অনুসারীদের ভালবাসা। সমস্ত ভালবাসার উদ্দেশ্য আল্লাহ্তায়ালার ভালবাসা। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে ভালবাসার কারণে আল্লাহ্তায়ালাও তাঁদের ভালবাসেন।

আল্লাহ্তায়ালা যেহেতু তাঁর সৃষ্টিকে ভালবাসেন, সেজন্য মাখলুককে ভালবাসতে হবে, কিন্তু শিরক-কুফরকে ঘৃণা করতে হবে। শয়তান নবী-রাসূলদের, ওলী ও মুমিনদের শত্রু বলে আল্লাহ্তায়ালারও শত্রু। শয়তান তাঁর সৃষ্টি আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করে আদম (আঃ)এর শত্রু হওয়ায় আল্লাহ্র শত্রু হয়েছে, নইলে হুকুম অমান্য করে শুধু না-ফরমান হত। শয়তান আল্লাহ্তায়ালাতে বিশ্বাস করে নবীদের বিরোধীতা করে কাফির হয়েছে। এখনও তওবাহ্ করে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর অনুসারী হলে মাফ পাবে আল্লাহ্তায়ালার আইন অনুযায়ী। কিন্তু যে অহংকারী, তার তকদীরে তওবাহ্ নেই। এ চরিত্রের মানুষেরা ও জিনেরা কাফির হয়ে গেছে।

ফিরিশতারা যেহেতু আল্লাহ্ভীরু, সেজন্য সঠিকভাবে আল্লাহ্র দাসত্ব করতে পারে, তারা আমাদের ইবাদতে সাহায্যকারী, আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনাকারী, তারা মুমিনদের ভালবাসে এবং আল্লাহ্তায়ালার আনুগত্যকারী, সে জন্য তাদের ভালবাসতে হবে।

www.pathagar.org

যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর অনুসরণ দ্বারা নিজে পরিপূর্ণ হয়েছে এবং যিকির ও ইবাদত দ্বারা বিশুদ্ধ ও পবিত্র হয়েছে এবং আল্লাহ্ প্রেমিকদের ভালবাসেন ইনশাআল্লাহ্ তার মনে আল্লাহ্ প্রেম জন্মাবে। শর্ত হল হারাম না খায় হারামী কাজ না করে, মিথ্যা কথা না বলে ও নিজকে বিনয়ী রেখে ইবাদতে ও যিকিরে নিবিষ্ট থাকে এবং আল্লাহ্ ভিন্ন পদার্থ মন থেকে বের করে দিতে পারে এবং সর্বকাজে আল্লাহ্তায়ালার সার্বভৌমত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বকে অগ্রাধিকার দিতে পারে।

মনে কোন সময়ই এ ধারণা না নেওয়া যে, আল্লাহ্তায়ালা কিছুই করেন না, তাঁর কাজ রাসূল, ফিরিশতা এবং ওলি-আল্লাহ্গণ করেন, অন্তরচোখে এরূপ দেখলেও মনে করতে হবে আল্লাহ্র হুকুম ছাড়া তাঁরা কিছুই করেন না। ইবরাহীম (আঃ)কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের সময়ও তিনি ফিরিশতাদের সাহায্য নেননি। আর অনেকে চালাকি করে রাসায়নিক দ্রব্য, জিন শয়তানদের সাহায্য নিয়ে নকল বুযুর্গ সেজে দোকানদারী করছে। আল্লাহ্তায়ালার যাত-সিফাতকে মানুষের দেহ, কর্মক্ষমতা ও গুণের মত মনে করাও মস্ত ভুল। স্রষ্টার যাত, সিফাত ও কাজ তুলনাবিহনী।

আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) প্রভূর প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্বের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপক জড় ও আধ্যাত্মিক জগতের। তিনি সুস্পষ্ট সত্য, সুষ্ঠু রাজনীতি, আদর্শ আচরণ, পাক-পবিত্র আখলাক, অমর বাণী এবং পরিপূর্ণ আহকামসহ নূরী জগত হতে জড় দেহ নিয়ে জড় জগতে আসেন আল্লাহ্র বন্দেগী বা দাসত্ব শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং আল্লাহ্তায়ালার তওহীদসহ তাঁর স্বরূপ জানাবার জন্য। আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে দুনিয়া ও আখিরাতের কাজ এবং দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের শৃংখলার জন্য নিয়োগ করেছেন। আল্লাহ্র ইচ্ছা ছাড়া তাঁর কোন আলাদা ইচ্ছা নেই। দুনিয়াতে তিনি প্রমাণ রেখে গেছেন যে, তিনিই আল্লাহ্তায়ালার সর্বশ্রেষ্ঠ তাবেদার বান্দা। বিভিন্ন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েও তিনি আল্লাহ্র আদেশ পালন করে গেছেন। বদর যুদ্ধে তিনি শত্রুর প্রতি কংকর নিক্ষেপ করেছিলেন, আল্লাহ্তায়ালা কোরআনে বলেন, "কংকর তুমি নিক্ষেপ করোনি, আমি নিক্ষেপ করেছি।" এখানে আল্লাহ্র ফায়েযে বান্দার হাত আল্লাহ্র হাতে রূপান্তরিত হয়েছে। তাই রসুলুল্লাহর (সাঃ) কর্ম ও বাণী ফায়েযের দ্বারা আল্লাহ্রই কাজ ও বাণী হয়েছে। অন্তরালে থেকে ফায়েযের দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে দিয়ে আল্লাহ্তায়ালা কথা বলিয়েছেন, কাজকর্ম করিয়েছেন। হযরত আলী (কা) বলে গেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহ্তায়ালার মধ্যেই অবস্থান করতেন। যার অর্থ

www.pathagar.org

আল্লাহ্তায়ালার আদিম অপরিবর্তনশীল গুপ্ত ভাণ্ডার রূপ নূরে অবস্থান করতেন বা ফানা থাকতেন। আল্লাহু জাল্লা শানুহুর ইচ্ছা, জ্ঞান, গুণ, শক্তি ও সৌন্দয্যে ফানার অর্থ সেসব গুণাবলীতে বাকা লাভ করা, সে স্তরে ফানাই বাকা। ইনশাআল্লাহ্ তরীকত খন্ডে বিস্তারিতভাবে জানানো হবে।

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে আমার সুন্নতকে ভালবাসে, সে আমাকে ভালবাসে। যে আমাকে ভালবাসেন, সে আমার সাথে বেহেশতে যাবে।" তিরমিযি, মিশকাত।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হলেন আল্লাহ্তায়ালার হেদায়েতের ও জ্ঞানের শিক্ষক আর দাতা স্রষ্টা স্বয়ং; তিনি জ্ঞানের নূরের বন্টনকারী। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জিবরাঈল (আঃ) মারফত শিক্ষা প্রাপ্ত। আর জিবরাঈল (সাঃ)কে শিখিয়েছেন আল্লাহ্তায়ালা। এভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়ে তিনি ওলী ও মুমিনদের শিখাচ্ছেন।

আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞান সার্বজনীন বলে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গবেষণা, অভিজ্ঞতা ও যুক্তির সাহায্যে বইপত্র পড়ে মানুষ সে জ্ঞানের অংশ বিশেষ বা আংশিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে। উপযুক্ত শিক্ষক ছাড়া শুধু প্রকৃতি যাচাই করে এ জ্ঞান লাভ করে বলে এর আদি অন্ত জানতে পারে না। কিন্তু হেদায়েত আল্লাহ্তায়ালার প্রেমাস্পদ রসুলুল্লাহর (সাঃ) অনুসারী না হলে নূর পাবে না, আসল সত্য জানতে পারবে না। দ্বীনের ব্যাপারে এবং খন্ডিত আংশিক জ্ঞান দ্বারা অখন্ড জ্ঞানের বিরোধীতা করলে তারাও কাফির হয়ে আল্লাহ্র শত্রুতে পরিণত হবে, এ জ্ঞানও কোন কাজে আসবে না আস্তিক হলেও। নিয়ম-পদ্ধতি না মানার কারণে মৃত্যুর মহাসংকটে সব ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে। কেউ নাফ্সের বিরোধীতা করে সাধনার দ্বারা অন্তরচোখ খুললেও যদি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বা অন্য কোন নবী -রাসূলের সত্যিকার অনুসারী না হয় ও রাসূলূল্লাহ (সাঃ) এর রেসালতের সাক্ষী না দেয় তবুও তার মৃত্যুর সময় তা কোন কাজে আসবে না, বেঈমান হয়ে মরতে হবে। আর অন্য কোন নবীর সত্যিকার অনুসারী হলে সেই নবী তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে যোগাযোগ করিয়ে তাঁর অনুসারী বানিয়ে দিতে পারেন। কারণ আখেরী যমানাতে শুধু রসুলুল্লাহর (সাঃ) নবুয়ত কার্যকরী রয়েছে।

যারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর অনুসারী হবে না তাদের অন্তর সীল করে দেওয়া হবে, নাফ্স ও শয়তান তার দীল-দেমাগ দখল করে নেবে এবং আত্মা ও আক্লের নূরকে ঢেকে দেবে; ফলে সহজাত আক্ল ঢাকা পড়বে। তওবাহ্ করে ঈমান গ্রহণ করলেই সীল ধীরে ধীরে সৎকাজ দ্বারা উঠিয়ে নেওয়া হবে। নইলে

www.pathagar.org

বিনা তওবাহ্য় মৃত্যু হলে অপরাধী হিসাবে কয়েদখানারূপ সিজ্জীনে আবদ্ধ হবে, স্থায়ী সৃষ্টিতে যার বাস্তব রূপ জাহান্নামে চলে যেতে বাধ্য হবে ও সেখানে আটক থাকবে।

জ্ঞানও আল্লাহ্তায়ালার একটি গুণ। জ্ঞান গুণ বলে একত্বের কারণে জ্ঞান গুণকে, গুণ জ্ঞানকে, এক জ্ঞান-গুণ অন্য জ্ঞান-গুণকে টেনে আনে, এবং সমস্ত জ্ঞান-গুণ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে সংশ্লিষ্ট বলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে অনুসরণ করলে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর জ্ঞান ও গুণের নূরকে অনুসরণ করলে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর জ্ঞান ও গুণের নূরকে অনুসরণকারীর কলবে ঢেলে দেন বা তাজাল্লী করেন, তখন তার কাছে জ্ঞানের মহাবিশ্ব খুলে যায়। তখন অক্ষরবিহীন লোকও আল্লাহ্র জ্ঞানে জ্ঞানী ও গুণী হতে পারে। তাঁর গুণাবলী জ্ঞান নামক স্তরে স্তরে টেনে আনে এবং আত্মাতে মিশায়। হৃদয় বা মনই হল জ্ঞানের স্থান। কাম ক্রোধ, লোভ-লালসা, সংসারের মোহ ও অহংকার মনে না থাকলে এবং আল্লাহ্র স্মরণের জন্য আল্লাহ্ ভিন্ন পদার্থ মন থেকে বের হয়ে মন পবিত্র হয়ে যাওয়ায় তখন কাশ্ফ, ইলহাম ও স্বপ্ন মারফত এ জ্ঞান লাভ হয়। এ জ্ঞান ওপর থেকে নীচে অবতরণ করে। এটা হল নবী-রাসূল ও ওলী আল্লাহ্দের জ্ঞান লাভের পদ্ধতি। এ জ্ঞান খুবই নিশ্চয়াত্মক। এ পদ্ধতির জ্ঞান যদি কোরআন-সুন্নাহ্র জ্ঞানের অনুগামী না হয় তবে ওলী-আল্লাহ্গণ তা প্রত্যাখ্যান করেন। একেও শয়তানের ধোঁকা বলেন। তাই সকল জ্ঞানকে অবশ্যই কোরআন সুন্নাহর অনুগামী হতে হবে। নইলে ভুল হবে।

আবার সৃষ্টিপুঞ্জ দেখে ও গবেষণা করে কোরআন-সুন্নাহ্র অনুগামী ও সামঞ্জস্যশীল যে জ্ঞান লাভ করা যায় তা হল দ্বিতীয় শ্রেণীর জ্ঞান। এরূপ ভাবে জ্ঞান লাভ করতেও আল্লাহ্তায়ালা উৎসাহ যুগিয়েছে। এতেও ঈমান সমৃদ্ধি লাভ করে, সাথে সাথে আক্ল ও আত্মা বৈজ্ঞানিকগণ ও বিজ্ঞাননির্ভর দার্শনিকগণ এভাবে খন্ডিত জ্ঞান লাভ করেন। কোরআন- সুন্নাহ্র বিরোধী না হলে এ খন্ডিত জ্ঞান সত্য হবে, বিরোধী হলে ভুল হবে, পরে হয়ত তা পরিবর্তিত হয়ে সত্য হতে পারে যা কোরআন-সুন্নাহ বিরোধী হবে না। তাই কোরআন-সুন্নাহ্র সত্যের সাথে যাচাই-বাছাই না করে হঠাৎ করে এ জ্ঞানে বিশ্বাস জন্মাতে নেই, যদি অসত্যে বিনা দলীলে বিশ্বাস জন্মানো যায় তবে মৃত্যুর সময় আল্লাহ্তায়ালা তা প্রকাশ করে দেবেন, তখন ঈমান নিয়ে মরাই মুশকিল হবে। এরূপ জ্ঞান নীচ থেকে উপরে যায়।

এক আল্লাহ্কে বিশ্বাসী বৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞান নির্ভর আস্তিক দার্শনিকগণ আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন। তাদের আবিষ্কৃত একত্ব মহাশক্তি পর্যন্ত

www.pathagar.org

অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টি শক্তি জগত আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু তাঁর সত্যিকার স্বরূপ আবিষ্কার করতে পারেনি ও তাঁর প্রমাণ পায়নি। ফলে এসব জ্ঞানের ওপর নির্ভর করা খুবই ভুল হবে। তাদের আবিষ্কৃত মহাশক্তি বা শক্তিজগত আল্লাহ্তায়ালা নন। এই শক্তিজগত সৃষ্ট, যার থেকে জড় জগত প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ জড়জগতের পদার্থসমূহ জন্ম নিয়েছে। আবার সৃষ্টির নিয়ম বা আল্লাহ্তায়ালার প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী সেই পদার্থ সকল শক্তিতে বিলীন হচ্ছে; শক্তি ঠিকই আছে, ক্ষয় হচ্ছে না।

বিজ্ঞানীগণ দৃশ্য ও অদৃশ্য পদার্থ সকলের যে ভর বা আকর্ষণ আবিষ্কার করেছেন তাতে প্রমাণিত হয়েছে, শতকরা দশভাগ মাত্র দৃশ্যমান এবং শতকরা নব্বই ভাগ অদৃশ্য পদার্থ। অদৃশ্যে বিশ্বাস না থাকায় তারা বর্তমানে হতবুদ্ধির প্রান্তরে দিশেহারা অবস্থায় আছে। অখন্ড জ্ঞানের ব্যাপারে তারা নানা জল্পনা-কল্পনার প্রলেপ দিচ্ছে। কোরআন-সুন্নাহ বিরোধী এসব কল্প-কথায় বিশ্বাস আনা যাবে না, অনুগামী হলে বিশ্বাস যোগ্য হবে, তবে বিশ্বাসী ঈমানদারগণ না বুঝলে এ ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকাই উচিত, কেবল অভিজ্ঞতার জ্ঞান কারিগরী বিদ্যার দ্বারা পার্থিব উন্নতি হতে পারে বলে তা গ্রহণযোগ্য। তেমনি চিকিৎসাবিদ্যা, ভূগোল, জ্যামিতি ও অংক ইত্যাদি মোবাহ ও মানবকল্যাণকর বলে গ্রহণযোগ্য। যেমন বিষয়ে বিষয়ের চেয়ে লেখকের স্বকর্তৃত্ব বেশী থাকে, যেমন দর্শন, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি বিজ্ঞান না হলেও বিজ্ঞান বলে আখ্যায়িত হচ্ছে। এ সব বিষয় বিভ্রান্তিকর বলে এ সবে বিশ্বাস করতে নেই। বিজ্ঞাননির্ভর আস্তিক দার্শনিকগণ আল্লাহ্তায়ালার স্বরূপ সঠিকভাবে বলতে পারে না, তবে তারা আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও একত্বের প্রমাণ পেয়েছে। তবে শক্তি জগত বা আলমে জাবরূত পর্যন্তই তাদের একত্ব। শক্তি জগতকেই তারা মহাশক্তি বলে উল্লেখ করছে। এ শক্তিজগত সৃষ্ট, মহাশক্তি বা সার্বভৌম শক্তি নয়। সৃষ্ট শক্তি জগতকে মহাশক্তি বলে ভাবাও শিরক। এ পর্যন্ত গিয়েই তারা মনে করে শক্তি থেকেই প্রাকৃতিক নিয়মে জড় ও জীব জগত সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহ্তায়ালাকে তারা অনুপস্থিত রাখে। এ সব তথাকথিত আস্তিকরা ভেবে নিচ্ছে, শক্তিই আল্লাহ্তায়ালা যার দ্বারা জড়, উদ্ভিদ ও জীব জগত সৃষ্টি হয়েছে। সত্য হল যে শক্তিজগতকে আল্লাহ্তায়ালা সৃষ্টি করে শক্তি কণা ও বিভিন্ন গুণাবলীর কণা মিশ্রিত ও যৌগিক করে সুনিপুণ সৃষ্টি কৌশলে বিভিন্ন গুণাবলী হতে ভিন্ন ভিন্ন জড়, উদ্ভিদ ও প্রাণী জগত সৃষ্টি করেছেন এবং বৈশিষ্ট্যময় করেছেন। শক্তি কনার সাথে যদি বিভিন্ন নূরী গুণাবলীর কণার মিশ্রণ না ঘটত, আল্লাহ্তায়ালা যৌগিক না করতেন, তবে বিশ্বজগত তার যাতী নূরে ছারখার হয়ে যেত।

www.pathagar.org

বিজ্ঞানীদের একত্বও বিভ্রান্তিকর। একত্ব বিশ্বাস না করলে তাদের পদার্থ ও মহাকাশ গবেষণা অচল হয়ে যায়। তাই শক্তি ও পদার্থের একত্বে বিশ্বাস করে, আল্লাহ্তায়ালার একত্বে বা তাঁর গুণাবলীর একত্বে নয়। আল্লাহ্তায়ালার একত্ব ব্যাপক; চলমান জীবের বিভিন্ন কর্মক্ষমতা গুণাবলীসহ বিশ্ব-প্রকৃতির একত্বে বিশ্বাসী নয়। তাই বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল না হয়ে আল্লাহ্ তথা কোরআন ও সুন্নাহর উপর জ্ঞানের ব্যাপারে নির্ভরশীল হতে হবে।

আস্তিক বিজ্ঞানীগণ ও বিজ্ঞাননির্ভর আস্তিক দার্শনিকদের মতে শক্তিই সব কিছু সৃষ্টি করেছে, সমস্ত কিছুই শক্তির অন্তর্গত। তখন এ সংগত প্রশ্ন আসে যে, শক্তির বিপরীত দয়া-মায়া ও ক্ষমার গুণ কোথায় যাবে? শ্রবণ, দর্শন, জীবন, জ্ঞান ও সৃজনের গুণাবলী কোথায় যাবে? এ প্রশ্নের সমাধানের জন্য তাদের একদল বলছে, আল্লাহ্তায়ালার কোন গুণ নেই, অন্যদল বলছে, এসব গুণরাজী শক্তির অন্তর্গত। যারা গুণরাজি শক্তির অন্তর্গত বলছে তারা বিজ্ঞানের উপর নির্ভর না করে বিবেকের উপর নির্ভর করে বলছে। বিজ্ঞান শক্তি ছাড়া কিছু জানতে ও বুঝতে রাজী নয়। তাদের জানা উচিত দু'দলই বিভ্রান্তিতে আক্রান্ত। যারা বলে, আল্লাহ্তায়ালার গুণ নেই, তাদের জানা উচিৎ যে নির্গুণ থেকে গুণ সৃষ্টি হতে পারে না। যারা বলে, সব গুণ শক্তির অন্তর্গত, তারা তা হলে স্বীকার করে নেয় যে, শক্তি সব সময় প্রবল থাকে, অন্যান্য সম্মিলিত গুণ হতেও। এরূপ হলে শক্তিকে অন্য গুণ ব্যবহার করতে পারবে না- শক্তিই অন্য গুণকে ব্যবহার করবে। একবার এটম বোমার বিস্ফোরণ হলে এর শক্তি আল্লাহ্তায়ালার অন্য গুণাবলী টেনে না নিলে তা চিরস্থায়ী থাকত। শক্তিও আল্লাহ্তায়ালার অন্যান্য গুণের মধ্যে একটি গুণ মাত্র।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর অনুসারীদের মতে কোরআন-সুন্নাহ, বিশ্ব-প্রকৃতি ও নূরী জগত দ্বারা আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্ব প্রমাণিত। সেরূপ দয়া-মায়া, হেদায়েত, শ্রবণ, দর্শন, জীবন, জ্ঞান, সৃজন ক্ষমতা ও শক্তি আল্লাহ্তায়ালার পৃথক পৃথক গুণরাজি, যা তাঁর থেকে পৃথক নয়। শক্তি আল্লাহ্তায়ালার পৃথক গুণাবলীর মধ্যে একটি গুণ। শক্তিই আল্লাহ্তায়ালা নন, আবার শক্তি থেকে অন্যান্য গুণাবলীর মত আল্লাহ্তায়ালা পৃথক নন। এসব পথহারা দিশেহারা দার্শনিকদের মতবাদে বিভ্রান্ত হয়ে অনেকে সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ্তায়ালার প্রকাশবিহীন অবস্থাকে নির্গুণ বলে পথ ভ্রষ্ট হচ্ছে। প্রকাশ বিহীন অবস্থায় সমস্ত গুণরাজিসহ আল্লাহ্তায়ালা শক্তিরূপে অবস্থান করতেন। তরীকত খন্ডে বিস্তারিত জানানো হবে। দার্শনিকদের মত অনুযায়ী যারা এক বা একাধিক ঈশ্বরে বিশ্বাসী সে সব ঈশ্বরের স্বরূপ, সার্বভৌমত্ব সম্মন্ধে বিভিন্ন মতবাদ পোষণ করে, মুশরিকদেরও তারা

www.pathagar.org

আস্তিক বলে। এখন বিজ্ঞান নির্ভর হয়ে অনেক মুশরিকও নিজেদের একেশ্বরবাদী বলছে, যদিও স্বরূপে আল্লাহ্তায়ালাতে বিশ্বাস নেই। প্রকৃতিতে আল্লাহ্তায়ালার সার্বভৌমত্ব মানে, অথচ যমীনে মানবীয় সার্বভৌমত্ব। নবুয়ত ও রিসালাত মানে না। বিজ্ঞান নির্ভর বিশ্বাস সব সময় বিজ্ঞান মুতাবিক স্থানচ্যুত হয় অর্থাৎ সত্য অসত্য এবং অসত্য সত্য হয়। তাদের নিকট আগে জড় সব কিছু ছিল, এখন শক্তিই সব কিছু, পূর্বেও মুশরিকগণ জড় ও শক্তির প্রতীক গড়ে পূঁজা করত।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর অনুসারীগণ। দার্শনিকদের বিভ্রান্তি হতে সাবধান। সত্যিকার আস্তিক হল তারা, যারা কোরআন-সুন্নাহ মুতাবিক স্বরূপে তওহীদের মাধ্যমে আল্লাহ্র অস্তিত্বে ও একমাত্র তাঁর সার্বভৌমত্বে এবং নবুয়ত ও রিসালতে বিশ্বাসী।

আল্লাহ্তায়ালার একটি বাক্য অর্থাৎ কোরআনের একটি আয়াত অস্বীকার করলে কেউ আর আস্তিক থাকে না। সেখানে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত দু'চারটি আয়াত বিশ্বাস করে আর বিশ্ব-প্রকৃতি দেখে আল্লাহ্র আস্তিত্ব স্বীকার করে কেউ আস্তিক হতে পারে না।

কোরআনসুন্নাহর আহ্বানে সাড়া না দিলে, সত্যকে না জানলে, তাদের কাজ তারা করুক, আমাদের কাজ আমরা করব, ফায়সালাকারী স্বয়ং আল্লাহ্। তিনি বলেছেন, "তারা যদি তোমাদের আহ্বানে সাড়া না দেয় তবে জেনে রেখ, ইহা কোরআন আল্লাহ্রই জ্ঞান হতে অবতীর্ণ এবং তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তবে কি তোমরা আত্মসমর্পনকারী হবে না? " ১১ঃ১৪।

রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইবাদতের রীতিনীতি, অভ্যাস ও চরিত্র আল্লাহ্তায়ালার নিকট খুবই পছন্দনীয় ও কবুলযোগ্য প্রেমাস্পদের সুন্নত প্রেমিক আল্লাহ্র নিকট পছন্দনীয় ও বরণীয়। তাই তাঁর অনুকরণ-অনুসরণই আল্লাহ্তালার নৈকট্য ও মিলন লাভের একমাত্র পথ। যে ব্যক্তি শরীয়তের অনুগত হয় সে সম্মানের আসনে বসে। যারা তার অনুসরণ করে না, তারা পর্দার আড়ালে পড়ে থাকে, তারা নাফ্সের খিয়াল-খুশীতে আবদ্ধ। তাঁর নবুয়ত-রিসালাত ও জ্ঞান সারা জাহানকে পরিবেষ্টন করে আছে। যে ব্যক্তি তার উপর ঈমান এনে তাঁর হুকুম-আহকামের আনুগত্য করবে সে মুক্তি পাবে, যে বিরোধীতা করবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহ্তায়ালার নিকট হতে যে নির্দেশ পেয়েছেন তাই মানুষ ও জিনদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এর উপর কোন যুক্তি -তর্কের অবকাশ নেই। যদি শক্তিশালী বাদশাহর ফরমানের বিরুদ্ধে সমালোচনা দন্ডনীয়

www.pathagar.org

অপরাধ বলে গণ্য হয়, তবে স্রষ্টার ফরমানের বিরুদ্ধে সৃষ্টির সমালোচনা কত বড় অপরাধ হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। ঈমানের ব্যাপারে কলহকারী হৃদয় নিয়ে আখিরাতে মুক্তি পাওয়া যাবে না। পরকালে আল্লাহ্‌র দীদার ও মিলন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এবং অন্যান্য নবীগণের অনুসরণ ছাড়া সম্ভবপর হবে না। অনুসরণের উপর আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতিশ্রুতি বা ওয়াদার শাস্তি বা পুরস্কার কার্যকরী হবে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সুন্নত অনুসরণের মধ্যেই তাসাওউফ ও তরীকত নির্ভরশীল। এ ছাড়া কোন তাসাউফ ও তরীকত নেই। যদি শরীয়তে মুহাম্মদী ছাড়া তাসাওউফ ও তরীকত আছে বলে কেউ দাবী করে তবে দাবীদার হয় ভন্ড, নইলে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট। উক্ত পথভ্রষ্টের অনুসারীগণও পথ ভ্রষ্ট। এ নিয়ে হাজার বছর ধরে বহু লেখালেখি হয়েছে।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণায় দেখা গেছে, শরীয়তকে নিষ্ঠা সহকারে ইখলাসের সাথে পালন করতে হলে তাসাওউফ বা তরীকতের সাধনা একান্ত প্রয়োজন। আল্লাহ্‌তায়ালা কর্তৃক নাযিলকৃত সকল তরীকার ইমাম সাহেবগণ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নির্দেশিত পথে কোরআন-সুন্নাহ্‌র আদেশ পালন করেই ওলীআল্লাহ্‌ হয়েছেন, আল্লাহ্‌তায়ালার প্রিয়ভাজন হওয়ার কারণেই তাদের উপর তরীকত নাযিল হয়েছে।

কোন মুসলমান পথভ্রষ্ট হলে যেমন ইসলাম দায়ী নয়, তেমনি তরীকার কোন অনুসারী পথভ্রষ্ট হলেও তরীকত দায়ী নয়। তাসাওউফ ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পূর্ণ ও বিশুদ্ধ অনুসরণ ও আনুগত্য নেই। যারা শরীয়ত এবং তাসাওউফ ও তরীকতকে আলাদা বলে, তারা এ সম্মন্ধে অজ্ঞ এবং অজ্ঞতার ওজর আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। যে জ্ঞানের কথা তাদের বলা হয়েছে তা গ্রহণ করল না কেন? প্রকাশ্যে রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)কে অনুসরণ এবং অপ্রকাশ্যে তাঁকে অবজ্ঞা করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ইহা ফাসেকী ও মুনাফিকী ছাড়া কিছুই নয়। প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে অনুসরণই কবুলযোগ্য।

আল্লাহ্‌তায়ালা কোন কিছু বিনা উদ্দেশ্যে ও কারণে শুধু খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করেননি। সকল সৃষ্টি তাঁর বশ্যতা স্বীকার ও আনুগত্য করবে, যার নাম ইবাদত। জড় পদার্থসমূহ ইচ্ছা ও অনিচ্ছায় তার আদেশ পালন করছে। চলমান জীব সকল তাঁর নির্দেশ ও ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন যাপন করছে। মানুষ ও জীনকে অধিকতর আক্‌ল দিয়ে দায়িত্ব ও কর্তব্য স্থির করে আদেশ-নিষেধ করেছেন। প্রবৃত্তি বা নাফ্‌সের বিরোধিতা করে সে আদেশ-নিষেধ পালন করবে।

www.pathagar.org

আল্লাহ্তায়ালা মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন, কেবল ইবাদত করার জন্যই তাদের সৃষ্টি করেছেন। যাতে তারা তাঁকে জানতে ও বুঝতে পারে। সে জন্যই তিনি গুপ্ত অবস্থা থেকে তাঁর জ্ঞান, গুণ, সৌন্দর্য, প্রেম ও ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। যে জন্য তাঁর প্রেমাস্পদ হাকীকতে মুহাম্মদী সৃষ্টি করেন এবং তাঁর প্রতি মুহব্বত এলকা করেন, তাঁকে প্রবৃত্তি দান করেন। তাঁর প্রেমাস্পদ স্বেচ্ছায় সে প্রবৃত্তির বিরোধীতা করে, সকল বাঁধা-বন্ধনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, তাঁর আদেশ নিষেধ মেনে তাঁর সাথে মিলিত হবেন এবং জগতের সাথে ও নিজের সাথেও সংগ্রাম করে আদর্শ স্থাপন করবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দ্বারা সে আদর্শ স্থাপনের উদ্দেশ্যে সমগ্র কিছু সৃষ্টি করেন। সব সৃষ্টি ইচ্ছা-অনিচ্ছায় তাঁর আনুগত্য করছে, স্রষ্টার আনুগত্যকে ইবাদত বলে। সব সৃষ্টি ইবাদত করছে মানুষের মঙ্গল ও প্রয়োজনের জন্য আর অপরাধীদের শাস্তির জন্য। আর মানুষ আল্লাহ্র ইবাদত করে তার নিজের মঙ্গলের জন্য। এজন্যই ইবাদতকে স্বেচ্ছাধীন করা হয়েছে। জড় ও উদ্ভিদজগত তাঁর আনুগত্য করছে, অথচ তাদের আক্ল দেননি, বিনা আক্লেই উদ্দেশ্য পূরণ করছে। সচল প্রাণীদের আত্মরক্ষার ও বংশ বিস্তারের আকল দিয়েছেন। কতগুলোকে মানুষের অনুগত করে দিয়েছেন হালচাষ, বোঝা বহন ও দুধের জন্য। বন্য পশু-পাখী তাদের খাদ্যের জন্যই প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে। পাখী ফল খেয়ে প্রকৃতির বংশ বিস্তার করে তাদের কর্তব্য পালন করে। ফিরিশতাদের তাঁর ভয় কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের আক্ল দিয়েছেন, এমন কি তাঁর ইচ্ছা ছাড়া অন্য ইচ্ছা শক্তি তাদের দেননি। কর্তব্য ও দায়িত্ব ছাড়া তারা চিন্তা-ভাবনা করতে পারে না, মানুষের মঙ্গল চিন্তা ছাড়া। এভাবে সমগ্র সৃষ্টি ইচ্ছা বা অনচ্ছায় তার আনুগত্য করছে। একেই বলে স্রষ্টার দাসত্ব বা বন্দেগী।

মানুষ ও জিন ছাড়া চলমান প্রাণীদের আত্মরক্ষা ও আত্মবিস্তারের আক্ল দিয়েছেন সে জন্য তারাও পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অভিজ্ঞতার সাহায্যে প্রকৃতি হতে কমবেশী জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং সে -জ্ঞানের সমন্বয় করতে পার, যদিও অংগ-প্রত্যংগ সুনিপুণ নয় বলে মানুষের মত তা কার্যে পরিণত করতে পারে না।

মানুষ ও জিনকে অধিক মাত্রায় আকল দিয়েছেন এবং মানুষকে সুনিপুন অংশ প্রত্যংগ দিয়েছেন। এবং তাদের স্বার্থে ঈমান গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে দায়িত্ব ও

www.pathagar.org

কর্তব্য স্থির করে আদেশ-নিষেধ জারী করেছেন। এ অস্থায়ী সৃষ্টি কিয়ামতে ধ্বংস করে স্থায়ী সৃষ্টিতে তাঁর আদেশ নিষেধ মান্যকারীদের পুরস্কার ও তাঁর আদেশ-নিষেধ অমান্যকারীদের শাস্তি দেবেন, এ কথাও জানিয়ে দিয়েছেন। মানুষকে তাঁর প্রতিনিধি হওয়া ও তাঁকে প্রেম করার মত যোগ্যতা, অদৃশ্যের জ্ঞান অর্জনের উপাদান ও অংগ-প্রত্যংগ দিয়েছেন। পশু প্রবৃত্তি দমন করলেই সে এ যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে।

তাঁর দাসত্ব বা আনুগত্য করার জন্য সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। দাসত্ব তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ও নিয়ামত। আল্লাহ্তায়ালার ধন-ভান্ডারে যত নিয়ামত আছে, যেমন প্রেম, দয়া, করুণা, চিরস্থায়ীত্ব, অভাবশূণ্যতা, সৌন্দর্য, মর্যাদা প্রত্যাশা, গৌরব, সর্বশক্তির আধার, সর্বগুণের আধার ইত্যাদি যাবতীয় কিছু প্রভূর জ্ঞান ও গুণ। সেই ধন-ভাডারে নেই অক্ষমতা, দীনতা-হীনতা, অনুনয়-বিনয়। এগুলো তিনি নতুন করে সৃষ্টি করেছেন তাঁর দাসদের জন্য। এগুলো বান্দার নিজস্ব গুণ। যে এ আনুগত্যের গুণগুলো নিয়ে আল্লাহ্তায়ালার সাথে ব্যবসা করবে, সে আল্লাহ্র ধন-ভান্ডার হতে সৃষ্টি ও প্রতিপালনের ক্ষমতা ছাড়া সব কিছু লাভ করতে পারবে। এ সৃষ্টিই হল দাসত্বের গুণগুলো বাস্তবায়িত করার সময় ও সুযোগের সৃষ্টি, এ সৃষ্টির জীবন হল সেই ধনভান্ডার হতে নিয়ামত লাভের জন্য দাসত্বের গুণ লাভ করার জীবন। বেহেশতেই মানুষ চিরস্থায়ীত্ব, অভাবশূণ্যতা, মর্যাদা ও সৌন্দর্য্য লাভ করবে যা মানুষের কল্পনার বাইরে, পৃথিবীতে যা অলৌকিক ও অসম্ভব বলে বিবেচিত হয়, কল্পনায় যা আসতে পারে না, তাই সে দাসত্বের দ্বারা অর্জন করতে পারবে। তাই দাসত্ব হল আল্লাহ্র গুণরাজি অর্জনের কারণ ও উপায় স্বরূপ। এ সৃষ্টির মধ্যে মানুষের সত্তাকে সবচেয়ে দুর্বল ও অসহায় করে সৃষ্টি করেছেন, প্রবৃত্তি ও শয়তান রূপ শত্রুর মোকাবিলায় ছেড়ে দিয়েছেন তাঁকে কতটা মান্য করে পরীক্ষার জন্য। যে এই প্রবৃত্তিকে পরাজিত করতে পারবে, সেই লাভ করবে অফুরন্ত শক্তি, চিরস্থায়ী ও অভাবশূণ্য সত্তা। যে যত সুষ্ঠুভাবে ও নিষ্ঠার সাথে আনুগত্য বা ইবাদত করতে পারবে, সে তত আল্লাহ্তায়ালার গুণরাজি অর্জন করে স্রষ্টার ধনভান্ডারের অধিকারী হবে। স্রষ্টার মধ্যে বিলীন হয়ে তাঁর দীদার লাভ করলে তাঁর সার্বভৌমত্ব ও সৃষ্টি কর্তৃত্ব ছাড়া তাঁর সব গুণ লাভ করতে পারবে।

তাই সৃষ্টির জন্য দাসত্বের উপরে শ্রেষ্ঠ যোগ্যতা বা গুণ আর কিছুই নেই। দাসত্ব আল্লাহ্তায়ালার কোন গুণের সাথে মুকাবিলা করে না। দাস হিসাবে প্রভূর কোন গুণ লাভ করলে সে গুণকেও দাসত্বের সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করতে হবে।

www.pathagar.org

দাস হিসাবে থাকতে হবে এবং দাস হিসাবেই জীবন যাপন করতে হবে। যারা দুনিয়াতে সামান্য কিছু লাভের আশায় ও বিপদ মুক্তির জন্য আল্লাহ্তায়ালার দাসত্ব ছেড়ে তাগুতি শক্তির কাছে তোষামোদ, অনুনয়-বিনয় করতে পারে, তারা অতুলনীয় ও অকল্পনীয় সম্পদের জন্য আল্লাহ্তায়ালার দাসত্ব করতে পারে না, এটাই আশ্চর্য। যে যত বেশী দাসত্ব করতে পারবে, সে আল্লাহ্তায়ালার গুণরাজি অর্জন করে তত বেশী চিরস্থায়ী সম্পদের অধিকারী হবে। যে যত পরিপূর্ণ দাস হবে সে তত পরিপূর্ণ মানব হবে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পরিপূর্ণ তাবেদার ও আদর্শ দাস ছিলেন বলে পরিপূর্ণ ও আদর্শ মানব ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে ভালবেসে অনুসরণ করলে আল্লাতাআলার দাস হওয়া যায়, আল্লাহ্তায়ালার দাস হলে তাঁর ভালবাসা পাওয়া যায়। পরিপূর্ণ অনুসরণকারী হলে দাসত্ব পরিপূর্ণ হয়, দাসত্ব পরিপূর্ণ হলে পরিপূর্ণ মানব হওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আদর্শ তাবেদার দাসের পরীক্ষা দেবার জন্য এবং মানুষের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য হাকীকতে মুহাম্মদীর নূরী জগত ছেড়ে ধরার ধূলায় নেমে এসেছিলেন।

সমস্ত নবী অনুকরণযোগ্য পরিপূর্ণ দাস ছিলেন। তবে অন্যান্য নবী তাঁর বৈশিষ্ট্য হল সৃষ্টি, মানব মন্ডলীর নেতা, জগত সমূহের রহমত, তাঁর হাকীকত দ্বারা সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে। তার হাকীকতকে সর্ব প্রথম খিলাফত দ্বারা ভূষিত করা হয় এবং এ খিলাফত কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। হাদীসে তিনি বলে গেছেন- আদম (আঃ) যখন মাটি ও পানিতে ছিলেন তখনও তিনি নবী ছিলেন।

মি'রাজে তিনি সকল নবী ও ফিরিশতাদের ইমামতি করেছেন। হাশরে শুধুমাত্র তাঁর সুপারিশে বিচার শুরু হবে। দুনিয়াতে কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর অনুসারীদের মধ্যে হতে গওস, কুতুব বা খলীফা করা হচ্ছে তাঁর মাধ্যমে। তার অনুসারীগণই বেহেশতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। তিনি একমাত্র মানব যিনি মি'রাজে সশরীরে পরকাল তথা বরযখ, বেহেশ্ত-দোযখ এবং অদৃশ্য জগত দেখে আল্লাহ্তায়ালার সাথে কথা বলে সব কিছু দেখ শুনে দুনিয়াতে ফিরে এসে মানুষকে বলতে পেরেছেন, সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, অদৃশ্য জগত সত্য। তাঁর অনুসারীরা তা অকাট্য সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। যারা তা বিশ্বাস করে না তারা পথভ্রষ্ট, ঈমান হারা।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জগতসমূহের রহমতস্বরূপ বা রহমাতুল্লিল আলামীন। তাঁর সময়ই নবী মনোনয়ন শেষ হয়ে গেছে, তিনি শেষ নবী। তাঁর সময় মানুষের নিকট আল্লাহ্তায়ালার আদেশ-নিষেধ বা শরীয়ত পরিপূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে,

www.pathagar.org

নতুন শরীয়ত আর আসবে না। তার নবুয়ত সকল নবী-রাসূলের শরীয়ত স্থগিত করে দিয়েছে। এজন্য বাতিল করা হয়নি যে, হাশরে সে সব নবীর শরীয়ত অনুযায়ী তাদের অনুসারীদের বিচার হবে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহ্তায়ালার হাবীব, তিনি হাবীবুল্লাহ বা আল্লাহ্তায়ালার প্রেমাস্পদ। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রতি মহান আল্লাহ্তায়ালা আসক্ত। এ উপাধী কোন নবী বা রাসূল লাভ করেননি। তিনিও আল্লাহ্তায়ালার প্রতি আসক্ত আল্লাহ্তায়ালাকে যে ভালবাসে সে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর গুণ লাভ করে, আর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে যে ভালবাসে, সে আল্লাহ্তায়ালার গুণ লাভ করে। স্রষ্টা ও সৃষ্টি দুটো আলাদা সত্তা হলেও আল্লাহ্তায়ালা হতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পৃথক নন, আবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হতে আল্লাহ্তায়ালা পৃথক নন। দুটো সত্তাই আদি-অন্ত সৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত। স্রষ্টার নামের সাথে যুক্ত হয়ে এখনও দুনিয়ার সকল প্রান্তে লক্ষ লক্ষ মিনার হতে দৈনিক পাঁচবার তাঁর নাম ধ্বনিত হয়। আরশে মুআল্লায় আল্লাহ্তায়ালার নামের সাথে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নাম লিখিত আছে। আরশ হল দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতসমূহের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মর্যাদা মানব কল্পনার অতীত।

আল্লাহ্তায়ালা যেমন তাঁর হাবীরের প্রতি দরূদ বা শান্তি কামনা করেন ও শান্তি পাঠান, তেমনি তাঁর কোটি কোটি অনুসারীগণ তাঁর প্রতি দরূদ পাঠাচ্ছেন বা শান্তি কামনা করছেন। কোন একজন মানুষের প্রতি এত অধিক লোকের শান্তি কামনা একমাত্র রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-ই পাচ্ছেন।

হযরত ঈসা (আঃ) এর অনুসারী বলে দাবীদার খৃষ্টানগণ পৃথিবীতে সংখ্যায় বেশী। কিন্তু তারা তাঁর প্রতি শান্তি কামনা দূরের কথা তাঁকে প্রভূর আসনে বসিয়ে আল্লাহ্তায়ালাকে বাদ দিয়ে তাঁর কাছে নিজেদের শান্তি প্রার্থনা করে। তাঁকে আল্লাহ্তায়ালার দাস মনে করলে হেয় হয়ে যাবে মনে করেন। এ ভাবে তাঁরা শিরক করে, অহংকার করে ও আল্লাহ্র কাছে ঈসা (আঃ) এর প্রতি শান্তি কামনা হতে তাঁকে বঞ্চিত করে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর খাস অনুসারীগণ সমস্ত নবী-রাসূল ও আউলিয়াদের প্রতি ছওয়াব পাঠান ও ভালবাসেন। কারণ সমস্ত নবী-রাসূল রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথী ও বন্ধু। আলমে বরযখে তাদের নিয়েই আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছা অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

আল্লাহ্তায়ালা এ সম্মন্ধে বলেন- "আল্লাহ্ এবং তাঁর ফিরিশ্তাগণ নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন, হে মুমিনগণ! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাঁকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।' ৩৩ঃ৫৬

www.pathagar.org

হাবীবে আল্লাহ্‌কে অনুসরণ করতে হলে কালামের জ্ঞান তথা আকায়েদ বা ঈমান সংক্রান্ত বিশ্বাসের জ্ঞান, ফিকাহ বা শরীয়তের বিধি- বিধানের শাখা-প্রশাখা ও তা আমলের জ্ঞান, তাসাওউফ বা তরীকতের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। না জানলে বা সুন্নত জামাতের বইপত্র পড়ার সুযোগ না হলে হাক্কানী আলেম হতে জিজ্ঞেস করে নিতে হবে। সবগুলো জ্ঞানের সাথে আমল করতে হবে, আমল না করে শুধু জ্ঞানে কি লাভ হবে? আমল দ্বারা গুণ লাভ হয়, আত্মা ও আক্‌ল সমৃদ্ধি লাভ করে। নূরে ইলাহীর দ্বারা আরো অধিকতর জ্ঞান ও ইয়াকীন লাভ হয়। জ্ঞানও আল্লাহ্‌তায়ালার গুণ। অন্যান্য গুণ লাভ করলে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কল্‌ব যা একটা জ্ঞান ইন্দ্রিয়, তা খুলে দেওয়া হয়। তখন নূরে ইলাহীর সাহায্যে অন্যান্য গুণ জ্ঞান নাম গুণকে টেনে আনে একত্বের কারণে। সে জ্ঞান কোরআন-সুন্নাহ ও ফিকাহ অনুযায়ী না হলে নাফ্‌স বা শয়তানের ধোঁকা বলে ধরতে হবে। তযকিয়া নাফ্‌স না হওয়া পর্যন্ত এরূপ হতে পারে। আহকামে ইলাহী ফিকাহ ছাড়া বুঝা যায় না। আবার ফিকাহ তাসাওউফ ও তরীকত ছাড়া সম্পূর্ণ হয় না। ফিকাহ, তাসাওউফ ও তরীকত ছাড়া ঈমান পরিপূর্ণ হতে পারে না। ইলমে ফিকাহর ইমাম আবু হানীফা (র) শরীয়ত, তাসাওউফ এবং তরীকত দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জাহের ও বাতেনসহ পরিপূর্ণ অনুসরণ করে প্রমাণ করে গেছেন যে, শরীয়ত, তাসাওউফ ও তরীকত ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর অনুসরণ সম্পূর্ণ হয় না। শরীয়ত ছাড়া তাসাওউফ ও তরীকত নেই, আবার তাসাওউফ ও তরীকত ছাড়া শরীয়ত ও দ্বীনের জ্ঞান ও আমল পরিপূর্ণ হয় না, সঠিকভাবে আল্লাহ্‌তায়ালার বন্দেগী বা দাসত্ব করা যায় না। নাফ্‌স ইখলাস পয়দা হতে দেয় না, রিয়া আমল বিনষ্ট করে দেয়, নাফ্‌সকে সঠিক ভাবে সংযত করা যায় না বলে কামনা- বাসনা, লোভ-লালসা ও অহংকার ফিতনা-ফ্যাসাদে জড়িত করে, জ্ঞানী হলেও ফিরকাবাজীতে জড়িত করে আমল নষ্ট করে দেয়।

এ সব কারণে ফিকাহ্‌র অন্যতম ইমাম মালিক (র) বলে গেছেন- "যে ব্যক্তি তাসাওউফ গ্রহণ করল কিন্তু ফিকাহ গ্রহণ করল না, নিশ্চয়ই সে যিন্দীক বা কাফের। যে ব্যক্তি ফিকাহ্‌ গ্রহণ করল কিন্তু তাসাওউফ গ্রহণ করল না নিশ্চয়ই সে ফাসেক। যে ব্যক্তি উভয় এলেমে আমল করেছে ও উভয় এলেমে পারদর্শী, নিশ্চয়ই সে মুহাক্কিক হয়েছে এবং সঠিক দ্বীন অর্জন করেছে। সে ধর্মে সম্পূর্ণভাবে প্রবেশ করে পুরোপুরি দ্বীনদার হয়েছে।"

শরীয়তের বিধানের শাখা প্রশাখা আমল করার জন্য মুজতাহিদ ইমামগণ কোরআন ও হাদীস থেকে গবেষণা করে যে সব মসলা-মাসায়েল বের করেছেন

www.pathagar.org

তাকে ফিকাহ বলে। এখানে শরীয়ত বলতে ইসলাম, ঈমান ও ইহসানের সমষ্টিকে বুঝাচ্ছি। ফিকাহ, আকায়েদ, তাসাওউফ তরীকত সব কিছুই কোরআন ও হাদীসের বিষয়বস্তু। এতে কোন সন্দেহ নেই যে তাসাওউফ ও তরীকত দ্বীনের একটা অতি প্রয়োজনীয় শাখা। তাসাওউফ ও তরীকত ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত আর ঈমান হল দ্বীনের ভিত্তি মূল।

তাসাওউফ ও তরীকত দ্বারা হৃদয়ের পবিত্রতা অর্জন করা যায়, তাযকিয়া-ই-নাফ্স বা প্রবৃত্তিকে পবিত্র করা হয়। নাফ্স পবিত্র না হলে হৃদয় পবিত্র হয় না। আর হৃদয় পবিত্র না হলে কল্‌বে ফিরিশতা অবতীর্ণ হয় না। লক্ষাধিক নবী-রাসূল ও তাদের অনুসারী ওলীগণ তাসাওউফ আমল করে নিজেরা নিজেদের নাফ্স ও দীল পবিত্র করে কল্‌বে ফিরিশতা অবতীর্ণ করার উপযোগী করে নবুয়ত লাভ করেছেন, সমস্ত ওলীগণ নবীদের অনুসরণ করে ওলীআল্লাহ্ হয়েছেন।

আখেরী যামানার তাসাওউফ ও তরীকত আল্লাহ্তায়ালা হতে কোরআন-সুন্নাহ মুতাবিক রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মারফত এসেছে। আল্লাহ্তায়ালার খাঁটি তাবেদার বান্দা হওয়ার জন্য এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর একনিষ্ঠ অনুসারী হওয়ার জন্য তাসাওউফ ও তরীকত গ্রহণ করা অপরিহার্য। এতে আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য, মিলন ও দর্শন লাভ হয়। ফলে আল্লাহ্তায়ালার গুণে গুণান্বিত হওয়া যায় এবং আল্লাহ্তায়ালার রঙে রঞ্জিত হওয়া যায়।

নাফ্স ও হৃদয়ের পবিত্রতা অর্জনের জন্য আদিকাল হতে নবীগণ তাসাওউফ মারফত যুহদ, ইখলাস ও তাওয়াক্কুল ইত্যাদি অর্জন করে নাফ্সকে বিশুদ্ধ করেই নবুয়ত লাভ করেছেন। সকল নবীগণই নবুয়ত মারফত কতগুলো বিশেষ গুণ লাভ করেছেন। সেই বিশেষ গুণগুলো হলঃ-

১। "নবীগণ সমস্ত ব্যাপারে প্রকৃত পরিচয় জানতে পারেন। তাতে আল্লাহ্তায়ালা ও তাঁর গুণাবলী, ফিরিশতা ও আখিরাতের সম্পর্ক থাকে।

২। নবীর এমন গুণ থাকে যদ্বারা তাঁর কার্যাবলীর পূর্ণ উন্নতি লাভ হয় যেরূপ অন্য স্বাধীন মানুষ স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারে তার শক্তির সাহায্যে। যদিও শক্তি ও শক্তির আধার সকলই আল্লাহ্তায়ালার কার্যাবলীর অন্তর্গত।

৩। নবীর এমন গুণ থাকে যার দ্বারা তিনি ফিরিশতাদের দেখতে পারেন। যেমন চক্ষুষ্মান দেখে থাকে। নবী অদৃশ্য বস্তু দেখতে পান।

৪। নবীর এমন গুণ থাকে যার দ্বারা শীঘ্রই অদৃশ্য জগতে কি হবে উপলব্ধি করতে পারেন। তা জাগ্রত বা নিদ্রিত অবস্থায়ই হউক বা না হউক। তিনি লওহে

www.pathagar.org

মাহফুযের লেখা দেখতে পান। অদৃশ্যে কি হবে সময় সময় দেখতে পান।" এহহিয়া উলুমউদ্দীন।

এগুলো নবুওতের গুণ তথা ফায়েজ। উম্মতের মধ্যে যারা নবীকে ইখলাসের সাথে অনুসরণ-অনুকরণ করেন তারাও নবীজীর উসিলায় এসব গুণরাজি অর্জন করতে পারেন। তাদের আউলিয়া ও ওলীআল্লাহ্ বলা হয়। অন্যান্য নবীদের শরীয়ত মানব হস্ত বিকৃতি ও ভেজাল মিশ্রিত করায় তা স্থগিত করে সর্বশেষ রাসূল (সাঃ) এর শরীয়ত আল্লাহ্তায়ালা চালু করেছেন এবং আলেমগণের দ্বারা সংরক্ষিত করেছেন। মানুষ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর এসব গুণ ও নিয়ামত তরীকত অনুসরণ করে লাভ করে তাঁর খলীফা হন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) খলীফাগণই অপ্রত্যক্ষ ভাবে আল্লাহ্তায়ালার খলীফা হয়ে গৌউছ ও কুতুব হন। আল্লাহ্তায়ালার দাসত্ব ও গায়রুল্লাহকে মন থেকে বের করলেই এ নিয়ামত হাঁসিল হয়।

অন্যান্য নবীদের চেয়ে আল্লাহ্তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে বিলায়েতের বা জ্ঞানের তিনটা মাকাম অতিরিক্ত দান করেন যা হাবীবুল্লাহ রূপে আল্লাহ্ ও তাঁর মধ্যে সম্পর্কিত। মাহবুবিয়াতে মুহাম্মদীর মাকামে তিনি যে মাহবুবুল্লাহ, তা হাশর প্রান্তরে প্রকাশিত হবে। হাকীকতে মুহাম্মদীতে তাঁর হাকীকতের মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালা যে সারা জাহান সৃষ্টি করেছেন। সেই আদি সৃষ্টির জ্ঞান দান করেন। হাকীকতে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুতে তাঁকে ফানা বাকা করে স্রষ্টার সর্বোচ্চ মা'রিফাত দান করেন। অন্যান্য নবীগণ এই তিন মাকাম পাননি, কিন্তু উম্মতে মুহাম্মদীর সৌভাগ্যবান ওলীগণ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর উসিলায় বিলায়েতের এ মাকামগুলি পান। তাই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর উম্মত হয়ে তাঁকে অনুসরণ করে বিলায়েতের মাকামগুলির ফায়েজ অর্জন করার জন্য হযরত ঈসা (আঃ) আবার দুনিয়াতে আসবেন।

আমরা আল্লাহ্তায়ালার অশেষ মেহেরবাণীতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর উম্মত হয়ে তাকে সঠিক ভাবে অনুসরণ না করে ঐ নিয়ামত হতে বঞ্চিত হচ্ছি। যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর একনিষ্ঠ অনুসারী হয়ে আল্লাহ্তায়ালার তাবেদার দাস হয়, সমগ্র সৃষ্টি খলীফা হিসাবে তাঁর অনুগত হয়।

তাসাওউফ ও তরীকত দ্বারা নাফ্সকে পবিত্র করার সাধনার মারফত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে জাহেরী-বাতেনী অনুসরণ দ্বারা তাঁরই উসিলায় আল্লাহ্তায়ালার মধ্যে অবস্থান করে হাদীসে কুদসী অনুযায়ী আল্লাহ্তায়ালার

www.pathagar.org

কুদরতী হাত-মুখ বান্দার হাত-মুখ হয়ে যায়। তরীকতের খন্ডে এর বিস্তারিত জানাবার আশা রইল।

"পার্থিব জীবন তো কেবল ক্রীড়া-কৌতুক, যদি ঈমান আন, তাকওয়া অবলম্বন কর, আল্লাহ্ তোমাদের পুরস্কার দিবেন এবং তিনি তোমাদের ধনসম্পদ চাহেন না।" ৪৭ঃ৩৬।

"শপথ মানুষের এবং তিনি তাকে সুঠাম করেছেন, তারপর তাকে সৎকর্ম ও অসৎ কর্মের জ্ঞান দান করেছেন। সেই সফলকাম হবে যে নিজকে পবিত্র করবে এবং ব্যর্থ হবে সেই যে নিজকে কলুষাচ্ছন্ন করে।" ৯১ঃ৭-১০।

"বস্তুত যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তারা শাস্তি ও ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে।" ৩৪ঃ৮।

অভিশপ্ত শয়তান পর্যন্ত আখিরাতে বিশ্বাস করে, কিন্তু বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করে না। এরা শয়তান হতেও অধম। আল্লাহ্তায়ালা চান, মানুষ তার একক অবিভাজ্য সার্বভৌমত্বে আত্মসমর্পন করুক, যে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পন করবে সে মুসলমান হবে। উত্তরাধিকারী সূত্রে মুসলমান হওয়া যায় না যদি না মা-বাবা তাকে ঈমান ও দ্বীন না শিখায়-রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জীবন পদ্ধতি মুতাবিক না চালায়।

আর আল্লাহ্তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে বলেছেন- "বল আমি ত প্রথম রাসূল নই। আমি জানি না আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কি করা হবে, আমার প্রতি যা ওহী আসে আমি কেবল তারই অনুসরণ করি। আমি এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।" ৪৬ঃ৯।

ওহী ও আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর আদর্শ চরিত্র গঠন করেছিলেন। কারো থেকে নিজকে উত্তম মনে না করার জন্য আল্লাহ্তায়ালা ইংগিত দিচ্ছেন। একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার মালিকই জানেন কার সাথে কিরূপ ব্যবহার করবেন, এ সার্বভৌমত্বই ঘোষণা করতে পরে অবশ্য কি ধরনের লোকের সাথে কি ব্যবহার করবেন, তা জানিয়েছেন।

www.pathagar.org

তাসাওউফ

" অবশ্যই কষ্টের সাথে স্বস্তি আছে। অতএব যখনই অবসর পাও সাধনা করো এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করো"। ৯৪ঃ৬-৮।

www.pathagar.org

তাসাওউফ ও তরীকত

সাধারণতঃ তাসাওউফ ও তরীকতকে অভিন্ন দেখা হয়। আগের দিনে শায়েখগণ খান্‌কাহ করে দুটোকে একত্রে শিক্ষা দিতেন এবং সেই অনুযায়ী আমল করাতেন, বর্তমান কালের খান্‌কাহর মত নয়। কাজেই সাধারণ মানুষ যাতে সহজে বুঝতে পারে সেজন্য দুটোকে আলাদাভাবে দেখালাম। এর আরো সুবিধা আছে আমলের ব্যাপারে। আগের দিনে খান্‌কাহ প্রস্তুত করে শায়েখের তত্ত্বাবধানে তাঁর সাহচর্যে রেখে মুরীদগণকে দুটো বিষয় একত্রে শিক্ষা দিতেন। সেজন্য একই অর্থে দুটো শব্দ ব্যবহার করা হত।

তাসাওউফ নিজে নিজে আমল করা যায়, কিন্তু তরীকত পীরের তাওয়াজ্জুহ ছাড়া হয় না। তাসাওউফ হল দীল ও নাফ্‌সকে পবিত্র করার সাধনা। আর তরীকত হল ফায়েযের দ্বারা তওহীদের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তায়ালার মা'রিফাত ও দীদার লাভ করার জন্য স্তরে স্তরে নূরে ইলাহী পীরের উসিলায় হাসিল করা।

তাসাওউফের সাধনা ছাড়া নাফ্‌স ও দীল পবিত্র করা যায় না এবং পীরের তাওয়াজ্জুহ গ্রহণ করার ক্ষমতা অর্জন করা যায় না। তেমনি তরীকত ছাড়া তাসাওউফ পরিপূর্ণ আয়ত্তে আসে না। দুটো পরস্পর সম্পূরক। তাসাওউফ অনুসরণ করলে পীরের তাওয়াজ্জুহ হতে তাহীর হয়ে ধীরে ধীরে তরীকতের ফায়েজসমূহ আসতে থাকে।

যদি কেউ তাসাওউফ ও তরীকতকে আলাদা করে দেখছি বলে আপত্তি করেন তবে তিনি যেন এ পুস্তকের এ দুটো খন্ডকে মিলিয়ে দেখেন, তবে বুঝবেন বিষয় বস্তু ঠিকই আছে, কেবল বোঝার ও বোঝাবার সুবিধার জন্য আলাদা করা হয়েছে। তাসাওউফ দ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টি লাভ এবং তরীকত দ্বারা তাঁর নৈকট্য, মিলন ও দীদার লাভ হয়। তাসাওউফ তাকওয়া পর্যন্ত নেয়, তাকওয়া বেহেশতে নিয়ে যায়- তরীকত আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্য ও দর্শন পর্যন্ত- নিয়ে যায়।

আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের একমাত্র উপায় হল, আচার-আচরণে, স্বভাব-চরিত্রে, অন্তর ও শরীর দ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালাকে পাওয়ার আশায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে অনুসরণ করা। তরীকতে ইরাদত বলে একটি ফায়েজ আছে। ইরাদত হলো, মানুষের ভাল-মন্দ যে সব কাজ করার অভ্যাস হয়ে যায়, তা পরিত্যাগ করে

www.pathagar.org

আল্লাহ্তায়ালার আদেশ-নিষেধে নিজেকে নিমগ্ন করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর অনুকরণে চরিত্র গঠন। এ চরিত্র গঠনের জন্য শায়েখের ইরাদায় নিজের ইরাদা বা ইচ্ছা তথা নিজকে বিলীন করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর ইচ্ছাতে নিজের ইচ্ছাকে বিলীন করতে হয়, সবশেষে আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছাতে নিজকে ফানা করতে হয় যা কোরআন ও সুন্না হতে বলা হয়েছে। তরীকতের এই ইরাদতকেই তাসাওউফ বলা হয়। তরীকতে ইরাদত ছাড়াও আরো বহু কিছু আছে।

এজন্য অসৎ চরিত্রকে সৎ চরিত্রে, অসৎ স্বভাবকে সৎ স্বভাবে পরিণত করার জন্য আল্লাহ্তায়ালার পথের যাত্রীকে যে সাধনা করতে হয়, তাকে বলা হয় তাসাওউফ। এজন্য নাফ্স বা পশু প্রবৃত্তির সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়, বিরামহীন সে সংগ্রাম নিজ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে করতে হয়। নাফসের বিরুদ্ধে এ লড়াইকে তাসাওউফ বলা হয়। এ লড়াই বা জিহাদের কথা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলে গেছেন। কিভাবে করতে হবে আল্লাহ্তায়ালা ও তাঁর রাসূল (সাঃ) সবকিছু কোরআন ও সুন্নাহতে বলেছেন। নিজের অসৎ স্বভাবের বিরুদ্ধে এ লড়াইয়ে কতগুলো হাতিয়ারের কথা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলে গেছেন। হাতিয়ারগুলো হল মৃত্যু, চিন্তা, তওবাহ্, যুহদ, সবর, মিথ্যা পরিহার, রসনা সংযত, পরনিন্দা ত্যাগ, বিবাদ বিসংবাদ পরিহার, ক্রোধ দমন, অহংকার বর্জন, বিনয় অবলম্বন, আল্লাহ্ভীতি, রহমতের আশা, শোকর, ইখলাস, সত্য পরায়ণতা ও তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্নির্ভরতা।

কোরআন-সুন্নাহতে এগুলো বিক্ষিপ্তভাবে আছে। একটা সুশৃংখল পদ্ধতিতে এসব হাতিয়ার দ্বারা যে লড়াই চালাতে হয়, তাকে বলা হয় তাসাওউফ। এ পুস্তকে এসব শিরোনামে বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে। সবগুলোই নাফ্সের বিরুদ্ধে জিহাদ, নাফ্সকে সংযত রাখার ও পবিত্র করার কলাকৌশল। এগুলোর সাথে আরো আনুসংগিক বিষয় এসেছে।

নাফ্স বা মানুষের প্রবৃত্তি জন্মগতভাবেই পশু প্রবৃত্তির অনুসারী। খাদ্যের জন্য, যৌন সংগীর জন্য, বাসস্থান ও নিজের আরাম-আয়েশের জন্য অন্যের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। সে জন্য আল্লাহ্র দেওয়া সীমার মধ্যে অবস্থান না করে কাম, ক্রোধ, গর্ব, অহংকার, লোভ-লালসা, প্রতারণা, মুনাফিকী, সুদ, ঘুষ, চুরি, ডাকাতি ও জুলুম নির্যাতন দ্বারা নাফ্স আপন ইচ্ছা পূরণ করতে চায়। সে জন্য অবাধ্য নাফ্সকে প্রশিক্ষণ দিয়ে রসুলুল্লাহর (সাঃ) চরিত্র গুণ অর্জন করতে হয়,

www.pathagar.org

তখন স্বেচ্ছায় শরীয়ত পালন করা যায়। নাফ্সের উপর প্রবল না হয়ে কেউ কামেল বা পূর্ণ মানব স্বভাব অর্জন করতে পারে না। নাফ্সের সাথে জিহাদই বড় ইবাদত। আল্লাহ্তায়ালা ভর্ৎসনাকারী নাফ্সের শপথ নিয়েছেন। তাই এ জিহাদ অনেক গুরুত্ব বহন করে। নাফ্সকে বশীভূত করতে পারলে আত্মা মানসিকভাবে শক্তিশালী ও পবিত্র হয়।

এজন্য দরকার নিজ নাফ্সকে প্রশিক্ষণ দেওয়া। প্রশিক্ষণ চালাতে হবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর স্বভাব-চরিত্রের ছাঁচে ফেলে তাঁর অনুসরণ-অনুকরণ দ্বারা তিনি স্বাভাবিক মানব ধর্মে পুরোপুরি বহাল ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সুন্নতের পায়রবী করে তাঁর অনুকরণে চরিত্র গঠন করতে হবে। এভাবে দুনিয়ার লাভ-লোকসানের পরোয়া না করে বেপরোয়াভাব আল্লাহ্র প্রতি নির্ভরশীল হয়ে তাঁর গুণরাজি অর্জন করতে হবে। নাফ্সকে পবিত্র করার প্রশিক্ষণের এ সাধনার নামই তাসাওউফ।

নাফ্সের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনার দ্বারা যদি স্বভাব-চরিত্র পরিবর্তন করা না যেত, তবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ নির্দেশ দিতেন না যে, "তোমরা তোমাদের স্বভাবকে সুন্দর কর।" আলেমরাও ওয়াজ নসিহত করতেন না, শিক্ষা দিতেন না। কোরআনে আল্লাহ্তায়ালা আদেশ নিষেধ করতেন না। অসম্ভব হলে আল্লাহ্তায়ালা ও তাঁর রাসূল (সাঃ) এ সম্মন্ধে বলতেন না। কুকুরকে প্রশিক্ষণ দিলে মনিবের হুকুম শুনে, সামনে গোশত রাখলেও খায় না। দুর্দান্ত হাতী ও ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দিয়ে মনিবের অজ্ঞাবহ করা যায়, আর সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী মানুষ তাঁর প্রবৃত্তিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর চরিত্র গুণ অর্জন করতে পারবে না? এটা অসম্ভব নয়, সম্ভবপর, যদি ধৈর্য সহকারে একনিষ্ঠভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়। যদিও সব রকম প্রশিক্ষণে বিরক্তিকর পরিশ্রম করতে হয়, বার বার পুনরাবৃত্তি করতে হয়। প্রশিক্ষিত হয়ে তা স্বভাবে পরিণত হলেই স্বস্তি ও শান্তি আসে, এর মজা উপলব্ধি করা যায়। এভাবে যখন আল্লাহ্তায়ালার স্বভাব এবং বান্দার স্বভাব এক হয়ে যায় তখন বান্দা আল্লাহ্তায়ালার বন্ধু হয়। সম স্বভাব না থাকলে বিপরীতমুখী দুই স্বভাবের মধ্যে বন্ধুত্ব হতে পারে না।

www.pathagar.org

নাফ্সের পরিচয়

কোন শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে তার পরিচয় জানা দরকার, তার শক্তি ও দুর্বলতার পরিচয় জানা চাই, তাকে কাবু করার কলা- কৌশল প্রয়োগের পূর্বে বিজ্ঞ সেনাপতির সব কিছু জানতে হবে। এ সংগ্রাম আল্লাহ্তায়ালার রাহে বলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ জিহাদকে জিহাদে আকবর বলেছেন। আত্মসমর্পনকারী বা মুসলমান হলেই আত্মসমর্পনের প্রমাণ স্বরূপ এ জিহাদে অংশ নিতে হবে, পিছপা হওয়া যাবে না। আপন সত্ত্বা ও তার অস্তিত্বের উপকরণ আল্লাহ্র রাহে আল্লাহ্র উপর নির্ভর করে বিলিয়ে দিয়ে এ জিহাদ পরিচালনা করতে হবে। সব কিছুই ধ্বংসশীল, একমাত্র আল্লাহ্তায়ালাই চির অমর। এ জিহাদে দুনিয়ার জীবন ধ্বংস হলেও আল্লাহ্তায়ালা অমর জীবন দান করবেন। এভাবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে জিহাদে অবতীর্ণ হলে নাফ্স নিজ আত্মা ও আল্লাহ্তায়ালার কাছে আত্মসমর্পনে বাধ্য হবে। আল্লাহ্তায়ালা অভিভাবক ও সাহায্যকারী হবেন।

নাফ্স বা প্রবৃত্তি সৃষ্টি করে আল্লাহ্তায়ালা জিজ্ঞাস করলেন- আমি কে? তুমিই বা কে? সে বলল- আমি আমিই, তুমি তুমিই। এভাবে সে আল্লাহ্কে তথা তাঁর সৃষ্টিকর্তাকে প্রভূ বলে স্বীকার করলো না। আদিতে সে দুষ্ট ছিল, নিজকে ছাড়া কিছুই বুঝতে চাইল না। অবাধ্য রইল।

তারপর আল্লাহ্তায়ালা তাকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অবশেষে দোযখ দ্বারা শাস্তি দেওয়ার পর সে বশ্যতা স্বীকার করলো, প্রভূ বলে আল্লাহ্তায়ালাকে স্বীকার করল।

তাই দুনিয়াতে রোযার ক্ষুধা-তৃষ্ণার দ্বারা তাকে শিক্ষা দিতে হয়। স্রষ্টা নিয়ামত স্বরূপ দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ দেন, বান্দাকে তখন আহাজারি না করে, হাসিমুখে তা সহ্য করে আল্লাহ্তায়ালার এ সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। ইবাদতের বা আল্লাহ্তায়ালার আনুগত্যের পরিশ্রম দ্বারা তাকে বশীভূত করতে হয়। দুঃখ-দারিদ্র্যের পেরেশানীর দ্বারা দোযখের শাস্তি আস্বাদ করিয়ে হাসিমুখে সব সহ্য করে আল্লাহ্র শোকরিয়া আদায় করে তাকে বশীভূত করতে হয়। ইমানদারদের ঈমান এতে আরো বেড়ে যায়। যে স্বেচ্ছায় এ সব রিয়াযত মেহনত করতে পারে সেই প্রকৃত গাযী বা বিজয়ী বীর পুরুষ। তাতে আল্লাহ্তায়ালার প্রতি অসন্তুষ্ট না হয়ে যে সহ্য করতে পারে সেও বীর সেনানী।

www.pathagar.org

মানুষের শরীর আগুন, বাতাস, পানি ও মাটির দ্বারা গঠিত। এগুলোর সমন্বয়ের দ্বারা আল্লাহ্তায়ালা নাফ্স নামক পৃথক একটা বস্তু সৃষ্টি করেছেন। এই চারটি বস্তুর দ্বারা সৃষ্টি করলেও এটি একটা ভিন্ন পদার্থ। একে প্রশিক্ষণ দিয়ে বিশুদ্ধ, বশীভূত ও মার্জিত না করলে সেটা কুরিপু ও পশুশক্তি হিসেবে অবাধ্য জংলী ঘোড়ার মত থেকে যায়। এর কুপ্রভাবের ফলে মানুষের অসংযত পশু স্বভাব থেকে যায়। আক্ল ঈমান গ্রহণ করলে এবং শরীয়তের অনুগামী হয়ে চলতে চাইলে নাফ্স সেটা মানতে চায় না। সে চায় কেবল তার স্বার্থ ও আরাম-আয়েশ।

ইবাদতে ও যিকিরে আসক্তি জন্মাবার জন্য নাফ্সের বিভিন্ন কুমন্ত্রণা ও যুক্তি না মেনে তাসাওউফের নীতি মেনে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও বিপদাপদের শাস্তি দিয়ে তাঁকে বশীভূত করতে হয়। সমস্ত নাফ্সকে বিশুদ্ধ করে কুরিপু সকল দূর না করলে কল্বে নাফ্সের বা শরীরের কয়লার অন্ধকার উৎপত্তি হয়ে তা অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রাখে। কাম, ক্রোধ, লোভ-লালসা, গর্ব ও অহংকার ইত্যাদি কুরিপুর উৎপত্তি হতে থাকে এবং এগুলোর দ্বারা শরীরের ইন্দ্রিয়গুলো সাময়িক সুখ অনুভব করতে থাকে এবং এগুলোর মানসিক চিন্তা-ভাবনা করে। ফলে শারিরীক ও মানসিক কালিমায় কল্ব সব সময় তমসাচ্ছন্ন থাকে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে আমরা জেনেছি, প্রত্যেকটি মানব শিশুর জন্মের সাথে সাথে একটা শয়তান শিশুকেও সেই শিশুর সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়। নাফ্সের আশ্রয়ে সেই শয়তানটাও বাড়তে থাকে এবং নাফ্সের সাথে মিলে সারা জীবন ধোঁকা দিতে থাকে। যদি না নাফ্সকে পবিত্র করা হয়। অপবিত্র নাফ্স শয়তান মিলে আক্ল ও জ্ঞানকে অকেজো করে মানুষটাকে বিভ্রান্ত করে। ফলে কল্ব বা হৃদয় এ দুই শত্রুর দখলে চলে যাওয়ায় আল্লাহ্তায়ালার আদেশ-নিষেধ অমান্য করে আল্লাহ্ বিরোধী শক্তিতে পরিণত হয়। নাফ্স, শয়তান, রূহ, ফিরিশতা, আক্ল ও কল্ব ভিন্ন ভিন্ন শক্তি যা মানব দেহে কার্যকরী থাকে।

কুরিপুর প্রভাব বেশী হলে আত্মার আধার সূক্ষ্ম দেহ কুকাজ ও কুচিন্তায় সেভাবে উন্নয়ন লাভ করে। ফলে আত্মা রুগ্ন, কম জোর ও কলুষিত হয়ে যায়। ফলে আল্লাহ্তায়ালার বর্তমান সৃষ্টি ও পরবর্তী সৃষ্টির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে না পেরে শাস্তি প্রাপ্ত হবে।

দুনিয়াতে ধ্বংসশীল অন্ধকারাচ্ছন্ন দেহের চাহিদার মধ্যে সেই মানবসত্তা বন্দী হয়ে যায়। নাফ্সের তখন কেবল দেহের দিকে বা দেহের স্বার্থের দিকে আকর্ষণ থাকে, স্রষ্টার দিকে নয়। শয়তানের কুমন্ত্রণা অস্থায়ী, কিন্তু নাফ্সের

www.pathagar.org

কুমন্ত্রণা স্থায়ী। আর নাফ্সের আকাঙ্খা ভীষণ, তা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত শান্ত হয় না। নাফ্সের সাহায্যেই শয়তান মানুষকে আক্রমণ করে। অবোধ নাফ্স আকলকে বিভ্রান্ত করে তার শত্রু শয়তানকে সাহায্য করে নিজ আত্মা ও আপন চিরস্থায়ী সত্তার প্রতি জুলুম করে নিজেরই ধ্বংস সাধন করে। নিজ প্রতিপালকের অবাধ্যতার ভিতর দিয়ে মন্দ স্বভাব লাভ করে।

আকলকে মোহাচ্ছন্ন ও বিভ্রান্ত করে শয়তানের অনুগামী হয়। দুনিয়াতে যে শয়তানের আনুগত্য করে হাশরেও সে শয়তানের অনুগামী হয়ে দোযখে যেতে বাধ্য হবে। এর থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হল আকলের সাহায্যে নাফসকে তার ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় তার ঈমানের অনুগামী করা। আল্লাহতায়ালার জ্ঞানের সাহায্যে নাফসের বন্দীরূপে ধর্মীয় উপদেশে সুখ পায় না, বিরক্ত হয়। স্রষ্টার আদেশ মত কেউ উচিত ও অনুচিতের কথা বললে বা লিখলে ক্রোধ ভরে সাপের মত ফণা তুলে।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) হাদীসে কুদসীতে বলেছেন, মহান আল্লাহতাআলা বলেন, "তুমি শত্রুতা কর নাফসের সাথে, নিশ্চয়ই নাফস আমার সাথে শত্রুতা করতে দণ্ডায়মান হয়েছে।"

আল্লাহ্তায়ালাকে পেতে হলে আল্লাহ্তায়ালার এই শত্রু অবাধ্য নাফ্সের সাথে জিহাদ করে বশীভূত করতে হবে। এজন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর অনুসরণ দ্বারা আক্লকে স্বচ্ছ ও সমৃদ্ধিশালী করতে হবে। নাফ্সকে পবিত্র না করলে মুক্তি নেই। সে বিশুদ্ধ ও পবিত্র হবে না। কারণ অপরিশুদ্ধ নাফ্স শয়তানের দোসর।

যখন মানুষ ঈমানকে মজবুত করে কুস্বভাব ত্যাগ করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর গুণরাজি গ্রহণ করে নেক কাজ, যিকির ও ইবাদতে লিপ্ত হয় এবং নাফ্সের ইখতিয়ারকে অস্বীকার করতে থাকে, তখন কল্বের নাফ্স নূরে পরিণত হয় ও শরীয়তের দিকে ঝুকে যায়। এ অবস্থায় আক্ল আল্লাহ্র জ্ঞানের বিরোধীতা করে না, অনুগামী হয়, সব কিছু বুঝে আসে। ক্রমে আল্লাহ্তায়ালার গুণের রঙে রঞ্জিত হয়, নাফ্স আত্মার বশীভূত হয়ে অসৎকাজ হতে বিরত হয়ে সৎ কাজে উৎসাহিত হয়।

প্রবৃত্তি বা নাফ্সকে আল্লাহ্তায়ালা এমন ভাবে সৃষ্টি করেছেন যে একে সংশোধিত করা না হলে, পার্থিব স্বার্থ না দেখলে সৎকাজ, ইবাদত ও পরিশ্রম হতে পালিয়ে বেড়ায় এবং অসৎ কাজের দিকে আগ্রহান্বিত থাকে। আল্লাহ্তায়ালা চান যে, বান্দা প্রবৃত্তির এ স্বভাব দূর করে তাঁর আনুগত্য করুক,

সৎকাজে ও তাঁর ইবাদতে নিমগ্ন থাকুক। যাতে বান্দাকে তিনি দয়া দেখাতে পারেন, পুরস্কার দিতে পারেন ও ভালবাসতে পারেন।

নাফ্স সব সময় নিজেকে বুদ্ধিমান বলে মনে করে, উৎকৃষ্ট ও ভাল মানুষ বলে নিজ সম্মন্ধে ধারণা পোষণ করে। তাকে কেউ বুদ্ধিহীন, বেওকুফ, নিকৃষ্ট ও মন্দ বললে দারুণ অসন্তুষ্ট হয়। সে যে বেওকুফ তার প্রমাণ মালেকুল মউত আজ বা কাল যে কোন মুহূর্তে প্রাণ হরণ করতে পারে, শরীর সুস্থ থাকলেও দুর্ঘটনায় মারা যেতে পারে, এ সত্য সে জানলেও বুঝতে নারাজ। এ অবস্থায় পরকালের সম্বল সংগ্রহ না করে বসে থাকে। অপকর্ম ও পাপকাজ দ্রুত সমাধা করে ফেলতে চায় যাতে কোন বিঘ্ন না ঘটে।

যে কোন সময় মৃত্যু হতে পারে, তবু নাফ্স মনে করে মৃত্যুর পূর্বে তওবাহ্ করে সৎকাজ করবে, পাপ করবে না, যেন মৃত্যুর মালিক তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন। এখন তওবাহ্ করে সৎকাজ না করলে মৃত্যুর সময় তওবাহ্র সুযোগ পাবে কিনা নিশ্চয়তা নেই। তওবাহ্ কবুল হল কিনা তারও নিশ্চয়তা নেই, তওবাহ্র পর সৎকাজ করে ও পাপ না করে তওবাহ্তে নিজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারল না। এ অবস্থায় মৃত্য হলে সে তো ঝঞ্জা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে ঝাঁপ দিল জলযান ছাড়াই। তীরে উঠবে কি ধ্বংস হবে তার স্থিরতা নেই। সেতো একরূপ বেওকুফ ছাত্রের মত যে মনে করে যে, এখন বিদ্যাচর্চার দরকার কি? যুবক হয়ে ফাইনাল পরীক্ষার সময় দুয়েক মাস পড়ে পাশ করে ফেলবে। যে ঈমানের চর্চাই করলো না, নামায পড়লো না, তার মৃত্যুর সময় ঈমান নিয়ে মরবে বলে আশা করাও বেওকুফি। এসব দুরাশা পোষণ করতে নাফ্স খুব ভালবাসে। ভবিষ্যতে তওবাহ্ করে পাপ কাজ হতে বিরত থাকবে ও নেক আমল করবে, সে নাফসের এ ধোঁকায় পড়ে, তার আর তওবাহ্ নসীব হয় না।

তওবাহ্ করতে যত দেরী করবে, পাপের ফলে দুনিয়ার আসক্তির কারণে তওবাহ্র মনোবৃত্তি তত দূর হয়ে যাবে, তওবাহ্ তত দুঃসাধ্য হবে।

আত্মশুদ্ধি ও আত্মার শক্তি অর্জন দ্বারা আল্লাহ্তায়ালার দয়া, সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জন করা যায়। সেজন্য দীর্ঘদিন চেষ্টা, পরিশ্রম ও উদ্যমের দ্বারা নিজকে বিদগ্ধ করে পবিত্রতা লাভ করতে হয়; তবু মনে ভয় থাকে যদি ঈমান নিয়ে মরতে না পারি। যার জীবন ক্ষয় হয়ে পরমায়ু বিফলে চলে গেছে, তার সে সময়- সুযোগ আর আসবে কি? তওবাহ্র জন্য নাফ্সের ওজর-আপত্তি না শোনাই বুদ্ধিমানের

www.pathagar.org

কাজ। নাফ্স নেক-কাজ না করেও নিজে নিজে ভাল মানুষ সেজে অন্যের দোষ খুঁজে জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট করে। অসহায় ও ক্ষুদ্র হওয়া সত্ত্বেও গর্ব-অহংকারে নিজকে বড় ভেবে নিজ সত্তাকে ধ্বংস করে।

পাপে আবদ্ধ থেকে আল্লাহ্র নাফরমানী করে কিংবা মানবীয় সার্বভৌমত্বের একনিষ্ঠ অনুসারী হয়েও নাফ্স মনে করে না যে, সে দোযখে যাবে। মনে করে আল্লাহ্ মাফ করে দেবেন অথবা সারা দুনিয়ার লোক পাপ করছে, সবার যে গতি হয় তারও তাই হবে। কোন পরোয়া নেই। এখানে নগদ আনন্দ-ফূর্তি করে যাই। আখিরাতের কথা ভাবলে আর দুনিয়াদারী করা যাবে না। এ সব সেকেলে কথা বার্তায় কান দিয়ে লাভ নেই। এসব চিন্তা করে আক্লকে বিকল করে সংসারের ভোগ-বিলাসে লিপ্ত থাকে। আল্লাহ্তায়ালার সামনে পাপ করে তার কাছে মাফ না চেয়ে আরো পাপ করে স্রষ্টার নিকট ধৃষ্টতা দেখিয়েও মনে করে যে সে শাস্তি পাবে না।

নাফ্স প্ররোচনা দিয়ে থাকে এবং আক্লকে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে যে সে, দীর্ঘ দিন বাঁচবে। যুবক থাকতে মনে করে, এখন দুনিয়ার ভোগ-বিলাস উপভোগের সময়, আয়-উন্নতির সময়, বৃদ্ধ বয়সে সুখে থাকার জন্য সহায়-সম্পত্তি করার সময়, এখন ইবাদত-বন্দেগীর সময় নয়। পাঁচ বার নামায, দান-খয়রতা, রমযান মাসে রোযা এবং সত্য কথন ও সৎভাবে চলতে যে যৎসামান্য সময় লাগে, এটা সে চিন্তা করে না।

রোগে বা দুর্ঘটনায় যদি যুবক বয়সে না মরে, তবে বার্ধক্য এলে মনে করে যে ছেলেমেয়েদের বিয়ে-শাদী দিয়ে, কিছু জমি-জমা কিনে অথবা শহরে দুয়েকটা দালান-কোঠা করে একটু গুছিয়ে নিয়ে পরকালের কাজে লেগে পড়বো। কারখানা বা ব্যবসার কাজটা গোছগাছ করে ছেলের হাতে দিয়ে নিশ্চিত মনে আল্লাহ্তায়ালার কাজে লেগে পড়বো। চাকুরীজীবী হলে নাফ্স তাকে পরামর্শ দেয় যে, ঘুষ তরী নিয়ে একটু গুছিয়ে পেনশান নিয়ে তওবাহ্ করে ইবাদত-বন্দেগী করব। নেপশন নিয়ে ভাবে যে, পেনশানের টাকা দিয়ে ব্যবসা করে টাকাটাকে কাজে লাগাই, ছেলে, মেয়ে ও জামাইদের একটু প্রতিষ্ঠিত করে যাই, ছেলে-মেয়েদের বিয়ে শাদী দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ইবাদত-বন্দেগী করবো। আমি না থাকলে অমুকে শত্রুতা করে ছেলেদের কষ্ট দেবে, মামলা করে বেটাকে জব্দ করে ঝামেলা মুক্ত হয়ে ইবাদত করবো। সংসারাসক্তির দ্বারা নাফ্স অসংখ্য দুনিয়াদারীর শাখা-প্রশাখা বের করে দুনিয়ার দ্বারা দুনিয়া কামাই করে তার সাহায্যে ঝামেলা ও অবল্যের অবসান করে পরকালের কাজ বলে দুরাশা পোষণ

www.pathagar.org

করে। এভাবে নাফ্স ও শয়তান ধোঁকা দিতে থাকে। সংসারের মোহে একের পর এক সাংসারিক কাজ সমাধারত অবস্থায়ই একদিন মৃত্যু এসে দ্বারে আঘাত হানে। তাঁর আর তওবাহ্ হয় না, পরকালের সম্বলও সংগ্রহ করা হয় না। শয়তানকে হাসিয়ে সকলকে কাঁদিয়ে বিনা সম্বলে পরলোকে যাত্রা করে।

আল্লাহ্তায়ালার কঠোর শাস্তি সহ্য করার ক্ষমতা যদি না থাকে, তবে কেউ যেন নাফ্সের এসব বেপরোয়া কুপরামর্শ ও সিদ্ধান্ত না মেনে আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনের সম্বল জোগাড়ের জন্য অনতিবিলম্বে তওবাহ্ করে আল্লাহ্তায়ালা ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) এর অনুগত হয়ে আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনে লেগে যায়।

মনে রাখতে হবে, সর্ববিষয়ে জ্ঞানী ও সূক্ষ্মদর্শী মহান আল্লাহ্তায়ালা আমাদের অন্তরের সব খবর রাখেন, তিনি অন্তরের চিন্তা-ভাবনা অবগত আছেন। তাই সর্বক্ষণ অন্তরকে সতর্ক অবস্থায় রাখতে হবে যাতে নাফ্স শয়তান খারাপ চিন্তা ও অপকর্মের দিকে ইন্দ্রিয়গুলোকে চালিত করতে না পারে। শরীয়ত বিরোধী কোন কাজের চিন্তা ও ভাবনা যেন নাফ্স শয়তান আনতে না পারে আত্মকর্ম ও কলবকে সর্বক্ষণ পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। আলাপ-আলোচনায় নাফ্স মনকে এদিক-ওদিক নিতে না পারে-সে জন্য নেহায়েত প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া নীরব থাকাই উত্তম।

অন্তরের কথা বান্দা ও আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না, আল্লাহ্র সাথে মিলনের স্থান অন্তরই। আল্লাহ্তায়ালা এখানে উদ্ভাসিত হন, অন্তরের চোখ তা দর্শন করে। খারাপ চিন্তা-ভাবনার দ্বারা আল্লাহ্র এ আরশকে কলুষিত করা উচিত নয়। বুদ্ধিমানগণ তাই সেটা পর্যবেক্ষণ করে সর্বক্ষণ পবিত্র রাখতে তৎপর থাকেন।

এ অবস্থায় পৌছতে হলে নাফ্সের সাথে জিহাদ করতে হবে সুনির্দৃষ্ট হাতিয়ার দ্বারা, নইলে নাফ্স শয়তান অন্তর দখল করে রাখবে। তাদের দখলমুক্ত করার জন্য এসব হাতিয়ার দ্বারা লড়াই চালাতে হবে। এর প্রধান হাতিয়ারই হল অসৎ স্বভাব দূর করে সৎ স্বভাব অর্জন। সেই সৎ স্বভাব অর্জনের জন্য সব হাতিয়ারের দরকার। যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, বিভিন্ন শিরোনামে তাসাওউফ খন্ডে তা বর্ণনা করা হবে। সব কিছু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হতে অবগত। আল্লাহতাআলা তিন প্রকার নাফ্সের কথা বলেছেন। একঃ নাফসে আম্মারা, দুইঃ নাফ্সে লাওয়ামাহ্, তিনঃ নাফ্সে মুতমাইন্নাহ।

www.pathagar.org

নাফ্সে আম্মারা হল অপরিশোধিত পশু প্রবৃত্তি, যা দেহের ভোগ-বিলাস ও দৈহিক প্রয়োজন পূরণের জন্য কুকাজ, লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা ও তার স্বার্থ উদ্ধারের জন্য যেকনো জায়েয বা নাজায়েয কাজে শয়তানের দোসর হিসেবে প্রেরণা দিতে থাকে, কু-পরামর্শ দিতে থাকে। আক্লকে মোহাচ্ছন্ন করে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করে ইবাদতে শৈথিল্য আনে বা ইবাদতকে বেড়াজাল মনে করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর অনুসরণকে অস্বীকার করে বা অবহেলা দেখায়।

মানুষ যখন সকল পাপ বর্জন করে তওবাহ্র মারফত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর অনুকরণে আল্লাহ্তায়ালার আনুগত্যে দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে নাফ্সের সাথে জিহাদে লিপ্ত হয় এবং সব কাজে নাফ্সের বিরোধিতা শুরু করে এবং নাফ্সকে শাস্তি দিতে শুরু করে, তখন মানুষ নাফসে লাওয়ামাহ বা ভর্ৎসনাকারী প্রবৃত্তির দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এ অবস্থায় নাফ্স নিস্তেজ হয়ে যায়, কবিরা গুনাহ বার বার করতে থাকলে বা সংসারাসক্তিতে নিমজ্জিত থাকলে নাফসে লাওয়ামাহ নাফসে আম্মারায় রূপান্তরিত হয়ে স্বমূর্তি ধারণ করে নাফসের বিরুদ্ধে জিহাদে সাফল্য লাভ করলে তাযকিয়া নাফ্স বা নাফ্স পবিত্র হয়ে নাফসে মুতমাইন্নাহ বা প্রশান্ত আত্মার অনুগত হয়ে যায়। কিন্তু সর্ব অবস্থায় নাফ্স সুযোগ পেলেই স্তর অনুযায়ী ধোঁকা দিতে ছাড়ে না। কোরআন-সুন্নাহ ও ফিকাহর দ্বারা অনুগত বান্দা তা ধরতে পারেন ও সাবধান হয়ে যান। নাফ্স মুতমাইন্নাহ হলে লোভ-লালসা ও সংসারাসক্তি কিছুই থাকে না বলে তখন যে ধোকা দেয় তা খুবই সূক্ষ্ম। নাফ্স মুতমাইন্নাহ হলে ইবাদতে সাহায্য করে। নাফ্সের বিরুদ্ধে জিহাদ ছাড়া কিছু হয় না, জিহাদ ছাড়া নাফ্সের অবস্থান্তর ঘটে না, ইবাদত করলেও ইখলাসের সাথে করা যায় না, নাফসে আম্মারা থেকে যায় ও দুনিয়ার প্রতি বেশী আকর্ষণ থাকে, আল্লাহ্তায়ালার প্রতি নয়।

তরীকত অনুযায়ী ফানাফি'র রাসূল পর্যন্ত নাফসে আম্মারার প্রভাব থাকে, ফানাফিল্লাহতে নাফ্স লাওয়ামা রূপ ধারণ করে নিস্তেজ হয়ে যায় এবং 'আবদিয়াতে মাকামের শেষ পর্যায়ে নাফ্স তাযকিয়া হয়ে মুতমাইন্নাহ হয়।

"হে মোমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র নিকট তওবাহ্ কর, বিশুদ্ধ তওবাহ্, এবং সম্ভবত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কর্মগুলো মোচন করে দেবেন"। ৬৬ঃ১৮।

www.pathagar.org

অসৎ চরিত্রের পরিবর্তন

আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য লাভের একমাত্র উপায় হলো, আচার-আচরণে, স্বভাব-চরিত্রে, দেহ-মন দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর অনুসরণ করা। তাহলে আল্লাহ্তায়ালাকে পাওয়া যাবে, অনুসরণকারী আল্লাহ্তায়ালার হবে, আল্লাহ্ও তার হবেন।

এ কারণে অসৎ চরিত্রকে সৎচরিত্রে, অসৎ স্বভাবকে সৎ স্বভাবে পরিণত করার জন্য আল্লাহ্র পথের যাত্রী নাফ্সের বিরুদ্ধে জিহাদ দ্বারা যে সাধনা করে নাফ্স ও দীল পরিষ্কার করে, তাকে বলা হয় তাসাওউফ। পবিত্র দীলেই ফিরিশতা অবতীর্ণ হয়, আল্লাহ্তায়ালা উদ্ভাসিত হন। যখন আল্লাহ্তায়ালা ও তাঁর আদেশ-নিষেধ ভিন্ন অন্য কোন পদার্থে আকর্ষণ বিন্দু মাত্র অবশিষ্ট না থাকে তখন বুঝতে হবে দীল পবিত্র হয়েছে। নাফ্স পবিত্র না হলে অন্য পদার্থের আকর্ষণ অন্তরে ঘুরে ফিরে আসবে।

অপরিশোধিত নাফ্স জন্মগত ভাবে পশু প্রবৃত্তির অনুসারী ও নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছু বুঝতে চায় না। পশুর মত খাদ্যের জন্য, যৌন সংগীর জন্য, বাসস্থান ও নিজ আরাম-আয়েশের জন্য অন্যের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হতে চায়, অন্যের হিস্যায় থাবা বিস্তার করে যারা অমার্জিত ও অসংযত কাম, ক্রোধ ও লোভ লালসার বশবর্তী হয়। সমাজবদ্ধ জানোয়ার হিসাবে তার হাতিয়ার প্রতারণা, মুনাফিক, হিংসা-বিদ্বেষ পোষণের কারণে অন্যের অমঙ্গল কামনা করা, পরনিন্দা করা, চুরি-ডাকাতি করা, দল সংগঠিত করে জুলুম করা, মানুষকে বিপদে ফেলে স্বার্থ উদ্ধার করা, ঘুষ, সুদ খাওয়া। নাফ্স শয়তানের প্ররোচনায় আত্মরক্ষা ও আত্মবিস্তারের জন্য মানুষ এ সব হাতিয়ার বার বার প্রয়োগ করতে গিয়ে স্বভাবকে কুস্বভাবে পরিণত করে এবং চরিত্র বিনষ্ট করে। কিন্তু শয়তান সেটাকে সুশোভিত করে দেখায়, ফলে সে নিজনকে সব সময় ভাল মনে করে।

প্রথম সে আল্লাহ্র আদেশ নিষেধের প্রতি উদাসীন থাকে, পরে শরীয়তকে মুক্ত পশু প্রবৃত্তির প্রতিবন্ধক ভেবে পরিত্যাগ করে এবং শিরক ও কুফরীতে লিপ্ত হয় এবং স্রষ্টার পরিবর্তে সৃষ্টির দাসত্ব করে এবং আল্লাহ্তায়ালা হতে বিচ্ছিন্ন

www.pathagar.org

হয়ে নিজে ধ্বংস হয়ে যায়। তার কুস্বভাব দ্বারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে কষ্ট দেয় ও দুনিয়াতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে।

কুস্বভাব যার মধ্যে আছে তার চরিত্র অসৎ হয়ে যায়, আত্মা কলুষিত হয় ও শুধু দুনিয়া অর্জনে মত্ত ও মশগুল থাকে। অসৎ স্বভাবের ফলে আত্মা রুগ্ন ও নিস্তেজ হয়ে যায়। মানুষের মন্দ স্বভাব হলো-লজ্জাহীনতা, বেসবর বা ধৈর্যহীনতা, অশ্লীলতা, অশ্লীল ও মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ, হিংসা-বিদ্বেষ, অপরের দুঃখে তৃপ্তি পাওয়া, কৃপণতা, ভোজন-স্পৃহা, সংসারাসক্তি, ধনী ও প্রভাবশালীদের প্রতি নাজায়েয আনুগত্য, দরিদ্রকে অবজ্ঞা করা, নাজায়েয যৌন তৃপ্তির আকাঙ্খা, সম্মান, যশ ও প্রভূত্বের স্পৃহা, গর্ব ও পথভ্রষ্টতাকে ভাল মনে করা, নিজকে বড় মনে করা ইত্যাদি ও তার শাখা-প্রশাখা। এসব মন্দ স্বভাব নিয়ে যে চরিত্র গঠিত হয় তাকে বলা হয় অসৎ চরিত্র। যে কেউ নিজে নিজে যাচাই করে দেখতে পারে, তার চরিত্র সৎ কি অসৎ। গোপন থাকলে মানুষের ভাল-মন্দ বলার উপর চরিত্র গুণ নির্ভর করে না, আল্লাহ্‌র কাছে তা গোপন করতে পারবে না।

সৎ চরিত্রের প্রধান গুণ সৎ ব্যবহার। হযরত মালেক (র) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল করিম (সাঃ) বলেছেনঃ "সৎ স্বভাবের পূর্ণতা আনয়নের জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি" (মুওয়াত্তা)। হযরত আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল করীম বলেছেন, "সত্য পথ প্রদর্শন, সুন্দর ব্যবহার ও মিতাচারিতা নবুয়তের ২৫ ভাগের এক ভাগ"।

কোরআনে আছে "আল্লাহ্ ন্যায় পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎ কাজ ও সীমালঙ্ঘন, তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।" ১৬ঃ৯০।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল করীম (সাঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি সারা রাত নামাজ পড়ে, সারা দিন রোযা রাখে, সুন্দর স্বভাব বিশিষ্ট বিশ্বাসী, তাঁর সমান পদমর্যাদা লাভ করবে।" আবু দাউদ।

তিনি আরো বলেছেন-"যার স্বভাব মন্দ ও কর্কশ, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে না।"

www.pathagar.org

অসৎ ব্যবহারের পরিবর্তে হয় সৎ ব্যবহার করতে হবে, নইলে সবর করে চুপ থাকতে হবে। অন্যে অনিষ্ট করলেও সহ্য করে তার কোন অনিষ্ট করা হতে বিরত থাকার নামই সৎস্বাব। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ মীযানে সর্ব প্রথম রাখা হবে সৎস্বভাব ও বদান্যতা।

আল্লাহ্তায়ালা যখন ঈমান সৃষ্টি করলেন, তখন ঈমান বলল;- 'প্রভু আমাকে শক্তি দাও'। আল্লাহ্ তাকে সৎ স্বভাব ও বদান্যতা দান করলেন। তাই সৎ স্বভাব ও বদান্যতা ছাড়া ঈমান শক্তিশালী হয় না ও বজায় থাকে না।

যখন কুফ্র সৃষ্টি করলেন তখন কুফ্র বলল, 'প্রভু আমায় শক্তি দাও'। তখন স্রষ্টা অসৎ স্বভাব ও কৃপণতা দান করলেন। সেজন্য ঈমানদারদের এ দুটি জিনিস অবশ্যই বর্জন করতে হবে।

সৎ ও অসৎ স্বভাব, কৃপণতা বা বদান্যতা মানুষের সহজাত নয়। প্রবৃত্তি ও আত্মাকে এগুলো থেকে মুক্ত করেই সৃষ্টি করা হয়েছে। ইমানের সহজাত হল সৎ স্বভাব ও বদান্যতা। ঈমানের সাথে জড়িত ও মিশ্রিত বলে ঈমানের সাথে সাথে সৎ স্বভাব অবলম্বন ও বদান্যতা গ্রহণ করতে হবে।

কুফরীর সহজাত কৃপণতা ও অসৎ স্বভাব বলে শয়তান নাফ্সের সাথে মিতালী করে মানুষকে কৃপণা ও অসৎ স্বভাব বিশিষ্ট করে, এ দুই হাতিয়ার দ্বারা ঈমানের উপর হামলা করে, সংসারের প্রতি মোহ ও আসক্তি সৃষ্টি করে।

ভাল কাজের প্রতি যার বেশী আগ্রহ আছে তার স্বভাব ভাল বলে মনে করতে হবে, মন্দ কাজের প্রতি যার আগ্রহ ও অনুরাগ বেশী, তবে বুঝতে হবে তার স্বভাব অসৎ। যখন কারো মনের ইচ্ছা ও আগ্রহ স্বাভাবিক ভাবে ভাল কাজের দিকে ধাবিত হয় এবং সকল বাঁধার মুকাবিলা করতে প্রস্তুত হয়, তখন বুঝতে হবে তার চরিত্র সৎ হয়েছে। সৎ চিন্তা, সৎ কাজ এবং সৎ ব্যবহার বারবার করতে করতে সৎ চরিত্রের জন্ম হয়। যখন আল্লাহ্ ভিন্ন কোন কিছুতে মনের টান ও আগ্রহ থাকে না, তখন মনে করতে হবে মন পবিত্র হয়েছে। সে অবস্থায় নিজের মন্দ কাজগুলোর প্রতি আন্তরিক ঘৃণা জন্মাবে। শরীয়তের হুকুম আহ্কাম মান্য করা ছাড়া, কোরআন- সুন্নাহ্র আদেশ নিষেধ পালন ছাড়া সৎ চরিত্র ও পবিত্রতা অর্জন সম্ভব নয়।

www.pathagar.org

ভাল কাজের প্রতি অনাগ্রহী ও মন যার উদাসীন থাকে, নিজ স্বার্থ ছাড়া কিছুই ভাল লাগে না। অসৎ কাজ ও সংসারের স্বার্থের প্রতি, দেহের স্বার্থের প্রতি মনের টান যার বেশী, লোকের দোষ-ত্রুটির প্রতি নজর বেশী; মিথ্যা কথা ও প্রতারণাকে বেশী পছন্দ করলে বুঝতে হবে; তার স্বভাব অসৎ হয়েছে। অন্যের অনিষ্ট চিন্তা ও অসৎ কাজ করতে করতে অসৎ চরিত্র জন্ম নেয়। তখন মনে হবে, তার অসৎ স্বভাব ও চরিত্র সবচেয়ে ভাল আর অন্যেরা তার চেয়ে মন্দ। কবিরা গুনাহ বার বার করলে দ্রুত অসৎ চরিত্র হয়ে যায়।

জ্ঞান ছাড়া নিজের সত্তা, প্রকাশ্য ও গুপ্ত শত্রু, নাফ্স ও শয়তানের কার্যাবলী বোঝা যায় না। আবার নাফ্স শয়তানকে না বুঝতে পারলে, এই দুশমনের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করা যায় না। আত্মসংযম অবলম্বন করতে হলে, সবর, লজ্জা ও বদান্যতা অবলম্বন করতে হয়, আল্লাহ্ ভীতির সাহায্যে।

সত্য ভাষণ, ধৈর্যধারণ, নিজের যে সম্পদ ও পার্থিব ক্ষমতা আছে তাতে সন্তুষ্ট থাকা, অধিক লজ্জাশীলতা, নিজের দুঃখ-দুর্দশাকে বড় করে না দেখালেই সহজে সৎস্বভাব অর্জন সম্ভব। ক্ষমা, সংযম, দয়া, তিরস্কার পরিত্যাগ, অভিশাপে বিরতি, হিংসা-বিদ্বেষ ও কৃপণতা পরিহার করে বদান্যতা গ্রহণ অপরিহার্য। পরনিন্দায় অরুচী আনা, সকলের প্রতি দয়ার্দ চিত্ত থাকা, অহংকার অন্তরে স্থান না দিয়ে, নিজকে বড় মনে না করে ছোট ভাবা, প্রতিজ্ঞা বা ওয়াদা ভংগ না করা, অন্যের অনষ্টে প্রতিশোধে না নিয়ে তা সহ্য করা, অল্পে সন্তুষ্ট থাকা, ক্রোধ হজম করা, আল্লাহ্র জন্য ভালবাসা ও ঘৃণা করা এবং শরীয়তের সীমার মধ্যে থেকে রুজি রোজগার করে জীবন যাপন করাই হল উৎকৃষ্ট স্বভাব। সকল কাজে আল্লাহ্র উপর নির্ভর করে পরহেযগারী অবলম্বন, মানুষের পরিবর্তে আল্লাহ্র কাছে আশা এবং সকল কাজ ও ইবাদত আল্লাহ্র ওয়াস্তে করা, সর্ব অবস্থায় হারাম বর্জন করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পায়রবী করা। এসব গুণরাজি যত বেশী অর্জন করতে পারবে সে তত বেশী সৎচরিত্রবান হবে। নাফ্সের সাথে লড়াই করে এসব গুণরাজি অর্জন করতে হয়।

এরূপ সৎ চরিত্রের ব্যক্তি অধিক ইবাদত ও যিকিরের মধ্যে থাকলে এবং আল্লাহ্র জন্য ত্যাগ স্বীকার করলেই তাঁর মধ্যে আল্লাহ্ প্রেম জন্ম নেবে।

সব মানুষ সমান হয় না, স্তর ভেদ আছে। ঈমান অনুযায়ী ভাল, মন্দ ও মিশ্রিত স্বভাব সবার মধ্যে কম-বেশী আছে। এ স্বভাবকে পরিবর্তন করে আল্লাহ্ ও রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর স্বভাব রূপান্তরিত করার ইচ্ছা পোষণ করে নাফসের

www.pathagar.org

বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে নাফ্সকে পরিশোধিত করতে হয়। আল্লাহ্তায়ালার রহমানী স্বভাব হল, দয়া-মায়া, ক্ষমা, সত্যবাদীতা, বদান্যতা, সবর, অপ্রয়োজনীয় কথা ও কাজ হতে বিরত থাকা, সুবিচার, প্রতিপালন, গীবত না করা, সকলকে স্নেহময় দৃষ্টিতে দেখা এবং সৃষ্টিকে ভালবাসা ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহ্তাআলার গুণে গুণান্বিত ছিলেন বলে হাবীবুল্লাহ হয়েছিলেন। একই স্বভাবের হলেই বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয়।

কিন্তু মানুষ যদি সংসারাসক্তি, ভাল ভাল খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, যানবাহন সংগ্রহ ও অন্যের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও নামযশের জন্য সংগ্রামে রত হয়, তবে তার আর নাফসের সাথে সংগ্রাম করে চরিত্র সংশোধন হবে না। নাফসের অনুকূলে চলার কারণে ভাল স্বভাব মন্দ স্বভাবে এবং মন্দ স্বভাব অধিকতর মন্দ স্বভাবে পরিণত হবে। এরূপ লোক দুনিয়ার লোককে প্রতারণা ও ফাঁকি দিয়ে ভাল মানুষ সাজলেও আল্লাহ্তায়ালার কাছে পাপিষ্ঠ দুষ্ট দুরাচারে পরিণত হয়ে প্রবৃত্তি উপাসকে পরিণত হবে এবং আল্লাহ্ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। মুখে মধু থাকলেও অন্তর বাঘের মত হিংস্র ও সাপের মত বিদ্বেষ পরায়ণ হবে। শয়তান ও নাফ্স তার কার্যাবলী সুশোভিত করবে। সে মনে করবে যে, সে সঠিক পথেই আছে। মুশরিক ও কাফেরদের মতবাদকে ভাল মনে করবে আল্লাহ্তাআলর দেওয়া বিধি-বিধান হতে। বিনা তওবাহ্য় মৃত্যু হলে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে ও ধ্বংস হয়ে যাবে।

শয়তানের মত নাফ্সও মানুষের শত্রু। আল্লাহ্তায়ালার কাছে আশ্রয় চাইলে ও লা হাওলা পড়লে শয়তান হতে রেহাই পাওয়া যায়, কিন্তু প্রবৃত্তি কিছু আকাঙ্ক্ষা করলে শত যুক্তি তর্কের দ্বারা প্রবোধ দিলেও শান্ত হয় না। আল্লাহ্ভীতি ও যুক্তি -তর্কে সাময়িকভাবে বিরত হলেও পুনঃ পুনঃ আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলবে, আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত শান্ত হবে না, তৃপ্ত হবে না। তাই প্রশিক্ষণ ও জিহাদ ছাড়া নাফ্সকে বশীভূত করা যায় না। এ কারণে আল্লাহ্তায়ালা দুঃখ-দারিদ্র্য, রোগ শোক দেন যাতে সে নত হয়, বশ মানে। যে দুঃখ-দুর্দশাকে কাজে লাগায় সে সফল হয়, আর যে পেরেশান হয়, তকদীরে বিশ্বাস করে না সে আল্লাহ্র উপর দোষারোপ করে ধ্বংস হয়।

তাই প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয়। জিহাদ ছাড়া অসৎ ও অমার্জিত নাফ্সকে মার্জিত না করে, অসৎ চরিত্রকে সৎ চরিত্রে রূপান্তর না

www.pathagar.org

করে নাফ্সকে পবিত্র করা যাবেনা। নিজ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে নির্মম ও কঠোর জিহাদ ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর খাঁটি অনুসারী হওয়া যাবে না। তাঁর খাঁটি নিষ্ঠাবান অনুসারী না হলে আল্লাহ্তায়ালাকে পাওয়া যাবে না, তাঁর নৈকট্য ও মিলন লাভ হবে না, দীদার তো দূরের কথা। নাফ্সের বিরোধীতা করে সৎ চরিত্র গঠন ছাড়া এসব নিয়ামত লাভ সম্ভব নয়।

পরহেযগারী হল শরীয়তের নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থেকে ফরজ, সুন্নত ও নফল আদায় করা। আলেমগণ জ্ঞানের সাহায্যে আল্লাহ্ ভীতির দ্বারা এরূপ আমল করে দোযখ হতে রক্ষা পেতে পারেন।

সাধারণ নিয়ম পালন, ছোট থেকে সৎ স্বভাব ও পুঁথিগত বিদ্যার দ্বারা আমল করে যে মিশ্রিত চরিত্র হাঁসিল হয় তা সাংসারিক জীবন-সংগ্রামে বিনষ্ট হওয়ার আশংকা থেকে যায়, ইখলাসের অভাবে ও নাফ্সের কাছে পরাজয় বরণের কারণে। পুঁথিগত বিদ্যা একান্ত প্রয়োজনীয়। শুধু জ্ঞানের সাহায্যে ও সাধারণ আমল করে যদি সৎ চরিত্র অর্জন ও আল্লাহ্র নৈকট্য হাঁসিল সম্ভব হত তবে সবাই ওলীআল্লাহ্ হয়ে যেত।

বিদ্যা শিক্ষা করে এবং ফরজ, সুন্নত নামাজ ও কিছু তসবীহ-তাহ্লীল আদায় করে ও নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকলেই আল্লাহ্তায়ালা ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর মত চরিত্র অর্জন করা যায় না। যতক্ষণ না নাফ্সের বিরুদ্ধে জিহাদ করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আখলাক বা আল্লাহ্তায়ালার চরিত্রগুণ লাভ করা না যায়। কারণ ইখলাসের সাথে বা রিয়া বিহীনভাবে সকল কাজ সমাধান ও প্রশান্ত হৃদয়ে নামায বা অন্য ইবাদত করা যায় না। নামাযে নাফ্স ও শয়তানের দ্বারা আনীত সাংসারিক বা আল্লাহ্ ভিন্ন পদার্থের দ্বারা অন্তর আলোড়িত হতে থাকে। নিজের নাম, যশ, প্রদর্শনী বাতিক এবং আত্মম্ভরিতা যুক্ত হয়ে সব বরবাদ করে দেয়। ধনমান, ধর্মীয় ফেতনা-ফ্যাসাদেরও পাপের প্রাচীর রচিত হয়। ফলে বান্দা ও আল্লাহ্র মধ্যে পরদা পড়ে অন্তরায় সৃষ্টি হয়, জ্ঞান কাজে আসে না। তাই আল্লাহ্র গুণ অর্জন ছাড়া জ্ঞান ও বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর মত চরিত্র গঠন সম্ভবপর হয় না।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর চরিত্রে ইখলাসহীনতা, রিয়া, আত্মম্ভরিতা, নাম-যশ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির মোহ ছিল না। অথচ এগুলো চরিত্রে থাকলেই ফসেক হয়ে

www.pathagar.org

যায়। তিনি কখনও নিজের মান-সম্মান ও প্রতিপত্তির দিকে লোকদের ডাকেননি, আল্লাহ্‌র দিকে ডাকতেন। তিনি বলে গেছেন যে একমাত্র লোভই আলেমদের পথভ্রষ্ট করে দেয়। ধনের লোভ, মানের লোভ, ক্ষমতার অংশীদারিত্বের লোভ ইত্যাদি দুনিয়ার লোভ। আমি অন্য লোক বা অমুক আলেম থেকে বড় এ মনোবৃত্তি অহংকার আনে। অহংকার সব আমল বিনষ্ট করে। দুনিয়ার লোভে জ্ঞানীরা সম্পত্তি লোভী ও ক্ষমতা লোভীদের দোসরে পরিণত হয়ে চরিত্র নষ্ট করে আল্লাহ্‌ হতে দূরবর্তী হয়ে যায়। এসব থেকে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ্‌ চাই।

রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)এর চরিত্র তথা আল্লাহ্‌তায়ালার রহমানী স্বভাব অর্জন করতে হলে নিজ মন্দ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে নির্মম ও কঠোর জিহাদ পরিচালনা করে সৎচরিত্র অর্জন করতে হয় যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্‌কে পাওয়া, তাঁর গুণরাজি ও জ্ঞানরাজিতে মিশে তাঁর মধ্যেই ফানা-বাকা লাভ করা। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ জন্য একে জিহাদে আকবর বলেছেন। কাফির ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদকে ছোট জিহাদ বলেছেন। কারণ কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদে আল্লাহ্‌ ও বান্দার মধ্যকার সকল বিভেদের প্রাচীর ও অন্তরায় বা পরদা অপসারিত হয়, বান্দা নিরাপদ হয়। নাফ্‌সের বিরুদ্ধে জিহাদে আল্লাহ্‌ ও বান্দার মধ্যকার সকল বিভেদের প্রাচীর ও অন্তরায় বা পরদা অপসারিত হয়, বান্দা নিরাপদ হয়। নাফ্‌সের বিরুদ্ধে জিহাদে নেতৃস্থানীয় কিছু লোক বিজয়ী না হলে শরীয়ত কায়েমের জিহাদও করা যায় না।

সারা জীবন অনুক্ষণ নাফ্‌সের বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত থাকতে হয়। কামেল বা পরিপূর্ণ মানব না হওয়া পর্যন্ত প্রবৃত্তি দমিত থাকলেও আকাঙ্ক্ষা বার বার মনে উদয় হয়। কামেল-মুকাম্মেল হতে হলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর চরিত্র গুণ অর্জন করা ছাড়া তা হয় না এবং তাযকিয়া নাফ্‌স না হওয়া পর্যন্ত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর চরিত্র গুণ হাঁসিল হয় না। আবার জিহাদ ও কলবী যিকির ছাড়া নাফ্‌সও পবিত্র হয় না। আর এ জিহাদে আকবর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর নিষ্ঠা সহকারে পায়রবী ছাড়া হয় না। এ কথা বিশ্বাস করতে হবে যে, ধন-মান, যশ ও ক্ষমতা বাড়লেও নিজের আয়ু বাড়ে না। এ সব ধ্বংস হবে, আমল সাথে যাবে।

শেখ ফরীদ উদ্দীন আত্তার (র) হিজরী তিন শতক পর্যন্ত ইসলামের প্রাথমিক যুগের ছিয়ানব্বই জন আউলিয়ার জীবনী 'তাযকিরাতুল আউলিয়া' নামক গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। ইসলামের ইতিহাসের প্রাথমিক যুগের এসব সুবিখ্যাত আউলিয়ার জীবনী, উক্তি ও নসিহত সহ এটি একটি প্রামাণ্য তাসাওউফের উপর

www.pathagar.org

গ্রন্থ। এ গ্রন্থ পাঠে আমরা জানতে পারি এ ছিয়ানব্বই জন আউলিয়া সবাই নাফ্সের সাথে জিহাদ করে শরীয়ত তথা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর চরিত্রগুণ লাভ করে তাঁকে অনুসরণ করেই ওলীআল্লাহ্ হয়েছেন, সূফী হয়েছেন। হিমালয়ান উপমহাদেশে কাদিরীয়া, চিশ্তীয়া, নাক্শ বন্দীয়া, মুজাদ্দেদীয়া, সুহরাওয়ারদীয়া ও ক্বদমীয়া সহ সব তরীকার ইমামগণ এবং তাদের অনুসারীগণ নাফ্সের সাথে জিহাদ করে শরীয়ত অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জাহেরী ও বাতেনী পায়রবী করে আউলিয়া হয়েছেন। যারা বলে শরীয়ত এবং তাসাওউফ বা তরীকত ভিন্ন, শরীয়ত পালন করলে তাসাওউফের দরকার নেই অথবা তরীকত পালন করলে শরীয়তের দরকার নেই- এই দু'দলই ভ্রান্ত এবং বিপথগামী। তারা যে বিভ্রান্ত, শরীয়তেই তা প্রমাণ করে।

বিপথগামী সূফী এবং বেআমল ও অজ্ঞ আলেমগণ না বুঝে এরূপ বলেন। কয়েক শতাব্দী ধরে এনিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে বহু লেখা-লেখি হয়েছে। সুন্নত জামাতের নিকট এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিষ্ঠাবান অনুসারীদের নিকট তারা বিভ্রান্ত বলেই প্রমাণিত হয়েছে।

শরীয়তের হুকুম দু'রকমঃ আযীমত ও রুখ্সত। আযীমত কষ্টসাধ্য এবং রুখ্সত সহজসাধ্য। যেমন এক বছরের খাদ্য পরিবারের লোকের জন্য জমা রাখা রুখ্সত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মত খাদ্য জমিয়ে না রাখা আযীমত। হালাল সুস্বাদু খাদ্য তিন ভাগের এক ভাগ পেট খালি রেখে দিনে তিনবার খাওয়া রুখ্সত। আবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মত নেহায়েত মামুলী নিম্ন পর্যায়ের সামান্য খাদ্য দিনে একবার গ্রহণ করা এবং লজ্জা নিবারণের জন্য এক প্রস্থ করে সাধারণ মামুলী কাপড় রাখা ও তালি চলতে পারা পর্যন্ত ব্যবহার করা আযীমত। এশা ও ফজরের নামাজ পড়ে সারা রাত ঘুমানো রুখ্সত আর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মত রাতের অর্ধেকের বেশী বা তিন ভাগের দুভাগ সময় ইবাদত করা আযীমত।

নাফ্সের সাথে সংগ্রাম রত বা পরাজিত নাফ্সের অধিকারী সূফী ও আউলিয়াগণ শরীয়তের আযীমত অনুসরণ করেন।

নাফ্সের সাথে জিহাদ করলে আযীমত দ্বারাই করতে হবে, কারণ রুখসতে কখন সীমালংঘন হয় বলা যায় না, নাফ্সও বশীভূত না হয়ে পেরেশান কর এটা নবী-রাসূল ও আউলিয়াগণের নীতি। আল্লাহ্তায়ালার সান্নিধ্য, মিলন ও দীদার যাদের কাম্য আযীমতকে গ্রহণ করাই তাদের উচিত। অপারগ ব্যক্তি কোন কোন

www.pathagar.org

ক্ষেত্রে রুখস্ত পর্যন্ত থাকতে পারে, তবে কামালিয়ত হাঁসিলের জন্য নাফসের বিরুদ্ধে জিহাদ দীর্ঘায়িত হবে। নাফ্সকে রেহাই দিলে পদস্খলন ঘটাও বিচিত্র নয়।

যারা নাফসের সাথে জিহাদ করে নাফ্সকে পবিত্র করে সৎ চরিত্র অর্থাৎ আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) এর চরিত্র গুণ লাভ করেছেন, তাঁরা অমর জীবন লাভ করেছেন। দুনিয়াতেই যারা বেহেশতীদের ক্ষমতা, সৌন্দর্য্য ও অমরত্ব লাভ করে। তাঁদের মৃত্যু নেই। জড় দেহ ত্যাগ করলেও তারা জীবিত ও কর্মতৎপর থাকে।

হযরত ফতেহ মুছেলী (র) একজন খ্যাতনামা প্রাথমিক যুগের সুন্নত জমাতের ইরানী খোদা প্রেমিক দরবেশ ছিলেন। তিনি বলে গেছেন, - "একদা আমি বন্ধু-বান্ধবসহ মসজিদে বসা ছিলাম, এমন সময় ছেঁড়া কাপড় পড়া একজন যুবক এসে আমাকে বললো- 'আপনি জানেন যে, মুসাফিরেরও হক আছে? তবে আগামী কাল অমুক সময় অমুক পল্লীতে আমার ঘর খুঁজে নেবেন, সেখানে আমি মৃত পড়ে থাকব, আপনি আমাকে গোসল দিয়ে ছেঁড়া কাপড় দিয়ে দাফন করবেন।' আমি কথিত সময় মত দ্বিতীয় দিন সেখানে যেয়ে দেখি সত্যি সে মরে গেছে। আমি নিজ হাতে তাকে গোসল দিয়ে তার পিরহান দিয়েই তাকে দাফন করলাম। আমি তার কবর হতে উঠতে চাইলে সে উঠে বসলো ও আমার কাপড়ের আঁচল ধরে বললো, হে ফতেহ। যদি আল্লাহ্ পাকের কাছে আমার কিছু মরতবা মেলে তবে আমি তোমার এ কষ্ট ও দয়ার প্রতিদান প্রদান করব। তারপর সে আরো বললো, ওহে! এরূপ ভাবে জীবন যাপন কর যেন অনন্ত জীবন লাভ করতে সক্ষম হও। এ কথা বলে সে নীরব হয়ে গেল।" আউলিয়াগণের জড়দেহ পঁচেনা, গলে না, কীট ও মাটিতে খায় না। সূক্ষ্ম দেহ বরযখে কর্মতৎপর থাকে।

আল্লাহ্ ভীতি, মৃত্যুর চিন্তা, আখিরাতের চিন্তা মানুষকে তওবাহ্র দিকে অগ্রসর করে। তওবাহ্ করে অনন্ত জীবন লাভের জন্য নাফ্সের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সৎ চরিত্র তথা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চরিত্র গুণ অর্জনের দিকে অগ্রসর হতে হয়। তওবাহ্ই নাফ্সের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দরজা বা প্রথম অস্ত্র। আর মৃত্যু চিন্তা এবং আল্লাহ্তায়ালার পুরস্কার ও শাস্তির ভয়ে মানুষ তওবাহ্ করে।

www.pathagar.org

মৃত্যুচিন্তা

মৃত্যু চিন্তা মানুষকে তওবাহ্ পর্যন্ত নিয়ে যায়। এ সত্য আমাদের ভাল ভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে, পৃথিবীতে এরূপ কোন মানুষ নেই, যার মৃত্যু হবেনা, এমন কোন মুসলমান নেই- পতঙ্গের খাদ্য হবে না, হাড়, মাংস পঁচে গলে মাটির সাথে মিশে ধ্বংস হবেনা। সবাই বাড়ী-ঘর, জায়গা-জমি, সহায়-সম্পত্তি ও পরিবার-পরিজন ফেলে চলে যেতে বাধ্য হবে। সবার ঠিকানা গোরস্থান। যে দুনিয়াতে আল্লাহ্তায়ালাকে চিরসাথী করে নিয়েছে, অক্ষয়, অব্যয় ও চির বিরাজমানের গুণরাজি অর্জন করেছে, সেখানেও দেহ-মন-আত্মাসহ অমর জীবন নিয়ে তাঁর মেহমান হিসাবেই অবস্থান করবে।

নাফ্সের সাথে, আত্মার সাথে দুনিয়াতে যা মিশিয়েছে, নেক অথবা বদ আমল, তা তার চিরসাথী হবে। কেয়ামতের ধ্বংসলীলার পর স্থায়ী বাস্তব সৃষ্টিতে সেই আমলই তার বন্ধু বা শত্রু হবে। এমন বেয়াকুপ কে আছে যে, এমন উৎকৃষ্ট সাথীকে অবহেলা করে নিকৃষ্ট সাথী বেছে নিয়ে সে অপরিচিত দেশে যাবে। নিকৃষ্ট বদ আমলরূপ সাথী তাকে যে জাহান্নামে নিয়ে যাবে- যা নিজ হাতে কামাই করেছে। ছোট বড় যে নাফরমানী বা অপরাধ যাই করিনা কেন তা ঝেড়ে ফেলার ক্ষমতা আমাদের নেই, সে সাথী হবেই। একমাত্র নেক আমলই আমাদের সেই নিকৃষ্ট সাথী থেকে বাঁচাতে পারে।

যে বাড়ী-ঘর, সহায়-সম্পত্তি না জায়েজ পথে কামাই করতে গিয়ে আল্লাহ্তায়ালার রহমতের বদলে গযব কামাই করেছে যা আযাব রূপে তার উপর আসবে, সম্পদ পড়ে থাকবে ওয়ারিশদের জন্য। সার্বিক জীবনের চিরস্থায়ী সুখ-শান্তির লোভ না করে, দুনিয়া হতে পেনসান নিয়ে আখিরাতের সম্বল জোগাড় না করে, অস্থায়ী ধ্বংসশীল দুনিয়ার লোভ করে ধ্বংসশীল জড় দেহের জন্য কামাই রোজগার করে মৃত্যুর সময় উপলব্ধি করবে যে, সে ধ্বংস হয়ে গেছে, চিরস্থায়ী আজাবকে সাথী করে নিয়ে সে বেয়াকুফি করেছে।

এ কথা অবধারিত সত্য যে, আমাদের শেষ বাসগৃহ কবরস্থান। সেখান হতে পুনরুত্থিত হয়ে এ জড় দেহ নিয়ে হাশরে আল্লাহ্তায়ালার দরবারে হিসাবান্তে কর্মফল অনুযায়ী বেহেশত অথবা দোযখে যাবো। দুনিয়াতে জড় দেহ দেওয়া হয়েছে ভাল বা মন্দ কাজ করার জন্য এবং পরীক্ষা করার জন্য যে, সে শয়তান

www.pathagar.org

ও নাফ্সের কথা মত চলে, না আল্লাহ্র হুকুম মত চলে। হাশরে আবার চিরস্থায়ী জড় দেহ দেওয়া হবে শাস্তি ও পুরস্কার গ্রহণের জন্য। যে স্বেচ্ছায় আল্লাহ্র বান্দা হবে সে পুরস্কার পাবে আর যে আল্লাহ্ হতে পালিয়ে তাঁর বান্দা না হয়ে, নাফ্স শয়তানের বা সৃষ্টির বান্দা হবে, সে পাকড়াও হয়ে শাস্তি পাওয়ার জন্য জাহান্নামে যাবে।

মৃত্যু যে কোন মুহূর্তে ঘটতে পারে, দুর্ঘটনা বা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে প্রতি মুহূর্তে অহরহ মানুষ মরছে। যে কোন মুহূর্তে রোগাক্রান্ত হয়ে আমাদের মৃত্যু ঘটতে পারে। মৃত্যুর জন্য কোন নির্ধারিত কাল সুনির্দৃষ্ট নেই। জন্ম হতে সাধারণত আশি -নব্বই বছরের মধ্যে যে কোন মুহূর্তে এই ঘটনা ঘটতে পারে।

রাসূল মকবুল (সাঃ) বলেছেন- "যে ব্যক্তি স্বীয় নাফ্সকে বশীভূত করতে পেরেছে এবং ইহলোকে থেকে মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের জন্য কাজ করেছে সে ব্যক্তিই প্রকৃত বুদ্ধিমান।"

তিনি আরো বলেছেন "তোমরা অধিক পরিমাণে ভোগ-বিলাস বিনষ্টকারীকে (মৃত্যুকে) স্মরণ কর।"

একদিন হযরত আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রতি নিবেদন করলেন- "জিহাদে শহীদ লোকের মর্যাদা জন্য কেউ লাভ করতে পারবে?"

হুজুর জওয়াব দিলেন, "হাঁ পারবে, যে ব্যক্তি প্রতিদিন অন্তত বিশবার মৃত্যু চিন্তা করে সে শহীদের মর্যাদা পাবে।"

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন "হে আনাস! অধিক পরিমাণে মৃত্যু চিন্ত করো, মৃত্যু চিন্তা তোমার অন্তরে বিরাগ ভাব উৎপন্ন করবে এবং ইহা তোমার গুনাহসমূহের কাফফারা স্বরূপ হবে।"

কবর খানার বাশিন্দারা ধন-দওলত কামাই করেছিল, দামী দামী আসবাবপত্র, বাসন-কোসন, দালান-কোঠা, জায়গা-জমির কামাই করেছিল। তার পরিণাম ফল হয়েছে, সে কবর খানায় মাটির সাথে মিশে গেছে, তার অর্জিত সব কিছু ওয়ারিশরা ভোগ করছে। আমরা কি এই পরিণাম ফল থেকে রেহাই পাব? যদি আমাদের এ পরিণাম হয় তবে কেন সংসারের প্রতি আসক্তি আমাদের চিরস্থায়ী জিন্দিগী ভুলিয়ে দেয়? মৃত্যু আসার আগেই কেন পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করিনা? আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন,-"এবং আখিরাতই সত্যিকারের জীবন যদি তারা জানতে পারতো।"

www.pathagar.org

এই চিরস্থায়ী জীবনের উপর সেই তো অবহেলা দেখায় যার উপর তার আপন শত্রু শয়তান ও নাফ্স বিজয়ী হয়েছে, সত্যকে তার চিন্তা-ভাবনা থেকে সরিয়ে দিয়েছে। অবশ্যই দূরদর্শী জ্ঞানী লোক পরিণাম চিন্তা করে। অপরিণামদর্শী স্থূল বুদ্ধি সম্পন্ন লোক নাফ্সের কবলে পড়ে ভাবে-সবার যে গতি হয় তারও তাই হবে, মৃত্যু ও আখিরাতের চিন্তা করলে কি দুনিয়া কামাই করা যাবে? গাছ তলায় বসতে হবে। হায়রে অবোধ! মৃত্যু ও আখিরাতের চিন্তা না করলেও এ সত্য তার উপর কার্যকরী হবে। তখন নিঃস্ব হয়ে কবর থেকে উঠতে হবে। যে তা অস্বীকার করে সে তো কাফির, চিরকাল আগুন তার সাথী হবে।

এরূপ মৃত্যু ও আখিরাতের বাস্তবতা বার বার চিন্তা করতে থাকলে কিছু দিনের মধ্যেই তওবাহ্ করার স্পৃহা তার মনে জাগবে এবং তওবাহ্ করে আখিরাতের সম্বল সংগ্রহে মনযোগী হবে। তার অসৎ চরিত্রকে সৎ চরিত্রে রূপান্তরিত করার জন্য নাফসের সাথে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হবে।

www.pathagar.org

তওবাহ্

আল্লাহ্তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন, "হে মু'মিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ্তায়ালার সমীপে তওবাহ্ করো, নিশ্চয় তোমরা সাফল্য লাভ করবে।" - সূরা নূর।

"আল্লাহ্ তওবাহ্কারীকে ভালবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরও ভালবাসেন।" ২ঃ২২২।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন- "কৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়ার নামই তওবাহ্।"

তিনি আরো বলেছেন, - "পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদয় হওয়ার পূর্বে যে ব্যক্তি আল্লাহ্তায়ালার সমীপে তওবাহ্ করে, সে ব্যক্তি এমন নিষ্পাপ হয়ে যায় যেন সে কোন পাপই করেনি।"

হুজুর (সাঃ) বলেছেন, "পাপ কাজ হতে তওবাহ্ করে পুনরায় কখনও সে পাপের নিকটবর্তী না হওয়াকেই প্রকৃত তওবাহ্ বলে"।

তিনি আরো বলেছেন, -"আমি প্রত্যহ সত্তর বার তওবাহ্ করে থাকি। এবং নিজ পাপের জন্য আল্লাহ্তায়ালার কাছে ক্ষমা চেয়ে থাকি।" মনে কোন ওয়াসওয়াসা এলেই বা ইবাদত সঠিক হল কিনা ইত্যাদির জন্য নিষ্পাপ হয়েও তিনি তওবাহ্ করতেন। সর্বদা মনে করতেন এই বুঝি প্রভূ অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন, এই বোধ হয় গাফিলতি হল। এরূপ ভয়ভীতিতে থাকতেন এবং তওবাহ্ করতেন। আসলে তিনি নিষ্পাপ ছিলেন।

প্রবৃত্তির তাড়নায় লোভ ও হিংসার বশবর্তী হয়ে নিষিদ্ধ কাজ করে পরে লজ্জা, অনুতাপ ও ভয় অন্তরে দেখা দেয়। অনুতাপের জ্বালা তার মধ্যে পরিবর্তন আনে। তখন সেই ব্যক্তি অতীত পাপের ও গাফিলতির সংশোধনে, পাপের ক্ষতিপূরণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন তওবাহ্ করে পাপের পথে পা না বাড়াবার সংকল্প করে এবং সৎকাজে লিপ্ত হয়। এরূপ ব্যক্তিকেই তওবাহ্কারী বলে। তওবাহ্কারী অনুতাপ দ্বারা অন্তরের অবস্থা বদলিয়ে দিতে পারে। তার আচার-আচরণ ও স্বভাবে পরিবর্তন আনতে পারে। এ অবস্থা প্রাপ্ত হলে সংসার আসক্ত

www.pathagar.org

লোকদের সংশ্রব পরিহার করে, আলেম, নেককার ও সূফীদের সাহচর্য লাভের জন্য লালায়িত হয় এবং নাফ্সের সাথে জিহাদ করার জন্য মনে মনে প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

নেককার লোক খোদা ভীতির জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর মত মনে করে যে, আল্লাহ্তায়ালা আমাকে দেখছেন। না জানি তাঁর কি নাফরমানী করে ফেলেছি অথবা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে পারিনি এবং সময়টা হয়ত বিফলে গেছে ইত্যাদি ভেবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মত সব সময় আল্লাহ্র ভয়ে ভীত থাকে ও বার বার তওবাহ্ করে। আউলিয়া কিরাম তাই করতেন। আল্লাহ্তায়ালা শয়তানকে যেমন পাপে প্ররোচিত করে পথভ্রষ্ট করার ক্ষমতা দিয়েছেন, তেমনি মানুষকে দিয়েছেন তওবাহ্র উপহার। তওবাহ্ করলেই পাপ হতে মুক্তি লাভ হয়- যা শয়তানের লজ্জা ও আপসোসের কারণ হয়। অমার্জিত নাফ্স শয়তানের দোসর বলে অমার্জিত নাফ্সকে প্রশিক্ষণ দিয়ে মার্জিত করে চরিত্র সংশোধন করে নিলে শয়তানের শক্তি ক্ষয় হয়ে যায়-তখন বান্দার তওবাহ্র ভয়ে বেশী পন্ডশ্রম করতে অগ্রসর হয় না।

নতুন সাধকের কর্তব্য হলো নিজের গুনাহর জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে তওবাহ্ করা। তারপর অন্তরের মন্দ কামনা-বাসনাকে সমূলে উৎখাত করে ভাল ও সৎকাজ দ্বারা পূর্ব ক্ষতি পূরণের চেষ্টায় নিয়োজিত হওয়া উচিত। কোরআন পাক বুঝে পড়ে আল্লাহ্তায়ালার আদেশ-নিষেধ ও উপদেশ মজবুত করে ধরে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) চরিত্র, কার্য ও তাঁর সুন্নতের পায়রবীতে অভ্যস্ত হওয়া উচিত। হালাল খাদ্য গ্রহণ করতে হবে এবং সব রকম নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। কেউ কষ্ট দিলে তাকে কষ্ট না দিয়ে সবর করতে হবে। সকল কাজ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য করতে হবে। মিথ্যা, পরনিন্দা , অহংকার ও আত্মম্ভরিতা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে। তা হলে তওবাহ্য় টিকে থাকা সম্ভব হবে। যে এসব কাজগুলো করতে পারবে না তার তাসাওউফের সাধনায় আসা পন্ডশ্রম ছাড়া কিছুই হবে না।

তওবাহ্কারী লোকের নাফ্সের সাথে লড়াই করতে হয়। যাতে তার আবার পদস্খলন না হয়। পূর্বে যে সব পাপ কাজ করেছে সেজন্য মনে অনুতাপ নিয়ে মুখে এস্তেগফার পড়তে হয়। যাতে ভবিষ্যতে পাপে লিপ্ত না হয় সে জন্য সজাগ

www.pathagar.org

থাকতে হবে এবং অতীত ইবাদতের ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করতে হবে। লোকের যে হক নষ্ট করেছে তা পূরণ করতে হবে। পাপের দ্বারা নাফ্সকে তার তিক্ততার স্বাদ আস্বাদন করাতে হবে।

দুনিয়াদার মানুষের সংশ্রব এড়িয়ে নির্জনতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ নির্জনতা ছাড়া তওবাহ্ হাসিল হয় না। আল্লাহ্তায়ালার বেহেশত- দোযখের ওয়াদার কথা এবং তিনি যে রিযিক দাতা, এসব চিন্তা-ভাবনা করলে তওবাহ্ মজবুত হয়। হালাল খাদ্য না খেলে নির্জন বাসের তওফীক হয় না। ফরজ-সুন্নত যথা সময়ে আদায় না করলে হালাল রুজীর তওফীক হয় না। কামরিপু এবং ইন্দ্রিয়ের সংযম ছাড়া ফরজ-সুন্নত আদায় হয় না। সব কিছুর জন্য আল্লাহ্তায়ালার কাছে তওফীক চাইতে হয়।

নাফ্সের সাথে লড়াইয়ে তওবাহ্কে চিরসাথী করে নিতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর মত অসংখ্য বার তওবাহ্ করতে হবে। আমরা যেমন অন্য লোকদের চোখের সামনে দেখতে পাই আল্লাহ্তায়ালা তেমনি আমাদের দেখছেন এবং আমাদের মনের কথা জানছেন। তাঁর সামনে পাপ করা ও মন্দ চিন্তা করা গুরুতর অপরাধ বলে বিশ্বাস করতে হবে এবং সর্বদা এ কথা মনে রাখতে হবে। তওবাহ্ ও ক্ষমা প্রার্থনাকে চিরসাথী করে নিতে হবে। বর্তমান ও ভবিষ্যতের সারা জীবনই তওবাহ্ ও মাফ চাইতে হবে।

তওবাহ্ খাঁটি হলে কারামত জাহির হয়। আবার কারামতের পিছনে থাকলে আল্লাহ্তায়ালাকে পাওয়া যায় না। কারামত নিয়ামত, আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টির চিহ্ন। নিয়ামত ছেড়ে নিয়ামত দাতাকে ধরতে হবে। কারামত গোপন করে ফেললে পরীক্ষায় পড়তে হয় না। হেদায়েতের উদ্দেশ্য ছাড়া জাহির করলে দুনিয়াতে দোকান সাজানো হয়। শয়তানের ধোঁকায় দুনিয়ার বদলে আখিরাত বিক্রি হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

তওবাহ্ ও পরহেয়গারী ছাড়া যে অলৌকিক জিনিস আল্লাহ্তায়ালা তাঁর শত্রুদের দান করেন, তাকে বলা হয় ইসতিদরাজ, নাফ্সকে শাসনে রাখার পুরষ্কার। আখিরাতে তার কোন হিস্যা নেই। অবশ্য তওবাহ্ করে বিশুদ্ধ নিয়তে পরহেয়গারী, অবলম্বন করলে এবং ইসতিদরাজ লুকিয়ে ফেললে আল্লাহ্তায়ালা তাকে কারামত দান করতে পারেন।

www.pathagar.org

যুহদ

যে বস্তু আল্লাহ্তায়ালার ইবাদত, যিকির, মুহব্বত, ইচ্ছা, আল্লাহ্তায়ালার গুণরাজি এবং আখিরাতের চিন্তা-ভাবনা হতে মানুষকে বিরত এবং আল্লাহ্তায়ালার সান্নিধ্যে গমনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় বা গাফেল করে ফেলে তা নিঃসন্দেহে নিকৃষ্ট ও জঘন্য বস্তু, যার নাম দুনিয়া।

মানুষ নিজের স্বার্থের জন্য পার্থিব সব ভোগ্যবস্তু, সুস্বাদু খাদ্য, আরাম দায়ক সুদৃশ্য রকমারী পোষাক, সুউচ্চ দালান কোঠা, সৌখিন আসবাবপত্র, বিচিত্র ধরণের তৈজসপত্র, মূল্যবান যান-বাহন, সুন্দর গৃহ সামগ্রী এবং অন্যের সাথে সাজ-সজ্জা, ধন-মান ও ক্ষমতার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়, মেয়েদের বেপরদা রাখে আর জানালায় মূল্যবান পরদা দিয়ে বাড়ীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। ধন-মান, যশ, ক্ষমতার লোভ -লালসার ও আরো বেশীর জন্য আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে সে চেষ্টা -তদবীরে নিজেদের চরিত্র কদর্য করে। এসব জিনিস সংগ্রহের জন্য অস্থির থাকার জন্য আল্লাহ্ হতে দূরবর্তী ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কবর খানায় না যাওয়া পর্যন্ত সে বেহুশ ও বেখেয়াল থাকে। যারা এসব জোগাড় করতে পারে না তারাও এগুলো সংগ্রহের জন্য মনে আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এর পিছনে বেহুদা দৌড়াদৌড়ি করে কবর খানায় গিয়ে হাজির হয়। এদের বলা হয় দুনিয়াদার।

যে নেককার আল্লাহ্র ওয়াস্তে এ প্রতারক দুনিয়া হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং নাফ্সের সাথে লড়াই করে তারাও নবী হতেন, তাঁদের অনুসারীরা আউলিয়া হতেন। কিন্তু নবীর ওফাতের পর তাদের অনুসারীরা যুহ্দকে সঠিক ভাবে না বোঝার জন্য সন্ন্যাসী হয়ে যেত।

খৃষ্টানদের সন্ন্যাস সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন- "অথচ তারা বৈরাগ্য তৈরী করে নিল। আমি তাদের এজন্য আদেশ দেইনি। তারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য এ পথ বেছে নিলো, কিন্তু পুরোপুরী খিয়াল করতে পারেনি।" ৫৭ঃ ২৭

আল্লাহ্তায়ালা যে বৈরাগ্যের নিন্দা করেছেন, তা হল আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গীর্জা, মঠ, প্যাগোডা, মন্দির ও আশ্রমে থাকা এবং বন-জঙ্গল, পাহাড়- পর্বতে অবস্থান করা। আল্লাহ্ এ জাতীয় যুহ্দ বা সন্ন্যাস পছন্দ করেন না। কোন নবী বা রাসূল সন্ন্যাস জাতীয় যুহ্দ এখতিয়ার করেননি, অন্তত যাঁদের কথা পাক কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্যতিক্রমধর্মী ছিলেন একমাত্র হযরত ঈসা (আঃ)। তিনি বিয়ে-শাদী করেছিলেন বলে জানা

www.pathagar.org

যায় না। আবার দুনিয়াতে এসে উম্মতে মুহাম্মদী হয়ে বিয়ে-শাদী করবেন বলে প্রকাশ। তাঁর জন্মও ব্যতিক্রমধর্মী ছিল।

যে বস্তু আল্লাহ্‌র পথ হতে মানুষকে দূরে সরিয়ে নেয়, তাঁর যিকির ও ইবাদতে বাঁধার সৃষ্টি করে, গর্ব ও অহংকার আনে, তা পরিত্যাগ করাই ছিল মহানবী (সাঃ)-এর যুহ্‌দ বা সংসার-বৈরাগ্য। আল্লাহ্‌তায়ালা প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ অভাবীদের দান করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এ আদর্শ পালন করতে গিয়ে তুষ্ট দরিদ্রের মত জীবন যাপন করতেন। মহানবী (সাঃ)কে অনুসরণ করে আমাদের নাফ্‌সের সাথে লড়াই চালাতে হবে। নাফ্‌স যেমন আল্লাহ্‌ ও মানুষের শত্রু, দুনিয়াও তেমনি আল্লাহ্‌ ও মানুষের শত্রু। দুনিয়াকে আশ্রয় করে নাফ্‌সের সাহায্যে শয়তান মানুষের শত্রুতা করে। মানুষের শত্রু হয়ে অপরিশোধিত নাফ্‌স ও শয়তান আল্লাহ্‌র শত্রু হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলে গেছেন, "আদম সন্তানের তিনটি বিষয় ছাড়া কোন অধিকার নেই-বসবাসের জন্য একটি ঘর, লজ্জা নিবারণের জন্য একখন্ড কাপড় এবং এক টুকরা রুটী ও পানি।" এগুলো দেহের অস্তিত্বের জন্য সর্বনিম্ন প্রয়োজন। এর উপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জীববৃত্তি চালিয়ে গেছেন, এর অতিরিক্ত তিনি খয়রাত করে দিতেন। সূফীগণ এ ব্যাপারে তাঁকে অনুসরণ করে আউলিয়া হয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি বহু পরিজন নিয়ে সৎভাবে জীবন যাপন করে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাকে ভালবাসেন।"

হুজুর (সাঃ) বলেছেন, "হে বেলাল। তুমি চেষ্টা করো ইহলোক হতে যাতে দরিদ্র অবস্থায় যেতে পার, ধনী অবস্থায় যেতে চেষ্টা করো না।"

আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) আরো বলেছেন, "আমার উম্মতের মধ্যে দরিদ্র লোক ধনী লোকের পাঁচশ বছর আগে বেহেশতে প্রবেশ করবে।"

একদিন জিবরাঈল (আঃ) আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)কে বললেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং জিজ্ঞেস করেছেন, আপনি যদি ইচ্ছে করেন আল্লাহ্‌তায়ালা আপনার জন্য ভূ-পৃষ্টের সমস্ত পাহাড়-পর্বতকে স্বর্ণে পরিণত করে দেবেন। হুজুর (সাঃ) জওয়াব দিলেন, 'আমি তা পেতে চাই না। এ পৃথিবী গৃহহীন লোকদের জন্য গৃহ, ধনহীন লোকদের জন্য ধন। ইহলোকে ধন সঞ্চয় করা নির্বোধ লোকের কাজ।' হুজুর (সাঃ) এর কথা শুনে জিব্‌রাইল (আঃ) বললেন, 'আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাকে এ মনোভাবের উপর অটল রাখুন।"

www.pathagar.org

হুজুর আকরাম (সাঃ) বলেছেন,-"হে দরিদ্রগণ! সর্বান্তকরণে স্বীয় অভাব ও দারিদ্র্যতার প্রতি সন্তুষ্ট থাকো তোমরা দারিদ্র্যতার অশেষ সওয়াব লাভ করবে, অন্যথায় সওয়াব পাবে না।"

তিনি আরো বলেছেন, -"নিজের অধিকারে সামান্য যা কিছু আছে তাতে যে দরিদ্র সন্তুষ্ট থাকে এবং আল্লাহ্তায়ালা যখন যে পরিমাণ জীবিকা দান করেন তা পেয়েই পরিতৃপ্ত থাকে, আল্লাহ্ তাকে সর্বাধিক ভালবাসেন।"

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ধনের প্রতি নির্লোভ ও অনীহা ছিলেন। তিনি নিজে তুষ্ট দরিদ্র ছিলেন। তিনি প্রায় বার লক্ষ বর্গমাইল এলাকার সম্রাট হওয়া সত্ত্বেও ধনরত্ব দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে নিজে তুষ্ট দরিদ্রের মত জীবন যাপন করতেন। এক বেলার বেশী খাদ্য সাধারণত জমিয়ে রাখতেন না। যদিও পরিবার বিশিষ্ট লোকের জন্য এক বছরের খাদ্য জমিয়ে রাখা শরীয়ত অনুমোদিত।

ইসলামে সংসার পরিত্যাগ করা যুহুদ নয়। সংসারে জায়েয ভোগ্য বস্তু ব্যবহারের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার নিয়তে নাফ্সের বিপরীতে তা পরিত্যাগ করার নাম যুহ্দ। যে বস্তু ভোগ করার ক্ষমতাই যার নেই, সে তো বাধ্য হয়ে তা পরিত্যাগ করলো। এটা যুহ্দ বা তরকে দুনিয়া নয়। জায়েয বস্তু করায়ত্ব হওয়ার পরও যে নাফ্সের বিপরীতে আল্লাহ্র জন্য তা পরিত্যাগ করে সেই তরকে দুনিয়া বা যাহিদ। এতে আত্মা খুবই শক্তিশালী হয়। নাফ্স দমিত থাকে।

না জায়েয বা হারাম বস্তুসামগ্রী পরিত্যাগ ওয়াজিব। সে ওয়াজিব পালন করতেই হবে, এটা যুহ্দ বা সংসার বৈরাগ্য নয়। সূফীরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মত জায়েয পদার্থসমূহ স্বেচ্ছাকৃত ভাবে পরিত্যাগকে ওয়াজিব মনে করে। এসব দেখে অনেক জাহিরী আলেম হালালকে হারাম করলো বলে বেহুদা আর্তনাদ করেন, অনেকে তাকে কৃপণ বলেন, তারা না বুঝে ভুল করেন। যেমন সুস্বাদু খাদ্যের ভোজন বিলাস, উত্তম গৃহ ও গৃহ সামগ্রী, সুন্দর পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ধন-সম্পদ হস্তগত হওয়া মাত্র দান করে দিতেন, এমন কি দান না করতে পারলে রাতে অন্দর মহলে না যেয়ে সমজিদে রাত্রি যাপন করতেন। এমন নজীরও আমরা দাহীসে পাই।

যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীদের (রাঃ) মত অসীম মানসিক বল প্রয়োগে নাফ্সকে দমন পূর্বক সংসারের ভোগ বিলাস ত্যাগ করে ফকীরের মত জীবন যাপন করেছেন তাকেই তরকে দুনিয়া বলা হয়। ভোগ্য বস্তু হাতে

www.pathagar.org

আসলেও তা পরিত্যাগ করে নাফ্সের সেবা না করে তাকে সদা শাসনে রাখা উচিৎ। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর সত্যিকার অনুসারী ছিলেন তাঁর সাহাবীগণ বা তাঁর অনুগত সংগীবৃন্দ। তাই তাঁরা সমালোচনার ঊর্ধ্বে, তাঁরা যা করতেন তা আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুকরণে করতেন। তাঁদের অস্তিত্ব থাক বা না থাক, সে পরোয়া তারা করতেন না। তাঁরা শুধু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মত আমাদের সমালোচনার শুধু ঊর্ধে নন বরঞ্চ তারও ঊর্ধে। ফিরিশতাদের চেয়েও অগ্রগামী। কারণ ফিরিশ্তারা প্রাণ বিসর্জন দিয়ে আল্লাহ্র হুকুম পালন করেছেন এমন নজীর নেই। কিন্তু তাঁদের আমাদের মত রক্ত মাংসের শরীর ছিল, আল্লাহ্র হুকুম পালন করতে গিয়ে তাঁরা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন বা বিসর্জনের জন্য সদা প্রস্তুত থাকতেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মত। তাঁদের জীবনোপকরণ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পায়ে বিসর্জন দিয়েছেন। তাঁরা রসুলুল্লাহতে ফানা ছিলেন আর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ছিলেন আল্লাহ্তে ফানা।

সেই মহামানবগণের নাম শুনে যে উম্মতের দেহমন তাঁদের প্রতি ভক্তি ও প্রেম-রসে আপ্লুত না হয়, সে নিকৃষ্ট উম্মত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মত তাঁরাও অনুসরণীয়। তাঁদের মধ্যে স্তর ভেদ থাকতে পারে, বৈশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্রবোধ থাকতে পারে, তাই বলে সর্বনিম্ন স্তরের সাহাবীর সাথে অন্য কোন উম্মতের তুলনা হতে পারে না, এমন কি শ্রেষ্ঠ আউলিয়াগণেরও নয়। যারা এরূপ মনে করে, তাদের আল্লাহ্তায়ালা ক্রোধের নজরে দেখছেন। মনে রাখা প্রয়োজন, ইসলামের বর্হিপ্রকাশ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হতে সাহাবীদের মাধ্যমে ঘটেছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হতে যা প্রকাশ পেয়েছে সাহাবীগণ মারফত আমরা তা জেনেছি। কারণ তাঁরা ছিলেন প্রত্যক্ষ দর্শন ও শ্রবণকারী এবং আনুগত্যকারী।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (র) সারা দুনিয়ার একটি বৃহত্তম আবাদী অংশের শাসক হয়েও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীগণের মত সংসার বিরাগী বা যাহিদ ছিলেন। এরাই সত্য সাধক। যারা নিজ প্রবৃত্তিকে শাসনে রাখতে পারে না তারা আবার কি করে জনগণের শাসক হয়? উম্মতের মধ্যে যারা সত্য সাধক বিশেষ করে শ্রেষ্ঠ সাধক ও যাহিদগণ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর অনুসরণে নাফ্সকে শাসন করে আউলিয়া হয়েছেন।

কয়েকটি বস্তুতে যুহ্দ একান্ত জরুরী, যা না হলে কামিয়াব হওয়া যায় না যেমন খাদ্যে যুহ্দ, পোষাকে যুহ্দ, আপন জনের প্রতি যুহ্দ, সংসার সম্পর্কে যুহ্দ, মান-যশ ও খ্যাতি সম্পর্কে যুহ্দ।

www.pathagar.org

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর যুহ্দ সম্পর্কে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) বলে গেছেন,- "নবী করীম (সাঃ) যে ক'বছর দুনিয়াতে ছিলেন তিনি ও তাঁর পরিবারবর্গ রাতের বেলা ক্ষুধা নিবারণ করে আহার করলে পরদিন দুপুর পর্যন্ত অনাহারে থাকতেন। একদিন কিছু আহার্য সুন্দর খাঞ্চায় করে আনা হলে উহা তাঁর নিকট এত অপছন্দনীয় হলো যে, তাঁর মুখ মন্ডলের রং পরিবর্তিত হয়ে গেল। অবশেষে তাঁর নির্দেশে তা খাঞ্চা হতে নামিয়ে মাটিতে রাখা হয়েছিল। তিনি নগণ্য ও সামান্য বিছানায় শুইতেন। খেজুরের চাটাইয়ের উপর কম্বল দুভাজ করে তাঁর শয্যা পাতা হত। একদিন কম্বলখানী দুভাজের বেশী করায় পরদিন সকালে বললেন, আজ রাতে কম্বলের কোমলতা আমাকে রাতের নফল ইবাদত হতে বঞ্চিত করেছে। এরপর কম্বল দুভাজের বেশী করো না। তাঁর পরিধেয় বস্ত্র এক প্রস্থের বেশী ছিল না। যেদিন কাপড় ধুইতেন সেদিন বেলাল (রাঃ) এর আযান শুনে কাপড় না শুকানো পর্যন্ত হুজরা হতে বের হতেন না।"

হুজুরের জীবন ছিল যাহিদ বা সংসার বিরাগীর জীবন। হালাল হলেও তাঁর পরিবারবর্গের মধ্যে সুস্বাদু খাদ্য গ্রহণের পরিবেশ সৃষ্টি হতে দেননি।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলে গেছেন, মদীনার জীবনে হুজুর (সাঃ) কোন দিন দুবেলা রুটী আহার করেননি।

এ সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস আছে, কলেবর বাড়বে বলে উল্লেখ করলাম না। হুজুর (সাঃ) ও সাহাবীগণের জীবনী জেনে নিলেই হবে।

হুজুর (সাঃ)-এর পরিধেয় বস্ত্র দু'খানা তহ্বন্দ ও কম্বলের মূল্য দশ দিরহামের বেশী ছিল না।

একবার এক ব্যক্তি রাসূল করীম (সাঃ)কে একখানি বুটিদার বস্ত্র হাদিয়া স্বরূপ দান করেছিল। তিনি তা গ্রহণ করে পরিধান করেছিলেন, কিন্তু বস্ত্রের নক্সার প্রতি নজর পড়ায় তা খুলে জনৈক সাহাবীকে বললেন, "এটা আবু জাহহাসকে দিয়ে তার কম্বলখানি আমার জন্য নিয়ে এসো। এ বস্ত্রের নক্শা আমার চোখকে এর প্রতি আকৃষ্ট করে ফেলেছে।"

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে লোকের জাঁকজমক ও আড়ম্বরপূর্ণ পোষাক পরিধান করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্তায়ালার উদ্দেশ্যে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বনে সেরূপ পোষাক না পরে দীন-হীন পোষাক পরে, তার বদলে পরকালে বেহেশতের বিচিত্র কারুকার্যময় পোষাক ইয়াকুত পাথরের তৈরী নৌকার মধ্যে

www.pathagar.org

বোঝাই করে তাকে দান করা আল্লাহ্তালার উপর প্রাপ্ত দাবীরূপে অবধারিত হয়ে পড়ে।"

মানুষের জীবন ধারণের জন্য খাদ্য-বস্ত্রের পরই আসে বাসগৃহ। এরপর গৃহের আসবার পত্র, ঐশ্বর্য, সম্মান ও স্ত্রীর আবশ্যক হয়। শ্রেষ্ঠ সংসার বিরাগী বা যাহিদ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ বিষয়ে কিভাবে জীবন যাপন করে গেছেন, তা বিবেচনা করা যাক।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদে নব্বী নির্মাণ করার সময় মসজিদের পাশে ছোট ছোট ঘর বানিয়ে মক্কা হতে পরিবার পরিজনকে আনিয়ে এসব ঘরে বসবাস শুরু করেন। এ ঘরগুলোর কোন বারান্দা বা আঙিনা ছিল না। ঘরগুলো ছয় হতে সাত হাত লম্বা-চওড়া ছিল। দেওয়াল ছিল খেজুর পাতার মধ্যে কাদা-মাটির প্রলেপের। ছাদও ছিল খেজুর পাতা ও শাখার উপর মাটির প্রলেপের। ছাদ ও দেওয়াল বৃষ্টি ভালভাবে আটকাতে পারত না বলে বৃষ্টির সময় কম্বল টানিয়ে আত্মরক্ষা করা হত। ছাদের উচ্চতা দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে নাগাল পাওয়া যেত। সব ঘরে একটি করে দরজা ছিল। কোন কোন ঘরে একাধিক পাল্লার দরজা থাকত, কোন কোনটিতে এক পাল্লার দরজা ছিল। কোনটাতে পরদা ঝুলানো থাকত। জীবনের শেষ দিনগুলোতে যখন তিনি প্রায় বার লক্ষ বর্গমাইল এলাকার শাসক ছিলেন এবং ধন-সম্পদের স্রোত তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়তো, তখনও তিনি বিবিগণকে নিয়ে এরূপ নয়টি ঘরে বসবাস করতেন। হুজুর (সাঃ) পর্যায়ক্রমে এ ঘরগুলোতে রাত্রি যাপন করতেন। এছাড়া নিরিবিলির জন্য একটি আলাদা ঘর ছিল। এটাকে হুজরাখানা বলা হত।

ওফাতের সময় সারা আরব জাহানের একচ্ছত্র অধিপতির গৃহে কয়েক মুঠো যব ব্যতীত খাওয়ার মত কিছুই ছিল না। তিনি সব সময় সাহাবীদের বলতেন, দুনিয়াতে মানুষের জন্য ততটুকু দরকার যতটুকু একজন মুসাফিরের জন্য দরকার।

দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী, এর উপায়-উপকরণও ক্ষণস্থায়ী। এই ক্ষণস্থায়ী জিনিসের লোভ আল্লাহ্র জন্য পরিহার করার নাম যুহদ বা সংসার বৈরাগ্য। সেই লোকই প্রকৃত সংসার বিরাগী পরহেয়গার যিনি সংসারের সব রকম মান-সম্মান, ভোগ-বিলাস ও আনন্দ পরিহার করে চিরস্থায়ী আখিরাতের উপায়-উপকরণ সংগ্রহে মনযোগী হন। ধন-সম্পদ হস্তগত হলে আনন্দিত না হয়ে নিজের ও পরিবার পরিজনের জন্য নেহায়েত প্রয়োজন অনুযায়ী রেখে বাকীটুকু অভাবগ্রস্থদের মধ্যে দান করে দিলে অন্তত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে মান্য করা হল।

www.pathagar.org

আল্লাহ্‌র পথের যাত্রীকে দুনিয়ার কোন পদার্থ আকর্ষণ করবে না, দুনিয়ার সব কিছুতে অনাসক্ত ও নির্লিপ্ত থেকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও দ্বীনের আকাঙ্ক্ষা পূরণের অন্বেষণে থাকতে হবে, দুনিয়ার ধন-মান ও ক্ষমতার অন্বেষণে থাকলে আল্লাহ্‌ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এজন্য শত্রুজ্ঞানে সংসার পরিত্যাগ ও বর্জন করার দরকার নেই। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শ্রেষ্ঠ সংসার বিরাগী হয়েও সংসার ত্যাগ করেননি। তিনি আল্লাহ্‌ ভিন্ন সব পদার্থ হতে মনকে নির্লিপ্ত ও উদাসীন রেখেছিলেন। ধন-সম্পদ এলো কি চলে গেল, রাজস্ব থাকবে কি চলে যাবে-এ চিন্তা করে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ থেকে তিনি বিরত হননি। তিনি সংসারকে লোভনীয় জ্ঞানে ভালবাসেননি বা শত্রুজ্ঞানে পরিত্যাগ করেননি। সংসারে থেকেই ধন-সম্পদের মায়া ত্যাগ করে নাফ্‌সের সেবা করেননি, আল্লাহ্‌র দাসত্ব করে গেছেন। আমাদের তাঁকে অনুসরণ করে আল্লাহ্‌তায়ালাকে সন্তুষ্ট করতে হবে।

বিবাহে সংসার বৈরাগ্য নেই। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অন্যান্য নবীদের মত সংসার করেছেন, পরিবার-পরিজনসহ সংসার বিরাগী হয়ে জীবন যাপন করেছেন সৃষ্টির খিদমতের নিয়তে।

আউলিয়া-ই-কিরাম রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে অনুসরণ করে আউলিয়া হয়েছেন, তরীকার ইমাম হয়েছেন। তাদের মধ্যে স্তর ভেদ আছে। তরকে দুনিয়া হতে গিয়ে কেউ কেউ বিয়ে শাহদি করেন নি। ইবরাহীম আদহাম বলখী (র) রাজত্ব ও স্ত্রী- পুত্র ত্যাগ করে সংসার ত্যাগী হয়েছিলেন। এগুলো ব্যতিক্রম। এতে যেন কেউ এ কথা না ভাবেন, যে শরীয়ত ও তাসাওউফ বা তরীকত আলাদা।

মুষ্টিমেয় আউলিয়া-ই-কিরাম যাঁরা সংসার বর্জন করেছেন, তাঁরা ছিলেন উম্মত। মনে রাখতে হবে যে উম্মত কখনও নবীকে ডিঙ্গিয়ে আদর্শস্থানীয় হতে পারেন না, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মত অনুসরণযোগ্য নন।

হযরত ইবরাহীম আদহাম বলখী (র) ব্যক্তিগত অসুবিধায় হয়ত নিজকে ও নাফ্‌সকে মানসিক দিক থেকে এতটা শক্তিশালী বলে মনে করেননি, যে, রাজত্ব ও পরিবার-পরিজন নিয়ে তরকে দুনিয়া হতে পারবেন আশংকা করেছেন যে হয়ত আবার তিনি সংসারে জড়িয়ে পড়বেন, অথবা রাজত্ব ও পরিবার-পরিজন নিয়ে তরকে দুনিয়া হয়ে খিলাফতের শাসন চালাবার মত পরিবেশ তখন ছিল না। অপারগ অবস্থায় তিনি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সব কিছু ছেড়ে দেশ ত্যাগ করেন। জঙ্গল থেকে লাকড়ী সংগ্রহ করে তা বিক্রি করে জীবিকা চালাতেন। তাঁর ত্যাগ-তিতীক্ষা, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর অনুসরণ ও আল্লাহ্‌ প্রেম তাঁকে মর্যাদার আসনে

www.pathagar.org

বসিয়েছে। বাদশাহীর বিনিময়ে স্বেচ্ছায় ফকিরী গ্রহণ করে আল্লাহ্তায়ালাকে পেতে চেয়েছেন। আল্লাহ্ প্রেম তাঁকে মর্যাদার আসনে বসিয়েছে। আরো বেশী মর্যাদা পেতেন-যদি রাজত্ব ও পরিবার পরিজন ত্যাগ না করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে অনুসরণ করে খেলাফতের শাসন চালাতেন। যদিও তিনি সব কিছু ত্যাগ করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে অনুসরণ করেছেন এই একটা মাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া।

হযরত ওমর ইবন আবদুল আযীয (র) তরকে দুনিয়ার ব্যাপারে হুবহু রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে অনুসরণ করে ইসলামের পঞ্চম খলীফার মর্যাদা লাভ করেছেন। আধ্যাত্মিক মর্যাদা দাতা আল্লাহ্তায়ালা হলেও বন্টনকারী রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দাতা নিজেই রাসূল প্রেমিক বলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সুন্নতের উপর নিষ্ঠাবানদের দান করেন। নিজের স্বার্থে না হলে ইজতিহাদে ভুল হলেও ক্ষমা পাওয়া যায়, কিন্তু সুন্নতের উপর আমল না হলে মর্যাদায় হেরফের হয়। সুন্নতের বাইরে নিজের উপর অতিরিক্ত ত্যাগ ও কঠোরতা আরোপ করলে আল্লাহ্তায়ালার কিছু যায় আসে না। নাফ্সের উপর শাসন ও কঠোরতা আরোপের উদ্দেশ্যে ও শরীয়তে আযীমত পালনের জন্যই যাতে চরিত্র রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মত হয়ে যায়, যা আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রেত।

আউলিয়াগণের অনেকে তরকে দুনিয়া হওয়ার জন্য বিয়ে করেননি। তাঁরাও এ সুন্নতটি বাদ দেওয়ায় তাঁদের আধ্যাত্মিক মর্যাদা মেহনত ও ত্যাগ অনুযায়ী যতটুকু পাওয়ার কথা তার চেয়ে কম পান। হযরত সাম্মা (র) আব্বাসীয় সুলতান হারুন-উর-রশীদের সময়ে সর্বজনমান্য ওলীআল্লাহ্ ছিলেন। তিনি বিয়ে করেননি। তিনি বলতেনঃ দুই শয়তানের মোকাবিলার শক্তি আমার নেই। এক শয়তান আমার সাথে আছে, আরেক শয়তান স্ত্রীর সাথে থাকবে। তাঁর ওফাতের পর কেহ স্বপ্নে তাঁকে দেখে জিজ্ঞেস করলঃ আল্লাহ্তায়ালা আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি জওয়াব দিলেন যে, আমার প্রতি অশেষ কৃপা করেছেন, ইজ্জত ও খেলাত (রাজকীয় ভূষণ) দান করেছেন। তবে যারা দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে পরিবার-পরিজনের ঝঞ্ঝাটের বোঝা বহন করে ঈমান নিয়ে আসেন, তাদের মত ইজ্জত আর কারো নেই। আলমে বরযখে যাদের যোগাযোগ স্থাপতি হয়েছে, তাঁরা দেখতে পান, যে সব আউলিয়া বিয়ে করেননি, তাঁরা এ সুন্নত পালন না করায় তাঁদের আধ্যাত্মিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে আফসোস করেন। জীবনে অন্তত একবার বিয়ে করে হলেও এ সুন্নাতের প্রতি মর্যাদা দিতে হবে।

www.pathagar.org

হযরত জুনায়েদ বোগদাদী (রাঃ) আধ্যাত্মিক সাধনার প্রাথমিক অবস্থায় বিয়ে না করা ভাল বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ তাতে একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতা বিনষ্ট হতে পারে। এটা অভিজ্ঞতা প্রসূত মহাজ্ঞানীর বাণী। অবিবাহিত যুবকগণ তা পালন করতে পারলে সুফল পাবেন। নিজকে সাধনার দ্বারা মানসিক ভাবে শক্তিশালী করে বিয়ে করা উচিত।

তবে যারা বিয়ে-শাদী করে তওবাহ্ করে তাসাওউফের লাইনে এসেছেন তাদের চিন্তার কারণ নেই, সেজন্য স্ত্রী পরিত্যাগের প্রয়োজন নেই। যেমন বিখ্যাত আউলিয়া হাবীব আযমী (র) সহ বহু ওলীআল্লাহ্ বিয়ের পর তওবাহ্ করে তাসাওউফ অনুসরণ করে আউলিয়া হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিয়ের পর নবুয়ত পেয়েছেন। তাঁর অসংখ্য সাহাবী বিয়ের পর মুসলামন হয়ে নাফ্সের সাথে সংগ্রাম করে হুজুর (সাঃ)কে অনুসরণ করে আল্লাহ্ পাকের প্রিয়ভাজন হয়েছেন। সাহাবীগণের পর আউলিয়াদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন তাবিইন ও তরীকার ইমামগণ। তরীকার ইমামগণ সবাই বিবাহিত ছিলেন এবং তরকে দুনিয়া ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মত। তবে পাত্রীটি মানবীয় সার্বভৌমত্বের অনুসারী না রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সুন্নতের অনুসারী সে খোঁজর-খবর নিয়ে বিয়ে করতে হবে।

যারা পার্থিব লোভ-লালসা, ভোগ-বিলাস ও লোভনীয় পদার্থের আকর্ষণ ও চিন্তা হতে চিত্তকে নির্লিপ্ত ও নির্বিকার করে মনকে এমন করেছেন যে, ধনমানের দিকে কোন লোভ নেই, স্বর্ণ ও মাটি তাদের কাছে সমান, তারাই তাসাওউফ ও তরীকতে সাফল্য লাভ করেছেন, হুজুর (সাঃ)-এর মত মহান চরিত্রের অধিকারী হয়েছেন। হযরত বা মহাত্মা বিশেষণের যোগ্য হয়েছেন। তাঁরা অল্পে তুষ্ট থাকনে, নিজের কাছে যা কিছু আছে তাতেই তুষ্ট থেকে আল্লাহ্র কাছে শোকর গোজারী করেন। তাঁদের আকষর্ণ আল্লাহ্তায়ালা ও আখিরাতের দিকে, দুনিয়ার ব্যাপারে তাঁরা তরকে দুনিয়া বা সংসার বিরাগী।

আল্লাহ্তায়ালা বলেন, 'হে মানুষ! আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদের কিছুতেই প্রতারিত করতে না পারে এবং সেই প্রবঞ্চক (শয়তান) যেন কিছুতেই প্রবঞ্চিত না করে" (৩৫ঃ৫)।

এর বিপরীতে যারা ক্ষণস্থায়ী ধ্বংসশীল দুনিয়ার সাথে মনের ও চিত্তের সম্পর্ককে দৃঢ় করে ফেলেছে, দুনিয়া অন্বেষণ যাদের লক্ষ্য, দুনিয়ার লোভলালসা ও লোভনীয় দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহে যে ব্যস্ত, সেই দুনিয়াদার। সে আল্লাহ্ হতে দূরবর্তী ও প্রবৃত্তির উপাসক, সকল পাপের মূল দুনিয়াই তার প্রিয়। পাপ সম্বন্ধে

www.pathagar.org

দুনিয়া তাকে বেপরোয়া করে ফেলেছে, আল্লাহ্ ও আখিরাত সম্পর্কে সে উদাসীন হয়েছে। শয়তান তাকে বিপথে চালাচ্ছে। নামাযে দাঁড়ালেও তাঁর মনকে শয়তান আল্লাহ্ হতে বিচ্ছিন্ন করে দুনিয়াতে নিয়ে যায়। কবরখানায় না যাওয়া পর্যন্ত সে দুনিয়ার ধন-সম্পদের পিছনে দৌড়াবে। দুনিয়াতে প্রবেশ করা সহজ, কিন্তু নাফ্সের সাথে সংগ্রাম করে তরকে দুনিয়া না হয়ে এর থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়, এই বেড়াজাল হতে মুক্তি না পেলে মৃত্যু কালে ঈমান হরণ করে শয়তান তাকে জাহান্নামে নিয়ে ছাড়বে। কারণ সে তো আল্লাহ্ হতে দূরে চলে গেছে।

অনেক দুনিয়াদার মনে করে, মৃত্যু সময় কলেমা পড়ে বেড়া পার হয়ে যাবো। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলে গেছেন- "যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই বাক্যটি একাগ্র মনে একান্তভাবে বিশ্বাস করে এবং এর সাথে অন্য কিছু মিশ্রিত না করে তার জন্য বেহেশ্ত সুনিশ্চিত। এক শুক্রবার জুমা আর খুৎবান্তে এ কথা তিনি বললেন। এটা শোনা মাত্র হযরত আলী (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে যে বস্তু মিশানো উচিত নয় তার পরিচয় বলে দিন। উত্তরে হুজুর (সাঃ) বললেন-তা হলো সংসারাসক্তি ও সংসারের অন্বেষণ।" অন্যত্র হাদীসে উল্লেখ আছে, 'অন্তিম সময়ে যার শেষ বাক্য হবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' সে বেহেশতী হবে"। প্রশ্ন হলো সারা জীবন যে দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, সংসারাসক্তি যার প্রবল থাকবে, অন্তমিকালে তার কলেমা সংসারাসক্তিশূন্য হবে কিভাবে? দুনিয়াতে সে তো সংসারকেই ইলাহ করে নিয়েছিল। অন্তিম কালে সে সুযোগ আল্লাহ্তায়ালা দেবেন কিনা?

হুজুর (সাঃ) আরো বলে গেছেন- "ইহকালে যারা সংসার বিরাগী, তাদের অন্তরের সামনে আল্লাহ্তায়ালা হিকমতের দ্বার মুক্ত করে দেন। তাদের বাগেন্দ্রিয়কে জ্ঞান-গর্ভময় বাক্যের সহিত প্রচলিত করে দেন। সংসারের যাবতীয় রোগ-ব্যাধির কারণ ও উহার চিকিৎসা প্রণালী তাদের শিখিয়ে দেন, পরে তাদের নিরাপদে শান্তির সাথে দুনিয়া হতে বেহেশতের দিকে নিয়ে যান।

নাফ্সকে শাসন করে সংযত রাখাই সংসার বৈরাগ্যের প্রথম সোপান, সবর ও পরহেযগারী এর দরজা। নাফ্সের আকাঙ্খা ত্যাগ করে অল্পে তুষ্ট থাকলে আল্লাহ্ পাক সন্তুষ্ট হণ, আর সংসার বৈরাগ্য এখতিয়ার করলে আল্লাহ্তায়ালার উপর নির্ভরশীলতার গুণ জন্মে।

সুন্নতের পায়রবী ছাড়া কোন ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের রোজগার করা হালাল নয়। সুন্নত তরীকা মুতাবিক ব্যবসাই হালাল।

www.pathagar.org

যে ব্যক্তি বিদআতী ও মানবীয় সার্বভৌমত্বের অনুসারীদের সাথে উঠাবসা করে, সে সুন্নত তরীকা হতে বঞ্চিত হয়। যে এদের কার্যকলাপে আনন্দিত হয়, আল্লাহ্তায়ালা তার অন্তর হতে ঈমানের নূর ছিনিয়ে নেন। তার পক্ষে তরকে দুনিয়া হওয়া সম্ভবপর হবে না। পরহেয়গার না হলে তরকে দুনিয়া হওয়া যায় না, আবার আল্লাহ্ভীতি ছাড়া পরহেযগার হওয়া যায় না-আর কোরআনে আল্লাহ্তায়ালার ওয়াদাসমূহের চিন্তা-ভাবনা না করলে আল্লাহ্ভীতি জন্মে না।

দুনিয়া নাফ্সের মত। যে তার নাফ্সের তাবেদারী করে, সে দুনিয়ার সাথে প্রেম করে। ফলে আল্লাহ্তায়ালা দুনিয়াতে তাকে হয়রান, পেরেশান ও অশান্তি দেন, বেইজ্জতি করেন এবং পরকালে শাস্তি দেন।

আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন-"অনন্তর সে সীমা লংঘন করে এবং পার্থিব জীবন বেছে নেয়, জাহান্নাম হবে তার আবাস। পক্ষান্তরে যে প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং প্রবৃত্তি হতে নিজেকে বিরত রাখে, জান্নাত হবে তার আবাস"। (৭৯ঃ ৩৭ঃ৪০)।

যদি দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে ধর্ম সঞ্চয় সম্ভব হত, তবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ধন সঞ্চয় করতেন, দুনিয়াকে এত ভয় পেতেন না, অন্যকে ধন-দওলত হতে দূরে থাকতে বলতেন না। আল্লাহ্তায়ালাকে পেতে হলে তাঁকে অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য পদার্থের সাথে মনকে যতই নিবদ্ধ করা যায়, আল্লাহ্তায়ালা হতে মনের আকর্ষণ ততই ছুটে যায়।

ধনী ও দরিদ্রের মানসিক অবস্থা দু'রকম। ঈমানদার ধনীর ধন হালাল উপায়ে এলেও তা দরিদ্রদের মাঝে বিলিয়ে দেওয়া উচিত, আর ঈমানদার গরীবের তার দারিদ্র্যতাকে আল্লাহ্তায়ালার স্নেহের অবদান হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। উভয়ের শোকর করা উচিত। ধনী ও দরিদ্র উভয়ের জন্য হারাম উপায়ে উপার্জন হতে বিরত থাকাও তরকে দুনিয়া।

হাদিয়া গ্রহণের যুহদ্ নষ্ট হয়না। হাদিয়া গ্রহণ করে নিজের ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করে নিম্নমানের প্রয়োজন মিটিয়ে সব দান করে দিলে যুহ্দ অটুট থাকে। ইহাই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নীতি ছিল।

আল্লাহ্তায়ালা দুনিয়া সম্পর্কে বলেছেন-"তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, জাকজমক, পারস্পরিক শ্লাঘা, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ভিন্ন কিছুই নয়। উহার উপমা-বৃষ্টি, যার দ্বারা উৎপন্ন শস্য সম্ভার কৃষকদের চমৎকৃত করে, তারপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা পীত বর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা খড়-কুটায় পরিণত হয়। পরকালে রয়েছে

www.pathagar.org

কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।" ৯৫৭ঃ২০।

দুনিয়া এত নিকৃষ্ট যে তার বাসনায় মশগুল হলেই ধ্বংস অনিবার্য। সংসার বিরাগী মৃত্যুর পূর্বে পরকালের সম্বল সংগ্রহ করে, বিচারের আগেই আল্লাহ্‌পাককে সন্তুষ্ট করে।

যাহেদ সবর দ্বারা অন্তর রোগের চিকিৎসা করতে পারে। যে নাফ্‌সের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে হক তাআলাকে গ্রহণ করে, তার প্রতি আল্লাহ্‌তায়ালার বন্ধুত্ব জাহির হয়। যখন আল্লাহ্‌ ভিন্ন সব পদার্থ হতে বিমুখ হয়ে যায়, তখন সে প্রকৃত আল্লাহ্‌ প্রেমিক হয়। যে দুনিয়া প্রেমিক হয়, সে আল্লাহ্‌ প্রেমিক হতে পারে না।

যে ব্যক্তি লোকের কাছে পরিচিত ও সম্মানের জন্য সূফী সাজে, নেক কাজ করলেও সে অংশীবাদী বা মুশরিক; তার ইবাদত কবুল হয় না। আল্লাহ্‌তায়ালাকে পাওয়ার জন্য সে লোকে ভাল কি মন্দ বলবে, তার পরোয়া করে না। কামভাব ও অহংকার ত্যাগ না করলে, আমানত খেয়ানত, গীবত করলে, মিথ্যা বললে, নাফ্‌সের উপর বিজয়ী না হলে তরকে দুনিয়া হলেও উদ্দেশ্য সফল হবে না। এজন্য দুনিয়াদার লোকের সংশ্রব ত্যাগ করে পরহেযগার হলে ইন্‌শাআল্লাহ্‌ কামিয়াবী হাসিল হবে।

আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন, "প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের মোহাচ্ছন্ন করে রাখে, যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও (১০২ঃ১,২)।"

দুনিয়া মানুষকে নিত্য নতুন পাপে জড়িত করে। দুনিয়া হাসিলের জন্য ক্রোধ জন্মে, অহংকার আসে, দুনিয়ার মুসিবতে বেসবর হয়, শোকে দুঃখে জর্জরিত হয়, অন্তর নিস্তেজ হয়ে মরে যায়। দুনিয়া নাফ্‌সের মত ধোঁকা, শক্তি ও মোহের জালে আবদ্ধ করে ফেলে। দুনিয়া হতে বাঁচার পথ হল যুহদ এখতিয়ার করা। যুহ্‌দ এখতিয়ার করতে হলে সবর অবলম্বন একান্ত দরকার। তা হলে দুনিয়া ও নাফ্‌সের ধ্বংসকর উপাদান হতে রক্ষা পাওয়া যায়। এ বিষয়ে সবর অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

দুনিয়ার মানুষের ঝামেলা হতে মুক্তি হলে তাদের থেকে দূরে থাকতে হবে। দুনিয়ার আমোদ-আহলাদ আল্লাহ্‌ পাকের সন্তুষ্টি লাভের চিন্তা ভাবনাকে মন থেকে সরিয়ে দেয়। শুধু হিদায়েতের জন্য সংযত হয়ে মানুষের সাথে মেলা-মেশা করা যায়।

ধন-মান, ইজ্জত ও লোকের নিকট গ্রহণীয় হওয়ার জন্য নাফ্‌সের আকাঙ্ক্ষা সমূলে উৎপাটন না করতে পারলে হকতাআলার আনুগত্য ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)

www.pathagar.org

এর পায়রবী সঠিক হয় না। কোন নাজায়েয কাজে আল্লাহ্তায়ালার উপর নির্ভর করা উচিত নয়। সেটা হবে আল্লাহ্তায়ালার দ্বারা আল্লাহ্তায়ালার দুশমনকে আহ্বান জানানো। যে লোক আল্লাহ্পাক ছাড়া অন্যের দ্বারা ইজ্জত হাসিল করতে চায়, সেও দুনিয়াদার, সে ইজ্জতের বদলে বেইজ্জত হবে।

যিনি দুনিয়াদারীর আপদ-বিপদ হতে মুক্ত থাকতে পারেন এবং আল্লাহ্ ছাড়া কারো মুখাপেক্ষী থাকেন না তিনিই প্রকৃত সূফী। অবশ্য পরীক্ষার জন্য ঈমানের আপদ বিপদ আসবে, যেমন রাসূল করীম (সাঃ) এর এসেছিল। দৃঢ় থাকলে আল্লাহ্ই উদ্ধার করবেন। নাফ্সকে সঠিক করার জন্য আল্লাহ্তায়ালা এ রহমত দেন। সূফী যখন দুনিয়াদারীতে লিপ্ত হন, তখন তাসাওউফ হতে পৃথক হয়ে যান। সৃষ্টির প্রতি আসক্তি এলে আল্লাহ্তায়ালার বন্ধু হওয়া যায় না। ইবরাহীম (আঃ) কে কুরবানীর নির্দেশ দিয়ে অর্থাৎ দুনিয়ার আসক্তিযুক্ত বস্তু কুরবানী দিয়ে হৃদয়কে আসক্তিশূন্য করে তিনি তাঁকে বন্ধু করে নিয়েছিলেন।

যে পর্যন্ত মন দুনিয়াদারীতে লিপ্ত থাকবে, সে পর্যন্ত সৎ চিন্তা জন্ম নেবে না, সৎ চিন্তা ও সৎকাজ না করলে সৎস্বভাব লাভ করা যায় না। জ্ঞানের মিষ্টতার জন্য শুধু জানা -শোনার জন্য নয়, পায়বরী করার নিয়তে হক্কানী আলেম ও সূফীগণের সংগ লাভ করা ও ওয়াজ শোনা দরকার, তাতে তাছীর হবে। কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য লিপ্সা মন হতে দূর করতে না পারলে, এক আলেমের ওয়াজ অন্য আলেম পছন্দ না করলে, এক সূফীর কথা অন্য সূফী না শোনলে তাছীর ও ফায়েজ হতে বঞ্চিত হতে হবে। প্রাধান্য স্পৃহা না থাকলে আদনা লোকের কথাতেও তাছীর হবে, ফায়দা পাওয়া যাবে। প্রকৃত সূফী বালক ও শিশুর কথা থেকে পর্যন্ত ফায়দা নিতে চেষ্টা করেন। সাধারণ লোকদের সাথে একান্তই যদি মিশতে হয় তবে ধৈর্য্য ও সৎ ব্যবহার দ্বারা মিশতে হবে, তাদের অপরিশোধিত নাফ্স বলে তারা অজ্ঞতার কারণে বেসবর, অহংকার ও প্রধান্য বজায় রাখার জন্য বড় বড় কথা বলে, তা সহ্য করে ধৈর্য্য ও সৎ ব্যবহার করতে হবে, মনে মনে তার মঙ্গল ও হেদায়েত কামনা করতে হবে। অবশ্য আল্লাহ্র প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি হলে তখন এসব অপরিশোধিত নাফ্সের লোকজনের সাথে মিশতে মন চাইবে না।

পার্থিব কামনা-বাসনা না থাকলেই বান্দা হওয়া যায়, স্রষ্টার তাবেদার হওয়া যায়। সাধারণ লোকদের সংগ্রাম করতে হয় নাফ্সের ওয়াসওয়াসার সাথে, পরহেযগার হতে চাইলে সংগ্রাম করতে হয় কুধারণা ও কুচিন্তার সাথে, তরকে দুনিয়া লোক হলে সংগ্রাম করতে হবে কামনা-বাসনা ও লোভ-লালসার সাথে।

www.pathagar.org

পরহেযগার হয়ে তরকে দুনিয়া হলে সূফী হলো, তখন সংগ্রাম করতে হবে আমিত্ব ও নাফ্সের আকাঙ্ক্ষার সাথে।

"পার্থিব জীবন তো কেবল ক্রীড়া-কৌতুক, যদি তোমরা ঈমান আর তাকওয়া অবলম্বন কর, আল্লাহ্ তোমাদের পুরস্কার দিবেন এবং তিনি তোমাদের ধনসম্পদ চান না।" (৯৪৭ঃ৩৬)।

মনে রাখা ভাল যে, আখিরাতের পুঁজি না কমিয়ে দুনিয়াতে ধনসম্পদ দেয়া হয় না। দুনিয়াতে সুস্বাদু খাদ্য, সুদৃশ্য পোষাক, সুউচ্চ দালান ও প্রভূত্বের প্রতি আসক্তি জন্মালে আখিরাতের সুস্বাদু খাদ্য, সুন্দর পোষাক আর কারুকার্যময় দালান-কোঠা হতে বঞ্চিত হতে হবে। যে আল্লাহ্ এ অস্থায়ী জড় জগত সৃষ্টি করেছেন তিনি তাঁর ওয়াদা মত আখিরাতের বেহেশত-দোযখ সৃষ্টি করতে পারেন করেছেনও।

হারাম বা নিষিদ্ধ কাজ ও খাদ্য হতে বেঁচে থাকতে পারলে অন্তর উজ্জ্বল হয়। ভোজন্যসক্তি হতে সতর্ক থাকলে ধৈর্যশীল হওয়া যায়। সবর ঈমানের অর্ধেক। ধৈর্যশীল হলে ইবাদতের স্বাদ পাওয়া যায়। যার পরিণাম হয় পবিত্রতা অর্জন। নিজের মান-সম্মান উপেক্ষা করতে পারলে তরকে দুনিয়া বা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি আনা যায়। নিজের মানসিক ঐশ্বর্য্য নিয়ে লোকজন হতে পৃথক থাকা যায়। উচ্চ পদ বা সম্মানের জন্য লালায়িত থাকলে তরকে দুনিয়া হওয়া সম্ভবপর হয় না।

যে লোক তাবিজ-কবচ ও আল্লাহ্তায়ালার কালাম দ্বারা দুনিয়া তালাস করে, তার কোন ইজ্জত থাকে না, তবে হেদায়েতের জন্য হলে আলাদা। যে আল্লাহ্তায়ালাকে পাওয়ার জন্য লালায়িত ও পিপাসু হয়, ধন-দওলত লাভ করে সে সন্তুষ্ট হতে পারে না, যদি সন্তুষ্ট হয় তবে তরকে দুনিয়া হল কি করে? দুনিয়া অপবিত্র, অপবিত্র বস্তুর প্রেমে মশ্গুল হলে কোরআন-সুন্নাহর স্বাদ ও নূরে ইলাহীর মিষ্টতা গ্রহণ করতে পারে না, তার অন্তর মরে যায়। মৃত অন্তর দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ), তাঁর সাথী আম্বিয়া কেরাম ও আউলিয়াগণ যে বরযখে জীবিত ও কর্মতৎপর, তা দেখতে পায় না, কাফির ও মুশরিকদের মত মৃত বলেই ধারণা করে। যারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রকৃত অনুসারী, তারা যে বরযখে অমর ও জীবিত এ বিশ্বাস আসে না। কারণ তারা অন্ধ ও বধির। এটা হলো নাফ্স ও দুনিয়ার পর্দা, দুনিয়া মন থেকে বর্জন না করলে এ পর্দা উঠানো হয় না। এ পর্যদা না উঠালে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) এবং আখিরাতকে সত্যিকার রূপে জানা ও বোঝা যায় না। দলীল-প্রমাণ দ্বারা জানলেও বুঝে আসতে চায় না।

www.pathagar.org

ইলমুল ইয়াকীন হলেও আয়নুল ইয়াকীন হয়না, হাক্কুল ইয়াকীন তো দূরের কথা।

আল্লাহ্তায়ালাকে জানতে বুঝতে পারলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে বোঝা যায়, আবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে জানতে বুঝতে পারলে আল্লাহ্তায়ালাকে বোঝা যায়।

খাঁটি সূফী তরকে দুনিয়া সেই ব্যক্তি যিনি ধন-দওলত পেলেও মখলুকের খিদমত করে নিজে গরীব থাকেন, মান-ইজ্জত পেলেও নিজকে হেয় মনে করেন। খ্যাতির লালসা করেন না, প্রচার বিমূখ থাকেন। এর বিপরীত হলে তিনি তরকে দুনিয়া নন, দুনিয়াদার। দুনিয়ার বদলে বদনসিবগণ আখিরাত বিক্রি করে। বহু জ্ঞানী-গুণী মনিষী বলে গেছেন- আল্লাহ্তায়ালা ছাড়া সকল পদার্থ হতে বিমুখ হওয়ার নাম তরকে দুনিয়া। সবর, পরহেযগারী ও আল্লাহ্র উপর ভরসা ছাড়া তরকে দুনিয়া হওয়া যায় না।

দুনিয়াদার লোকেরা ধন ও পার্থিব ক্ষমতা লাভ করে তৃপ্তি পায় না। দুনিয়া লাভের জন্য অপমানিত হলেও তা অর্জনে ক্ষান্ত হয় না। সব সময় তার মনে অতৃপ্তি ও অপূর্ণ আশা থাকার কারণে মনোকষ্টে অমৃত্যু ভোগে, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এ অতৃপ্ত বাসনা থাকে, গোছগাছ হল না বলে আক্ষেপে থাকে। মৃত্যু লক্ষণ দেখা দিলে মনে করে এবার দুনিয়া হতে বিদায় নিতেই হবে, সে মরবে। তখন পরকালের পাথেয় সঞ্চয় হলো না বলে আফসোস করে। এরূপ লোকেরা নিজেদের চালাক ও যারা আল্লাহ্র পথের যাত্রী ঈমানদার গরীব, তাদের বেয়াকুফ বলে মনে করে। আসলে কিন্তু তারাই বেয়াকুফ; নাফ্স শয়তানের ধোঁকায় নিজেরাই বিনষ্ট হচ্ছে।

দুনিয়া বিসর্জন দিয়ে যে আখিরাতের জীবনকে সুসজ্জিত করে সেই বুদ্ধিমান। যে আখিরাতকে বাদ দিয়ে শুধু দুনিয়াকে চিনেছে, সে আল্লাহ্তায়ালার সাথে শত্রুতা করছে। যে যতবেশী ধন-দওলতের প্রতি আসক্ত থাকে আল্লাহ্তায়ালার নজরে সে ততবেশী হেয় ও ঘৃণিত হয়।

যে লোক ভাবে যে, সে বুযুর্গ-লোক তাকে অনুসরণ করুক, সে তো নির্বোধ দোকানদার। তার অন্তর ঠিক হয়নি, সে রিয়াকার। আল্লাহ্র দিকে ডাকতে হবে, নিজের দিকে নয়। নিজের দিকে হলে ইখলাস বিনষ্ট হবে, ইবাদত বরবাদ হবে,

www.pathagar.org

কবুল হবে না। অনুসরণ করতে হবে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে, তাকে নয়। অন্যকে সৎ কাজে আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করার পূর্বে নিজে সে কাজের অনুশীলন করতে হবে। সে জন্য আল্লাহ্তায়ালার অন্তুষ্টির নিয়ত থাকবে, মানুষের নিকট কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকবে না। শুধু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হকতাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় না। সাথে সাথে অন্তর দ্বারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করতে হবে। সেজন্য দরকার সদাজাগ্রত অন্তকরণের। জাগ্রত অন্তর দ্বারা সবসময় যিকির, নাফ্স থেকে হিসাব নেওয়া, নাফ্সের প্রতি সদা সর্তক থাকা এবং স্রষ্টার দয়া, মহত্ব ও প্রতাপের চিন্তায় বিভোর থাকতে হয়।

যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করে, তার বাকশক্তি রহিত হয়, হাসি চলে যায়, অযথা কথা তার মুখ দিয়ে বের হয়না, গীবত হতে পলায়ন করে। সে আল্লাহ্কে ভয় করে, সৃষ্টি তাকে ভয় করে। আল্লাহ্ভীতি কামভাব ও দুনিয়ার প্রতি আসক্তি দুর্বল করে দেয়। আখিরাতের নিয়ামতে বা আল্লাহ্র নৈকট্য ও দীদারে যতটুকু অনুরাগী হওয়া যায়, দুনিয়াতে ততটুকু সংসার বিরাগী হওয়া যায়।

দুনিয়ার প্রতি বা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি যতটুকু আকর্ষণ হয় সে বস্তুর প্রতি ততটুকু প্রেম হয়। কারণ হৃদয়ের আকর্ষণই প্রেম, মনের এই আকর্ষণ যখন মাত্রা ছাড়িয়ে আল্লাহ্তায়ালার আদেশ-নিষেধের সীমালংঘন করে তখন মনের সেই আকর্ষিত বস্তুই হয় ইলাহ্, যা পাপ। ঈমানদার লোক হলে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্র সাথে অন্য কিছু মিশানো হলো বলে, আল্লাহ্তায়ালার কাছ হতে তওবাহ্ করে মাফ করিয়ে নিতে তৎপর হয়। এ জন্য দোযখে যেতে হবে, বিনা তওবাহ্য় ঈমান নিয়ে মরলে শাফায়াতে মাফ পাবে।

মনের আকর্ষণ প্রেমের সৃষ্টি করে, মনের আকর্ষণকেও প্রেম বলা যায়। স্ত্রী-পুত্র, মা-বাবা, সন্তানাদি ও বিষয়-সম্পত্তিসহ সমস্ত সৃষ্টি হতে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) এর প্রতি অধিক মুহব্বত না থাকলে, আকর্ষণ না থাকলে ঈমান পূর্ণ হয়না।

আল্লাহ্ সকল কাজে সন্তুষ্টির সাথে সবর করতে পারলে যুহ্দ এখতিয়ার সহজ হয়। তবে একটি কথা জানা খুবই জরুরী যে, সংসারের প্রতি আসক্তি, কামভাব ও চিন্তা দূর না করে কেউ তাসাওউফের লাইনে সাফল্য লাভ করতে পারে না।

www.pathagar.org

সবর

মানুষ ও পশুর স্বভাবের মধ্যে পার্থক্যের চেয়ে মিলই বেশী। যে গুণটির দ্বারা মানুষ ও পশুর স্বভাবে ব্যবধান সূচিত হয়, তা হলো সবর বা ধৈর্য। মানুষ ধৈর্য ধারণ করতে পারে, পশু তা পারে না। ফলে মানুষ পরিণামদর্শী হতে পারে, পশু তা পারে না। পাশ্চাত্য পন্ডিতরা বলে বিবেক, আসলে তা হবে সবর।

ঈমানদার লোক প্রবৃত্তির সাথে ভাল মন্দের সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে নাফ্স ও শয়তানের প্ররোচনাকে পরাজিত করে আল্লাহ্তায়ালার আদেশ কার্যকরী করতে পারে অথবা নিষেধ হতে নাফ্সকে বিরত রাখতে পারে। নাফ্সের নিকট পরাজিত না হয়ে যে শক্তির দ্বারা প্রবৃত্তির উত্তেজনাকে দমন করে রাখে তাকে বলা হয় সবর। প্রবৃত্তির সাথে জিহাদে সবরই হল সবচেয়ে বড় হাতিয়ার।

আল্লাহ্তায়ালা পাক কোরআনে সত্তরবার সবরের কথা উল্লেখ করেছেন। এতে সবরের গুরুত্ব বোঝা যায়। "নিশ্চয়ই সহনশীলদের তাদের সবরের পুরষ্কার বিনা হিসাবে দেয়া হবে"। (সূরা বাকারা)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্তায়ালা সবরকারীদের সাথে আছেন।" (সূরা বাকারা)

এভাবে সত্তরবার সবরের মরতবা ও ফযিলত বর্ণনা করেছেন। সবর আল্লাহ্তায়ালার স্বভাবের একটি মহৎ গুণ। আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) বলেছেন- "ভৎর্সনা শুনেও অধিকতর সহিষ্ণু আল্লাহ্ হতে আর বেশি কেউ নেই। তারা তাঁর সন্তান আছে বলে দোষারোপ করে, কিন্তু তাদের তিনি ক্ষমা করেন এবং জীবিকা দেন" (বোখারী ও মোসলেম)। আল্লাহ্র স্বভাবে রঞ্জিত হতে হলে সবর, দয়া, ক্ষমা, উদারতা গুণগুলো সত্যবাদী ও বদান্যতা থাকতে হবে। এগুলো আল্লাহ্তায়ালার রহমানী গুণাবলীর অন্তর্গত।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন- "সবর ঈমানের অর্ধেক"। তিনি আরো বলেছেন- "সবরকারীদের আল্লাহ্তায়ালা ভালবাসেন।" (মিশ্কাত, আবু নইম)। হুজুর (সাঃ) একথাও জানিয়েছেন- "বহেশেতের রত্ন ভান্ডারের মধ্যে সবর একটি রত্ন ভান্ডার।"

সবর না থাকলে ঈমান থাকতে পারে না। যার সবর যত বেশী তার ঈমানও তত শক্তিশালী। যেকোন সৎকাজ করতে সবর অবলম্বন দ্বারা দুঃখ-কষ্ট ও পরিশ্রম বরদাস্ত করে সে কাজ করতে হয়। আল্লাহ্তায়ালাকে পাওয়ার জন্য প্রতিটি কাজে সবর বা ধৈয্য অবলম্বন করতে হয়।

www.pathagar.org

ইবাদতে, পাপ বর্জনে রসনা দমনে, ক্রোধে, মানুষের দেওয়া দুঃখ-কষ্টে অভাব-অনটনে, সংসারের প্রতি অনাসক্তিতে, হারাম দ্রব্য উপভোগে রোগে এবং প্রিয়জনের মৃত্যুতে সবর করতে হয়। সবর দ্বারা নাফ্সের বিরুদ্ধে সকল জিহাদ পরিচালনা করা যায়। নাফ্স পাপ কাজে বা নাজায়েয ধন-সম্পদ হস্তগত করার জন্য অন্তরকে আলোড়িত করলেও সবর এখ্তিয়ার করে চুপ করে মরা লাশের মত পড়ে থাকতে হয়। ক্রোধ হজম করা ও অন্যায়ের প্রতিশোধ না নেওয়াও সবর। আপদ-বিপদে সবরের পরীক্ষা হয়, তখন পেরেশান না হয়ে যা তক্দীরে আছে বা আল্লাহ্তায়ালার অনুমোদন ক্রমে ঘটছে বিশ্বাস করে আল্লাহ্র উপর নির্ভর করলে, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়। যে সবর করে অধৈর্য হয়ে আপত্তি অভিযোগ করে সে সাবির বা ধৈর্যশীল নয়। চঞ্চল ও পেরেশান লোকের জন্য সবর অপরিহার্য।

সবর অভ্যাস করতে করতে আল্লাহ্তায়ালার সব কাজে রাজী থাকার অভ্যাস গড়ে উঠে। বিপদে পড়ে আহাজারি শুরু করলে সবরের বিপরীত হয় এবং আল্লাহ্তায়ালার কাজে অসন্তুষ্ট হওয়া বুঝায়।

ঈমানের বহু শাখা-প্রশাখা আছে, তার সবগুলোতে সবর এখতিয়ার করা দরকার। এজন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সবরকে ঈমান বলেছেন। আল্লাহ্তায়ালা বলেন, "ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত করে উৎকৃষ্টের দ্বারা, ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরংগ বন্ধুর মত। এগুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদের, যারা ধৈর্যশীল; এ গুণের অধিকারী কেবল তাদের করা হয়, যারা মহাভাগ্যবান।" ৪১ঃ ৩৪,৩৫।

ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নত ইবাদতে কায়েম থাকা যেমন জরুরী, তেমনি নফল ইবাদত যা আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য ও সন্তুষ্টির জন্য করা হয়, তাতে সারা জীবন কায়েম থাকাও সবর বা ধৈর্য। কিছু দিন করে তা ছেড়ে দেওয়া, আবার করা, এটা অধৈর্য বা বেসবরী। নফল ইবাদতের মধ্যে সর্বদা আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকির ও সাধ্য মত দান-খয়রাত করাই শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ আল্লা যিকিরের মরতবা হলো, এতে আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য ও প্রেম জন্মে। এতে বাহুল্য চিন্তা মনে আসেনা, আল্লাহ্ ভিন্ন পদার্থ মন-মগয হতে দূর করা যায়, সময় বা জীবনের অংশ বিশেষ বিফলে যায় না। এতে সারা জীবন কায়েম থাকাও সবর। এতে জীবন বিফলে যায় না, দুনিয়াতে আল্লাহ্তায়ালা তার সাথী ও অবিভাবক হন।

যে সমস্ত বিষয় বস্তু লোকে ভালবাসে প্রবৃত্তির অনুকুলে, সে সম্বন্ধে সংযত না হলে ও সবর না করলে আল্লাহ্তায়ালা যা না-পছন্দ করেন সে বিষয়ে সবর অবলম্বন করা ঠিক নয়।

www.pathagar.org

তওবাহ্ করে পাপ বর্জন করে তাতে কায়েম থাকা এবং আর পাপ না করাও সবর। এরূপ সবর অবলম্বন করলে পরহেযগার হওয়া যায়, যা বান্দাকে তরকে দুনিয়াতে নিয়ে যায়। অবশ্য আল্লাহ্ ভীতি না থাকলে পাপ বর্জন ও সবর করা যায় না। আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশ-"আর তোমার প্রভুর হুকুমের উপর সবর কর।" আদেশ-নিষেধ দু'টোই আল্লাহ্র হুকুম। আদেশ পালন করা পূণ্য, নিষেধ অমান্য করা পাপ।

এখানে কতগুলো জরুরী নিষিদ্ধ কাজের কথা বলছি যাতে সবর করে আল্লাহ্তায়ালার নিষেধ মানা যায়ঃ-

রসনা সঞ্চালন করে বা কথা বলে পাপ কামাই করার চেয়ে সহজ পথ আর নেই। জিহবাকে দমন করাই এ ক্ষেত্রে উত্তম জিহাদ। চুপ থাকা ও নির্জনতা অবলম্বন এর ঔষধ। বেহুদা বকবক করে পাপ কামাই করা থেকে রেহাই পাবার একমাত্র পথ হল চুপ থেকে রসনা দমন করা এবং নেহায়েত প্রয়োজনীয় কথা সংযত হয়ে বলা।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, "মানুষ কোন দোষের জন্য অধিক দোজখে যাবে, তা কি তোমরা জান?- রসনার অপব্যবহার ও গুপ্ত অংগ।" (মিশকাত)।

তিনি আরো বলেছেনঃ- "দু'পাটি দাঁতের ভিতর এবং দু'উরুর মাঝে যা আছে, তার জন্য যে আমাকে জামানত দিতে পারে আমিও তার জন্য জান্নাতের জামিন হতে পারি" (বোখারী)।

রসনা ও গুপ্ত অংগ পাপের সবচেয়ে বড় দরজা। এছাড়া আরো দশটি পাপের দরজা আছে। যথাঃ -দু'চোখ, দু'কান, দু'হাত, দু'পা, ময়লা খালাসের রাস্তা ও ত্বক। এই মোট বারটি অংগ প্রত্যংগ আল্লাহ্তায়ালার নিয়ামত স্বরূপ বহির্জগতের সাথে সম্পর্কিত হয়ে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করছে। এগুলো পাপ ও পূণ্যের দরজা। এ গুলোর দ্বারা পাপ অন্তরে প্রবেশ করে অন্তর কলুষিত করার পর নাফ্স শয়তান সেটা দখল করে আবার সেই কলুষিত অন্তর ও অংগ-প্রত্যংগকে পাপের দিকে চালিত করে। পাপের জন্য এ দরজা বন্ধ করতে হবে এবং ইবাদত বা স্রষ্টার আনুগত্যের জন্য শোকরগোজারীর উদ্দেশ্যে খুলে দিতে হবে।

রসনার দ্বারা যে পাপ কাজগুলো করা হয়, তা হল- অশ্লীল বাক্য, বিবাদ-বিসংবাদ সৃষ্টি করা, মিথ্যা বলা, গালাগালি দেওয়া, তোষামোদ করা, পরনিন্দা করা, মোনাফিকী করা, অনাবশ্যক ও বাহুল্য কথা বলা, মানুষের প্রবৃত্তিকে উস্কাতে পারে এরূপ মন্দ গান করা ইত্যাদি। মুখ দ্বারা এ সব পাপ কামাই করে নাফ্স আনন্দ পায়।

www.pathagar.org

যে কাজের প্রয়োজন নেই তা জানতে চাওয়া, ভালবাসা দেখাবার জন্য বা সহানুভূতি পাবার জন্য বেহুদা কথা বলাকে বাহুল্য কথা বলে। অনাবশ্যক ও বাহুল্য কথায় হৃদয় কঠিন হয়। আর হৃদয় কঠিন হলে আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ শুনলেও মন তা গ্রহণ করতে চায় না, অমনোযোগী থাকে। মেয়েদের রূপ বর্ণনা, পাপীদের প্রশংসা, ধনীদের সম্পদের কথা, শাসকদের অবৈধ সম্পদ ও জুলুমের আলোচনা-সমালোচনা ও নিজের পাপের চিন্তা না করে অন্যের পাপের মুখরোচক আলোচনা ইত্যাদি বাহুল্যের অন্তর্গত। এসব বাহুল্য ও অনাবশ্যক কথার দ্বারা নাফ্‌স মনে করে অনেকে তাকে জ্ঞানী ও সমাজ হিতৈষী ও চালাক বলে মনে করুক। এসব ভেবে নাফ্‌স মনে শান্তি আনে। যে অধিক কথা বলে, সে অধিক মিথ্যাবাদী হয়। এসব আলোচনা মজলিসে যোগ না দিয়ে সবর এখতিয়ার করে চুপ থাকাই জ্ঞানীর লক্ষণ। আর এ সবের চর্চা করলে পাপের সাথে সাথে স্বভাব মন্দ হয় এবং অসৎস্বভাব গড়ে উঠে।

কথা মালায় নিজের মতামতকে উচ্চ করার জন্য এবং নাফ্‌স নিজকে বড় মনে করে তর্ক-বির্তক ও অন্যের কথার প্রতিবাদ করে। তর্ক-বিতর্ক ও প্রতিবাদ থেকে বিবাদের সৃষ্টি হয় এবং মনে হিংসা-বিদ্বেষের জন্ম নেয়, যা আমলকে বিনষ্ট করে এবং ঝগড়ার উৎপত্তি হয়। ঝগড়া করলে মনুষত্ব চলে যায়, প্রতিপক্ষের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চায়। প্রবৃত্তির লোভ হলো নিজের গৌরব জাহির করা। যে বাদ প্রতিবাদ বেশী করে সে সহজেই ঝগড়া-ফ্যাসাদে লিপ্ত হয়, সে তখন নিজের ক্রোধ এবং অন্যের ক্রোধের কবলে পড়ে। প্রাধান্য বজায় রাখতে গিয়ে বিবাদ-বিসম্বাদ অভ্যাসে পরিণত হয়। তখন মনে করে প্রাধান্য বজায় রেখে বড় বড় কথা বললে বা গালি দিলে লোকে তাকে ভয় ও সম্মান করবে, মূর্খ ও ভীরু বলে মনে করবে না, লোকটার দাপট আছে বলে মনে করবে। বাস্তবে লোকে তাকে ঘৃণা করে ও তার অমঙ্গলে খুশী হয়। এরূপ লোকের হৃদয়ে হিংসা-বিদ্বেষ ও গর্ব অহংকার প্রবল হয়। এর ফলে ক্রোধ, রিয়া, আত্মম্ভরিতা, নাম-ধামের ও সম্মান এবং অর্থের লালসা হৃদয়ে একত্রীভূত হয়ে তাকে আল্লাহ্‌তায়ালা হতে দূরবর্তী করে ফলে, খোদার দরবারে পাপিষ্ঠ নামে তার পরিচিতি লিখা হয়। এ অবস্থায় মারা গেলে তার কলুষিত আত্মার দুর্গন্ধে ফিরিশ্‌তারা নাক-মুখ ঢাকে, ঊর্ধাকাশে যাওয়ার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

রসনার সাহায্যে মিথ্যা কথা বলে লোকজনকে ধোঁকা দেওয়া যায়। হযরত আবু বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল করীম (সাঃ) বলেছেনঃ "শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠতর গোনাহর সংবাদ আমি কি তোমাদের দেবনা? সতর্ক হও, তা আল্লাহ্‌র

www.pathagar.org

সাথে অংশীস্থাপন, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা কথা বলা" (বোখারী মুসলেম)।

হুজুর (সাঃ) মিথ্যা সম্বন্ধে আরো বলেছেন- "যখন কোন লোক মিথ্যা কথা বলে, ফিরিশ্‌তারা তার নিকট হতে মিথ্যার দুর্গন্ধে এক মাইল দূরে চলে যায়" (বোখারী, মুসলিম)।

"যখন চাটুকারদের সাথে দেখা হয়, তাদের মুখে ধুলি নিক্ষেপ কর" (মিশকাত)।

কোরআন বলছে,- "অতর্কিত ওয়াদা ভংগের জন্য আল্লাহ্ শাস্তি দেন না, কিন্তু ইচ্ছাকৃত ওয়াদা ভংগের জন্য শাস্তি দেন"। তাঁর কাফ্‌ফারা দশজন দরিদ্রকে খাদ্য বা বস্ত্র দানে অথবা তিনদিন রোযা রাখা। তাহলে এ ব্যাপারে নাফ্‌সের বিরুদ্ধে জিহাদ হয়ে যায়। ওয়াদা পালন অপরিহার্য বলে ওয়াদা বা আল্লাহ্‌র নামে শপথ না করাই উত্তম।

মিথ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হলে সবর থাকতে হবে অথবা সত্য কথা বলতে হবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন- "সত্য কথা বল। সত্য কথা পবিত্রতার দিকে পরিচালিত করে এবং পবিত্রতা জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। কোন লোক সত্য কথা বলতে বলতে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকে সত্যবাদী রূপে আল্লাহ্‌র নিকট লিখিত হয়। মিথ্যা পরিত্যাগ কর, কেননা মিথ্যা গুনাহর দিকে পরিচালনা করে দোযখের দিকে পরিচালিত করে। কোন লোক মিথ্যা কথা বলতে বলতে মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আল্লাহ্‌র নিকট মিথ্যাবাদী রূপে লিপিবদ্ধ হয়" (বোখারী, মুসলিম)।

হুজুর (সাঃ) আরো বলেছেন- "মিথ্যা কথা জীবিকা হ্রাস করে।" যে মিথ্যা কথা বলে তার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য করাও হারাম।

কেউ যদি মিথ্যা পরিত্যাগ করতে না পারে, তাসাওউফ ও তরীকতে তার পরিশ্রম বিফল হবে। পরিশ্রম ও সাধনার দ্বারা যে ঈমান ও ইয়াকীনের নূর অর্জন করবে, মিথ্যা বলায় নাফ্‌স ও শয়তান তা খেয়ে ফেলবে অর্থাৎ কালিমা তা ঢেকে দেবে, গ্রাস করে ফেলবে, শায়েখের তওয়াজ্জুহ তাকে তাছির করবে না, অন্যান্য পাপও সে সহজে ত্যাগ করতে পারবে না।

ফিরিশ্‌তা স্বভাব অর্জন দূরূহ হবে। ঈমান-ইয়াকীন সৃষ্টিকারী ফিরিশ্‌তারাই মিথ্যার দুর্গন্ধে তার কাছে থাকতে পারবে না। মিথ্যা না বলে যে কাজ করা যায়

www.pathagar.org

না তা পরিত্যাগ করা উচিত। সত্য কথা বললে মানসিক শক্তি অর্জিত হয়, আত্মা শক্তিশালী হয়। যার ফলে নাফ্সের বিরুদ্ধে জিহাদ করা খুবই সহজ হয়।

রসনার দ্বারা আর একটি মারাত্মক পাপ সহজেই কামাই করা যায় তাহল পরনিন্দা।

আল্লাহ্তায়ালা নিষেধ করে বলেছেন- "তোমরা একে অন্যের নিন্দা করো না, তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে ভালবাস? তোমরা নিশ্চয়ই তা ঘৃণা কর" (৪৯ঃ১২)।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন,- 'পরনিন্দা হতে সর্তক হও, কেননা, পরনিন্দা জেনা হতেও বেশী জঘন্য পাপ'। কোন কোন জেনা করে তওবাহ্ করলে আল্লাহ্ হয়ত তার তওবাহ্ কবুল করতে পারেন, কিন্তু যে পর্যন্ত নিন্দিত ব্যক্তি ক্ষমা না করে, সে পর্যন্ত তওবাহ্ কবুল হয় না।

অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিত ব্যক্তি অভিযোগ করলে তা পরনিন্দা হয় না।

মুখ ছাড়া ইশারা-ইংগিত, অংগভংগি ও লেখনির দ্বারাও পরনিন্দা করা যায়। ক্রোধের জন্য, ঈর্ষাবশত, নিজের দোষ হালকা করার জন্য, আত্মগৌরব প্রকাশ করার জন্য, নিজের সংগীদের মনতুষ্টির জন্য, তার প্রতিদ্বন্দ্বী বা সমাজে তার চেয়ে সম্মানিত ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষবশত অসুস্থ রুগ্ন আত্মার লোকেরা পর নিন্দা করে পরকালের শাস্তিযোগ্য হয়।

আত্মার রোগের বড় ওষুধ হল আপন নাফ্সের যা ভাল লাগে তার বিপরীত কাজ করা। পরনিন্দা হতে সবর ও নীরব থাকা উচিত। যাকে নিন্দা করবে সে দোষ নিজের আছে কিনা তা অনুসন্ধান করা এবং পরনিন্দা শুরু হলে বৈঠক বর্জন করা, পারলে বাধা দেওয়া অন্যথায় মৌন থাকা ও তাদের জন্য হিদায়েতের দোআ করা উচিত। পরনিন্দাকারীর জানা উচিত যে, এ পরনিন্দায় তার সব নেকী পন্ড হবে, নিন্দিত ব্যক্তি নিয়ে যাবে। পর নিন্দার দ্বারা যার সম্মান নষ্ট হয় সে নিন্দুকের নেকী পাবে, নেকী না থাকলে নিন্দিত ব্যক্তির পাপ তার ঘাড়ে চলে আসবে। পরনিন্দাকারীর নেকীর পাল্লা এভাবে হালকা হয়ে দোযখে যাবে। আল্লাহ্তায়ালা বলেন- "এবং তার অনুসরণ করো না যে কথায় কথায় শপথ করে, সে লাঞ্ছিত, যে পশ্চাতে, নিন্দাকারী, একের কথা অপরের নিকট নিন্দা করে বেড়ায়। সে কল্যাণের কাজে বাধা দান করে, সে সীমালংঘনকারী, পাপিষ্ঠ রুঢ় স্বভাব ও তদুপরি কুখ্যাত, যদিও সে ধন-সম্পদ ও সন্তান- সন্ততিতে সমৃদ্ধশালী" (৬৮ঃ১০-১৪)।

www.pathagar.org

যারা কুটনামী করে তাদের ঠকবাজ বা চোগলখোর বলে। এরা একের কথা অন্যের কাছে বলে ঝগড়া-ফ্যাসাদ ও ঘৃণার সৃষ্টি করে। আল্লাহ্তায়ালা এদের দুশ্চরিত্র ও অবৈধজাত বলেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "চোগলখোর জান্নাতে যাবে না"।

চোগলখুরীর ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। অনেক সময় রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে পর্যন্ত ঠান্ডা-গরম লড়াই চলে। চোগলখোরকে বিশ্বাস না করে তদন্ত করা উচিত এবং মিথ্যা প্রমাণিত হলে এরূপ লোকের সংগ ত্যাগ করা জরুরী। যার এ স্বভাব আছে তার নাফ্সের সার্থে লড়াই করে এ জঘন্য ঘৃণ্য স্বভাব বর্জন করে সবর অবলম্বন ও সত্যবাদী হওয়া দরকার। চোগলখোররা যখন সমাজে প্রকাশ হয়ে পড়ে তখন লোকজন এদের ঘৃণা করে। দুনিয়াতেও সুফল পায় না।

যারা আল্লাহ্কে ভয় পায় না, মুখে মুখে নিজ স্বার্থে ইসলামের কথা বলে বা কারো পক্ষে-বিপক্ষে বলে, অন্তরে অন্তরে বিপরীত প্রতিপক্ষ বা মানবীয় সার্বভৌমত্বের পক্ষে থাকে বা সুযোগ বুঝে নিজ স্বার্থে মানবীয় সার্বভৌমত্বের অনুকূলে কাজ করে এবং পরস্পরবিরোধী দু'দল বা দু'ব্যক্তির নিকট দু'রকম কথা বলে, এরা মুনাফিক। মুনাফিকগণ দোযখের সর্বনিম্নে সব চেয়ে বেশী শাস্তিযোগ্য এলাকায় অবস্থান নিতে বাধ্য হবে। যারা মুনাফিকির দ্বারা রাজনীতি করে, তারা শাসক, কাফের ও মুশরিকদের নিকট এক কথা আর জনগণের নিকট অন্য কথা বলে, ভাল জিনিষের প্রলেপ দেয়। তারা ধ্বংস হবে। শাসক কখনও মিথ্যাবাদী হতে পারে না, আল্লাহ্ তাঁকে পরীক্ষার জন্য ক্ষমতা দিয়েছেন, তার মিথ্যাবাদী হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না, কারণ আল্লাহ্ ছাড়া তার আর কাউকে ভয় করা উচিত নয়। আল্লাহ্র পথের যাত্রীদের এসব পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকতে হবে। নীরবতা ও সবর এখ্তিয়ার করতে হবে।

ভোট যুদ্ধে মুনাফিকী, প্রতারণা ও ব্যক্তিস্বার্থ ব্যাপক হয়ে এ বিদআত ব্যাপক হারে মানুষকে ঈমানহারা করছে। দুনিয়াদাররা বলছে, ভোট পবিত্র আমানত। কিসের আমানত? জালেম ভোট দিচ্ছে জুলুম বজায় থাকার জন্য, সেও যাতে এর অংশীদার হতে পারে এ নিয়তে। কাফের, মুশরিক ও নাফ্সের অনুসারীরা এ নিয়তে ভোট দেয়, যাতে কুফ্রী ও শিরকী বজায় থাকে বা কায়েম হয়। ঈমানদাররা ভোট দেয় এ মনে করে যে, যাতে ইসলাম কায়েম হয় বা কায়েম থাকে। এ সকল নিয়তে সবার ভোটের ফলাফল এমন লোকের উপর অর্পিত হয় যে অধিকাংশের নিয়ত অনুযায়ী যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। নির্বাচিত হয়ে সে মানবীয় সার্বভৌমত্বের পায়রবীতে নিযুক্ত হয়- নির্বাচনের পরও সে যে মানবীয় সার্বভৌমত্বের পায়রবী করবে না এমন কথা বলে না, ভাবেও না তিনি দুনিয়াদার

www.pathagar.org

আলেম বা জালেম যেই হউন। এখানে ভোট পবিত্র আমানত হয় কি করে? ভোট যুদ্ধে আলেম, জালেম, কাফের ও মুশরিক' একই সমতলে অবস্থান করে, সবার এক ভোট। মৃত্যুর সময় ও হাশরের মাঠে এ আমলের পরিণতি প্রকাশ পাবে। ভোট যুদ্ধের প্রধান হাতিয়ার মিথ্যা, প্রতারণা, মুনাফিকী, মিথ্যা ওয়াদা, ব্যক্তি স্বার্থ ও তাগুতি শক্তির প্রয়োগ, ইত্যাদির সকল প্রয়োগকারীরা নিজেদের ঈমান ও চরিত্র নষ্ট করে আখিরাতের বদলে দুনিয়া ক্রয় করে। তাগুতি শক্তির দ্বারা ইসলাম কায়েম হয় না, ইতিহাসে নেই। ইসলাম দ্বারাই ইসলাম কায়েম হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবীগণ (রাঃ) কায়েম করে গেছেন। ভোট যুদ্ধ তাগুতি শক্তির বাহন বা হাতিয়ার, যার দ্বারা তাগুতি শক্তির সাময়িক নেতা হওয়া যায়। তাগুতি শক্তিকে ইসলামী লেবাস পরালেই ইসলাম হয়ে যাবে না। তাওহীদ ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর রিসালাত ছাড়া ইসলাম নেই। আল্লাহ্‌র পথের যাত্রীদের তথা আল্লাহ্‌তায়ালার সার্বভৌমত্বের অনুসারীদের ইসলাম প্রচারের সাধ্য না থাকলে সবর করে এ তাগুতকে ঘৃণা করা ও বিচ্ছিন্ন থাকা উচিত।

ধন-সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ হয় এ সম্বন্ধে আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট সর্বাপেক্ষা ক্রোধভাজন ঐ ব্যক্তি, যে ধন-সম্পদ নিয়ে সর্বাপেক্ষা অধিক বিবাদ করে।" তিনি আরো বলেছেন, -"যে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত ধন-সম্পত্তি নিয়ে অন্যের সাথে বিবাদ করে, সে অনবরত আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির মধ্যে থাকে যে পর্যন্ত না সে নিরস্ত হয়।"

ধন-সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ, বাদানুবাদ, গালাগালি, মিথ্যা কথা, মামলা, হিংসা-বিদ্বেষ ও ক্রোধ সৃষ্টি করে ঈমান নষ্ট করে। তাই পরহেযগার লোকেরা ধন-সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ করে না। কিন্তু মানুষের যখন কোন সম্পত্তিতে হক থাকে আর জালেম তা আত্মসাৎ করে নিয়ে গেছে বা নিতে চায়, তবে তার যদি চলার মত যথেষ্ট ধন-সম্পত্তি থাকে, তবে বিবাদে না যাওয়াই উচিত। আর অপারগ হলে নির্যাতিত ব্যক্তি শরীয়ত সম্মত পন্থায় স্বত্বের প্রমাণ দিবে ও বিচারের অতিরঞ্জন ও অতিরিক্ততা পরিত্যাগ করে স্বত্ত্ব রক্ষার চেষ্টা করতে পারবে। তবে বিবাদ হতে মনকে মুক্ত রাখতে হবে, আলোড়িত হলে চলবে না। সাথে সাথে প্রতিপক্ষের সাথে সৎব্যবহার করতে হবে। সংযত থাকতে হবে।

কাম প্রবৃত্তির দ্বারা মানব বংশ রক্ষা পায়। একে শরীয়তসম্মত ভাবে বিয়ে করে সংযত রাখতে হবে। যার পক্ষে কাম রিপু দমন সম্ভব না হয়, তার বিয়ে করা উচিত। তবে শর্ত হল মেয়েটিকে অবশ্যই পরহেযগার হতে হবে। মানবীয় সার্বভৌমত্বের সমর্থক ও প্রবৃত্তির অনুসারী, বেপরদা, প্রদর্শনী বাতিকগ্রস্থ মেয়েলোককে বিয়ে করলে তাকে হয়রান-পেরেশান করে ছাড়বে এবং ইসলামের

www.pathagar.org

বিপরীত চলবে। মানবীয় সাবভৌমত্বের শিক্ষা-দীক্ষা ছেলে-মেয়েদের যৌন স্বাধীনতার প্রবক্তা করে তাদের বরবাদ করে ফেলছে। তাই সাবধানে পদক্ষেপ নিতে হবে অভিভাবকদের।

কাম রিপু দমনের জন্য নফল রোযা রাখতে হবে যতক্ষণ না তা দমন হয়। ভোজন প্রিয় হলে কাম রিপু সহজে দমন হয় না। রাত-দিনে একবার খেয়ে তিন ভাগের একভাগ পেট খালি রাখলেই হবে; এটা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর নীতি ছিল। কারণ যৌন উত্তেজনা হৃদয়কে অন্ধকার করে ফেলে। মনে যৌন চিন্তা এলেই দূর করে ফেলতে হবে। রোযা সবরের মধ্যে গণ্য। রোযা ছাড়া এবং কাম উত্তেজনা বৃদ্ধিকারক চিন্তা-ভাবনা দূর করা ছাড়া কাম প্রবৃত্তি দমন করার কোন বিকল্প নেই। সে জন্য মেয়েলোক ও কিশোর বালকদের প্রতি দৃষ্টি সংযত রাখতে হবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন- "তিনটি ধ্বংসকর দোষঃ- কাম প্রবৃত্তি বশীভূত না হওয়া, কৃপণতা ও আত্মাভিমান।" এ দোষগুলো নাফ্সের সাথে জিহাদ করে সমূলে উৎপাটন করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আরো বলেছেন- "আমার উম্মতের জন্য যা আমি বেশী ভয় করি তা হলো কাম প্রবৃত্তি ও দীর্ঘ আশা।"

তিনি আরো বলেছেন- "কাম প্রবৃত্তির সাথে যুদ্ধ করাই বড় জিহাদ"। মেশকাত।

আরেকটি মারাত্মক দোষ হল ক্রোধ। আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) বলেছেন- "যেরূপ তিক্ত ফল মধুকে নষ্ট করে তদ্রুপ ক্রোধ ঈমানকে নষ্ট করে।" বায়হাকী, মেশকাত।

হযরত সহল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল করীম (সাঃ) বলেছেন,- "ক্রোধ প্রকাশ করার ক্ষমতা থাকা সত্বেও যে তা হজম করে, বিচারের দিন আল্লাহ্ সমস্ত জীবকে তার সামনে ডেকে তন্মধ্যে যে কোন হুর পছন্দ করে নিতে বলবেন"।-আবু দাউদ, তিরমিজি।

ক্রোধ দমনের জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করতে হবে। ক্রোধ দমনে যে সওয়াব এবং দমন না করলে যে শাস্তি তা স্মরণ করা। ক্রোধের কারণে শত্রুতাভাব আসে, হিংসা-বিদ্বেষ পয়দা হয়। নাফ্স শত্রুতা উদ্ধার কুপথে চালিত করে, তা হলে সর্তক হওয়া ও সবর করা দরকার। ক্রোধের সময় শরীর বিকৃত

www.pathagar.org

হয় ও অশ্রাব্য কথা বের হয় এবং লোকচক্ষে হেয় হতে হয়। এসব চিন্তা করা দরকার। তাই ক্রোধের সময় শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনার জন্য আউযুবিল্লাহ পড়া উচিত। দাঁড়ানো থাকলে বসে পড়া, তাতেও উপশম না হলে শুয়ে পড়েতে হবে, তাতেও উপশম না হলে ওজু করলে ইনশাল্লাহ ক্রোধ দমন হবে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সৎ ব্যবহার দ্বারা অসৎ ব্যবহারের মোকাবেলা সম্বন্ধে বলেছেন- "ক্রোধের সময় সবর এবং অসৎ ব্যবহারের সময় ক্ষমা কর। যখন তারা এটা করবে, আল্লাহ্ তাদের রক্ষা করবেন, তাদের শত্রুকে হেয় করবেন যেন তারা পরম সুহৃদ হয়"। বোখারী।

মানব চরিত্রে আরেক মারাত্মক দোষ পয়দা হয়, তা হলো অহংকার। বান্দা বা দাসের কোন অহংকার থাকতে পারে না, থাকলে আর বান্দা থাকে না। ক্রোধ, ধন-সম্পত্তি, লোকবল, ক্ষমতা, বিদ্যা ও শারিরীক শক্তি লোকদের মনে অহংকার আনে। বক্তৃতা, ওয়াজ-নসিহত, নাম-যশ, সুন্দর বাড়ী-ঘর ও পোষাক-পরিচ্ছদ লোকদের আত্মম্ভরি করে তোলে। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যার হৃদয়ে সরিষার বীজ পরিমাণও ঈমান আছে সে দোযখে যাবে না এবং যার মনে এক সরিষা পরিমাণও অহংকার আছে সে বেহেশতে যাবে না।" -মুসলিম।

রাসূল করীম (সাঃ) বলেছেন- মহান আল্লাহ্তায়ালা বলেন- "অহংকার আমার পরিচ্ছদ, শৌর্য আমার পায়জামা। তন্মধ্যে যে একটিও আমার গা হতে খুলে নেয় তার জন্য জান্নাতের দুয়ার খোলা হবে না। যে পর্যন্ত উট সুঁচের ছিদ্র পথে না যায় সে পর্যন্ত সে বেহেশতে যাবে না"। মেশকাত।

ক্রোধে অহংকার আসে। খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান কেউ কেড়ে নিলে ক্রোধ হয়। ধন-সম্পত্তি, চাকর-বাকর, গৃহ পালিত পশু-পাখী, যশ, মান-সম্মান, সহায়-সম্বলের উপর যখন কেউ হস্তক্ষেপ করে তখন লোকের ক্রোধ হয়। যে প্রকৃত তাওহীদে বিশ্বাসী সে জানে সকল কাজ আল্লাহ্তায়ালার অনুমোদনক্রমে ঘটে। একমাত্র তিনি জানেন এসব আপদ-বিপদে মঙ্গল কি অমঙ্গল আছে। পরস্পরকে পরীক্ষার জন্য একজন দ্বারা অন্যজনের বিপদ-আপদ দেন। তাওহীদে বিশ্বাসীগণ মনে করেন যে সব কিছুতেই মঙ্গল আছে যদি পরীক্ষা সঠিকভাবে দিতে পারেন। সেজন্য অনিষ্টকারীকে ক্ষমা করে দেন। যেমন

www.pathagar.org

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,- "ক্রোধ আমাকে সত্যের গন্ডি হতে বাইরে নিয়ে যেতে পারবে না।"

স্ত্রীলোক, রোগী, বৃদ্ধ ও বদমেজাজী লোকের ক্রোধ অধিক দ্রুত-বেসবর হওয়ার কারণে। বখীল ও মন্দ স্বভাবের লোকের ক্রোধ অধিক।

রাসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, "কুস্তিতে বিপক্ষকে পরাভূত করলে কেউ শক্তিশালী হয় না। ক্রোধের সময় যে নিজ নাফ্সকে দমন করতে পারে সেই শক্তিশালী।"

সবর, সংযম ও ক্ষমা এই গুণগুলো যাদের আছে তারা মানসিক ভাবে শক্তিশালী হয় না। ক্রোধের সময় যে নিজ নাফ্সকে দমন করতে পারে সেই শক্তিশালী।"

সবর, সংযম ও ক্ষমা এই গুণগুলো যাদের আছে তারা মানসিক ভাবে শক্তিশালী বলে ক্রোধ হজম করতে পারে। ক্রোধ হজম করলে মানসিক শক্তি বেড়ে যায়- সব কিছুতে সবর এখতিয়ার সহজ নয়। ক্রোধ অহংকারের বহির্প্রকাশ ঘটায়।

অহংকার হলো প্রভূত্ব। তা কেবল আল্লাহ্তায়ালার জন্য শোভা পায়। ইহা প্রভূত্বের গুণ, বান্দার জন্য জঘন্য দোষ। গোলামের সব কিছু আল্লাহ্তায়ালার দান। তার নিজস্ব কি আছে? যার দ্বারা সে অহংকার করবে, এটাই তো সত্য। সরিষা পরিমাণ অহংকার থাকলেও বেহেশতে যেতে পারবে না, সব ইবাদত, যিকির ও সাধনা ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই সমুদয় অহংকারকে হৃদয় থেকে মিটিয়ে দিতে হবে। যে অহংকার ক্রোধের দরুন জন্মে তা সবর দ্বারা দমন করা যায়। কিন্তু যে অহংকার ধনবল, জনবল, ক্ষমতা, নাম-যশ, সুন্দর বাড়ীঘর, যানবাহন, বিদ্যা, ওয়াজ-নসিহত থেকে উদ্ভব হয়, তরকে দুনিয়া না হলে এবং বিনয় না শিখলে সেগুলো থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। আল্লাহ্-ভীতি, রোগ-শোক ও ইখলাস দ্বারা উপকার পাওয়া যায়।

বান্দা কখনও অহংকার করতে পারে না। যদি করে তবে সে আর বান্দা থাকে না, প্রভূর সাথে তার প্রতিদ্বন্দ্বীতা শুরু হয়। যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহতে বিশ্বাস করে, সে কিভাবে নাফ্সকে ইলাহ বানাতে পারে? প্রবৃত্তির ইচ্ছা অনুযায়ী চললে প্রবৃত্তির গোলাম হতে হয়, প্রবৃত্তি তার উপাস্য হয়। যে দুনিয়াকে ভালবাসে, দুনিয়াতে মশগুল হয়, দুনিয়া তার উপাস্য হয়। যারা প্রবৃত্তি ও

www.pathagar.org

দুনিয়ার উপাসক তারাই অহংকারী হতে পারে। সে তখন নিজের বুদ্ধি, শক্তি ও ক্ষমতার জন্য অহংকারী হয়, যা আল্লাহ্‌র দান, তার চাওয়া পাওয়ার কিছুই নেই। সে জানে আল্লাহ্‌তায়ালা মেহেরবানী করে যে নিয়ামত দান করেছেন, তাতে তার গর্বিত হওয়ার কিছু নেই। প্রভূ নিয়ামত দান না করলে সে তা পেতো না। যে কারণেই হউক সেই নিয়ামত সে পেয়েছে, তাঁর নির্দেশেই পেয়েছে, কারণ তিনিই সৃষ্টি করেছেন। স্মর্তব্য, আল্লাহ্‌তায়ালা কারণের মুখাপেক্ষী নন।

আযাযীল অহংকার করে শয়তান হয়ে গেছে, এত ইবাদত তাকে রক্ষা করতে পারেনি, সব ইবাদত বরবাদ হয়ে গেছে। কারামতের গর্বে বালআম বাউরের পতন হয়েছিল। তার তাসাওউফ ও ইবাদত কোন কাজে আসেনি। দুনিয়ার সুসজ্জিত দালান-কোঠা ও ধন-দওলতের অহংকার বেহেশতের মনি- মুক্তার দালান-কোঠা হতে বঞ্চিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।

আল্লাহ্‌তায়ালা অহংকারী ও আত্মগরিমাকারীকে তার চেয়ে নিকৃষ্ট লোক দ্বারা অপমান না করিয়ে দুনিয়া হতে উঠাবেন না, যেমন লোভীর গলা ক্ষুধা ও পিপাসায় না শুকানো পর্যন্ত দুনিয়া হতে উঠাবেন না। তেমনি আত্মগরীমাকারীকে মল-মুত্র দ্বারা জড়িত না করে প্রাণ হরণ করবেন না।

যে ব্যক্তি অহংকারী হয় সে আল্লাহ্‌কে ভয় করে না-সে ঈমানদার হতে পারে না। অথচ তাসাওউফ ও তরীকত ঈমান মজবুত করে। সকল সাধনা ও পরিশ্রম ব্যর্থ হয়। আল্লাহ্‌তায়ালাকে পাওয়ার পথে অহংকারের চেয়ে ভীষণ পরদা আর কিছু নেই। নিজকে তুচ্ছ জানাই দাসত্ব, আর দাসত্ব ছাড়া আল্লাহ্‌কে পাওয়া যায় না অর্থাৎ দীদার ও নৈকট্য লাভ হয় না।

যে চালাকী করে, তার মনে অহংকার আসে। আল্লাহ্‌র পথের যাত্রী এভাবে ধ্বংস হতে পারে। ধূর্ত না হয়ে সহজ সরল হলে আত্মিক উন্নতি বেশী হয়। নিজকে মন্দ মনে না করে ভাল ভাবলেই অহংকার চলে আসবে। নিজকে দুনিয়ার সব কিছু থেকে নিকৃষ্ট বা বড় মনে না করলে অহংকার থেকে আত্মরক্ষা করা যায়। নিজকে সর্বাবস্থায় কারো চেয়ে বড় না ভাবা ও দাবী না করাই বিনয়।

এই বিনয়ের অভাবে ও হারাম খেয়ে তাসাওউফ ও তরীকত লাইনের অনেকের তাযকিয়া নাফ্‌সের ফায়েজ চলে গিয়ে সাধারণ লোকে পরিণত হন। তাই এ পথের সাধকগণ হারাম খাদ্য ও অহংকার হতে সাবধান।

যে পর্যন্ত লোকে মনে করে যে, সে অনেক জানে, সে পর্যন্ত জ্ঞানের ব্যাপারে সে আত্ম অহংকারী থাকে। যখন মনে করে, সে কিছুই জানে না তখন

www.pathagar.org

অহংকারের পরদা উঠে যায়। আর নিজকে গৌরবান্বিত মনে করলে গুনাহ করা সহজ হয়ে পড়ে। লোকের চোখে তারাই সম্মানিত, যারা নিজকে হেয় ও আপন নাফ্সকে ঘৃণার চোখে দেখে। দাবী ও অহমিকা আল্লাহ্র দাসত্বের বিপরীত। হৃদয়ে এ দুটোর একত্র সমাবেশ হলেই অপরাধী হিসাবে সাব্যস্ত হবে। অহংবোধ ও দাসত্ব পরস্পর বিরোধী।

দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ অহংবোধ নিয়ে আসে। যে লোক নিজকে অবনত রাখে, আল্লাহ্ পাক নিজ দয়ায় তাকে উন্নত করেন। যে লোক নিজের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করে, আল্লাহ্ পাক তাকে অবনত করেন। অতি নিকৃষ্ট লোকের সাথেও অবনত থাকা উচিত। কারণ কাকে আল্লাহ্ মাফ করবেন, তা আমরা জানি না। আমার চেয়েও নিকৃষ্ট লোককে হয়ত মাফ করবেন, আমাকে মাফ নাও করতে পারেন। মৃত্যুর পরই কেবল তা জানা সম্ভব।

যে লোকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের দ্বারা সম্মান লাভের আশা করে, সে ব্যক্তি অপদস্থ হবে। ঈমানদার লোকের অপদস্থ ও হেয় হওয়ার কারণ এখানেই নিহিত, যদি এর দ্বারা ভুল বুজে সংশোধিত হয়। ধন, বংশ, লোকবল, বিদ্যা-বুদ্ধির গর্বে সম্মান এসেছে মনে করলে এরূপ হবে। আল্লাহ্তায়ালা জানাচ্ছেন- "যে যত বেশী পরহেযগার, আল্লাহ্র নিকট সে ততবেশী সম্মানিত।" যে লোকের নিকট সম্মান চায়, সে তো মুশরেক।

সবর, বিনয়, লজ্জাশীলতা, শোকর ও আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীলতা আল্লাহ্র পথের যাত্রীকে সাহায্য করে।

কবীরা গুনাহ ও নিষিদ্ধ কাজ হতে বেঁচে থেকে নাফ্সের সাথে সংগ্রাম মারফত আত্মাকে শক্তিশালী করে নিজে সংশোধিত হয়ে আল্লাহ্র দিকে ধাবমান হতে হয়। গরিবী ও আযীযির সাথে আল্লাহ্তায়ালার নিকট চাইতে হবে। অহংকারী ও দেমাগী লোক সূফী হতে পারে না, সরল ও নিরহংকার লোক সাধনায় উন্নতি করতে পারে।

নিজেকে পাপীরূপে না দেখাও অহংকার। প্রসন্নতার সাথে দেখলে ধ্বংস হয়ে যাবার আশংকা থাকে আত্মম্ভরি হওয়ার কারণে। যে নিজেকে ভাল জানে, সে অহংকার প্রকাশ করে দোযখের উপযোগী হয়।

এখানে মারাত্মক দোষগুলোর আলোচনা করা হলো যে গুলো সবর ও বিনয় দ্বারা নাফ্সের সাথে সংগ্রাম করে দূর করা যায়। আরো যেসব দোষ আছে, পারলে সেগুলো কোরআন-হাদীস, ফিকাহ থেকে সরাসরি, অন্যথায় নির্ভরযোগ্য আলেম হতে জেনে নিতে হবে।

www.pathagar.org

আল্লাহ্-ভীতি

আল্লাহ্-ভীতি মানুষকে পরহেযগার করে এবং নাফ্সের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হতে বাধ্য করে, ইবাদতে পরিশ্রমী হতে সাহায্য করে। আল্লাহ্-ভীতি যত বেশী থাকবে বা হবে তার চারিত্রিক দোষ-ত্রুটি ততবেশী সংশোধিত হবে। আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) এর আল্লাহ্-ভীতি সবচেয়ে বেশী ছিল। ফিরিশ্তারা আল্লাহ্তায়ালার ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে বলে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্-ভীতির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। ফিরিশ্তা-স্বভাব অর্জন করতে হলে আল্লাহ্-ভীতি অপরিহার্য। বেশেহতের চাবিকাঠি ঈমান, আল্লাহ্-ভীতি ও সৎকর্ম।

আল্লাহ্তায়ালা বলেন- "যারা স্বীয় প্রভূকে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে হেদায়েত ও রহমত।" সূরা আরাফ;

আল্লাহ্তায়ালা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট-এরূপ অবস্থা সে ব্যক্তির জন্য, যে ব্যক্তি তার প্রভূকে ভয় করে।

"যে ব্যক্তি তার প্রভূর সামনে দাঁড়াতে ভয় করে, তার জন্য দুইটি বেহেশ্ত।" সূরা আর-রাহমান।

আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ "মহা মহিমান্বিত আল্লাহ্তায়ালা বলেন, "আমি আমার ইযযতের শপথ করে বল্ছি- "আমি কখনও দুই ভয়কে কোন মানুষের মধ্যে একত্রিত করিনা। যে বান্দা ইহকালে আমার ভয়ে ভীত থাকবে, পরকালে সে নির্ভয় থাকবে। ইহকালে যে আমা হতে নির্ভয় থাকবে, পরকালে তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখব।"

হুজুর (সাঃ) আরো বলেছেন, - "যে মুসলমানের চোখ হতে আল্লাহ্র ভয়ে অন্তত মক্ষিকার মস্তক পরিমাণ অশ্রু বের হয়ে মুখ মন্ডলের উপর প্রবাহিত হয়, তার মুখ মন্ডল দোযুখের আগুনের জন্য হারাম হয়ে যাবে।"

রাসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, - "মানুষ দারিদ্র্যতাকে যে রূপ ভয় করে থাকে তদ্রুপ ভয় দোযখের জন্য করলে অবশ্যই বেহেশতী হতে পারত।"

এরূপ আরো অসংখ্য হাদীস আছে। আধ্যাত্মিক সাধকের মনে আল্লাহ্ পাকের ভয় একটি উন্নত অবস্থা। যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে, দোযখের ও কবরের শাস্তির ভয় তাদের মনে উৎপন্ন না হয়ে পারে না। বার বার তা মনে করলে এবং সেটা হতে বাঁচার জন্য সৎকাজ করতে থাকলে সে ভয় কায়েম ও

www.pathagar.org

মজবুত হয়। যে তা বিশ্বাস করে না, সে কাফির। আমাদের ইহকালের কার্যাবলীই আমাদেরকে বেহেশত বা দোযখে নিয়ে যাবে।

আল্লাহ্‌র হুকুম ছাড়া কাউকে দোযখে ফেলা হবে না। যে সব কাজ দোযখে নিয়ে যাবে তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন এবং যে কাজ করতে নিষেধ করেছেন, সেই নিষিদ্ধ কাজগুলো না করে নিজ সত্তাকে ধ্বংস হতে বাঁচাতে হয়। কারণ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নিষেধ অমান্য করা এবং ইসলামের পাঁচ রোকন পালন না করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

মানুষ নিজকে সংশোধনের জন্য যখন আদেশ-নিষেধ পালনের জন্য নাফ্‌সের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হয় এবং যিকিরে মশগুল হয়, তখন নূরে ইলাহীর সাহায্য জানতে পারে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর বাক্যবলী কত সত্য ও বাস্তব। তখন এ সব আদেশ-নিষেধে ইয়াকীন বা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। সে অবস্থায় মনে ভয়ের আগুন জ্বলে উঠে। ফলে সে বার বার তওবাহ্ করতে থাকে যা তাকে নিষ্ঠাবান বান্দায় পরিণত করে। তখন নাফ্‌সের সাথে জিহাদ খুবই সহজ হয়ে পড়ে,- ফলে সহজেই সে তরকে দুনিয়া হতে পারে। শিথিল ঈমানের দুনিয়াদাররা যা কঠিন বলে মনে করে এবং ভয় পেয়ে মন্তব্য করে, এ রূপ করতে হলে জঙ্গলে যেতে হবে। তারা দোযখে যেতে চায় না, আবার যে জিনিস দোযখে নিয়ে যাবে তা হতেও সংশোধন হতে চায় না। এ হলো সীমাহীন বেয়াকুফী ও নাফ্‌সের ধাঁকা। যা দোযখে নিয়ে যায় তার চর্চা করলে দোযখে যেতে না চাইলেও অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে দোযখে যেতে ও শাস্তিসমূহ বরণ করতে বাধ্য করা হবে। যেমন মরতে না চাইলেও মরতে হয়। যে বুদ্ধিমান সে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতাপ, গৌরব ও সার্বভৌমত্ব উপলব্ধি করে ও প্রভূর সামনে তার অক্ষমতা, অসহায়তা ও দুর্বলতার কথা চিন্তা করে। যেমন সুস্থ সবল লোক কিছুক্ষণ বুক ধড়ফড় করে মারা যায় বা কয়েকবার পাতলা পায়খানা করে দুনিয়া হতে বিদায় নেয়। সামান্য কিছুতেই যার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে তার চেয়ে অসহায় ও দুর্বল আর কে হতে পারে? এত অসহায় হয়েও সে কিভাবে মহাশক্তিশালী আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশ-নিষেধ অমান্যকারী হতে পারে? আল্লাহ্‌তায়ালা সংকল্প ও ওয়াদা যা কোরআন পাকে ব্যক্ত করেছেন তার নড়চড় হবে না, অটুট ও অপ্রতিহত থাকবে, কারণ তিনি অপরিবর্তনশীল। তাঁর হুকুম অমান্যের ফলে যে গুনাহ বা নাফরমানী হয়েছে তার শাস্তি অবধারিত।

এ শাস্তি হতে বাঁচার একমাত্র উপায় তাঁর দয়া ভিক্ষা। স্রষ্টার দয়া ভিক্ষার পদ্ধতিও আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) বলে দিয়েছেন। তাহলো, তওবাহ্ করে

www.pathagar.org

নিজ অবস্থানের পরিবর্তন করে পাপের কাজ হতে নেক কাজে ফিরে আসতে হবে অর্থাৎ দোযখে যাওয়ার কার্যাবলী পরিত্যাগ করতে হবে এবং বেহেশত লাভের কার্যাবলী করতে হবে এবং তাঁর ক্ষমা ভিক্ষা করতে হবে। এ ছাড়া দোযখ হতে বাঁচার কোন পথ নেই। আর ঈমানের সাথে মানবীয় সার্বভৌমত্ব মিশালে বা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর রিসালাত অস্বীকার বা অবহেলা করলে তিনি মাফ করবেন না বলে ওয়াদাবদ্ধ। তওবাহ্ করে ঈমানে ফিরে না এলে দোযখ অবধারিত ও অনিবার্য। বেহেশত-দোযখ নেই মনে করে যদি দোযখে যাবে না মনে করে, তবে চিরকালের জন্য দোযখে নিয়ে আল্লাহ্তায়ালা প্রমাণ করবেন যে, দোযখ আছে। আল্লাহ্তায়ালা পাক কোরআনে বেহেশ্ত ও দোযখে কাদের নিয়ে যাবেন, সেই ওয়াদাগুলোর বিষয় চিন্তা-ভাবনা করলে আল্লাহ্তায়ালার ভয় জন্মাবে এবং সৎ কার্যাবলী করতে থাকলে দোযখ হতে মুক্তি ও বেহেশ্ত লাভের আশা মনে জন্মাবে। এটাই কার্যকরী দয়ার আশা। ঈমান এনে সৎকাজ না করে যে আশা করা হয় তা হলো দুরাশা।

ভয় আর আশা নিয়ে ইবাদত করে সারা জীবন কাটাতে হয়। সাধনার চরম উন্নত স্তরে উঠলেও ভয় আরো মজবুত হয়। কারণ শেষ মুহূর্তে ঈমান নিয়ে মরতে পারবে কিনা এ ভয় হতে মুক্তি পাওয়া যায় না, এই ভয় সব সাধকগণের থেকে যায়। কারণ তকদীরে আজকের দিন বেহেশ্ত না দোযখ লিখিত হয়েছে তা কেউ বলতে পারে না। ফিরিশ্তারা দোযখে যাবে না, তবু আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদে। কারণ আল্লাহ্তায়ালা সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক, তাঁর আইনে তিনি আবদ্ধ নন; তাই ইচ্ছা করলে তিনি দোযখে দিতে পারেন যদি কোন কসুর হয়ে যায়।

যেহেতু উন্নত স্তরের সাধকগণ অন্তর চোখে আল্লাহ্র শাস্তি দেখেছেন, তাঁর কোন কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে যদি তিনি দোযখে ফেলে দেন, এজন্য তার ভীত-সন্ত্রস্ত থাকেন। আবার তাঁরা আল্লাহ্তায়ালার দয়াও দেখেছেন অন্তর চোখের সাহায্যে। তাতে তাঁদের আশাও ভয়ের মতই সমভাবে প্রবল। এই ভয় আর আশা নিয়েই ইহকালের জীবন। ভয়ে আসে পরহেযগারী, আশা নিয়ে আসে প্রেম। এমনই সুশৃংখল সুনিপুণ ব্যবস্থা আল্লাহ্ পাক করেছেন যে, ভয়ই প্রেম নিয়ে আসে, অবেশেষে দু'টি এক সাথে মিশে প্রেম হয়। নাফ্স তাযকিয়া হলে হুকুম- আহকাম পালন ছাড়া অন্য কিছুতে মজা পায় না। রিয়াযত অভ্যাস পরিণত হয়। তখন ভয় ও আশা দুটোই প্রেমে রূপ নেয়। তবে অহংকারীর মনে ভয় ও আশা স্থায়ীভাবে আসন নিতে পারে না, দুরাশা ঢুকে যায়।

www.pathagar.org

ঈমানের সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলে যাননি বা করেননি এমন নব আবিষ্কৃত মতবাদে যদি বিশ্বাস করে বা কাজ করে এবং এসব ভুল বিশ্বাসের উপর সারা জীবন কাটিয়ে দেয়, যেমন বর্তমান কালের গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম মতবাদ ইত্যাদি অথবা বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ, সাহাবীগণের উপর এবং সুন্নত জমাত ছাড়া অন্য আরেকটি ইসলামী মতবাদ দাঁড় করায় এবং এসবের উপর তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি করে বা ঈমানের প্রমাণ খুঁজে বেড়ায়, সে লোক পরহেযগার হলেও মৃত্যুর সময় যদি ভুল বিশ্বাসের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ হয়ে পড়ে তখন ইমানের দৃঢ়তা নষ্ট হয়ে ঈমানহারা হয়ে মরতে পারে। ভুল বিশ্বাসের উপর শয়তান খুবই কার্যকরী হয়। মৃত্যুর সময় ভুল বিশ্বাস দিয়েই আক্রমণ চালায়। ঈমাম রাযী (র) যুক্তি দিয়ে তওহীদ নিজে বুঝতেন এবং অন্যকেও বুঝাতেন। ত্রুটি ছিল এটুকুই যে, ঈমানে কোন যুক্তি-তর্ক নেই, এটা নির্ভেজাল বিশ্বাস। এর মধ্যে কোন যুক্তির অবকাশ নেই। ঈমান যুক্তির উপর নির্ভরশীল নয়। এ ত্রুটির জন্য ইমাম রাযী (র) এর ঈমান শয়তান হরণ করে নিতে চেয়েছিল, তখন একজন আউলিয়ার উসিলায় বিনা যুক্তি ও দলীলে শুধু বিশ্বাসের উপর আল্লাহ্‌র একত্বের সাক্ষী দিয়ে শয়তান থেকে রক্ষা পান এবং ঈমান নিয়ে ইন্‌তিকাল করেন।

এসব নানাবিধ কারণে ঈমানদারগণও ঈমান নিয়ে মরতে পারবেন কিনা সে ভয়ে থাকেন এবং মৃত্যুর সময় ঈমানহারা হওয়া থেকে আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ চান। কোরআন-সুন্নাহ ছাড়া সব কিছু অস্বীকার করে শুধু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পায়রবীতে নিমগ্ন থাকাই মৃত্যুর মহা সংকটে নিরাপদে ঈমান সাথে নিয়ে যাওয়ার একমাত্র পথ।

আবশ্যক পরিমাণ ইসলামের জ্ঞান না থাকলে, আমল সঠিক ও নেক না হলে, প্রবল সংসারাসক্তি থাকলে, আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি মুহব্বত দুর্বল হলে এবং সৎ কাজ দ্বারা ঈমানকে মজবুত না করলে মৃত্যুর সময় ঈমান হারাবার আশংকা থেকে যায়। ঈমানহারা হয়ে মরার অর্থ কাফির হয়ে মরা, যার পরিণাম চিরস্থায়ী জাহান্নাম। এর থেকে বাঁচার একমাত্র পথ কোরআন-সুন্নাহতে বিশ্বাস করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পায়রবী করা। যার জন্য নাফ্‌সের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাসাওউফ ও তরীকতের দ্বারা ঈমান মজবুত করা।

গুনাহ করে আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে তওবাহ্ করে মাফ চাওয়া ও কিছু দান-খয়রাত ও সৎকাজ করে এ ঘাটতি পূরণে সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক। মাপ না চাওয়া ও তওবাহ্ না করা মানে শাস্তি বরণ করা। যতক্ষণ আল্লাহ্‌তায়ালাকে

www.pathagar.org

ভয় করা যায় ততক্ষণ ঠিক পথে থাকা যায়, ভয় চলে গেলে ভুল পথে যাবার আশঙ্কা থাকে। তাই সর্বক্ষণ অন্তরে আল্লাহ্তায়ালার ভয় জাগ্রত রাখা অনুশীলন করতে করতে তা অভ্যাসে পরিণত করে নিতে হয়। শুধু আস্তাগফিরুল্লাহ পড়াতে কাজ হয় না, মিথ্যাবাদীর তওবাহ্ হয়। যে যত আল্লাহ্ সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞানী হয়, সে ততবেশী আল্লাহ্ভীরু ও তওবাহ্কারী হয়। সে জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিষ্পাপ হয়েও দিনে সত্তরবার তওবাহ্ করতেন। অন্তর যত রোগা হয় আল্লাহ্-ভীতি তত কম হয়। আল্লাহ্-ভীতি না থাকলে সত্যের কথা, জ্ঞানের কথা শুনলেও বুঝে না, ভাল লাগে না, রুগ্ন আত্মার লোকেরা ইবাদতে অবহেলা করে, তাদের মন নাফ্স শয়তানের আকর্ষণে চলে যায়।

আল্লাহ্-ভীতির উপর জিন ও মানুষের দোযখ হতে মুক্তি নির্ভর করে। আল্লাহ্র ভয় হৃদয়ে বদ্ধমূল করতে পারলে মনের কোমলতা লাভ হয়, মন নরম হয়। আল্লাহ্-ভীতি না থাকলে হৃদয় কঠিন ও অনাবাদী থাকে। অনাবাদী জমিনের মতই বিভিন্ন আগাছা মনে জন্মায়। যিকির দ্বারা এসব পরিস্কার করে আখিরাতের চিন্তার দ্বারা আল্লাহ্- ভীতি জন্মাতে হয়।

যার আল্লাহ্-ভীতি নেই, শুধু আশা আছে, ইবাদতে তারা গাফেল হয়। ভয় ও আশা দুটোই থাকতে হবে। এই পরিমাণ আল্লাহ্-ভীতি রাখতে হবে যা আল্লাহ্তায়ালার রহমত হতে নিরাশ না করে, আবার এটুকু রহমতের আশা থাকতে হবে যেন তা আল্লাহ্ হতে নির্ভর করে না ফেলে।

www.pathagar.org

ক্ষমা ও রহমতের আশা

ঈমানদারগণ আল্লাহ্তায়ালার শাস্তির ভয়ে অথবা তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আশায় শরীয়তের আদেশ-নিষেধ মেনে চলে। আল্লাহ্তায়ালা সন্তুষ্টি থাকলে তাকে মাফ করবেন, তার উপর দুনিয়া ও আখিরাতে রহমত ও নিয়ামত বর্ষিত হবে। স্রষ্টার সন্তুষ্টির আশা বান্দাকে ইবাদত ও যিকিরে নিবিষ্ট করে, খোদার প্রতি তাকে প্রেমময় করে। ভয় তার অবাধ্যতা ও উদাসীনতার দূর করে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এক লোককে মৃত্যুর সময় জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তুমি এখন নিজের অবস্থা কেমন মনে করতেছ? সে ব্যক্তি জওয়াব দিল, "ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমি স্বীয় পাপ-সমূহের জন্য ভীত-সন্ত্রস্ত আছি এবং আল্লাহ্তায়ালার রহমতের আশা হৃদয়ে পোষণ করছি।"

হুজুর (সাঃ) বললেন, -এ সময়ে যে ব্যক্তর হৃদয়ে এ দু'টো বস্তুর সমাবেশ হয়, আল্লাহ্তায়ালা তাকে ভয়ের বিষয় হতে নিষ্ক্রান্ত এবং তার আশা সফল করে থাকেন।

মনের কুপ্রবৃত্তি বা নাফ্সের সাথে সংগ্রাম রত হয়ে যারা যিকির দ্বারা হৃদয়কে আবাদ করে সব জঞ্জাল দূর করে পবিত্র করেছে বা করছে, ইবাদতে লিপ্ত আছে, গুনাহ হতে দূরে থাকছে, তারা আল্লাহ্তায়ালার রহমত ও মাফের আশা করতে পারে। এরূপ প্রসংশনীয় আশাকে ইসলামী পরিভাষায় 'রজা' বলে। তেমনি তওবাহ্ করে নেক কাজে লিপ্ত হয়ে গুনাহ মাফের আশা করা, আল্লাহ্ ভয়ে পরহেযগার হয়ে বেহেশতের আশা করা, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পরিপূর্ণ অনুসরণ করে তরকে দুনিয়া হয়ে আল্লাহ্ ভিন্ন সব পদার্থ দীল থেকে বের করে সর্বক্ষণ যিকির দ্বারা হৃদয়কে আবাদ রেখে আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য ও দীদারের আশা করা, ইনশাআল্লাহ্ দুরাশা হবে না। কারণ আমাদের প্রভু পরম দয়ালু, তিনি কর্মীর কর্মপ্রচেষ্টা ব্যর্থ করেন না।

কিন্তু কুপ্রবৃত্তি বা নাফ্সের ইচ্ছানুযায়ী কুপথে চলা, আল্লাহ্তায়ালার সার্বভৌমত্বকে, তাঁর প্রভূত্বকে অবজ্ঞা-অবহেলা করে মানবীয় সার্বভৌমত্বের অনুসারী সেজে নাফ্সের দাসত্ব করে, দুনিয়া হাসিলের প্রবল আসক্তিযুক্ত হয়ে শরীয়তকে অবজ্ঞা করে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পায়রবী না করে কেউ যদি আশা করে যে দোযখে যাবে না, কোন ভাবে বেহেশত পেয়ে যাবে তবে তা দুরাশা তওবাহ্ না করে, আল্লাহ্তায়ালার কাছে মাফ না চেয়ে মনে মনে আশা করে যে

www.pathagar.org

তাকে মাফ করে দেয়া হবে, সেটাও দুরাশা হবে। কারণ দুনিয়াতেও আমরা দেখি বীজ না বুনে ফসলের আশা করা, বিয়ে না করে সন্তানের আশা করা বেয়াকুবি ও দুরাশা মাত্র।

প্রত্যেক আশার পিছনে যেমন আশা অনুযায়ী কাজ থাকতে হবে, তেমনি ঈমানের পিছনে ঈমান অনুযায়ী সৎকাজ থাকতে হবে। তা হলে আল্লাহ্তায়ালার নিয়ামত ও রহমতের আশা করতে পারে। স্রষ্টার নৈকট্যের সাধনা করে নৈকট্যের আশা করতে পারে। কিন্তু দোযখের কাজ করে বেহেশতের আশা করা দুরাশা ছাড়া কিছুই নয়।

যারা আল্লাহ্তায়ালাসহ অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, সালাত কায়েম করে এবং সাধ্যানুসারে দান-খয়রাত করে, তবে নাফ্স ও শয়তানের ধোঁকায় পাপ করে ফেলেছে বা অসতর্ক অবস্থায় পাপ করে তওবাহ্ করে, মাফ চায়, তারা আল্লাহ্তায়ালার রহমতের আশা করতে পারে। কারণ আমাদের একমাত্র স্রষ্টা ও রিযিকদাতা হলেন মহাকরুণাময় ক্ষমাকারী প্রভু।

মহাবিশ্বে আল্লাহ্তায়ালার করুণা প্রবাহ লক্ষ্য করলে বুঝা যায় তিনি কত ধৈর্য্যশীল ও দয়াময়। এমনকি যারা তাঁকে অবিশ্বাস করে কাফির, যারা তাঁর সাথে শরীক সাব্যস্ত করে, যারা তাঁর আইন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে প্রতিরোধ করে তারা মহা পাপী বলে তাদের মাফ করবেন না, আখিরাতে দোযখের অনল দ্বারা মহাশাস্তি দেবেন এবং তাঁর নিয়ামতসমূহ হতে বঞ্চিত করবেন। করুণাসিন্ধু পাক কোরআনে বলেছেন- সব মানুষ এক মতাবলম্বী হয়ে কাফির হয়ে যাবার আশংকা থাকায় বর্তমান নীতি অনুযায়ী চলছে, নইলে তিনি কাফিরদের এত ধনী ও সম্পদশালী করে দিতেন যে, তাদের দালান-কোঠা, দরজা-জানালা স্বর্ণ ও রৌপ্যের হত। সেই কাফিরগণ পার্থিব দুনিয়ার জীবনে তাঁর রহমত হতে বঞ্চিত নয়।

ঈমান নিয়ে মরতে পারলে তিনি যে কতটুকু দয়ালু ও দাতা তা মানুষ দেখতে পাবে। এখন সেই দয়া ও দান মানব কল্পনার বাইরে। আখিরাতে এক পর্যায়ে আল্লাহ্তায়ালা এত দয়া দেখাবেন যে, শয়তান পর্যন্ত মনে করবে সেও হয়ত মুক্তি পাবে। কিন্তু কাফির, মুশরিক ও বিদ্রোহীদের ক্ষমা করবেন না বলে তিনি ওয়াদাবদ্ধ, আর তিনি ওয়াদা খিলাফকারী নন।

তিনি বলেছেন, "আল্লাহ্র রহমত হতে নিরাশ হয়ো না।" সূরা যুমার।

www.pathagar.org

বড় পাপিষ্ঠ ছাড়া কেউ আল্লাহ্‌র রহমত হতে নিরাশ হয় না। সামান্য সৎকাজ করে হলেও আল্লাহ্‌র রহমতের আশা করা উচিত যাতে তিনি মাফের একটা উসিলা পান।

"নিশ্চয় আপনার প্রভু মানব জাতির জন্য তাদের পাপ-রাশী থাকা সত্ত্বেও ক্ষমার অধিপতি, হুজুর (সাঃ) বলেছেন- "মহান আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেনঃ- আসমান পরিপূর্ণ হয়ে যায় এত পরিমাণ পাপ করেও যদি বান্দা আমার দরবারে ক্ষমার প্রত্যাশী হয় তবে তাকে আমি মাফ করে থাকি। আবার যদি বান্দা পৃথিবী পূর্ণ হয়ে যাওয়া গুনাহ করে আমার নিকট অনুতপ্ত হয় তবে আমিও পৃথিবী পরিপূর্ণ হওয়ার পরিমাণ দয়া প্রকাশ করে থাকি।"

তাই পাপী লোকও যদি আল্লাহ্‌র ভয়ে তওবাহ্ করে সৎকাজে লিপ্ত হয় তবে সে তাঁর দয়া হতে বঞ্চিত হবে না বলে আশা করা যায়। যার সামান্য ঈমানও আছে তারও আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও দয়া হতে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। বিশেষ করে মৃত্যুর সময় আল্লাহ্‌তায়ালার একত্ব ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর রিসালতের উপর দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহ্‌তায়ালার রহমতের আশা করে মরতে হবে। তবেই ঈমান নিয়ে মরা হবে।

আল্লাহ্‌র ভয় ও আশা সমভাবে হৃদয়ে থাকাই ঈমানের লক্ষণ। ভয় ও আশা নিয়ে ধৈর্যের সাথে যিকির ও ইবাদত করতে হবে। ভয় হতে পরহেযগারী আসে আর আশা হতে তাওয়াক্কুল ও প্রেম জন্মে। দু'টোরই দরকার। নাফ্‌সের সাথে লড়াইয়ে এ দুটি অবস্থা ঔষধের কাজ দেয়। যে ভয় হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় এবং দীল যা অপরিহার্য বলে গ্রহণ করে এবং সেই ভয়ের উপর যে কাজ হয় তা খুবই মূল্যবান। আশা তাকে সাহায্য করে।

প্রাণপণ ইবাদতে লিপ্ত হয়ে এবং সর্বদা যিকিরে ও আল্লাহ্‌র চিন্তায় হৃদয় ও চিত্তকে ব্যস্ত রাখার সাথে সাথে মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্‌র রহমত ছাড়া শুধু পরিশ্রমে কাজ হয় না। সেজন্য সর্বদা রহমতের আশা মনে জাগ্রত রাখতে হবে।

দুরাশা সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন- "তাদের মধ্যে এমন কতক নিরক্ষর লোক আছে যাদের মিথ্যা আশা ব্যতীত কিতাব সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই, তারা শুধু অমূলক ধারণা পোষণ করে।" ৪ঃ৭৮।

www.pathagar.org

শোকর

আল্লাহ্তায়ালা বলেন,-"তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদের (রহমতের সাথে) স্মরণ করব এবং আমার শোকর গোজারী কর আর আমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ো না।" সূরা বাকারা।

"আমার বান্দাদের মধ্যে অল্প লোকই শোকরকারী।" রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আহারের পর কৃতজ্ঞতা সহকারে আল্লাহ্র শোকর গোজারী করে, তার মর্যাদা রোজাদার ও সবরকারীর সমতুল্য।"

আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) আরো বলেছেন, কিয়ামত দিবসে যখন এ বাণী প্রচার করা হবে-শোকরকারী লোকগণ গাত্রোত্থান করুক' তখন কেবল প্রত্যেক অবস্থায় আল্লাহ্র প্রতি শোকরকারীগণ ব্যতীত আর কেউ দন্ডায়মান হবে না।"

হযরত আবু বাকরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, "যখন কোন সুখের সংবাদ রাসূল করীম (সাঃ) এর নিকট পৌছত, তিনি আল্লাহ্র নিকট শোকর জ্ঞাপনার্থে সিজদায় পড়ে যেতেন।" তিরমিজী।

আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন,- "আমিতো মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুক্র বিন্দু হতে, তাকে পরীক্ষার জন্য, এজন্য তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তিসম্পন্ন। আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি। হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় অকৃতজ্ঞ। অকৃতজ্ঞদের জন্য আমি প্রস্তুত রেখেছি শৃংখল, বেড়ী ও লেলিহান শিখা" (৩১ঃ২২-৪)।

এখানে মানব সৃষ্টির অন্যতম উদ্দেশ্য যে স্রষ্টার প্রতি শোকর গোজারী করা তা ব্যক্ত হয়েছে।

আল্লাহ্তায়ালা আমাদের অস্তিত্ব দান করেছেন, অস্তিত্বের পূর্বে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলাম না, ঘৃণিত এক ফোটা শুক্র বিন্দু ছাড়া। অস্তিত্বের সাথে ছয়টি মহামূল্যবান ইন্দ্রিয় দান করেছেন। পাঁচটি জ্ঞান-ইন্দ্রিয় যা বাইরে থেকে জ্ঞান আহরণ করে; আরেকটি এ সবের সমন্বয়কারী অন্তর ইন্দ্রিয় দীল দান করেছেন। যার দ্বারা অদৃশ্য সত্য দেখতে ও শুনতে পারে। স্রষ্টা মানুষকে ছয়টি জ্ঞান-ইন্দ্রিয় ছাড়া হাত, পা, মস্তিষ্ক ইত্যাদি সুসম অংগ-প্রত্যংগ দান করেছেন। এগুলো আল্লাহ্তায়ালার প্রদত্ত নিয়ামত। এসব নিয়ামতের শোকর গোজারী করা দরকার।

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুসমূহের সহযোগীতায় ও সাহায্যে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করা হচ্ছে। আল্লাহ্তায়ালার আদেশ ও ইচ্ছায় বস্তুসমূহ

www.pathagar.org

ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কাজ করছে। তিনি তাদের সৃষ্টি করে এ কাজে নিয়োগ করেছেন। এদের এমন কৌশলে সৃষ্টি করেছেন যে তারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সহযোগীতা ও সাহায্য করতে বাধ্য হচ্ছে। এ ভাবে আল্লাহ্তায়ালা আমাদের প্রতিপালন করছেন। তাপ, বাতাস, পানি, মাটি, গ্যাস ও উদ্ভিদ আমাদের প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করতে বাধ্য হচ্ছে। আবার তাদের অস্তিত্ব অন্য শক্তির দ্বারা রক্ষা করছেন। ব্যালেন্স বা ভারসাম্য সঠিক রাখার বিপরীত বস্তু-সকল সৃষ্টি করেছেন। আমাদের অস্তিত্বের পক্ষে বিপদজনক বস্তু ও প্রাণীসমূহও ভারসাম্য রাখার জন্য এবং আমাদের অস্তিত্বের জন্য অতি প্রয়োজনীয়। খেলাচ্ছলে কিছুই সৃষ্টি করেননি। রহমতের পাশাপাশি অকৃতজ্ঞদের শাস্তি দিয়ে বিনীত করার জন্য এবং তাঁর শাসন পরিচালনার জন্য প্রকৃতিতে কিছু গজবের বস্তু ও প্রাণী রেখেছেন। তবে সর্ব অবস্থায় তার গজবের চেয়ে রহমত শতগুণ বেশী কার্যকর রাখেন। শাসন না থাকলে মানুষরূপী হিংস্র হায়েনাদের যুলুমে পৃথিবী মানুষের বসবাসের অযোগ্য হয়ে যেত।

সব কিছু মানব জাতির প্রয়োজনে ও উপকারার্থে সৃষ্টি করে মানব জাতির কাজে লাগানো হয়েছে। সঠিক ভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে সব কিছু উপলব্ধি করা যাবে। সার্বজনীন উপকারকে যারা উপকার বলে মনে করে না, সংকীর্ণতা ও অপরিবত্রতায় আক্রান্ত হয়ে মানসিক ভাবে তাদের আত্মা রোগগ্রস্থ হয়ে পড়েছে, তাদের বোধশক্তি নিস্তেজ হয়ে গেছে। আল্লাহ্তায়ালার দয়া ও জ্ঞান সার্বজনীন। ইহকালে তাঁর দয়া ও জ্ঞান কাফির-মু'মিন সবাই পেতে পারে। কাফির ও ফাসেকের তাদের মানসিক কালিমার কারণে অদৃশ্যের ব্যাপারে বোধশক্তি নিস্তেজ ও অকেজো হয়ে যায়, ফলে সত্য উপলব্ধি হতে বঞ্চিত হয়। সত্যে বিশ্বাসের কারণে মুমিনগণের বোধশক্তি প্রখর হয়।

সত্য উপলব্ধির কারণে মুমিনগণ আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ হয়, শোকর করে। কাফির ও ফাসেকগণ সত্য উপলব্ধি করতে পারে না, শোকর করে না, কৃতজ্ঞ হয় না। তারাই কাফির ও ফাসিক যারা আল্লাহ্র নিয়ামতের জন্য আনন্দিত হয়, যিনি নিয়ামত দান করেছেন তাঁর প্রতি শোকর না করে যার উসিলায় নিয়ামত আসে, তাকে ও নিজকে নিয়ামত প্রাপ্তির কারণ স্বরূপ মনে করে। আসল নিয়ামত দাতাকে চিনে না, জানে না, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হয় না। তারা প্রকৃতিকে চিনে, জানে, কিন্তু বিশ্ব প্রকৃতির স্রষ্টাকে জানতে চায় না। মহাবিশ্বের সার্বজনীন স্রষ্টা ও নিয়ামতদাতার প্রতি শোকর করে না, কৃতজ্ঞ হয় না।

www.pathagar.org

অথচ মানুষ উপকারীর গোলাম। আল্লাহ্তায়ালা ছাড়া কেউ বিনা স্বার্থে কারো উপকার করে না। যদি কেউ স্বেচ্ছায় অন্যের উপকার করে তবে আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য তাঁর হুকুম মুতাবিক কেবল, তাঁর তাবেদার কাউকে অন্যের উপকার করে। মানুষ ও প্রকৃতির সাহায্যে আল্লাহ্তায়ালা অনুক্ষণ মানুষের উপকার করে চলেছেন। আল্লাহ্তায়ালা ছাড়া মানুষের নিঃস্বার্থ উপকারী কেউ নেই। উপকারের প্রতিদানে মানুষ যদি তাঁর আদেশ-নিষেধ না মানে, তবে তার অস্তিত্বের জন্য স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শোকরগোজারী করা হয় না। আল্লাহ্তায়ালা প্রকৃতির দ্বারা অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য অনুক্ষণ যে মানুষের উপকার করে চলেছেন সেটা আন্তরিকভাবে স্বীকার এবং মুখে স্বীকারোক্তি আল হামদুলিল্লাহ্র দ্বারা করা যায়। ইবাদত ও তাঁর যিকির দ্বারা এতে কিছুটা পূর্ণতা আনা যায়। তবে এত উপকারের শোকর করা মানুষের সাধ্যের বাইরে। যে এই সামান্য শোকর গোজারীও করবে না, সে স্রষ্টার নিকট অকৃতজ্ঞ ও নাফরমান বলে গণ্য হবে।

আল্লাহ্তায়ালা বলেন, -"তোমরা অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ্ তোমাদের মুখাপেক্ষী নহেন, তিনি তাঁর বান্দাদের অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন না। যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তিনি তোমাদের জন্য ইহাই পছন্দ করেন" (৩৯ঃ৭)।

আমাদের অস্তিত্ববান করা হয়েছে মা এবং বাবার উসিলায়। আমাদের অস্তিত্বের জন্য আল্লাহ্তায়ালার প্রতি শোকর গোজারীর সাথে সাথে তাঁরই নির্দেশে মা-বাবার খিদমত করে ও কথাবার্তা, আচার-আচরণে তাদের মনে দুঃখ-কষ্ট না দিয়ে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে হবে। তেমনি আল্লাহ্তায়ালা যাদের উসিলা করে আমাদের নিয়ামত দান করেন বা উপকার করেন তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞ থাকতে হবে। তবে এ কৃতজ্ঞতা আল্লাহ্তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতার উপলক্ষ্য বলে মনে করতে হবে।

আমাদের ছয়টি জ্ঞান-ইন্দ্রিয় ও অংগ-প্রত্যংগ দান করে সে গুলি সুস্থ রাখার বন্দোবস্ত করেছেন, সে জন্য স্রষ্টার শোকর আদায় করতে হবে।

পাশ্চাত্যের আংশিক জ্ঞানের পন্ডিতগণ দীল বা হৃৎপিন্ডকে আত্মা বলে জ্ঞান-ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা পাঁচটি বলে উল্লেখ করেছেন। আসলে হৃৎপিন্ড পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সমন্বয়কারী একটি জ্ঞান-ইন্দ্রিয় বলে জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা ছয়টি। কলব বা দীল ও মস্তিষ্ক আত্মা নয়, আত্মা চৈতন্য সৃষ্টিকারী আল্লাহ্র আদেশের অদৃশ্য পদার্থ যা সর্ব শরীরব্যাপী বিরাজমান থাকে। দীল ও দেমাগ বা মস্তিষ্কের দ্বারা আত্মা পুষ্টি লাভ করে। আল্লাহ্তায়ালা পাক কোরআনে নেয়ামত হিসাবে বার বার চোখ ও কানের সাথে হৃদয়ের উল্লেখ করেছেন। হৃৎপিন্ড যে একটি ইন্দ্রিয় তাতে কোন

www.pathagar.org

সন্দেহ নেই। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের জন্য একটি করে পৃথক অংগ আছে, মনের জন্য আছে হৃৎপিন্ড। জ্ঞান-ইন্দ্রিয়ের সমস্ত গুণ হৃৎপিন্ড বহন করে।

পাশ্চাত্য পন্ডিতগণ মনকে আত্মা বলেন যা ভুল। আত্মা সূক্ষ্ম দেহের মধ্যে সর্বশরীর ব্যাপী বিরাজমান আছে, যার দ্বারা শরীর চৈতন্যময় থাকে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হতে আমরা জেনেছি, আদম (আঃ) এর আত্মা সর্বশরীরে ব্যাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি দাঁড়াতে পারেননি। হৃৎপিন্ডে আত্মা যাবার পর তাঁর সর্বশরীর চৈতন্যময় হয়নি। তাই মনকে আত্মা বলে দাবী করা ভুল।

নিজ শরীরের প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় ও অংগ-প্রত্যংগের সৎ ব্যবহার করাই হল সেগুলোর শোকর আদায় করা। সেগুলোকে তাঁর আদেশ-নিষেধ মুতাবিক পরিচালনা করার অর্থ হল তাঁর দেয়া নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। যেমন চোখ দ্বারা দুনিয়ার সব কিছু দেখে তাঁর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা করা। চোখ দ্বারা স্রষ্টার সৃষ্টি বৈচিত্র্য, শিল্প নৈপুণ্য ও তাঁর নিদর্শনাদি দেখে, তাঁর অনন্ত মাহাত্ম্য ও অসীম ক্ষমতা উপলব্ধি করা। মানুষ ও জিনের প্রতি আল্লাহ্তায়ালার ফরমান কোরআন শিক্ষা, অধ্যয়ন করা, রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস অধ্যয়ন করে জ্ঞান লাভ করা ও সে অনুযায়ী জীবন যাপন করার মাধ্যমে চোখের শোকর আদায় করা। আল্লাহ্র দেয়া রিযিক অন্বেষণ ও আত্মরক্ষা চোখের দ্বারা হয়। এ জন্যই স্রষ্টা আমাদের দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন।

কিন্তু চক্ষুরূপ নিয়ামতকে যদি স্রষ্টা যে উদ্দেশ্যে চক্ষু দান করেছেন সে উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করে তার অপব্যবহার করে পরস্ত্রীর রূপ-লাবণ্যের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে দেখে এবং তাকে বাগে এনে নগ্ন সৌন্দর্য্য দর্শন ও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, কামভাবে কিশোর বালকদের প্রতি নজর দেয়া, অশ্লীল বই পড়ে, অশ্লীল সিনেমা, ভি,সি, আর দেখে চক্ষুরূপ নিয়ামতের অপব্যবহার করে তবে স্রষ্টার নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। চোখের সাহায্যে নিষিদ্ধ কাজসমূহ করা যেমন অকৃতজ্ঞতা, তেমনি পাপ। দৃষ্টি শক্তির সৎ ব্যবহার করাই হলো স্রষ্টার শোকর করা।

ক্বদমীয়া তরীকার কামেল মুকাম্মেল শায়েখ ও আমার পীর মহাত্মা মরহুম আবদুল (রহঃ) আনসারী (র) সাহেব আমাকে বলেছিলেন- কোন লোক যদি প্রতিদিন নিয়মিত কোরআন পরে তবে তার চোখ আল্লাহ্তায়ালা নষ্ট করবেন না। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে চোখে ছানি পড়ছে এমন লোকও যদি প্রতিদিন ভক্তি সহকারে নিয়মিত কোরআন পড়ে ও নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকে তবে

www.pathagar.org

যতটুকু ছানি পড়েছে এর বেশী পরদা বাড়ে না। এর কারণ হলো চোখের শোকরিয়া আদায় করা হয়েছে।

ইন্দ্রিয় ও অংগ-প্রত্যংগ বিকল হওয়ার রহস্য এর মধ্যে নিহিত। ব্যক্তি বিশেষের হিসাবে বিভিন্ন কারণ থাকলেও ইন্দ্রিয় ও অংগ প্রত্যংগ বিকল হওয়ার অধিকাংশ কারণ সে অংগের বা ইন্দ্রিয়ের অপব্যবহার দ্বারা স্রষ্টার প্রতি অকৃতজ্ঞতার ফলে ঘটে থাকে। অবশ্য জন্মান্ধের কথা আলাদা। অনেক সময় পাপরাশী মোচনের জন্যও আল্লাহ্তায়ালা ইন্দ্রিয় ও অংগের কার্যকারীতা বিলুপ্ত করেন।

কানের শ্রবণ শক্তি এজন্য দান করা হয়েছে যাতে সে অন্যের কথা শুনতে পারে, স্রষ্টার আয়াত ও আযান শুনতে পারে, ওয়ায-নসিহত শুনে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। এসব প্রয়োজনীয় বিষয়াদি শুনে যদি সে মতে বিশ্বাস করে জীবন যাপন করে তবে সে কৃতজ্ঞ বান্দা হলো। কিন্তু যদি গান ও নৃত্যের নূপুরের ঝংকার শোনার জন্য নিজকে নিয়োজিত করে, তবে সে অকৃতজ্ঞ হলো। নিষিদ্ধ বিষয়াদি শ্রবণে মনযোগী হওয়া মানে নাশোকরকারী হিসাবে গণ্য হওয়া ও শ্রবণ শক্তির অপব্যবহারকারী হিসাবে গণ্য হওয়া বুঝায়। গান-বাজনা ভালবাসা ও তার প্রসংশার জন্য বধিরতা দেখা দিতে পারে।

জিহ্বার দ্বারা যদি মিথ্যা বলে, অশ্লীল ও দেমাগী বাক্য বলে পরনিন্দা ও কুটনামী করে, তবে বাক শক্তির অপব্যবহারকারী হয়ে স্রষ্টার নিকট অকৃতজ্ঞ হয়। যদি সত্য কথা, কোরআন-সুন্নাহর বাণী অপরকে শোনায়, সৎ কাজে আদেশ, অসৎ কাজে নিষেধ করে এবং ওয়ায-নসিহত করে, তবে জিহ্বার শোকর করলো। জিহবা বাক শক্তির সাথে সাথে স্বাদ ও খাদ্য গ্রহণের ইন্দ্রিয়ও বটে, হারাম খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করলে জিহ্বার সাথে সাথে পাকস্থলী ও যকৃতের মত নিয়ামতের প্রতিও অকৃতজ্ঞ হলো, ফলে গোটা দৈহিক অস্তিত্বের জন্যও স্রষ্টার প্রতি অকৃতজ্ঞ হলো।

হাত দ্বারা কাজ কর্ম করা যায়, পা দ্বারা স্থানান্তরে যাওয়া যায়। হাত দ্বারা দান-খয়রাত, কোরআন-হাদীসের এবং এসবের অনুগামী কিতাবসমূহের পাতা পড়ার জন্য উল্টানো যায়। এ সবের অনুকুলে বই-পুস্তক লেখা যায় ও বিভিন্ন সৎ কাজ করা যায়। ফলে হাতের শোকর আদায় হয়। হাত ও পায়ের দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সুন্নত সামরিক ট্রেনিং নিলে বা জিহাদ করলে হাত-পায়ের শোকর আদায় হয়। পায়ের দ্বারা কোরআন-হাদীস শিক্ষা কেন্দ্র বা ওয়ায-নসিহতের মজলিস, জিহাদের ময়দানে গমন, বুযুর্গ ও হাক্কানী আলেমগণের

www.pathagar.org

মজলিসে গেলে পায়ের শোকরিয়া আদায় হয়। হাত-পায়ের দ্বারা নিষিদ্ধ হারাম ও পাপ কাজ করলে স্রষ্টার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়।

আল্লাহ্তায়ালা যে ধন-দওলত দিয়েছেন, তদ্বারা যাকাত, দান-খয়রাত, ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন ও অন্যের অভাব পূরণে ব্যয় করে স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা বা শোকর আদায় করতে হয়। সেই ধন-দওলত দ্বারা নিজের ভোগ-বিলাস ও প্রবৃত্তির সেবা করলে স্রষ্টার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়।

ইহ-পরকালের শ্রেষ্ঠ সম্পদ জ্ঞান ও সৎ স্বভাব। এ দুটোর দ্বারা আল্লাহ্তায়ালার দীদার, মিলন ও নৈকট্য অনুসন্ধান করা যায়। এ জন্য আল্লাহ্র বান্দাগণ যারা তাঁর সোহবত চায়, তাদের সোহবত ও উপদেশ দিয়ে চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা-তদবীর করা এবং সৃষ্টির খিদমত দ্বারা এ দুটো সম্পদের শোকর করা উচিত। জ্ঞানী-মনিষীদের উচিত কোরআন-সুন্নাহর অনুগামী বই পত্র লিখে জাহিল পন্ডিতদের আংশিক জ্ঞানের অসারতা প্রতিপন্ন করা। ঈমান-আকীদা তথা কোরআন-সুন্নাহ মুতাবিক পুস্তক রচনা করলে যেমন মৃত্যুর পর সৎ কাজ জারী বা চালু থাকে, আত্মা সওয়াব পেতে থাকে, তেমনি সুন্নত জামাতের ঈমান-আকীদা বিরোধী বই-পুস্তক রচনা করলে এটা স্রষ্টা প্রদত্ত বুদ্ধিমত্তার প্রতি অকৃজ্ঞতা প্রকাশের জন্য মৃত্যুর পর সেসবে যারা বিশ্বাস করে পাপ করবে, তার অংশও তারা পেতে থাকবে। ফলে পাপের বোঝা ভারী হতে থাকবে। যারা মানবীয় সার্বভৌমত্বের পক্ষে ও ইসলামের বিরুদ্ধে বই-পুস্তক রচনা করবে এবং যারা পড়ে তা বিশ্বাস করবে, তারা ঈমান নিয়েই মরতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে, আল্লাহ্তায়ালার অনুমোদনক্রমে শয়তান তার ঈমান হরণ করবে, কারণ সে অকৃতজ্ঞ বান্দা।

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) অনুগামী যেসব পুস্তক লিখা হয় তাতে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ইচ্ছা অনুযায়ী আদেশ ও নিষেধ করা উচিত। এতে যার নাফ্সের অহংবোধ জাগ্রত হয় এবং কেন উপদেশ দেওয়া হচ্ছে বলে লেখকের প্রতি গোস্বা আসে, মনে এভাব উদয় হলে তার মনে করা উচিত যে, সে পাপীষ্ঠ ও আল্লাহ্র দরবারে শাস্তিযোগ্য অপরাধী। তার মুক্তি পেতে হলে তওবাহ্ করা অপরিহার্য। বড় পাপীষ্ঠ ছাড়া আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) এর আদেশ-নিষেধে গোস্বা আসতে পারে না, তার দীল সীলমোহরাংকিত।

ইহ্-পরকালের সবচেয়ে ক্ষতিকর জিনিস হল মূর্খতা ও অসৎ স্বভাব। এদু'টো বিষয় দুনিয়া-আখিরাতের দু'টো কালের জন্য মহা বিপজ্জনক, যার ফলে আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামতের অপব্যবহার ঘটে। অলসতার কারণেও নিয়ামতের অপব্যবহার ঘটে থাকে।

www.pathagar.org

সন্তানের জন্য পিতা-মাতার কৃতজ্ঞতা হল তাকে ইসলামের জ্ঞান দান করা এবং সন্তানের সৎ স্বভাব সংগঠনে সাহায্য করা। যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সৎ স্বভাব সংগঠন করে, সে গুলোতে ভর্তি করা। মানবীয় সার্বভৌমত্বের প্রবক্তারা যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত করে, সেগুলোতে চরিত্র গঠনের অনুশীলন তাদের কারিকুলাম বা পাঠ্যসূচীতে নেই, এর উপর কোন নম্বর নেই। এরা আল্লাহ্তায়ালার বান্দাদের শোকরকারীরূপে সৎ স্বভাব বিশিষ্ট চরিত্রবান করে গড়ে তোলে না। সন্তানকে যদি সুশিক্ষা না দিয়ে মানবীয় সার্বভৌমত্বের ও প্রবৃত্তির সেবাদাস রূপে গড়ে তোলে, তবে রাষ্ট্র ও সমাজে তার বিষক্রিয়া ছড়াবে এবং পিতা-মাতাকে কষ্ট দেবে, যা তারা দু'হাতে অর্জন করেছে আল্লাহ্র প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ে। মৃত্যুর পর যে দোয়ার সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, এমন সন্তান রেখে গেছে যারা হয়ত দোয়াতেই বিশ্বাস করে না। যে শাসকগণ মানবীয় সার্বভৌমত্বের শিক্ষা-দীক্ষা দেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, সেসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা তাদের কষ্ট দেবে।

মনে রাখতে হবে দুনিয়ার সম্পদ যে কারণের দ্বারা বা উসিলা মারফত আল্লাহ্তায়ালা দান করেন সেই মধ্যবর্তী কারণকে যে কোন অবস্থায়ই যেন নিয়ামতের কারণ বলে মনে করা না হয়, আল্লাহ্তায়ালাই আসল কারণ, উসিলা নয়। তা না হলে শোকর হবে না। কারণ নামক আগাছা মন হতে উঠিয়ে একমাত্র আল্লাহ্তায়ালাকে নিয়ামতদাতারূপে জানতে হবে। কার্য-কারণ হল নিয়ামত পাওয়ার একটি পদ্ধতি, যা পরদা। কাজ করা ও দোয়া চাওয়া স্রষ্টার নিকট হতে নিয়ামত পাওয়ার একটি পদ্ধতি। যেমন সন্তান চাইতে হলে বিয়ে ও দোয়া দু'টোরই দরকার।

শরীরের প্রতিটি ইন্দ্রিয় ও অংগ-প্রত্যংগ দয়ালু আল্লাহ্তায়ালার এক একটি অমূল্য দান। তিনি যে অংগকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তাঁর সার্বভৌমত্বের আনুগত্যে থেকে সেটাকে সে কাজে নিয়োগ করতে হবে।

আমাদের অস্তিত্ব বা সর্বাংগের শোকর একমাত্র নামায ও রোযার দ্বারা সম্পন্ন করা যায়। অস্তিত্বের উসিলা স্বরূপ মা-বাবার খিদমত করা জরুরী। স্রষ্টার এ নির্দেশ দিয়েছেন, তাদের খিদমত স্রষ্টার সন্তুষ্টির কারণ স্বরূপ হবে।

ইন্দ্রিয় ও অংগ-প্রত্যংগসমূহকে স্রষ্টার পছন্দনীয় কাজে নিয়োজিত রাখলে শোকর পালন করা হয়। দীল ও জিহবার সাহায্য যিকির করলে উভয় অংগের শোকর করা হয়। অন্তর যেহেতু আল্লাহ্তায়ালাকে পাওয়ার স্থান, পবিত্রতার উৎসমূল, পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের সমন্বয়কারী ইন্দ্রিয় বলে অন্তর দ্বারা যিকিরের সাথে সাথে কোরআনের আয়াতসমূহ, আখিরাত, স্রষ্টার মহিমা ও সৃষ্টি নৈপুণ্য সম্বন্ধে

www.pathagar.org

চিন্তা-ভাবনা করলে অন্তর ও মস্তিষ্কের বা মানসিক শক্তির শোকর আদায় করা হয়। সুস্থতা, শক্তি, পরমায়ু ও সময়কে আল্লাহ্তায়ালার আদেশ-নিষেধ ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পায়রবীতে কাটাতে পারলে জীবনের শোকর আদয় হয়, যদিও মানুষের পক্ষে আল্লাহ্তায়ালার নিয়ামতসমূহের যোগ্য শোকর আদায় করা সম্ভব নয়, তবু যতটুকু সম্ভবপর হয়, শোকর আদায় করলে অনেক আসমানী ও জিসমানী বিপদ-আপদ হতে বেঁচে থাকতে পারে। অকৃতজ্ঞ হলেই বিপদ-আপদে গ্রেফতার হতে হয়। তবে পরীক্ষা ও আত্মাকে সবর দ্বারা শক্তিশালী করার জন্য কিছু বিপদ-আপদ আসা স্বাভাবিক।

ঈমানদার মানুষ বিপদে সবর করে। তবে আল্লাহ্তায়ালার বান্দাদের মধ্যে যারা উন্নত আত্মিক কামনা করেন, তারা সব রকম বিপদ-আপদে শোকর করেন। কুফরী ও পাপ করা ব্যতীত সকল কিছুতেই কিছু না কিছু মঙ্গল নিহিত আছে। পাপ কাজ অন্যে করলে নিজে করেনি বলে শোকর করা উচিত।

আপদ-বিপদে, রোগে-শোকে, দুঃখ-দারিদ্র্যে এবং আকাংখিত নিয়ামত না পেয়ে ও সর্ব-অবস্থায় এটা আল্লাহ্তায়ালার দ্বারা হয়েছে, হয়ত তার কোন মঙ্গলের জন্য হয়েছে মনে করে শোকর করলে মনে আরো উন্নত অবস্থা রেযা বা সন্তুষ্টি জন্মে। রেযা থেকে আল্লাহ্তায়ালার প্রতি তাওয়াক্কুল ও প্রেম জন্মে। আধ্যাত্মিক শাখা-প্রশাখার মধ্যে স্রষ্টার প্রতি মুহব্বত একটি উন্নত অবস্থা।

দুনিয়ার কোন কাজে বিপদ এলে বা ক্ষতিগ্রস্থ হলে মনে করতে হবে যে, ক্ষণস্থায়ী সংসারের সম্পদ বিনষ্ট হয়েছে, ঈমান সঠিক আছে, এর বদলে দুনিয়া বা আখিরাতে আরো উৎকৃষ্ট সম্পদ আল্লাহ্ পাক আমাকে দান করতে পারেন; আমাদের কোন মঙ্গলের জন্য তিনি তা নিয়ে গেছেন। তেমনি রোগ-শোক ও বিপদে আক্রান্ত হলে এর চেয়ে কঠিনতর রোগ-শোক ও বিপদ আসেনি বলে শোকর করা উচিত। ঈমানদারগণের ইহকালের বিপদে আখিরাতের বিপদ কেটে যায়, আখিরাতে রক্ষা পাওয়ার উসিলা স্বরূপ হয়, পাপ কেটে যায় বলে বিপদেও শোকরিয়া আদায় করতে হয়। আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) বলে গেছেন, "আল্লাহ্তায়ালা যাকে পৃথিবীতে বিপদ দিয়ে থাকেন, আখিরাতে তাকে কঠিন বিপদ দেবেন না।"

বিপদ-আপদ, সন্তানহানী, রোগ-শোক, দুঃখ-দারিদ্র আল্লাহ্তায়ালার দ্বারা ঘটে, কতগুলো আমাদের কৃতকর্মের শাস্তি স্বরূপ আসে, কতগুলো ঈমান পরীক্ষার জন্য বা তকদীর অনুযায়ী দেন। এ জন্য আল্লাহ্ পাকের প্রতি মনে মনে অসন্তুষ্ট না হয়ে আখিরাতের ভীষণ আযাব ও বড় শাস্তি ও যন্ত্রণা হতে রক্ষা পাবে বলে শোকর করা উচিত। অসন্তুষ্ট হয়ে তার কোন লাভ হবে না, কারণ

www.pathagar.org

এতে তা ফিরবে না, বরং অসন্তুষ্টির ফলে আরো বিপদ-আপদে গ্রেফতার হওয়ার আশংকা আছে। সন্তুষ্টির দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাতে নিয়ামত প্রাপ্তির দরজা খুলে যাবে, পাপ মাফ হবে।

এটুকু জেনে রাখা দরকার যে, মানুষের সারা জীবনে ভাল-মন্দ পর্যায় ক্রমে কি কি ঘটবে তা পূর্বেই নির্ধারিত রাখা হয়েছে, লাওহে মাহফুযে লিখিত আছে। জন্মের পর হতে একে একে তা প্রকাশ পেতে থাকে। বিপদ-আপদে মানুষ নিরহংকারী ও তরকে দুনিয়া হওয়াতে সাহায্য করে যা সাধকগণের কাম্য। প্রতিটি আপদ-বিপদ স্রষ্টার পক্ষ হতে সর্তকীকরণ ও শাসন, যা ঈমানদার মানুষকে তাঁর প্রতি আরো নিষ্ঠবান করে দেয় এবং তাবেদার দাস হতে সাহায্য করে, এ কারণে সর্বাবস্থায় শোকর করা কর্তব্য। আপদ-বিপদ সীমাবদ্ধ, তার নিয়ামত সীমাহীন। আপদ-বিপদ, রোগ-শোক স্রষ্টার স্নেহের শাসন যা সন্তানের প্রতি পিতা-মাতা করে থাকেন। বিপদ-আপদে সন্তুষ্ট থাকলে সওয়াব লাভ হয়, শোকর করলে সওয়াবের উপর বাড়তি সওয়াব হয়। সম্পদ স্বরূপ নিয়ামতের যে শোকর করে না, বিপদ-আপদে যে আহাজারি করে, তার জন্য কোন মঙ্গল নেই।

আল্লাহ্তায়ালা যদি দুনিয়া-আখিরাতের কোন নিয়ামত দান করেন, সাধারণত তা ফিরিয়ে নেন না, যদি না বান্দা বার বার কবিরা গুনাহ্র দ্বারা তা পরিবর্তন না করে অর্থাৎ কৃতঘ্ন না হয়। অনেক সময় আধ্যাত্মিক ব্যাপারে নিয়ামত না পেয়েই নাফ্সের ধোকায় মনে করে নিয়ামত পেয়েছে। ধোঁকা চলে গেলে মনে করে নিয়ামত ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।

নিয়ামতের মূল্য ও মর্যাদা উপলব্ধি করা ও সঠিক ভাবে শোকর আদায় করতে নিজকে অক্ষম জানাই শোকর। আল্লাহ্তায়ালার নিয়ামত দ্বারা তার নাফরমানী করা ও নিয়ামতের দাতা আল্লাহ্তায়ালা বলে না জানাই অকৃতজ্ঞতা। নিয়ামতের প্রতি আকৃষ্ট ও মনযোগী না হয়ে নিয়ামত দাতা আল্লাহ্তায়ালার প্রতি আকৃষ্ট ও মনযোগী হওয়ার নাম স্রষ্টার সাথে সদাচরণ করা।

আল্লাহ্তায়ালার আদেশ-নিষেধ মানা, তাঁর অবাধ্য না হয়ে সব সময় নিয়মিত ফরজ, সুন্নত ইবাদতগুলো করা, সর্বক্ষণ তার যিকিরে ব্যস্ত থাকা, তাঁকে না ভোলা-তিনি যে সবসময় আমাদের সাথে আছেন, সবকিছু দেখছেন, আমাদের মনের কথা জানছেন, এ সত্য মনে গেঁথে নিয়ে তাঁকে ভয় করা এবং যে কাজে নিয়ামত দাতা আল্লাহ্পাক অসন্তুষ্ট হন তা থেকে বিরত থাকাই হল তাঁর প্রতি শোকর বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

আপদে-বিপদে আহাজারি করা ও নিয়ামত পেয়ে তাঁকে ভুলে উল্লসিত হওয়া অনুচিত। আল্লাহ্তায়ালা বলেন,-"পৃথিবীতে বা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর

www.pathagar.org

যে সব বিপর্যয় আসে, আমি সংগঠিত করার পূর্বেই উহা লিপিবদ্ধ থাকে, আল্লাহ্‌র পক্ষে ইহা খুবই সহজ, ইহা এজন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছ তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও এবং তিনি যা তোমাদের দিয়েছেন তাতে হর্ষোৎফুল্ল না হও; আল্লাহ্ পছন্দ করেন না উদ্ধত অহংকারীদের" (৫৭ঃ২২-২৩)।

স্রষ্টার প্রতি যারা অকৃতজ্ঞ তাদের সম্বন্ধে তিনি বলেন- "মানুষ ধ্বংস হউক। সে কত অকৃতজ্ঞ।" ৮০ঃ১৭।

যারা প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ তারা কাফির বা পাপাচারী। তাদের ধ্বংস অনিবার্য। কারণ শুক্রবিন্দু হতে পরিমিত বিকাশ করে তিনি পূর্ণাংগ মানুষে পরিণত করেন। রিযিক দেন, ফলমূল ও খাদ্য দেন, পানি বর্ষণ দ্বারা। সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতিকে মানুষের অনুকুলে কাজ করিয়ে প্রতিপালন করেন, অথচ মানুষ অকৃতজ্ঞ হয়।

নিয়ামতের প্রতি বা তা পাওয়ার কারণের প্রতি লক্ষ্য না করে নিয়ামত দাতা আল্লাহ্‌র প্রতি লক্ষ্য করতে হবে। তিনি যে দয়া করে নিয়ামত দান করেছেন, সে জন্য সদা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে হবে। কখনও মনে এ ভাব আনা যাবে না যে, আমি নিজের গুণাবলী বা ক্ষমতার দ্বারা এ সব নিয়ামত অর্জন করেছি। ধন-সম্পদ, ব্যভিচার, মদ্যপান, জুয়া ও অন্যের উপর টেক্কা দিয়ে বা বিলাসিতার দ্বারা খরচ করে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত নয়।

ধন-দওলত ও দক্ষতার জন্য গর্ব না করলে ও বিনয় প্রকাশ করলে স্রষ্টার সাথে সদাচরণ রক্ষা করা হয়। আর দান-খয়রাত ও অন্যের অভাব পূরণ করে তার শোকরিয়া আদায় করতে হয়। যাকে আল্লাহ্ পাক জ্ঞান দান করেছেন তার উচিত নয় সেই জ্ঞানকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে লোকদের বিভ্রান্ত করা ও ঝগড়া-বিবাদ এবং ফেরেববাজী করে স্রষ্টার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। নিজের যোগ্যতা প্রমাণের জন্য কোরআন-সুন্নাহর অপব্যাখ্যা, আলেমগণের ইজমার ঐকমত্যের বিরুদ্ধে তর্ক-বির্তক সৃষ্টি না করে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সে জ্ঞানকে হিদায়েতের কাজে লাগানো উচিত।

দুনিয়ার প্রতি আসক্তি বর্জন করে আখিরাতের প্রতি উদগ্রীব হয়ে আল্লাহ্‌তায়ালার অন্বেষণ করতে হয়, নইলে অন্বেষণ সঠিক হয় না। অন্যের নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ার আশা ত্যাগ না করা পর্যন্ত দুনিয়ার প্রতি আসক্তিশূন্য হওয়া যায় না। তরকে দুনিয়া বা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি না এনে নিজকে দুনিয়ার ঝামেলা হতে মুক্ত করা যায় না। ঝামেলা মুক্ত না হলে যিকির ও শোকর সঠিক ভাবে আদায় করা যায় না। আবার বিশুদ্ধ সংকল্প বা ইখলাস ছাড়া এগুলোর কোনটাই হাঁসিল করা যায় না।

www.pathagar.org

ইখলাস

প্রত্যেক কাজেই নিয়ত বা ইচ্ছা থাকে। নিয়ত ছাড়া কাজ হয় না। নিয়ত যখন কাজটি করার জন্য দৃঢ় ও মজবুত হয়, তখন তাকে সংকল্প বলা হয়। নিয়তে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকলে তাকে বিশুদ্ধ সংকল্প বা ইখলাস বলা হয়।

রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের কার্যাবলীর প্রতি লক্ষ্য করেন না-তিনি কেবল তোমাদের অন্তরের দিকে লক্ষ্য করে থাকেন।" নিয়তের স্থান হলে অন্তকরণ।

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)এর আদেশ ও নির্দেশ মুতাবিক ফরজ, সুন্নত ও নফল এবং সেগুলোর অনুগামী হয়ে আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য যেসব কাজ করা হয় সেগুলোকে বলা হয় ইবাদত। রসুলুল্লাহর (সাঃ) জীবন পদ্ধতির যা কিছু অনুসরণ করা যায়, তাঁর সব কিছুই ইবাদত। দ্বীন ইসলাম বা খিলাফত কায়েমের প্রতিটি পদক্ষেপ ইবাদত রূপে গণ্য হবে। অন্য কোন উদ্দেশ্য, পাপ কাজ ছাড়া, কোরআন-সুন্নাহর অনুগামী যে কোন কাজ করাই ইবাদত বলে গণ্য হবে। আল্লাহ্ পাকের ইবাদতের জন্য নিজ শরীর ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য হালাল উপার্জন, খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান অন্বেষণ করাও ইবাদতের মধ্যে গণ্য হবে।

ক্ষমতা, নাম, যশ ও মান-সম্মান উদ্দেশ্যে না এনে আল্লাহ্র কালাম বুলন্দ করা, তাঁর সার্বভৌমত্ব, আইন-কানুন শাসনতন্ত্র ও আদালতে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা ও সংগ্রামও ইবাদত। শর্ত হল সর্ব অবস্থায় হুজুর (সাঃ) এর অনুসরণ করতে হবে। মানব প্রবৃত্তি খুবই দুষ্ট, তাঁকে অনুসরণ না করলে কোন দিকে ঝুঁকে পড়বে তার স্থিরতা নেই। ক্রোধ প্রতিশোধ পূরণ করে নিতে চাইলে বা নিয়তের সাথে আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কিছু মিশ্রিত করে পাপে লিপ্ত করবে। সব কাজের নিয়ত হবে খালেস, আল্লাহ্র ওয়াস্তে এবং কাজটি হবে রসুলুল্লাহ(সাঃ) ও তাঁর সাহাবীগণের (রাঃ) অনুসরণের মাধ্যমে, নইলে প্রবৃত্তির তাবেদারীতে চলে যাবার আশংকা থাকে। মনের আকর্ষণ সংসার ও প্রবৃত্তি হতে ফিরিয়ে আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টির দিকে নিবিষ্ট করার সাধনাই সৌভাগ্যের কারণ।

মানুষের সৎ সংকল্প বা সৎ নিয়ত ও সৎ গুণরাজীকে রিয়া বা প্রদর্শন-ইচ্ছা নষ্ট করে দেয়। রিয়া শিরকের অন্তর্গত। ইবাদতে বা আল্লাহ্র ওয়াস্তে যে কোন

www.pathagar.org

কাজের সাথে অন্য উদ্দেশ্য মিশ্রিত করলে তা গুপ্ত শিরকে পরিণত করে খাঁটি নিয়ত বিনষ্ট করে দেয়। ফলে মিশ্রিত নিয়তের কারণে ছওয়াব পাওয়া তো দূরের কথা, শিরকের কারণে তা গুনাহতে পরিণত হয়। এ জাতীয় গুপ্ত শিরক হতে তওবাহ্ করা দরকার। ঈমানদারগণও এর থেকে রেহাই পান না বলে বার বার তওবাহ্ করতে হয়। তওবাহ্ ছাড়া শিরকী গুনাহ মাফ হয় না।

হযরত শাদ্দাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে লোক দেখাবার জন্য নামায পড়ে সে শির্ক করে, যে লোক দেখাবার জন্য রোজা করে সে শির্ক করে, যে লোক দেখাবার জন্য দান করে সে শির্ক করে" (আহমদ)।

আজকাল মানবীয় সার্বভৌমত্বের ভোট পাওয়ার জন্য জনপ্রিয় হওয়ার মানসে জনগণকে দেখাবার জন্য, মুষ্টিমেয় আল্লাহ্ভীরু লোকের কার্যাবলী ছাড়া অধিকাংশ সৎকাজ করা হচ্ছে নিজেরা ভোটযুদ্ধে লাভবান হওয়ার জন্য। এতে শিরক ছাড়া ছওয়াব বা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কোনটাই অর্জিত হচ্ছে না নিয়তের কারণে।

আল্লাহ্র পথের যাত্রীরা এ সব গুনাহ হতে সাবধান। নিয়ত পরিশুদ্ধ করতে হবে। মানবীয় সার্বভৌমত্বের কুফরী এবং কুফরীর অনুকূলে সৃষ্ট বিদআত বর্জন করতে হবে এবং সংসারের প্রতি আসক্তি দূর করতে হবে। মানবীয় সার্বভৌমত্বের পূঁজা, দুনিয়ার পূঁজা, জনগণের নিকট জনপ্রিয় হয়ে ভোট নেওয়ার জন্য জনগণের অর্থাৎ গণদেবতার পূঁজা প্রভৃতি বিসর্জন দিয়ে একমাত্র আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য কাজ ও মানুষের খিদমত করতে হবে- যা হবে ইবাদত। শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির নিয়তে কোরআন-সুন্নাহর অনুগামী কাজ করার নাম ইখলাস, যদি না তাতে অন্য উদ্দেশ্য মিশ্রিত থাকে।

কাজ করার জন্য প্রেরণাদায়ক আন্তরিক সংকল্পকে বলে নিয়ত। সেই নিয়তের মধ্যে যদি আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের একটি মাত্র উদ্দেশ্য কাজ করে তবে তাকে ইখলাস বা পরিশুদ্ধ সংকল্প বলে। কিন্তু এর মধ্যে শর্ত হল আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য কুফর, শিরক বা কোন পাপ কাজ সম্পাদনের নিয়ত করা যাবে না। যেমন মানবীয় সার্বভৌমত্বের কুফ্র দ্বারা জনগণের খিদমত করার নিয়ত, ডাকাতি করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য গরীবদের মাঝে বিলিয়ে দেওয়ার নিয়ত ইত্যাদি। কেউ কেউ আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের সাথে সাথে মানবীয় সার্বভৌমত্বের নামকরণ ভৌগলিক সার্বভৌমত্ব করে একে জায়েয বা ইসলামী করতে চায়। আল্লাহ্তায়ালার সার্বভৌমত্ব ছাড়া সব রকম সার্বভৌমত্ব

www.pathagar.org

কুফ্‌রী ও ধোঁকা। সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌তায়ালারই হতে পারে, অন্যগুলি ধোঁকা ও পাপ কাজ অনুষ্ঠানের নিয়ত, যার জন্য গুনাহ হবে। পাপ পূণ্যের সাথে মিশতে পারে না। বিশুদ্ধ নিয়তের কারণে মোবাহ ব্যাপার ইবাদতে পরিণত হয়, পাপ ইবাদতে পরিণত হয় না। ফরজ, সুন্নত ও নফল ইবাদতে শুধু মাত্র আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টির নিয়ত না থাকলে তা বিনষ্ট হয়ে যায়।

আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টির নিয়তের সাথে অন্য আরেকটি উদ্দেশ্য চলে এলে গুপ্ত শিরক চলে এলো, এখলাস বিনষ্ট হলো। নিয়ত বিনষ্ট হওয়ার কারণে ইবাদত বিনষ্ট হলো। যেমন অজু করার সাথে যদি এ নিয়ত থাকে যে, অজু করলে আল্লাহ্‌র হুকুম পালনের কারণে শরীর পবিত্র হবে, আবার শরীরও ঠান্ডা হবে। নিয়তে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির সাথে শরীর ঠান্ডা হওয়া মিশ্রিত হলো। এখানে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির সাথে আরেকটি নিয়ত শরীর ঠান্ডা হওয়া জড়িত হলো। দুটি উদ্দেশ্য মিশ্রিত হওয়ার কারণে এখলাস বিনষ্ট হলো, ইবাদতও বিনষ্ট হলো। তেমনি নামাযে আল্লাহ্‌তায়ালার হুকুম পালনে তাঁর সন্তুষ্টি ছাড়া আরও উদ্দেশ্য মিশ্রিত হয়, যথাঃ লোকে ভাল বলবে, মুসল্লীদের সাথে আলাপ-পরিচয় হবে, লোকে দুষ্কৃতিকারী বলবে না ইত্যাদি। তবে তা রিয়া হলো। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্য থাকলেই বিশুদ্ধ নিয়ত নষ্ট হয়ে যাবে। ইখলাসে শুধু একটি নিয়ত থাকবে- আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি।

আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টিই তাঁর নৈকট্য, মিলন ও দীদার আনে। উচ্চকাংখী সাধকগণ সন্তুষ্টির সাথে যদি স্রষ্টার নৈকট্য, মিলন ও দীদারের নিয়ত করে এবং তা কার্যকরী করার জন্য কঠোর পরিশ্রম মারফত স্রষ্টার অনুসন্ধান করে তবে এখানে আল্লাহ্‌ ভিন্ন অন্য নিয়ত নেই বলে এটাও বিশুদ্ধ নিয়ত বা ইখলাস হল। কলবী যিকিরে নৈকট্য আনে, নিজের ইচ্ছা ও অন্য কিছুর প্রতি মুহব্বত আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও মুহব্বতে বিলীন হয়ে চরম নৈকট্য বা মিলন ঘটে, দীদার লাভ হয়। তরীকত খন্ডে বিস্তারিত বলা হবে।

মানুষের যাবতীয় কার্যাবলী নিয়তের সাথে সংশ্লিষ্ট। মানুষ যেরূপ নিয়ত নিয়ে কাজ করে সেই অনুযায়ী আল্লাহ্‌ পাক হতে প্রতিফল পাবে। যে কাজে নিয়তের সাথে পাপ মিশ্রিত থাকে, বাহ্য দৃষ্টিতে সৎকাজ হলেও তা পাপ হবে। যেমন একজন অভাবগ্রস্থ লোককে টাকা পয়সা এই নিয়তে দান করলো যে এতে করে তার সুন্দরী মেয়েটির মেলামেশার পথ সুগম হবে, নিয়তের কারণে এরূপ দানে পাপ কামাই করা হবে। আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন, -"যারা লোক দেখানোর জন্য কোরআন পাঠ করে তারা ভীষণ শাস্তি পাবে" (৪ঃ১১২)।

www.pathagar.org

শুধু সৎকাজ হলেই হবে না যদি না তার সাথে বিশুদ্ধ নিয়ত থাকে।

কর্ম অনুষ্ঠান না করেও শুধু বিশুদ্ধ নিয়তের কারণে ছওয়াব পাবে। তবে সৎকর্মটি সম্পাদনে তাকে ক্ষমতাহীন ও অপারগ হতে হবে। যেমন গরীব লোক নিয়ত করল-যদি আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমতা দেন তবে রমযান মাসে একশত গরীব লোককে কাপড় দেব, পাঁচশত গরীবকে পেট ভরে খাওয়াব। সে লোক টাকা পয়সার কারণে অপারগ হলেও নিয়তের কারণে এর ছওয়াব পাবে।

দিনরাত সকল সময়েই মনে মনে সৎকাজ করার নিয়ত করতে থাকলে সেই অনুযায়ী ছওয়াব আমল নামায় আসতে থাকবে। যার ফলে কম সৎকাজ করেও বেশী সৎকাজের ছওয়াব পাবে। এভাবে যে কেউ সীমাহীন নিয়ত দ্বারা সীমাহীন ছওয়াবের অধিকারী হতে পারে। আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) বলেছেন- "যে ব্যক্তি কোন সৎকাজ করার ইচ্ছা করে তা কার্যে পরিণত করতে না পারে তার জন্য একটি ছওয়াব লিখিত হয়" (বোখারী)।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন,- কিয়ামতের দিন মানব জাতিকে তাদের নিয়তের অনুরূপ আকারে পুনরুত্থিত করা হবে। নিরবিচ্ছিন্ন সৎ সংকল্পের বিনিময়ে এবং ফরজ-সুন্নত আদায়ের কারণে বেহেশত পাওয়ার আশা করা যায়। সৎ সংকল্পই সৎ স্বভাব ও সৎ চরিত্র গঠন করে।

সংকল্পকে সৎ স্বভাব ও সৎ চরিত্র গঠন করে।

সংকল্পকে বিশুদ্ধ রাখতে হলে সর্ব-সাধারণের শ্রদ্ধা অর্জনের কামনা-বাসনা হতে মনকে মুক্ত রাখতে হবে, নইলে রিয়া হয়ে যাবে। আলেম বা জ্ঞানীগণ পর্যন্ত এ বিপদ হতে সহজে নিজকে মুক্ত করতে পারেন না যদি না অন্তরের দিকে সদা সর্তক না থাকেন। নাম-যশের প্রলোভন ত্যাগ করে নিজকে ছোট মনে করলে এবং জনশ্রদ্ধা-আকর্ষণের অভিলাষ মন থেকে উৎপাটন করলেই ইখলাস অর্জন করা সহজ হয়।

নির্জনে সাধারণ ভাবে, আর মানুষের সামনে প্রকাশ্যে সুন্দর ভাবে নামায পড়লে, মানুষ তাকে ভাল মনে করবে, তবে তা প্রদর্শন ইচ্ছা বা রিয়া হবে। তেমনি ইসলামী আন্দোলনে গেলে বহু ভক্ত পাওয়া যাবে, লোকজনের সাথে পরিচয় হবে, খবরের কাগজে নাম উঠবে, দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিতে পরিণত হতে পারবে অথবা শাসকদের কাছ থেকে স্বার্থ আদায় করা যাবে, এরূপ নিয়তে আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টি ছাড়াও নিজ স্বার্থ জনিত অন্য উদ্দেশ্য মিশ্রিত আছে বলে তা রিয়াতে পরিণত হবে।

www.pathagar.org

রিয়ার কারণে গুনাহ হবে, ছওয়াব পাওয়া তো দূরের কথা। তেমনি কোন বুযুর্গের যদি শাসক, বড় বড় সরকারী কর্মচারী, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি মুরীদ থাকে আর কেউ এ নিয়তে উক্ত বুযুর্গের মুরীদ হয় যে, এ সব প্রভাবশালী লোকদের নেক নজরে থাকলে তার পার্থিব লাভ হবে, তাহলে এরূপ নিয়তের কারণে সে তরীকতে কোন উন্নতি করতে পারবে না এবং আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টিতে থাকতে পারবে না। কারণ তার উদ্দেশ্য দুনিয়া হাঁসিল করা।

আল্লাহ্তায়ালার আদেশ-নিষেধ মাথা পেতে নিতে হবে যাতে নাফ্সের কোন দখল বা ইখতিয়ার না থাকতে পারে। একেই বলে ইখলাস, আর ইখলাস নাফ্সের জন্য কঠিন কাজ। অপরিশোধিত নাফ্স সকল সৎকাজে তার স্বার্থ তালাস করবে, কিছু না কিছু পার্থিব স্বার্থ না থাকলে সৎকাজ করতে নাফ্স চায় না।

ইখলাস অর্জন করতে হলে নিয়তে যাবতীয় পার্থিব স্বার্থ, নাম-যশ, সম্মান, জনপ্রিয়তা বা লোকের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার কামনা-বাসনার আগাছা মন থেকে উৎপাটন করে সকল কাজ একমাত্র আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টির নিয়তে করতে হবে। মানুষের দৃষ্টির চেয়েও তীব্র ও তীক্ষ্ম নজরে স্রষ্টা তাকে দেখছেন, তার কথা শুনছেন এবং তার নিয়ত জানছেন, এ কথা মনে করে ইবাদত, হেদায়েত, ওয়াজ-নসিহত ও ইসলামী আন্দোলন করতে হবে। ওয়াজের সময় বা কথা বলার সময় শ্রোতাদের বধির ভেবে আল্লাহ্তায়ালাকে হাজির-নাজির জেনে তার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কথা বলতে হবে। তেমনি কাজ করার সময় দর্শক একমাত্র আল্লাহ্তায়ালাকে ভাবতে হবে। এ ভাবে অনুশীলন করলে ইখলাস আসবে ও ঈমান পুষ্টিলাভ করবে।

আল্লাহ্পাকের সন্তুষ্টির জন্য তাঁর সৃষ্টির খিদমত করতে হবে, কিন্তু এজন্য তাদের কাছে কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা করা যাবে না বা বিনিময় নেওয়া যাবে না। ধনী-দরিদ্র সবাই সমান নিঃস্ব, অভাবী ও হীনতাগ্রস্থ। ধনীকে বাহির থেকে সুখ-শান্তিতে আছে মনে হলেও সবাই অক্ষম, দুঃখ ও অশান্তিতে ভুগছেন। চোখের ও মনের মধ্যে পরদা দিয়ে প্রচ্ছন্ন ভাবে আল্লাহ্তায়ালা তার শাসন চালু রেখেছেন। বাহির থেকে যাকে সুখী বলে মনে হয় অনুসন্ধানে দেখা যাবে সে মোটেই সুখী নয়। সুখ দুনিয়াতে নেই, সুখ হল বেহেশতে। তবে যারা অবিরত কলবী যিকির করে তারা দুনিয়াতে কিছুটা অন্তরের সুখ অনুভব করে। তাই মানুষের দিক হতে নজর ফিরিয়ে সব কিছুর একমাত্র দাতা ও সকলের অবস্থার পরিবর্তনকারী আল্লাহ্তায়ালার কাছে কাকুতি-মিনতি করে যা চাইবার তা চাইতে হবে। অন্তর

www.pathagar.org

সঠিক না করলে আন্তরিকতা বা ইখলাস আসবে না। পার্থিব স্বার্থের পিছনে ছুটলে ইখলাসের নাগাল পাওয়া যাবে না, আল্লাহ্‌র দিকে ছুটতে হবে।

ইখলাসের একটি ফোটাও পরশমণির কাজ করে। যিনি যতটুকু ইখলাস অর্জন করেছেন তার প্রভাব অন্যের উপর ততটুকু আছর পড়বে। যে পীরের যে পরিমাণ ইখলাস অর্জিত হয়েছে, মুরিদগণের উপর তার ততটুকু আছর পড়বে। যে আলেম যতটুকু ইখলাস অর্জন করেছেন, ঈমানদার শ্রোতাদের মনে তার ওয়াজ-নসিহত ততটুকু তাছীর করবে।

মানুষের হৃদয়ে সংসারাসক্তি, পার্থিব শান্তি ভোগ ও বিলাসিতার লোভ-লালসা থাকলে ইবাদত ও অন্যান্য কাজে একমাত্র আল্লাহ্‌তায়ালার উদ্দেশ্যে বিশুদ্ধ নিয়তে দৃঢ় সংকল্প আসতে পারে না। তখন ফরজ ইবাদতের নিয়ত কষ্টে সঠিক করতে হয়। এ জন্য দোযখের শাস্তির ভয় দ্বারা মনকে ভীত -সন্ত্রস্ত করে নিতে পারলে, বারবার আল্লাহ্‌র শাস্তির চিন্তা-ভাবনা করতে থাকলে নিয়ত খালেস, দৃঢ় ও বলবান হয়, সাথে অধিক ইবাদত করতে হয় এবং সংসারাসক্তি দূর করে দিতে হয়। এরূপ করতে অভ্যস্থ হলে ধীরে ধীরে নিয়ত একমাত্র আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে করার সংকল্পে উন্নীত হয়। তখন সব কিছু একমাত্র উপকারী সত্তা আল্লাহ্‌র জন্য করা যায়। তখন বান্দা এ পর্যায়ে পৌঁছে যে, বান্দা বেহেশতের আশা ও দোযখের ভয়ে নেক কাজ না করে কেবল আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য করতে পারে।

সূরা বাইয়্যেনাতে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন,-"আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানকে বিশুদ্ধ করে তাঁর ইবাদত করুক। এ ছাড়া তাদের আর কিছুরই আদেশ দেওয়া হয়নি।"

সূরা যুমারে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন, "মনে রেখো একমাত্র খালেছ ইবাদত আল্লাহ্‌তায়ালার জন্যই।"

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "মু'আয! এখলাসের সাথে ইবাদত কর। তাতে অল্প ইবাদতই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।"

মোট কথা, প্রবৃত্তি বা নাফসের স্বার্থযুক্ত কোন ইচ্ছা ইবাদতে বা কোন কাজে আল্লাহ্‌তায়ালাকে সন্তুষ্টি করার কোন ইচ্ছা সাথে বিন্দুমাত্র যেন মিশ্রিত না হয়, সে দিকে নজর রাখতে হবে। আল্লাহ্‌তায়ালার সাথে নিয়ত বিশুদ্ধ রাখলে তিনিই অন্তর সঠিক করে দেন। নিয়ত যত বিশুদ্ধ হবে নামাযে ওয়াসওয়াসা তত কম হবে।

www.pathagar.org

সত্যপরায়ণতা

ইখলাস ও সত্য পরায়ণতা পরস্পর সম্মন্ধযুক্ত। নিয়তে, বচনে, সংকল্পে, অংগীকারে, অন্তরের ভাবের সাথে বাইরের কথা ও আচরণে এবং আল্লাহ্তায়ালার সাথে এবং মানুষের সাথে কথা ও কাজের বাস্তবতায় যে লোক সততা রক্ষা করে তাকে বলা হয় সিদ্দীক। চরম মানবতা হল সিদ্দীক পর্যায়ে যাওয়া। যারা কামিল মুকাম্মিল বা পরিপূর্ণ মানব হন, তাঁরা সিদ্দীক হতে পারেন। নবী-রাসূলগণকে পরিপূর্ণ অনুসরণ ছাড়া কেউ সিদ্দীক হতে পারেন না। নবী অনুসরণীয়, আর সিদ্দীক অনুসরণকারী হওয়ার মাধ্যমে অনুসরণীয়।

সাধারণ মানুষ নবী হতে পারে না। কারণ নবুয়ত আল্লাহ্তায়ালার মহাদান, বর্তমানে এ দরজা বন্ধ। সত্য পরায়ণতার গুণাবলীতে বিভূষিত সিদ্দীক পর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ হতে আল্লাহ্তায়ালা নবী-রাসূল মনোনীত করতেন। যদিও অনাদি কাল হতে যার ভাগ্যে নবুয়ত লিখা থাকত তাকে সিদ্দীক পর্যায়ের গুণাবলীর দ্বারা তাঁর চরিত্রকে সুসজ্জিত করেই আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে নবুয়ত দান করতেন। আখেরী যমানাতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হতে নবুয়ত খতম হয়ে গেছে। এখন তাঁর উম্মতগণ তাঁকে অনুসরণ করে সিদ্দীক পর্যায়ে যেতে পারে, যা হল নবুওতের নীচের ধাপ। এ ধাপ পর্যন্ত আউলিয়াগণ যেতে পারেন যদি নিয়ত পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে অনুসরণ করতে পারেন। সাহাবী হওয়ার কারণে আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর মর্যাদা অন্য সিদ্দীকগণের ঊর্ধ্বে তিনি সব সময়ই সিদ্দীকে আকবর বা শ্রেষ্ঠ সিদ্দীক থাকবেন। নাযিলকৃত তরীকার ইমামগণ সিদ্দীক হলেও সাহাবী হওয়ার কারণে তাঁর সমকক্ষের মর্যাদা পাবেন না।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে আরজ করা হয়েছিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ। মানুষের মানবতার চরম উন্নতি কিসে?

আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) জওয়াবে বললেন, "কথার সত্যতায় ও কাজের বাস্তবতায়।"

এটা সিদ্দীকগণের গুণ। কথার সত্যতা ও কাজের বাস্তবতা রক্ষা করতে হলে অতীত কালের ঘটনা, বর্তমান কালের কোন বাস্তব ঘটনার বর্ণনা এবং ভবিষ্যতে যা করবে সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র মিথ্যা না বলে যা কিছু মুখ দিয়ে উচ্চারিত হবে তা বর্ণে বর্ণে সত্য বলতে হবে। সত্য কথা বললে হৃদয় সতেজ ও সরল হয়।

আল্লাহ্তায়ালা সিদ্দীকগণের সংজ্ঞা এ ভাবে দিয়েছেন, "পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পূণ্য নেই, কিন্তু পূণ্য আছে কেহ আল্লাহ্,

www.pathagar.org

পরকাল, ফিরিশতাগণ, সমস্ত কিতাব ও নবীগণের উপর ঈমান আনলে এবং আল্লাহ্ প্রেমে আত্মীয়, স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্থ, মুসাফির, সাহায্য প্রার্থীগণকে এবং দাস মুক্তির জন্য ব্যয় করায়, প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করলে, অর্থ সংকটে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম- সংকটে ধৈর্য ধারণ করলে; এরাই তারা যারা সত্য পরায়ণ এবং এরাই মুত্তাকী" (২ঃ১৭৭)। এ সংকল্প বা এই ছকে যারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে তারাই সিদ্দীকের গুণাবলী অর্জন করবে।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর এসব গুণরাজি ছিল। কেউ যদি নিয়তের বিশুদ্ধতাসহ কথা ও কাজের বাস্তবতায় এগুলো ছিল। কেউ যদি নিয়তের বিশুদ্ধতাসহ কথা ও কাজের বাস্তবতায় এগুলো রূপায়িত করতে পারেন, তবে তিনি সত্য পরায়ণ বা সাদেকীনের গুণ লাভ করতে পারবেন।

সত্য পরায়ণতা লাভ করতে হলে সত্য কথা সহজ সরল ভাবে বলতে হবে, অস্পষ্টতা, বক্রোক্তি বা রূপকের আশ্রয় নিলে হবে না।

দোয়া-কালাম যা মুখে উচ্চারণ করা হয়, সে সব বাক্যের সাথে অন্তরের বিশ্বাস যদি বাহ্যিক কর্মে প্রকাশ পায় তবে সেই লোককে সিদ্দীক বলা যায়। অর্থাৎ কোরআন ও সুন্নাহর বাক্যাবলীতে আন্তরিক বিশ্বাস করে তা যদি তার কর্মে প্রকাশ করতে পারে। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। যেমন-সূরা ফাতিহাতে আছে- "আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।"

নামাযে আমরা এ সূরা পাঠ করি। এতে আমরা আল্লাহ্তায়ালাকে বলছি, তোমার ইবাদত করি এবং তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি, কিন্তু বাস্তবে যদি হারাম কাজে বা পাপে লিপ্ত হয়ে নাফসের ইবাদত করি। তেমনি নামাযে মুখে বলছি "তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি", আর বাস্তবে যদি ধনী ও প্রভাবশালীদের দুয়ারে সকাল-বিকাল ধর্না দিয়ে সংকটে তাদের সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকি, তবে আমাদের কথা ও কাজের বাস্তবতা থাকে না। আল্লাহ্র কালামে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদীসে আন্তরিক বিশ্বাস করে বাস্তব কাজে ও কথায় যিনি তা প্রকাশ করতে পারেন তিনিই সত্যপরায়ণ।

যাঁরা নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহ্র তথা শরীয়তের ইচ্ছাতে রূপান্তরিত করেন, যাঁদের নিজস্ব কোন আলাদা ইচ্ছা থাকে না, স্রষ্টার সকল বিধানের প্রতি সন্তুষ্টি থাকেন, ভাল-মন্দ সব কিছু আল্লাহ্ হতে আসে বলে বিশ্বাস করেন এবং নিজের

www.pathagar.org

ইচ্ছা শক্তিকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) এর ইচ্ছামত বিলীন করে দেন, তিনিই প্রকৃত সত্যবাদী বা সিদ্দীক। সিদ্দীক তাঁর সব কাজ ইখলাসের সাথে সম্পন্ন করেন এবং সব সময় ওয়াদা রক্ষা করেন, অন্তরে, কথায় ও কাজে এক থাকেন। এরূপ লোকের অন্তরে যা আছে বাহ্য কথা ও কাজে তাই প্রকাশ পায়। এসব গুণাবলী সবগুলো যাঁর মাঝে আছে তাঁকেই সিদ্দীক বলে। গুণাবলীর একটিও ঘাটতি থাকলে সিদ্দীক বলা যাবে না। যিনি যতটুকু সত্যপরায়ণতা অর্জন করতে পারেন, আল্লাহ্তায়ালার নিকট ততটুকু মর্যাদা লাভ করতে পারবেন।

সর্ব অবস্থায় সত্যের পক্ষপাতী হওয়া ও থাকা কঠিন। যেহেতু সত্য কোন অবস্থায়ই কারো পক্ষপাতী হয় না, এ অবস্থায়ও যিনি পার্থিব স্বার্থ ত্যাগ করেন, কোন সংকটে পড়লেও কোন কিছুর পরোয়া না করে আল্লাহ্তায়ালার উপর ভরসা করে সত্যকে আঁকড়ে থাকেন, তিনিই সত্য পরায়ণ বা সিদ্দীক। নবীগণের পরই সিদ্দীকগণের স্থান।

www.pathagar.org

তাওয়াক্কুল

যাবতীয় পদার্থ আল্লাহ্তায়ালা কর্তৃক সৃষ্ট ও সে সবের কর্মক্ষমতাও স্রষ্টা প্রদত্ত, তাঁর বিনা অনুমোদনে কারো কিছু করার ক্ষমতা নেই। তাই জীব জগত, উদ্ভিদ জগত এবং নূরী ও জড় জগতের গুণ ও কার্যাবলীর মূলে এক আল্লাহ্ ভিন্ন কিছুই নেই। মানুষ ও জীব-জানোয়ারের কর্ম ইন্দ্রিয়সমূহ আল্লাহ্তায়ালা সৃষ্টি করেছেন এবং সে সকল ইন্দ্রিয়ের কর্মক্ষমতাও তিনি সৃষ্টি করেছেন। মানুষ ও প্রকৃতির সকল কার্যকলাপ আল্লাহ্ প্রদত্ত উপাদান ও তাঁর সৃষ্ট নিয়মানুসারে ঘটে থাকে। সে সব নিয়ম শৃংখলাকে কার্যকারণ সম্পর্ক বলা হয়। অনেক সময় দৃশ্যমান জগতের সুসংগঠিত কার্যাবলীর কার্যকারণ অদৃশ্যজগত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

মানুষ তার নিজের বা সৃষ্ট পদার্থের ক্ষমতা আছে বলে মনে করে, বাস্তবে তা আল্লাহ্তায়ালার শক্তি। সকল পদার্থসহ মানুষ আল্লাহ্তায়ালার শক্তি প্রবাহের একটি মধ্যবর্তী অবস্থা। বাতাস প্রবাহিত না হলে যে রূপ বৃক্ষলতার পাতার নড়ার শক্তি নেই। তেমনি আল্লাহ্তায়ালার ক্ষমতা প্রবাহের কারণেই ইন্দ্রিয়সমূহ নড়াচড়া করে এবং কার্যক্ষম হয়। এ সব খোদা প্রদত্ত শক্তিও উৎপত্তি, বিকাশ ও লয়ের আইনের অধীন। আসলে সাকুল্য কাজের মূল কর্তা আল্লাহ্তায়ালা। আল্লাহ্তায়ালা ছাড়া কাজ করার পরিবেশ ও আনুকূল্য কেউ সৃষ্টি করতে পারে না।

আল্লাহ্তায়ালার এ একত্ব, শক্তি ও দয়ার উপর যার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তিনিই কেবল তাঁর উপর পরিপূর্ণ নির্ভর করতে পারেন। আল্লাহ্তায়ালা কার্য সম্পাদনের কারণ-উপকরণ সৃষ্টি করে দান করেছেন। কার্যকারণ ও উপকরণের উপর নির্ভর না করে এ সবের মালিকের উপর নির্ভর করে স্রষ্টার আদেশ-নিষেধ মুতাবিক পার্থিব দুনিয়ার পরিণামের দিকে না তাকিয়ে কাজ করার নাম তাওয়াক্কুল।

মানুষের সমস্ত ভাল-মন্দ কাজ আল্লাহ্তায়ালার ক্ষমতার দ্বারা সম্পন্ন হয়। সে কাজ স্রষ্টার আদেশ মুতাবিক হলে ভাল কাজ, আর তাঁর নিষেধ অমান্য করে করলে তা মন্দ কাজ, যার দ্বারা তাঁর নাফরমানী করা হয়। স্রষ্টাই ভাল-মন্দ সৃষ্টি করেছেন। ভাল-মন্দ সব কাজই পরীক্ষা স্বরূপ মানুষের সামনে আসে। যে ভালটি গ্রহণ করে সে বেহেশতের দিকে এক পা অগ্রসর হয়। যে মন্দ কাজটি

www.pathagar.org

গ্রহণ করে, সে জাহান্নামের দিকে এক পা অগ্রসর হয়। আল্লাহ্তায়ালা এই পরীক্ষাতে সাধারণত হস্তক্ষেপ করেন না, তার অনুমোদন ক্রমে সব ঘটে থাকে।

আল্লাহ্তায়ালা সূরা মাইদাহতে বলেছেন "তোমরা একমাত্র আল্লাহ্র প্রতি তাওয়াক্কুল কর, যদি মোমেন হয়ে থাক।" সূরা আল-ইমরানে বলেছেন- "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাওয়াক্কুলকারী লোকদের ভালবাসেন।"

আমাদের দয়াময় প্রভু আরো বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি তাওয়াক্কুল করে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট।" সূরা তালাক।

আল্লাহ্র রাসূল বলেছেন, "আল্লাহ্তায়ালার প্রতি দ্বিধাহীন চিত্তে যেরূপ তাওয়াক্কুল করা উচিত তোমরা যদি সেরূপ তাওয়াক্কুল করতে পার, তবে তিনি পশুপাখীর মত অজানা স্থান হতে রিযিক দান করবেন। পশুপাখীরা ভোর বেলায় ক্ষুধার্ত অবস্থায় নিজ নিজ বাসস্থান হতে বের হয়ে যায় এবং দিন শেষে পূর্ণ উদরে তৃপ্ত হয়ে নিজ নিজ বাসস্থানে ফিরে আসে।"

একদিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে উপদেশ স্বরূপ বললেন "হে বৎস! আমি তোমাকে কয়েকটি উপদেশ প্রদান করছি, খুব মনযোগের সাথে শোন এবং মনে রাখো। আল্লাহ্র প্রতি খিয়াল রাখো, তিনি তোমার প্রতি খিয়াল রাখবেন। অন্তরের সাথে তার যিকির করো, তাকে তোমার সামনেই পাবে। কিছু চাইলে, আল্লাহ্র নিকট চাও। আর খুব ভাল ভাবে বুঝে নাও- সমস্ত সৃষ্টি একত্র হয়ে তোমার কোন উপকার করতে চাইলেও আল্লাহ্তায়ালা তোমার অদৃষ্টে যা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন তা ব্যতীত কোনই উপকার করতে পারবে না। কলম উঠিয়ে রাখা হয়েছে এবং লেখা শুকিয়ে গেছে।"

সব কিছুই তকদীর নির্ধারিত আছে; সেখানে প্রচেষ্টায় কি ফল হবে, পুরস্কার ও শাস্তিই বা কেন?

আল্লাহ্তায়ালার আদেশ-নিষেধ এবং সেগুলো পালন করার পরিণামও তকদীর! তকদীরও দু'রকম, যথাঃ - অকাট্য ও পরিবর্তনশীল। আমাদের তকদীর কোনটা পরিবর্তশীল আর কোনটা অকাট্য, তা জানি না এবং তকদীরে কি আছে তাও জানি না। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা কোরআনে ওয়াদা করেছেন যে, তাঁর আদেশ পালন করলে মঙ্গল হবে, পুরস্কার দিবেন আর নিষেধ অমান্য করলে শাস্তি দেবেন। সেই ওয়াদার উপর নির্ভর করে তাঁর আদেশ-নিষেধ মান্য করার জন্যই মানুষ নবী ও রাসূলগণ কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছে। আল্লাহ্তায়ালা ওয়াদা খিলাপকারী নন, এ বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ় করে তাঁর আনুগত্য করতে হবে। তকদীরে যাই থাকুক।

www.pathagar.org

যাদের তকদীরে বেহেশত আছে সেখানে যেতে হলে জাহান্নাম হয়ে সকলকে বেহেশতে যেতে হবে। দোযখের উপর পুলসিরাত দিয়ে হেটে যেতে হবে। আমল অনুযায়ী কেউ বিদ্যুত বেগে, কেউ কষ্টের সাথে পার হবে। দোযখ যাতে তাদের নাগাল না পায়, সে জন্যই পুলসিরাতের ব্যবস্থা আল্লাহ্তায়ালা করেছেন। যারা নবী-রাসূলগণের অনুসরণ সঠিকভাবে না করেছে, পূণ্যের চেয়ে পাপ বেশী-তারা পুলসিরাত দিয়ে যেতে পারবে না, দোযখের ভিতর হয়ে বেহেশতে যাবে, লাখ লাখ বছর দোযখের শাস্তি ভোগ করে শাফায়াতে বেহেশতে যাবে, কবরে হাশরেও শাস্তি ভোগ করতে হবে। আর বেঈমান হয়ে মরলে তো চিরকাল দোযখেই থাকবে।

আখিরাতে যাতে সুখস্বাচ্ছন্ন নির্ভাবনায় করবে-হাশরে আরাম-আয়েসে থেকে অনায়াসে পুলসিরাত পার হতে পারে সে জন্যই সতর্ককারী হিসাবে নবী-রাসূলগণ আগমন করেছেন। ঈমান হলো বেহেশতে যাওয়ার একমাত্র শর্ত। আর আল্লাহ্তায়ালা ঈমান ও কুফর হতে পৃথক করেই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। ঈমান ও কুফ্রকে মানুষের সহজাত করে পাঠাননি। মানুষের সহজাত আক্লকে ঈমান গ্রহণ বা বর্জন করতে স্বাধীন ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। ঈমান গ্রহণের ডাক দেওয়ার জন্য এবং অদৃশ্যের কথা জানাবার জন্যই নবী-রাসূলগণ ধরাপৃষ্ঠে এসেছেন, যাতে কেউ না বলতে পারে যে অদৃশ্যের ও আখিরাতের কথা কেউ আমাদের জানায়নি।

যারা ঈমান গ্রহণ করে রাসূল (সাঃ)কে অনুসরণ করে নেক কাজ করেছে, নিশ্চয়ই সে বেহেশতী, আর যে নবী-রাসূলগণকে বিশ্বাস না করে মানুষের গড়া মতবাদের উপর জীবন কাটিয়েছে, বিনা তওবাহ্য় মৃত্যু হয়েছে, নিশ্চিয়ই সে দোযখী হবে। এটাই তকদীর।

আমাদের তকদীর আমরা জানি না, কিন্তু পাক কোরআনে আল্লাহ্তায়ালার ওয়াদাসমূহ জানি এবং এ কথাও জানি যে, আল্লাহ্তায়ালা ওয়াদা খিলাপকারী নন। তাই তার ওয়াদাসমূহের উপর তাওয়াক্কুল করে আমরা যদি ঈমান আনি এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর অনুসরণে নেক কাজ, ইবাদত-বন্দেগী, যিকির-আযকারে মগ্ন থাকি ও নিজকে পবিত্র করি, তবে স্রষ্টার অংগীকার মত বেহেশত লাভ করতে পারব বলে আশা করতে পারি। আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, "মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থ, কিন্তু ওরা নয় যারা ঈমান আনে ও সৎ কর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।" ১০৩ঃ২-৩।

www.pathagar.org

তকদীরে যেমন বিশ্বাস করতে হবে তেমনি আল্লাহ্তায়ালার ওয়াদাতে বিশ্বাস ও নির্ভর করতে হবে।

সবার রিযিক দানের ওয়াদা আল্লাহ্ পাক করেছেন। এতে সম্পূর্ণ তাওয়াক্কুল আনতে পারলে রিযিকের পেরেশানী ও রিযিকের জন্য পাপ কাজ হতে বিরত থেকে ইবাদতে মশগুল থাকা যায়। আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন- "দুর্ভোগ প্রত্যেকের যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে, যে অর্থ জমায় এবং উহা বার বার গণণা করে। সে ধারণা করে অর্থ তাকে অমর করে রাখবে। কখনও নয়, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়।" ১০৪-১-৪।

স্বহস্তে হালাল রুযিতে বা সুন্নত মুতাবিক হালাল ব্যবসা-বাণিজ্যে তাওয়াক্কুল নষ্ট হয় না, যদি উপায়-উপকরণের প্রতি নির্ভরশীল না হয়ে আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল থাকে। উপায়-উপকরণ আল্লাহ্তায়ালাই দান করেন। ধন সমাগম হলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দান-খয়রাত করে তা পরকালের জন্য জমা করতে হয়। উপার্জনে আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ বা শরীয়ত অমান্য করলে তাওয়াক্কুল নষ্ট হয়ে যায়, আল্লাহ্র উপর ভরসা থাকে না।

সুন্নাতের পায়রবী ছাড়া শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার দ্বারা উপার্জন হালাল নয়। স্বহস্তে হালাল উপার্জন নবীগণের সুন্নত। তাই কায়িক শ্রমকে মন্দ বলা প্রকারান্তরে সুন্নতের দোষারোপ করা। যার উপায় -উপকরণের প্রতি আকর্ষণ না থাকে, আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল থাকে, তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য করেও তরকে দুনিয়া হতে পারেন, যদি তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত দান-খয়রাত করেন।

তাওয়াক্কুল হলো আল্লাহ্তায়ালার প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ। স্রষ্টার নিকট এরূপ নির্ভরশীল হওয়া যেন গোসল দাতার নিকট মরা লাশ। গোসল দাতা যে ভাবে নাড়ায় সে ভাবেই নড়ে, যার কোনরূপ আপত্তি নেই। এরূপ হতে হলে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সুন্নতের পায়রবীতে নিজকে আবদ্ধ করে ফেলতে হবে, এ ছাড়া সকল জানা-বোঝা হতে নিজকে মুক্ত করে ফেলতে হবে।

তাওয়াক্কুল চিহ্ন হলো, তাওয়াক্কুলকারী কারো নিকট কিছু চাইবে না, কেউ কিছু দিলে সহজে গ্রহণ করবে না, আর গ্রহণ করলেও তা খরচ ও দান করে ফেলবে। আল্লাহ্পাক কোরআনে দুনিয়া ও আখিরাতে যা দিবেন বলে অংগীকার করেছেন, তা নিশ্চয়ই দিবেন। এতে কোনরূপ সন্দেহ না করাই তাওয়াক্কুল। যিনি পূর্ণ তাওয়াক্কুল হাসিল করতে পারেন, তিনি আল্লাহ্ ব্যতীত সকল সম্মন্ধ ত্যাগ করেও জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন। তাওয়াক্কুলকারীকে আল্লাহ্তায়ালা অদৃশ্য বিষয়েও জ্ঞান দান করেন, তিনি সহজেই মা'রিফাত হাসিল ও দীদারে ইলাহী লাভ করতে পারেন।

www.pathagar.org

তাওয়াক্কুল অবশ্য আল্লাহ্‌র উপর করতে হয়, কিন্তু বন্ধুত্ব বা প্রেম আল্লাহ্‌র সাথে করতে হয়, আল্লাহ্‌র উপর নয়। তাওয়াক্কুল এক তরফা, বন্ধুত্ব দু'তরফ হতেই হয়।

যুহ্‌দ, তরকে দুনিয়া, আল্লাহ্‌ভীতি, এলেম, মুজাহিদা, ভয়, আশা, সবর, রেজা, শোকর ও তাওয়াক্কুল ইত্যাদি আবশ্যকীয় জিনিসগুলো হাসিল করতে কম-বেশী কার্যকারণ সম্পর্কে যেতে হয়। যেমন আল্লাহ্‌ ভীতি হতে সংসারের প্রতি অনাসক্তি আসে, তাকওয়া লাভ করা যায়। যার ফলে যুহ্‌দ এখতিয়ার হয়। নাফ্‌সের বিপরীত কাজ করতে পারলে মুজহিদা হাসিল হয়। কোন পদার্থ বা জিনিসের স্বরূপ জানতে পারলে জ্ঞান হাসিল হবে। বান্দার একনিষ্ঠ আন্তরিকতা ও আল্লাহ্‌তায়ালার মেহেরবাণীর দ্বারা ভয় ও আশা হাসিল হতে পারে। আল্লাহ্‌তায়ালার সকল আদেশ-নিষেধ এবং মানবের মাঝে ও প্রকৃতিতে তার সকল কাজে রাজী থাকতে পারলে রেজা হাসিল হয়। স্রষ্টার সব নিয়ামতে কৃতজ্ঞ থাকলে শোকর হাসিল হয়। তেমনি তাওয়াক্কুল হাসিল করতে হলে একটি কার্যকারণ সম্পর্ক আছে তা হলো রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য ও আপদ-বিপদে সবর করতে পারলে তাওয়াক্কুল হাসিল হয়। সব কিছুতে আল্লাহ্‌ পাকের মেহেরবাণীর দরকার।

স্রষ্টার সাথে প্রেম শুধু ইবাদতের কার্যকারণে আবদ্ধ নয়। তাঁর সাথে মিলন ও নৈকট্যের ব্যাকুলতায় অস্থির হয়ে যে সর্বক্ষণ তাঁর যিকির, কৃতজ্ঞতা, তাঁকে পাওয়ার ঐকান্তিক আগ্রহে প্রতিটি মুহূর্ত কাটাতে থাকলে তার মধ্যে স্রষ্টার প্রতি প্রেম জন্মাবে। বান্দার প্রেম যদি রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বা অন্য ওলী আল্লাহ্‌র উসিলায় আল্লাহ্‌ পাক কবুল করেন, তবে বান্দা ও আল্লাহ্‌তায়ালার মধ্যে বন্ধুত্ব হয়।

আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করে জীবিকার জন্য নড়াচড়া বন্ধ করে দিতে পারে একমাত্র সিদ্দিক পর্যায়ের লোক। তা না হলে এ সব ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে পরীক্ষাকারী, আল্লাহ্‌ হতে দূরবর্তী।

কোন না জায়েয কাজের জন্য বা দুনিয়া হাসিলের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার উপর তাওয়াক্কুল করা উচিত নয়। যেমন হারাম উপার্জন, প্রতিশোধ গ্রহণ ও লোভনীয় সামগ্রী বা নারী হাসিলের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে দোয়া করতে নেই, বরং এতে লজ্জা করা উচিত। দুনিয়ার কোন শাসক বা হাকিমের নিকট

www.pathagar.org

বেআইনী কোন কিছু চাইতে যদি লজ্জা করে, তবে সবার উপর যে মালিক তার নিকট নাজায়েয কিছু চাওয়া এবং সে জন্য তাওয়াক্কুল করা কত বড় বেহায়াপনা, তা সহজেই অনুমেয়।

তাওয়াক্কুল করতে হবে আল্লাহ্তায়ালার দেওয়া অংগীকারের প্রতি। যেমন জীবিকা, গুনাহ মাফ, বেহেশত পাওয়া, আল্লাহ্তায়ালার গজব-আযাব হতে রক্ষা পাওয়া, তাঁর অনুগত বান্দা হওয়া, তাঁর দীদার ও মিলন চাওয়া এবং রসুলুল্লাহ্র চরিত্র গুণ লাভের জন্য দোয়া চাওয়া উচিত।

বান্দাকে তার কর্তব্য পালন করে তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করতে হয়। আল্লাহ্তায়ালা মুমিনগণের অভিভাবক-এ কথার উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল করে মুমিন হয়ে তার উপর পরিপূর্ণ নির্ভর করার নামই তাওয়াক্কুল।

আল্লাহ্তায়ালাকে পাওয়ার জন্য অনেকগুলো স্তর অতিক্রম করতে হয়। নীচের স্তর হলো তাঁকে স্বীকার করা, সবচেয়ে উপরের অন্যতম স্তর হলো একমাত্র তাঁর উপর পরিপূর্ণ নির্ভর করা বা তাওয়াক্কুল করা। একমাত্র আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীলতা মানুষকে মানুষের গোলামী হতে মুক্তি দেয়। ইখলাসের সাথে আল্লাহ্র উপর নির্ভর করলে সুন্দর প্রতিফল পাওয়া যায়। তাওয়াক্কুল ঈমানের একটি অতি প্রয়োজনীয় শাখা।

যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোন বস্তু বা লোকের উপর নির্ভর করে বা আশ্রয় গ্রহণ করে, তার তাওয়াক্কুল নষ্ট হয়ে যায়। তাকে আল্লাহ্তায়ালা দুনিয়াদারীর উপর ছেড়ে দেন।

যারা মানুষে গড়া মতবাদ, তন্ত্র-মন্ত্র, শুভলগ্ন, শরীরে দাগ লওয়া ইত্যাদিতে বিশ্বাস করে, তাদের তাওয়াক্কুল বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ঔষধ ব্যবহারে যদি ঔষধ ও ডাক্তারের উপর ভরসা না করে আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখে, তবে তাওয়াক্কুল নষ্ট হয় না। ঔষধ খেয়ে বা নিয়ে রোগ মুক্তির জন্য আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখতে হবে। রোগ যেমন আল্লাহ্র বিধান, তেমনি ঔষধ ব্যবহারও আল্লাহ্র বিধান। মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগেরই ঔষধ আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) রোগে ঔষধ ব্যবহার করতেন। তিনি বলে গেছেন- "হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! তোমরা রোগে ঔষধ সেবন কর।"

কেউ যদি রোগ ভোগকে সওয়াব লাভের ও পাপ মুক্তির কারণ মনে করে আরোগ্য লাভে অনিচ্ছুক হয় বা এ রোগকে মৃত্যু রোগ মনে করে বা অন্য কারণে রোগে চিকিৎসা না করে, তবে তা সুন্নাহ বিরোধী হবে না।

www.pathagar.org

আল্লাহ্তায়ালার উপর ভরসা করে তাক্ওয়া অবলম্বন করা এবং নাফ্সের বিরুদ্ধাচরণ দ্বারা সফলতা অর্জন করা সম্ভব। তার উচিত ইখলাস ও সততা অর্জন করে আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল থাকা। অন্তর সংশোধন না হলে, তার জাহেরী কাজও সংশোধন হবে না।

আল্লাহ্তায়ালা বলেন, "ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্রই, তিনি তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থান সম্মন্ধে অবহিত, সুস্পষ্ট কিতাবে সব কিছু আছে।" ১১ঃ৬।

জীবিকার জন্য এ কালাম পাকের উপর তাওয়াক্কুল করতে হবে।

যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্তায়ালা তার ওয়াদায় অটল, তিনি সবার রিযিক দানসহ সমস্ত ওয়াদা পূরণ করবেন, তিনি আল্লাহ্তায়ালার উপর পরিপূর্ণ ভরসা করতে পারেন। তাঁর ওয়াদার উপর বিন্দুমাত্র সন্দেহ না থাকার নামই তাওয়াক্কুল।

www.pathagar.org

প্রবৃত্তির হিসাব নেওয়া

আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- "যে ব্যক্তি সদা সর্বদা নিজ কৃত কর্মের হিসাব রাখতে থাকে এবং মৃত্যুর পর কাজে লাগবে এমন কাজ করে সেই বুদ্ধিমান।"

এ প্রসংগে তিনি আরো বলে গেছেন-"যে কাজ সামনে আসে, তা গভীর ভাবে পরীক্ষা করে যদি আখিরাতের জন্য হিতকর মনে হয়, তবে তা কর। আর ধর্মের বিপরীত অর্থাৎ পরকালের জন্য অহিতকর মনে করলে, তা থেকে বিরত থাক।"

যারা আল্লাহ্‌র পথের পথিক তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) এর আদেশ-নিষেধে দৃঢ় থেকে মন্দ পরিহার করে ভাল কাজে অভ্যস্থ হয়ে যায়, ক্রমে তা স্বভাবে পরিণত হয়। তখন আর প্রবৃত্তিকে শাসনে রাখতে বেগ পেতে হয় না। কেবল খিয়াল রাখলেই চলে। সামনে কোন জটিল সমস্যা এলে তাতে তীক্ষ্ম নজর ও শরীয়ত মুতাবিক সিদ্ধান্ত নিতে হয় আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করে।

আল্লাহ্‌তায়ালা সর্বক্ষণ আমাদের সাথে আছেন, তিনি দেখছেন এবং মনের খবর জানেন-সর্বক্ষণ এ ধ্যান চিন্তায় থাকার অনুশীলন করে এতে অভ্যস্ত হতে হয়। অনুশীলন করলে আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকিরের সাথে এ চিন্তায় সহজেই অভ্যস্ত হওয়া যায়। এরূপ অভ্যস্ত হলে পাপ চিন্তা ও পাপ কাজ হতে রেহাই পাওয়া যায়। স্রষ্টার এ গুণ যে বিশ্বাস করবে না, সে কাফির। জাহান্নাম তার তকদীরে আছে বলে বুঝতে হবে।

আল্লাহ্‌তায়ালা সূরা আলাকে বলেছেন-"সে কি জানে না যে, আল্লাহ্‌তায়ালা দেখছেন?" সূরা নেসাতে বলেছেন- "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের উপর পরিদর্শনকারী।"

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন- "তুমি যেন আল্লাহ্‌তায়ালাকে সামনে দেখছ এরূপ মনোভাব নিয়ে ইবাদত কর। যদি তদ্রূপ অবস্থা মনে উৎপন্ন করতে না পার তবে এটুকু ভয় রেখে ইবাদত করো যে তিনি তোমাকে দেখছেন।"

www.pathagar.org

আমাদের সব কাজ-কর্ম আল্লাহ্তায়ালা দেখছেন, তিনি আমাদের সাথে আছেন এবং আমাদের মনের কথা জানেন। এটা সুন্নাত জামাতের আকীদা। এ মনোভাব সর্বদা মনে জাগরুক রাখলেই পাপ কাজ করা যায় না, পাপ চিন্তা মনে আসে না। নেক কাজ ও নেক চিন্তার দ্বারা স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। আমরা যেমন জড় বস্তুকে দেখতে পারি, আল্লাহ্তায়ালাও আমাদের সেভাবে দেখেন, আমরা সব সময় তাঁর সামনে আছি।

প্রত্যকটি নেক কাজ করার পূর্বেই মনে ইখলাস পয়দা করে নিতে হবে যেন কাজটি শুধু মাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়। পাপ কাজ হতে বিরত থাকলে তা লোক লজ্জা ও দুনিয়ার শাস্তির ভয়ে না হয়ে শুধু মাত্র আল্লাহ্র ভয়ে বিরত থাকতে হবে। মুবাহ কাজও আল্লাহ্র সন্তুষ্টির নিয়তে করতে পারলে ইবাদত হবে। সব কাজের পূর্বে মন ও প্রবৃত্তিকে যাচাই করে দেখতে হবে কাজটি একমাত্র স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্য করা হচ্ছে কিনা? অন্য উদ্দেশ্য মিশ্রিত পেলে মন ও প্রবৃত্তিকে প্রশ্ন করতে হবে যে, অন্য উদ্দেশ্য মিশিয়ে কেন সে সওয়াব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে? নিয়তে নাফ্স শয়তানের কারসাজিতে সে কেন বন্দী হচ্ছে? এ ভাবে প্রবৃত্তিকে পরাভূত করে খালেস নিয়তে নিষ্ঠা সহকারে কাজটি করতে হবে।

আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন- "সাবধান! কেবল অমিশ্রিত ধর্মীয় কাজ আল্লাহ্তায়ালার জন্য।"

এভাবে প্রত্যেক কাজ করার আগে যেমন পর্যবেক্ষণ আবশ্যক, তেমনি কাজটি শেষ করেও প্রবৃত্তি হতে হিসাব নিতে হবে। যে কাজটি করলে, তাতে শেষ পর্যন্ত নিয়তে ইখলাস বজায় ছিল কিনা? না থাকলে এটা ইবাদতের মধ্যে গণ্য হবে না, নাফসের শাস্তি স্বরূপ আরেকটি সৎ কাজ ইখ্লাসের সাথে করে এ অভাব পূরণ করতে হবে। পাপ হতে বিরত হলে তা আল্লাহ্র ভয়ে বিরত না হয়ে লোক ভয় ও বিচারের শাস্তির ভয়ে বিরত হওয়ার উদ্দেশ্য মনে এলে পরকালে আল্লাহ্র কঠোর শাস্তির কথা মনে করে নিয়তকে খালেস করতে হবে। শুধু আল্লাহ্র ভয়ে বা সন্তুষ্টিতে সওয়াব যাবে, নইলে সওয়াব শূণ্য হবে। এভাবে নাফ্স যাতে ধোঁকা না দিতে পারে সে খিয়াল রাখতে হবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলে গেছেন-"যে ব্যক্তি সন্দেহমুক্ত কাজে দ্রুত কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারে, দূরদর্শী শক্তিতে ভাল-মন্দ বিচার করতে সক্ষম হয়; নাফ্সের কামনা প্রবল হয়ে উঠলে স্বীয় বুদ্ধি-বিবেচনা শক্তিকে পূর্ণরূপে ঠিক রাখতে পারে, আল্লাহ্তায়ালা তাকে ভালবাসেন।"

www.pathagar.org

আনুগত্য ও ইবাদতের গণ্ডিতে বান্দা ও খোদা ছাড়া কেউ থাকবে না। বান্দা ও খোদার মধ্যে এ নির্ভেজাল সম্পর্কের মধ্যে নাফ্স বিরুদ্ধচারণ ও শত্রুতায় লিপ্ত হয়। মানুষের মধ্যে দুরাশা ও কামনা-বাসনা সঞ্চার করার ব্যাপারে এ শত্রু তৎপর হয়। দাসত্বের বৈশিষ্ট্য হল আল্লাহ্তায়ালাকে সহায় করে নিজের এ অপরিশোধিত ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করা। এরূপ করতে পারলে স্রষ্টার প্রতি বন্ধুত্ব ও তাঁর ইবাদতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যাবে। সকল ইবাদতের সেরা ইবাদত হলো, নাফসের কামনা-বাসনার বিরুদ্ধাচরণ করে শরীয়ত মুতাবিক আল্লাহ্র তাবেদারী করা। নাফ্সের সাথে শত্রুতার মধ্যেই কল্যাণ লাভের মূল নিহিত আছে। সৎ স্বভাব লাভ করতে হলে নিষিদ্ধ ও সন্দেহযুক্ত বিষয়ের উপকার ও নির্ভরতা হতে বেঁচে থাকতে হবে এবং মনে রাখতে হবে আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছা ও অনুমোদন ছাড়া কোন কাজ হয় না। আল্লাহ্তায়ালাকে ভুলে গেলেই মানুষের গোলামী করতে হবে, সে দিকে নাফ্সকে সতর্ক পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। আল্লাহ্তায়ালার আদেশ ডিঙিয়ে মানুষের অনুগত্য করাকেই মানুষের গোলামী বলে। অদৃষ্ট আমরা জানি না বলে ভবিষ্যত অন্ধকারে থাকে, সেই অন্ধকার রাজ্যে কোরআন ও সুন্নাহর আলো নিয়ে প্রবেশ করতে হবে, এর বাইরে গেলেই ফ্যাসাদ, বিপদ ও ধোকাতে পড়তে হবে। আধ্যাত্মিক অবস্থায় থাকতে চাইলে নাফ্সের বিরুদ্ধাচরণ ও আল্লাহ্তায়ালার আদেশনিষেধ পালন করে যেতে হবে। দুনিয়া হতে নূন্যতম চাহিদার অংশ নিতে হবে, ভোগ-বিলাসিতা হতে বিরত থেকে প্রকাশ্য ও গোপন পাপ পরিত্যাগে ব্যস্ত থাকতে হবে। এসব ব্যাপারে সর্বদা নিজকে পর্যবেক্ষণ দ্বারা সতর্ক রাখতে হবে।

ধন-সম্পদ কামাই করা বা বিপদ হতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য অধ্যাবসায় শুরু করা উচিত নয়। ধন-দৌলত ভাগ্যে থাকলে অধ্যাবসায় ছাড়া শরীয়ত মুতাবিক সামান্য প্রচেষ্টায় তা আসবে। বিপদ তকদীরে থাকলে তা সহ্য করতে হবেই। ভাল-মন্দ সব কিছু নত শিরে মেনে নিতে হবে। ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে।

তকদীরের বা ভাগ্য লিপির দোহাই দিয়ে আল্লাহ্তায়ালার আদেশ পালন ও নিষেধ মান্য করার ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকলে আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজ ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ বুঝায়।

কারণ একমাত্র ইবাদতের জন্যই তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তাঁর আদেশ-নিষেধে নিষ্ক্রিয় থাকা মানে স্রষ্টার উদ্দেশ্যকে পন্ড করার উদ্যোগ নেওয়া ও নিজের উপর আল্লাহ্তায়ালার আদেশ-নিষেধ কার্যকরী হতে না দিয়ে অকৃতজ্ঞ পাপী বান্দায় পরিণত হওয়া ও আখিরাতের শাস্তি বরণ করা। তাঁর আদেশ

www.pathagar.org

পালনে তৎপর ও সচেষ্ট হওয়াই সৌভাগ্যের লক্ষণ। সূফী সেজে বা নেতা সেজে নবুয়ত ও রিসালাতকে ডিঙিয়ে এমন কোন নতুন নিয়ম সৃষ্টি করা উচিত নয় বা তা অনুসরণ করাও উচিত নয়, যা সুন্নত জমাতের আকীদা বিরোধী। যে আল্লাহ্তায়ালা ও তাঁর রাসূল করীম (সাঃ) এর রীতিনীতির বিরুদ্ধে যাবে, তাকে বরবাদ করে দেওয়া হবে। স্রষ্টার দাসত্ব না করে মুক্তির কোন উপায় নেই। বন্দেগীর ব্যাপারে নাফ্স শয়তানের প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। স্রষ্টার আদেশ-নিষেধের তৎপরতার নিকট নিজের ইচ্ছা শক্তিকে বিলোপ করে তাঁর ইচ্ছাকে নিজের ইচ্ছায় পরিণত করতে হবে, নইলে স্বভাব চরিত্র ও আত্মা সংশোধিত হবে না।

অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে সুক্ষ্ম বিচার-বিবেচনা করে প্রতিটি কাজের যথার্থ পরিচয় লাভ করে জ্ঞান ও আল্লাহ্-ভীতির সাহায্যে প্রবৃত্তির কামনাকে দমন করতে হবে। যে তা করতে ব্যর্থ হবে, প্রবৃত্তি তার দ্বারা পাপ কাজ করাবে। পূর্ব পাপের অনুশোচনা এবং পাপ বর্জনের পণ করে আল্লাহ্র নিকট মাফ চেয়ে তওবাহ্ করতে হবে নইলে মনে কোন স্বস্তি থাকবে না। সৎ স্বভাবের জন্য যেমন আল্লাহ্র কাছে দোয়া চাইতে হবে, নিজেকেও সেজন্য সদা তৎপর থাকতে হবে।

দুনিয়াদারদের হাতে সংসারের যে বিলাস সামগ্রী মওজুদ আছে তা জুলুম ও ধোঁকাবাজির মারাত্মক বিষে পরিপূর্ণ। আখিরাতের শাস্তির বদলে এগুলো ক্রয় করা হয়েছে। অপরিনামদর্শী লোকেরা নাফ্সের প্ররোচনায় এগুলো সংগ্রহ করে নিজেরা এতই অসাবধান ও বেখেয়াল হয়ে আছে যে যা তাদের বিপন্ন ও ধ্বংস করবে তাতেই তারা আনন্দ পাচ্ছে। এ সবের দিকে তাকালে এবং এ সবের কামনা-বাসনা হতে সর্বক্ষণ নিজের হৃদয়কে হেজাফতে রাখতে হবে।

আল্লাহ্তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে বলেছেন- "কাফেরগণকে পরীক্ষামূলক ভাবে আমি যেসব জাঁকজমক ও বিলাস সামগ্রী দিয়েছি তাতে চোখ টাটিয়ো না। তোমার প্রভু প্রদত্ত বরাদ্দ বেশী ভাল ও স্থায়ী।"

মানুষের কাজ চার ভাগে বিভক্ত। যথাঃ- সৎকাজ, অসৎকাজ, সন্দেহযুক্ত কাজ ও মোবাহ কাজ। সৎকাজে ও মোবাহ কাজে ইখলাস এনে সম্পন্ন করলে তা ইবাদত হবে।

ক্ষুধার্ত হলে আহার করা মোবাহ কাজ। খাদ্যের মজা আস্বাদনের নিয়ত না করে যদি এ নিয়ত করে যে, খাদ্য গ্রহণে শরীরের শক্তি বজায় থাকবে, ইবাদত করতে পারবে এবং আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য তাঁর সৃষ্টির খিদমত করতে পারবে, এরূপ খালেস নিয়ত করতে পারলে তা ইবাদতে পরিণত হবে।

www.pathagar.org

নাফ্স থেকে এরূপ প্রত্যেকটি নিয়ত ও কাজের হিসাব অনবরত নিতে থাকলে এবং মন্দ কাজ বা মন্দ কাজের নিয়ত করলে তাকে শাস্তি ও তিরস্কার করতে থাকলে এক পর্যায়ে ঠিক হয়ে যাবে।

সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে নাফ্স যাতে পার্থিব উদ্ধারের জন্য কোন প্রচেষ্টায় লিপ্ত না হয়। পার্থিব উদ্দেশ্য সিদ্ধি ও বিপদ হতে উদ্ধারের জন্য পার্থিব উপায় পরিত্যাগ করলে সুখে-দুঃখে তৎপর না হয়ে আল্লাহ্তায়ালার উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে পারলে তবেই আধ্যাত্মিক জীবনে তাড়াতাড়ি সফলতা আসবে।

নিজ প্রবৃত্তির স্বার্থে কোন অন্যায় কাজ করে ফেললে তওবাহ্ করে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হয়ে নাফ্সকে শাস্তি দিয়ে নাফ্সকে দমন করতে হয়। সে জন্য অতিরিক্ত রোযা, নামায ও দান-খয়রাত করে শাস্তির দ্বারা প্রতিকার করতে হয়। কঠোরভাবে শরীয়তের আযীমত পালন দ্বারা নাফ্সকে বশে আনতে হয়। এ পুস্তকে তাসাওউফ অধ্যায়ে বর্ণিত অসৎ চরিত্রের পরিবর্তন, মৃত্যু-চিন্তা, তওবাহ্, যুহ্দ, সবর, আল্লাহ্-ভীতি, মাফ ও রহমতের আশা, শোকর, এখলাস, তাওয়াক্কুল ও প্রবৃত্তির হিসাব লওয়া, এগুলো নাফ্সের সাথে জিহাদ করে অসৎ স্বভাবকে সৎ স্বভাবে পরিণত করার রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পদ্ধতি। যারা এ পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন তারা মুমিন ও আউলিয়া হয়েছেন। এটাই হল নবী, রাসূল, সিদ্দীক, আউলিয়া ও মুমিনগণের চারিত্রিক গুণ। নাফ্স ও শয়তানের ধোঁকার সাথে লড়াই করে তারা এ চারিত্রিক গুণ লাভ করেছেন।

www.pathagar.org

সূফী

তাসাওউফ হলো শরীয়ত অনুযায়ী নাফ্সের বিরোধীতা করে ও নাফ্সকে প্রশিক্ষণ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর স্বভাব-চরিত্রের ছাঁচে ফেলে আমল-আখলাককে পুনর্গঠন করার রীতি-নীতি। এ জন্য শরীয়তের আযীমত দ্বারাই রিয়াযত-মেহনত করতে হয় এবং নাফ্সের কামনা-বাসনার বিরোধীতা করে হুযুরের (সাঃ) অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালার অনুসন্ধানের নামই তাসাওউফ ও তরীকত।

সূফী বা দরবেশ ততক্ষণই তাসাওউফ ও তরীকতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত সুন্নতের উপর অটল থাকেন। যে শরীয়ত ও ইসলামের স্তম্ভসমূহ হতে সরে যায়, সে তাসাওউফ ও তরীকত হতে শুধু বিচ্ছিন্ন হয়েই যায় না, আল্লাহ্তায়ালা হতেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে সে সূফী সম্প্রদায় হতে আলাদা হয়ে যায়। কারণ সে সূফীদের তরীকা পালন না করে নিজকে সূফী বলে মিথ্যা দাবী করতে বা সে সূফী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলে ভাবতে পারে না। বরং নিজকে পথভ্রষ্ট ভাবলেই তার মঙ্গল হবে। এতে সংশোধনের আশা আছে। মৃত্যুর সংকটে বা মৃত্যুর পর পথভ্রষ্ট জেনে কোন লাভ নেই।

আলেম ও অভিজ্ঞ ঈমানদারগণ বুঝতে পারেন, কে সূফী আর কে মিথ্যা দাবীদার। আর তারা বুঝতে পারেন, তাদের কথাবার্তা, কাজকর্ম ও স্বভাব-চরিত্র রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর অনুসরণ ও অনুকরণের মধ্যে কিনা, তা যাচাই করে। শরীয়তের মাপকাঠিতে ওজন করলেই লোকটি সূফী কিনা, তা বোঝা যায়। সূফীদের বাহ্য আচরণও শরীয়তের অনুগামী। আর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর আমল-আখলাক বিসর্জন দিয়েছে, সে শুধু শরীয়ত বিসর্জন দেয়নি, তাসাওউফও বির্সজন দিয়েছে। সূফীদের ধর্ম হলো-ইসলামের একটি অতি প্রয়োজনীয় শাখা তাসাওউফের মারফত ইখলাস অর্জন করে ইসলামের অনুসরণ দ্বারা আল্লাহ্তায়ালার অনুসন্ধান করা এবং তাঁর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জন করা।

সূফী শব্দটি আরব দেশে সর্বপ্রথম চালু হয়। গাওছ ইবন মরর নামে এক ব্যক্তি তার মায়ের মানত অনুযায়ী মাথায় একটুকরো পশম বেঁধে নিজেকে খানায়ে কা'বার খিদমতে ওয়াক্ফ করে দেন। লোকে তাকে মাথায় পশম

www.pathagar.org

ব্যবহারের কারণে সুফাহ বলে অভিহিত করত। পরবর্তীতে তার বংশধরগণকে বনূ সুফাহ বলত। তারা হাজীদের খিদমত করত ও খিলাত দিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর আবির্ভাব হলে বনূ সুফাহ ইসলাম গহণ করে।

এ বংশে সাহাবী ও বহু বুযুর্গ ছিলেন। তাঁরা খুবই নিষ্ঠাবান ইবাদতকারী ছিলেন। তাঁদের ও তাঁদের অনুসারীগণকে সূফী বলা হত, যাদের দুনিয়ার প্রতি কোন লোভ-লালসা ছিল না। তারা ক্রমে যিকির-আযকার ও পশমী কাপড় পড়া আরম্ভ করেন।

পরবর্তীকালে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর একনিষ্ঠ পায়রবীকারীদের সূফী বলা হতো। তাদেরকে যাহেদ, দরবেশ, ফকীর ইত্যাদিও বলা হতো। তাসাওউফকে যখন শরীয়তের মধ্যে একটি ভিত্তির উপর দাঁড় করানো হলো, তখন সুন্নত জমাতের অনুসারীগণ তাসাওউফ এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর নিষ্ঠবান অনুসারীগণকে সূফী বলে অভিহিত করতেন থাকেন। যাঁরা একমাত্র আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য দুনিয়ার জীবনকে অবহেলা করে নিষ্ঠ সহকারে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর অনুসরণ করে তাসাওউফ পালন করে অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন তাদেরকেই সূফী বলা হতো। বর্তমান কালেও যাঁরা দুনিয়ার ভালবাসা বর্জন করে একনিষ্ঠভাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর পায়রবী করেন এবং সর্বক্ষণ আল্লাহ্র যিকিরে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন, তাঁদেরকে সূফী বলা হয়।

সূফী ধর্ম পালন করতে হলে শরীয়ত, তাসাওউফ ও তরীকত সমভাবে অনুসরণ করতে হয়। তাসাওউফ হলো শরীয়তের বাহ্য আচার-আচরণ যা আল্লাহ্তায়ালাকে উপস্থিত জেনে অর্থাৎ তিনি আমাদের ভিতর-বাহির জানেন মনে করে তাঁর দৃষ্টির সামনেই অকৃত্রিম ও ইখলাসের সাথে ইবাদত ও সকল কাজ সম্পন্ন করা। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর হাদীসে জিবরীলে এ অবস্থাকে ইহ্সান বলে উল্লেখ করেছেন।

সর্বক্ষণ হৃদয়কে আল্লাহ্তায়ালার যিকির ও চিন্তায় ব্যস্ত রেখে তাঁর নৈকট্য, মিলন ও দীদার লাভ করার নাম তরীকত। তাসাওউফ ছাড়া তরীকত ও শরীয়ত অনুসরণ করা যায় না। একটির সাথে অন্যটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যিনি শরীয়ত, তাসাওউফ ও তরীকত তিনটিই সমভাবে অনুসরণ করেন, তিনিই সূফী; যাঁর ভিতর বাহির রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর পায়রবী দ্বারা সুসজ্জিত ।

এ পুস্তকে তাসাওউফ খন্ডে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে, সার-সংক্ষেপ হিসাবে ইহাই তাসাওউফ। উৎসাহী সালেকগণ বিস্তারিত আরো জানতে চাইলে পূর্বকালের আউলিয়ায়ে কিরামের কিতাবাদি দেখে নিতে পারেন। তাসাওউফ

www.pathagar.org

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর সময় থেকে কিয়ামত পর্যন্ত একই থাকবে। তরীকতে শায়েখের ইরাদা বলতে এ পুস্তকে তাসাওউফ খন্ডে যা লিখা হয়েছে এ সমস্ত বিষয়াদি এবং যিকির ও তরীকতের নিয়মাবলী অর্থাৎ যে তরীকায় শায়েখ মুরীদকে শিক্ষা দিচ্ছেন তা বোঝানো হয়েছে। শায়েখের মুহব্বত এবং তাসাওউফের এ বিষয়গুলো এবং যিকিরে নিজকে ফানা করলে মুরীদের বরযখ শায়েখের বরযখে ফানার নামই ফানা ফিশ শায়েখ। তাসাওউফের এসব বিষয় ভালরূপে রপ্ত না হলে শায়েখের মাকামে ত্রুটি থেকে যাবে। ফলে পরবর্তী সব মাকামেই ত্রুটি পরিলক্ষিত হবে। এ জন্য শায়েখের মাকাম কঠিন হলেও উত্তমরূপে অতিক্রম করা একান্ত জরুরী। ফানা ফি'র রাসূলের মাকামে সুন্নাহকে উত্তম রূপে গ্রহণ করে ইরাদার ফায়েজ হাসিল করতে হয়। তেমনি ফানা ফিল্লাহর ইরাদার ফায়েযে কোরআনে বর্ণিত আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছাসমূহে নিজকে ফানা করে দিতে হয়। তাই তাসাওউফ, কোরআন ও সুন্নাহ্ ছাড়া কোন তরীকত নেই।

তাসাওউফ, কোরআন ও সুন্নাহ একই আছে ও থাকবে। তবে তরীকতে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে। কারণ যুগে যুগে বিভিন্ন শ্রেষ্ঠ উম্মত ও সৌভাগ্যবান সূফীগণের নিকট রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মারফত আল্লাহ্তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর শরীয়ত ও তাসাওউফের উপর বিভিন্ন তরীকা বিভিন্ন যমানাতে নাযিল করেছেন। তরীকত খন্ডে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হবে। যিনি নিষ্ঠা সহকারে শরীয়ত, তাসাওউফ এবং তরীকত অনুযায়ী জীবন যাপন করেন তিনিই সুন্নত জমাতের অনুসারীদের নিকট সূফী বলে পরিচিত লাভ করেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর পায়রবী ও তাঁকে ভালবাসা ছাড়া কোন তাসাওউফ ও তরীকত নেই; থাকতে পারে না। কারণ নবুয়ত ও রিসালাত খওতম হয়ে গেছে? সর্বশেষ নবী (সাঃ) -এর মাধ্যমে। তিনি ছাড়া স্রষ্টার সাথে মিলন, নৈকট্য ও দীদার লাভের কোন উপায়-উপকরণ অবশিষ্ট নেই। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর পায়রবী ছাড়াও আল্লাহ্তায়ালার ভালবাসা পাওয়া যায় না এবং নাফ্সের দুষ্টামী ও শয়তানের প্রতারণা হতে রক্ষা পাওয়ার উপায় নেই। এ দুটো শক্তি স্রষ্টার নৈকট্য লাভের সবচেয়ে বড় অন্তরায়, যা মানুষকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ব্যতীত সৎপথ প্রদর্শক নেই।

যদি কেউ বলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর অনুসরণ ছাড়া বা নামায-রোযা তথা শরীয়ত অনুসরণ ছাড়া আল্লাহ্তায়ালাকে পাওয়ার পথ আছে, তবে সে পথভ্রষ্ট। শিশু শ্রেণীতে থেকে এম.এ. ক্লাসের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কাল্পনিক কথা বলার অনুরূপ। নাফ্স শয়তানের কবলে পড়েই তারা এরূপ বলে থাকেন।

www.pathagar.org

সত্যিকার সূফীকে জানতে ও চিনতে হলে পথভ্রষ্ট ও অপরিপূর্ণ সূফী সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া দরকার। ডাকাতের কবলে পড়ে কত আল্লাহ্‌র পথের পথিক যে সর্মস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পেরেশানীর অন্ধকার গর্ভে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। তাদের রিয়াযত, মেহনত তো কম নয়। কেবল সরল পথ হতে বিচ্যুত বলেই ইপ্সিত ফল লাভ হচ্ছে না।

পাশ্চাত্যের আস্তিক দার্শনিক বা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের কাছে আধ্যাত্মিকতার সঠিক সংজ্ঞা বা মাপকাঠি নেই। তারা জিন বা শয়তানকে পাওয়ার সাধনাকেও আধ্যাত্মিকতা বলে আখ্যায়িত করে। জিন শয়তান ও অপরিশোধিত নাফ্‌স উভয়ই আল্লাহ্‌তায়ালাকে পাওয়ার প্রতিবন্ধক। জিন শয়তান পাওয়ার সাধনা আধ্যাত্মিকতা নয়। যাদুর খেলা বা রাসায়নিক পদার্থের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও আধ্যাত্মিকতা নয়। ইসলামে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)কে পাওয়ার সাধনাকেই আধ্যাত্মিকতা বা তাসাওউফ বলে। শরীয়ত বা তাসাওউফ মারফত নিজকে পবিত্র করে অসৎ স্বভাবকে সৎস্বভাবে রূপান্তরিত করে সংসারের প্রতি অনাসক্তি এনে সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র চিন্তা ও যিকিরে মগ্ন থেকে একমাত্র আল্লাহ্‌র অনুসন্ধানে নিয়োজিত থাকার নাম আধ্যাত্মিকতা বা তাসাওউফ।

কোন ব্যক্তি যদি নামায-রোযা না করে, ইসলামের স্তম্ভসমূহ হতে দূরে চলে যায়, শরীয়ত মুতাবিক না চলে, কিন্তু সে যদি সংসারের প্রতি অনাসক্ত হয়, সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র যিকির করে, কম কথা বলে, কাম রিপু হতে দূরে থাকে, তাহলে নাফ্‌সকে দমন করার জন্য, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে কিছুটা অনুসরণের কারণে এবং আল্লাহ্‌তায়ালার আইন ও তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী সে ব্যক্তির অন্তরচোখ খুলতে পারে। কারণ সে শুধু অন্তরচোখ খোলার নিয়ম-পদ্ধতি অনুসরণ করেছে। আগুন, বাতাস, পানি ও মাটির দ্বারা যেসব দেহ সংগঠিত হয় সেগুলি তার অন্তর চোখের সামনে আসতে পারে। হকতাআলা এত দয়ালু যে, ভবিষ্যতে সে হয়ত হেদায়েতও পাবে। তাকে এ উদ্দেশ্যে অন্তরচোখ দান করেন, যাতে ভবিষ্যতে সে ধীরে ধীরে সংশোধিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর অনুসারী হতে পারে।

কিন্তু সে ব্যক্তি যদি বিপরীত বুঝেন অর্থাৎ মনে করেন যে, নামায, রোযা ও শরীয়তের অনুসরণ ছাড়াই তার অন্তর চোখ খুলে গেল, আর যারা রোযা-নামায করে, আলেম হয়ে ওয়াজ-নসিহত করে অথচ তাদের অন্তরচোখ খোলেনি, তখন নিজের পথভ্রষ্টতাকে সে সঠিক মনে করে এবং এ পথেই কারামত জাহির হবে ও আল্লাহ্‌তায়ালাকে পাবে বলে বিশ্বাস করে। এরূপ লোক যদি মনে করে যে, শরীয়তের পথ আলাদা এবং মা'রিফাতের পথ ভিন্ন যা সে অনুসরণ করছে

www.pathagar.org

তাহলে সে আল্লাহ্তায়ালাকে পাওয়ার পথ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তার অন্তর চোখও ভবিষ্যতে থাকবে না বরং আল্লাহ্কে পাওয়া দূরের কথা, সে দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তি প্রাপ্ত হবে। অবশ্য শয়তান তাকে বুঝে উঠতে দেবে না। বরং নানা সংবাদ ও নানা দৃশ্য সুসজ্জিত ও সুশোভিত করে তাকে কব্জায় রাখবে।

এরূপ মন-মানসিকতার ফলে সে নিজকে খুবই কামেল বুযুর্গ বলে মনে করবে এবং অন্তর চোখে খোলার কারণে মা'রিফাত পেয়ে গেছে বলে জানবে। সেও শিষ্য-শাগরিদ ও মুরীদ করে তার অনুসারী বাড়িয়ে তুলবে। আল্লাহ্তায়ালার আইন অনুযায়ী শয়তান তার সাথী হবে এবং নানা ছল-চাতুরীর দ্বারা তার ভূয়া বুযুর্গগীরিতে সাহায্য করবে। গর্ব, অহংকার, মিথ্যা কথন ও কাম রিপুর চিন্তা- ভাবনা প্রভাব বিস্তার করলে এক পর্যায়ে হয়ত আল্লাহ্তায়ালার সর্তকীকরণ আসবে, কিন্তু সে তা বুঝবে না। বুঝলেও নাফ্স শয়তানের কারণে নিজকে সংশোধন করবে না। তখন আল্লাহ্তায়ালা তার অন্তরচোখ ছিনিয়ে নেবেন। অনেক ক্ষেত্রে কোন নেক আমলের জন্য হয়তো তা বিলম্বিত হতে পারে।

অনেক সময় দেখা যায় শরীয়ত বিরোধী পথভ্রষ্ট ব্যক্তি যদি কারামত জাহিরের নিয়তে জন সংশ্রব ত্যাগ করে তরকে দুনিয়া হয়ে সর্বক্ষণ আলাহ্ আল্লাহ্ যিকিরে লিপ্ত থাকে ও মিথ্যা কথা পরিহার করে কাম রিপুর তাড়না হতে মুক্ত হয়ে থাকতে পারে তাহলে দয়ালু দাতা আল্লাহ্তায়ালা তাকে ইসতিদ্রাজ জাহির করে দিতে পারেন, যা হবে দুনিয়াতেই তার প্রাপ্য। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর অনুসরণ না করার কারণে আখিরাতে তার কোন হিস্যা থাকবে না। অন্তর চোখ না খুললেও কোন লোক যদি শুধু আল্লাহ্র ভয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর অনুসরণ করেন ইখলাসের সাথে, তবে তিনি বেহেশত পাবেন বলে আশা করা যায়, এমন কি আখিরাতে আল্লাহ্র দীদারও পেতে পারেন। মৃত্যুর পর যখন নাফ্সের কোন এখতিয়ার থাকবে না তখন অন্তরচোখ খুলবে।

ইসতিদ্রাজ জাহিরের পর বেশরা ফকিরের দুটো অবস্থার সৃষ্টি হবে। সে যদি নিজ স্বার্থে দোকানদার সেজে দুনিয়াদারীতে লিপ্ত হয় তবে এক পর্যায়ে তার ইসতিদ্রাজ বন্ধ হয়ে যাবে। অবশ্য জিন ও যাদুর দ্বারা অলৌকিক কিছু দেখালে তা বন্ধ হবে না। ইসতিদরাজ ও কারামতে আলেমগণ ব্যতীত কেউ পার্থক্য করতে পারে না। শরীয়ত মুতাবিক যে চলে, সব রকম পাপ হতে যে তওবাহ্ করে এবং তওবাহ্ পূর্ণাঙ্গ হলে তার কারামত জাহির হয়। আর শরীয়ত বিরোধী লোকের নিকট ইসতিদ্রাজ জাহির হয়।

www.pathagar.org

কারো পথভ্রষ্টতা আসে সজ্ঞানে, আবার কারো পথভ্রষ্টতা আসে অজ্ঞতার কারণে। যদি কেউ ইসতিদরাজ নিজ স্বার্থে ব্যবহার না করে গোপন করে এবং তরকে দুনিয়া হয়ে যিকিরে মত্ত থাকে, তবে হয়ত হেদায়েত দ্বারা আল্লাহ্তায়ালা এবং নিজের ভুল বুঝে সংশোধিত হবে। তওবাহ্ পূর্ণ হলে ইসতিদরাজ বন্ধ হয়ে কারামতে রূপান্তরিত হবে বা আল্লাহ্ তাকে নতুন কারামত দান করবেন।

মনে রাখা একান্ত জরুরী যে, পানির উপর হাটা, বাতাসে উড়া বা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার চেয়ে নাফ্সের বিরোধিতা করে তাকে বশীভূত ও সংশোধন করে পবিত্র হওয়া অনেক উর্ধ্বে; দুটোতে আসমান ও জমিনের ব্যবধান। জিনেরাও মানুষকে শূন্যে নিতে পারে এবং পানির উপর দিয়ে হাটাতে পারে। ইসতিদ্রাজ ওয়ালা অনেক সময় ধরতেই পারে না যে, নিজ ক্ষমতা গুণে এসব অলৌকিক কাজ হচ্ছে, না জিনের দ্বারা হচ্ছে? যারা জিন দ্বারা বুযুর্গ হতে চায়, তাদের পাগল হওয়ার ও বেঈমান হয়ে মরার আশঙ্কা আছে। এক দীলে দু'জিনিসের স্থান হতে পারে না। আল্লাহ্ ভিন্ন সব পদার্থ বের করে সেখানে জিনদের স্থান দেওয়া অনুচিত। এরা সহজেই রাগান্বিত হয় এবং অনিষ্ট করে ছাড়ে। মানুষ কল্পনা করতে পারে না এরূপ ধোঁকা দেয়। বিলায়েত পাওয়ার আগে এদের প্রশ্রয় দিলে আল্লাহ্কে পাওয়ার পথে বিরাট প্রতিবন্ধক হবে। এদের দ্বারা কোন সাহায্য নিলে ভবিষ্যতে ক্ষতির কারণ হবে। যত অলৌকিকত্বই দেখাক না কেন, তাকে অনুসরণ করলে পরকাল বরবাদ হয়ে যাবে। এ সব লোক কিছুতেই সূফী হতে পারবে না। কামালিয়াত ও বিলায়েত হল আসল জিনিস, কারামত নয়।

লোকের সম্মান ও অর্থ আকর্ষণের জন্য অনেকে ভূয়া সূফী সাজে। দুনিয়া কামাই তাদের উদ্দেশ্য হয়, আল্লাহ্কে পাওয়া তাদের উদ্দেশ্য নয়। এরা প্রবৃত্তির পায়রবী করে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর নয়। এসব দুনিয়া প্রেমিকগণের কেউ কেউ শরীয়তপন্থী বলে নিজেদের জাহির করে, অনেকে আবার শরীয়ত বিরোধী হয়। স্বার্থ দিয়ে বা আপন লোকজন দিয়ে জনগণকে সংগঠিত করে তাদের কাছে নিয়ে যায়। এদের কাছে গেলে দুনিয়া কামাই হবে, আপদ- বিপদ, রোগ-শোক চলে যাবে বলে প্রচার করে। অথচ খাঁটি সূফী নিজের জন্য দুনিয়া বর্জনকে ভালবাসে, আপদ-বিপদকে আল্লাহ্র নিয়ামতরূপে পাপ মুক্তির কারণ ও আল্লাহ্র দয়া আকর্ষণের সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করে। আল্লাহ্তায়ালার সব কাজে সন্তুষ্ট থাকেন। তিনি কি করে অন্যের দুনিয়া কামাই এবং লোকেরা দুনিয়া কামাই করতে গিয়ে যে মন্দ কামাই করছে, তা খালাসের দায়িত্ব নেবেন? তিনি নিজের

www.pathagar.org

জন্য যা ভালবাসেন, অন্যের জন্য তাই ভালবাসবেন। তবে কোন লোক তওবাহ্ করলে তাকে মাফ করে পবিত্র করার জন্য দোয়া করতে পারেন।

সত্যিকার সূফীর নিকট একটি উদ্দেশ্যেই লোকজন যেতে পারে, তা হল কিভাবে নিজেরা পবিত্র হয়ে অসৎ চরিত্রকে সৎচরিত্রে রূপান্তরিত করে আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য ও মিলন লাভ করবে।

যে সূফী নামধারী নামায পড়ে না, শরীয়ত বিরোধী সে অজ্ঞ-মুর্খ লোকদের ও ইংরেজী শিক্ষিত ধর্মীয় জ্ঞানহীন লোকদের ইসতিদ্রাজ ও ধোঁকা দিয়ে সহজেই বিভ্রান্ত করতে পারে। কিন্তু নির্লোভ আলেমদের বিভ্রান্ত করতে পারে না। বিভ্রান্ত দুনিয়াদার সূফী বা পীর নামধারী ব্যক্তি বাহ্যিক ভাবে নামায পড়ে ও শরীয়ত অনুসরণ করে বলে প্রদর্শন করে, আবার দোকানদারী করে আল্লাহ্র ইবাদতকে পুঁজি করে। তাকে পর্যবেক্ষণ ছাড়া ধরা যায় না।

আল্লাহ্তায়ালার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) এর হুকুম- আহকাম কঠোর ভাবে তামিল করে, স্রষ্টার দাসত্ব বরণ করে তাঁর একনিষ্ঠ তাবেদার বান্দা হয়েই সূফী হতে হয়। এরূপ লোক চেনার উপায় হলো, এরূপ লোকের পার্থিব কোন ক্ষতি হলেও তিনি আনন্দের সাথে গ্রহণ করেন। পর্যবেক্ষণে দেখতে হবে, তিনি আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল না মানুষের উপর। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) এর আদেশ-নিষেধ নিষ্ঠার সাথে পালন করেন কিনা? তিনি দ্বীনের কথা বেশী আলোচনা করেন, না দুনিয়ার কথা? তিনি দ্বীনকে অগ্রাধিকার দেন, না দুনিয়াকে? মানবীয় সার্বভৌমত্বের অনুসারীদের দুনিয়াদারী পরিত্যাগ করে দ্বীন গ্রহণের হেদায়েত করেন কিনা, দ্বীনের সাথে তার সম্মন্ধ বেশী, না দুনিয়ার সাথে? লোকজন যে তার কাছে যায়, তারা দুনিয়া কামাই করতে গিয়ে যে মন্দ কামাই করছে- তা থেকে বাঁচার জন্য যায়, না কি অন্যবিধ উদ্দেশ্যে? তিনি তাদের সংশোধনের চেষ্টা করেন, না তার কাছে আরো লোক সমাগমের পদ্ধতি অন্বেষণ ও তদবীর করেন এবং সে চেষ্টায় রত থাকেন। পর্যবেক্ষণে নিশ্চয়ই ধরা পড়বে।

উপহার গ্রহণ সুন্নত বিধায় খাঁটি সূফীগণও রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর অনুকরণে উপহার গ্রহণ করে নিজের ঋণ পরিশোধ ও অতি প্রয়োজনীয় আবশ্যকতা মিটিয়ে উদ্বৃত যা থাকে তা দান-খয়রাত করে দেন। তাই খাঁটি ও নকল সূফী উপহার সামগ্রী গ্রহণ-বর্জন দ্বারা ধরা যায় না। খাঁটি সূফী দুনিয়াদারীর লোভ - লালসায় পড়েন না, ধন পাওয়া বা উপহার পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেন না। আল্লাহ্তায়ালা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে মগ্ন হন না, নিজ প্রবৃত্তির স্বার্থে কাজ-

www.pathagar.org

কারবার করেন না। তিনি সম্মান পেলে নিজকে হেয় ও নীচ মনে করেন। টাকা-পয়সা পেলেও অনোর প্রয়োজন মিটিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর অনুকরণে গরীব থাকেন, খ্যাতি লাভ করলে নিজকে গোপন করতে চেষ্টা করেন।

আল্লাহ্র ভয়ে শরীয়ত পালন করলে বেহেশত লাভ হয়, আর শরীয়ত, তাসাওউফ ও তরীকত পালন করলে আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য, মিলন ও দীদার লাভ হয়। যে সব আল্লাহ্র বান্দা আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য, মিলন ও দীদার লাভের আশায় শরীয়তের এমন আলেমের কাছে যায়, যিনি পীর বলে নিজেকে ঘোষণা করেন এবং শুধু নামায, রোযা, দোয়া, কালাম ও যিকির শিক্ষা দেন; যদিও তিনি জানেন যে, মুরীদকে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবেন না, যারা আল্লাহ্কে পাওয়ার আশায় মুরীদ হন, তাদের তিনি প্রতারণা করলেন।

যার নিজের নাফ্স পবিত্র হয়নি, তিনি মুরীদের তায্কিয়া নাফ্স করবেন কি ভাবে? তিনি তাদের আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছাবেন কি করে? তাঁর তরীকতের কোন ফায়েজ নেই, তিনি তরীকতে অভিজ্ঞ নন। তাযকিয়া নাফ্স হয় তওহীদের বা বাকাবিল্লাহর মাকামের পর দাসত্বের মাকাম অতিক্রম করলে। যিনি মুরীদের বিচিত্র রকম কলবের খবর রাখন না, অথচ তিনি পীরের আসনে বসে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছুতে আগ্রহী লোকদের আবদ্ধ রেখে প্রতারণা করছেন।

অথচ তিনি তরীকতের বাহানা না নিয়েও আলেম হিসাবে মজলিস করে শরীয়ত দ্বারাই লোকদের আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও বেহেশত লাভের উপায় শিক্ষা দিতে পারেন। এতে লোকেরাও প্রতারিত না হয়ে সঠিক রাস্তায় চলতে পারবেন এবং তিনি নিজেও এ জন্য আল্লাহ্র দরবারে পুরস্কৃত হবেন।

কিছু অপরিপূর্ণ সূফী আছেন যারা শরীয়ত মুতাবিক তরীকত শিক্ষা দেবার জন্য পীর সাজেন, যদিও তার তাযকিয়া নাফ্স হয়নি, বড় জোর ফানা ফিশ শায়েখ বা ফানা ফির রাসূল পর্যন্ত ফায়েজ আছে। তিনি আল্লাহ্ পর্যন্ত মুরীদকে পৌঁছাতে পারবেন না, মুরীদকে তাযকিয়া নাফ্সও করতে পারবেন না। তার ইখলাসও খাঁটি হবে না। প্রবৃত্তির উপর বিজয়ী না হওয়ার কারণে লোভ-লালসা ও অলসতা তাকে গ্রাস করে ফায়েজ নষ্ট করে দিতে পারে, মুরীদদের লজ্জায় কিছু বলতে পারবেন না। মুরীদরা তরক্কী ও ফায়েজ পাবে না। এরূপ হলে ফায়েজ নষ্ট হলে তিনিও বিনষ্ট হবেন, মুরীদগণও নষ্ট হবেন। স্বাভাবিক নিয়মে নাফ্স্ শয়তান কার্যকরী হয়ে তিনি দুনিয়ার দোকানদার বনে যাবেন। নষ্ট না হলে যে পর্যন্ত তার ফায়েজ আছে, মুরিদগণও তাই পাবেন। অপূর্ণ সূফীদের পীর সেজে দুনিয়া ও আখিরাত বরবাদ করা উচিত নয়। দুনিয়াদার আলেম ও অপূর্ণ

www.pathagar.org

সূফী ডাকাত সদৃশ, যারা লোকদের আল্লাহ্-প্রেম ডাকাতি করে। তবে অপূর্ণ সূফীগণ পীর না হয়ে এ পথের যাত্রীদের সোহ্বত দিলে অনেক ফায়েদা হাঁসিল করতে পারে। ইখলাস হাঁসিল করতে না পারলে তার প্রভাব অন্যের উপর কার্যকরী হবে না।

এ জাতীয় অপরিপূর্ণ সূফীদের মধ্যে অনেকে আছেন যারা মুরীদ বাড়াবার জন্য ব্যাকুল থাকেন। বিনা বাছ বিচারে বায়আত করেন। তরকে দুনিয়া বা নাফসের সাথে জিহাদের নিয়ম কানুন ও পদ্ধতি শিক্ষা না দিয়ে কতগুলো তসবীহ তাহলীল ও দোয়া-কালাম পড়তে বলেন। অথচ এসব দোয়া-কালাম যে কোন আলেম হাদীস মুতাবিক বলে দিতে পারেন, এজন্য পীরের দরকার পড়ে না। যদি আল্লাহ্ পাক কবুল করেন, এসব দোয়া-কালামে ছওয়াব হবে। পীর সাহেবের কর্তব্য হল অসৎ স্বভাবকে সৎ স্বভাবে এবং অপরিশোধিত নাফ্সকে প্রশিক্ষণ দিয়ে পরিশোধিত করা, মন্দ মানুষটিকে ভাল মানুষে রূপান্তরিত করা। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর ছাঁচে ফেলে চরিত্র সংশোধন করে দোয়া-কালাম পড়লে তা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অসৎ চরিত্রের অপবিত্র লোকদের দোয়া-কালামের ফায়েজ নাফ্স ও শয়তান নষ্ট করে দেয়।

আল্লাহ্তায়ালা রাসূল করীম (সাঃ) কে বলেছেন- "হে নবী ! মু'মিন নারীগণ যখন তোমার নিকট বায়আত করে এই মর্মে যে, তারা আল্লাহ্র সাথে কোন শরীক স্থির করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজের সন্তানদের হত্যা করবে না, তারা সজ্ঞানে অপবাদ রটাবে না এবং সৎকাজে তোমাকে অমান্য করবে না, তখন তাদের বায়আত গ্রহণ করো এবং তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট মাফ চেয়ো। আল্লাহ্তো ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু" (২৮ঃ১২)।

বায়আত কেবল বিলায়েত প্রাপ্ত ওলীগণ করতে পারেন। বিলায়েত প্রাপ্ত ওলী হলেন তিনি, যিনি তরীকতের সকল মাকাম অতিক্রম করে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর ছায়া হতে পেরেছেন। তিনি প্রকৃত নায়েবে রাসূল হিসাবে বায়আত নিতে পারেন। অথবা যিনি ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থাৎ খিলাফতের শাসন ক্ষমতা নায়েবে রাসূল হিসাবে গ্রহণ করেন। অথবা খিলাফত কায়েমের কথা ঘোষণা করেন, তিনিও বায়আত নিতে পারেন।

আল্লাহ্তায়ালা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে বলেছেন, "যারা তোমার বায়আত গ্রহণ করে, তারা আল্লাহ্রই বায়আত গ্রহণ করে, আল্লাহ্র হাত ওদের হাতের উপর। সুতরাং যে উহা ভংগ করে, উহা ভংগ করার পরিণাম তারই এবং যে আল্লাহ্র সাথে অংগীকার পূর্ণ করে, তিনি তাকে মহা পুরস্কার দিবেন।" (৪৮ঃ১০)।

www.pathagar.org

বর্তমান কালে বিপুল সংখ্যক লোক মানবীয় সার্বভৌমত্বের শিরকে লিপ্ত। আলেমগণ ছাড়া অনেকে তা জানে না। এসব লোকেরা সুদ, ঘুষ, মিথ্যা, প্রতারণা, পরনিন্দা ও বিভিন্ন পাপে জড়িত। এ সকল পাপ বর্জনের ও রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর পায়রবী করার অংগীকার না করা পর্যন্ত তাদের বায়আত করা কি তাসাওউফ, তরীকত ও শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয নয়? যদি আলেম ও খাঁটি সূফীগণের নিকট শরীয়ত ও তরীকত অনুযায়ী নাজায়েয হয়ে থাকে, তবে কিসের উপর ও তথাকথিত বায়আত অনুষ্ঠিত হচ্ছে?

অপরিপূর্ণ সূফীগণের নিকট কি কোন আলাদা ইসলাম আছে বা নাযিল হয়েছে? এ সব আজে বাজে কাজের জন্য অনেকের ফায়েজ চলে গেছে বা আটকা পড়ে গেছে। কেউবা মুরীদগণসহ অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। পাপী-তাপী সবাই তার কাছে যেতে পারবে, সোহবত নিতে পারবে। কিন্তু বায়আত করতে হলে মুরীদকে অবশ্যই গুনাহসমূহ পরিত্যাগের অংগীকার করতে হবে। এসব অংগীকারের কথা পীর সাহেবকে অবশ্যই শুনতে হবে। মুরীদ যদি না জানে বা বলতে না পারে তবে পীর সাহেব মুরীদকে স্পষ্ট করে জানিয়ে তার অংগীকার নিয়ে বায়আত করতে হবে। পরবর্তীতে মুরীদ তা পালন না করলে বায়আত ছুটে যাবে। তওবাহ্ করে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত তার বিষয়ে কোন দোয়া করলে তা কবুল হবে না।

আল্লাহ্তায়ালা বলেন-"তুমি ওদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর বা না কর উভয়ই সমান। আল্লাহ্ ওদের ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে ক্ষমা করেন না।" (৬৩ঃ৬)।

পীর সাহেব যদি মুরীদের আগমন ব্যাহত হবে বা দুনিয়ার কোন স্বার্থে কুফ্র, শিরক ও বিদ্আত অনুশীলনে তাদের মানা না করেন এবং এ ব্যাপারে নীরব থাকেন, তবে তিনি এ জন্য যে গুনাহ করলেন ও মুরীদের মাঝে শির্ক, কুফর ও বিদ্আত দূর না করার যে রেওয়াজ চালু করলেন, মৃত্যুর পরও তার অনুসারীদের গুনাহগুলো সমভাবে তার উপর বর্তাবে। তখন তওবাহ্র উপায় থাকবে না।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর ভিতর-বাইরের বা জাহের ও বাতেনের অনুসারী নয়, এরূপ সূফী নামধারী ব্যক্তিগণের দুনিয়া কামাইয়ের জন্য মুরীদ করার কোন হক নেই। এসকল ব্যক্তিগণের নিকট তরীকত শিক্ষা করতে গেলে কম-বেশী প্রতারিত হওয়ার আশংকা আছে। যার জাহেরী আমল দুরস্ত নয় তার কাছে গেলে বা সোহ্বত নিলে পথভ্রষ্টতার আশংকাই বেশী।

www.pathagar.org

খাঁটি সূফী না পাওয়া গেলে আমার ব্যক্তিগত অভিমত হলো, এ পুস্তকে বর্ণিত তাসাওউফের নীতিসমূহ অনুসরণ দ্বারা তওবাহ্ করে সাধনায় লিপ্ত হওয়া এবং তরকে দুনিয়া হয়ে যিকির দ্বারা আল্লাহ্ ভিন্ন পদার্থ মন থেকে বের করার জন্য চেষ্টারত হওয়া। সেজন্য দরকার দুনিয়ার প্রতি আসক্তিশূন্য হওয়া এবং প্রবৃত্তির বিরোধীতা করে নাফ্সকে শরীয়ত ও তাসাওউফের গন্ডিতে ফেলে প্রশিক্ষণ দেওয়া। এভাবে শরীয়ত মুতাবিক পরহেয়গার মুত্তাকী হয়ে আল্লাহ্র কাছে বার বার মোনাজাত বা আবেদন করতে থাকা- একজন যোগ্য তরীকতের শিক্ষক বা পীরের সন্ধান দেওয়ার। কারামত নয় বা পীর হওয়া নয়, আল্লাহ্কে পাওয়াই একমাত্র উদ্দেশ্য থাকলে আশা করা যায়, আল্লাহ্তায়ালা হয়ত তাকে মেহেরবাণী করে উপযুক্ত শায়েখের ইংগিত দেবেন। এ অধম এভাবেই শায়েখের সন্ধান পেয়েছিল।

তাসাওউফের নীতিমালা অনুসরণ করে যিকির করলে যোগ্য শায়েখের সন্ধান না পেলেও অন্তরচোখ খুলে যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে স্বপ্নে বা কাশ্ফে দেখা যেতে পারে। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কাশ্ফ ও এলহাম না হয়ে আল্লাহ্তায়ালাকে পাওয়ার উদ্দেশ্যে নাফ্সকে শরীয়তের বশীভূত করাকে উসিলা করা উচিত। ইবাদত দ্বারা কু-স্বভাবকে সু-স্বভাবে পরিবর্তিত করতে হবে, মন থেকে আল্লাহ্ ভিন্ন চিন্তা-ভাবনা দূর করে দিতে হবে।

যুবক বয়সে এরূপ ভাবে তাসাওউফ পালন করে উপযুক্ত পীরের জন্য প্রতীক্ষার নীতি গ্রহণ করা যায়। কিন্তু অধিক বয়সে তওবাহ্ করলে বেশী প্রতীক্ষা না করে হক্কানী আলেম বা শরীয়তপন্থী সিলসিলাধারী কোন পীরের সাহচর্যে তার নির্দেশ মুতাবিক চলা উচিত। কিন্তু কোন অবস্থায়ই তাসাওউফের রিয়াযত-মুজাহাদা বাদ দেওয়া উচিত নয়। এরূপ আমল করতে পারলে পথভ্রষ্টতার আশংকা থাকে না।

তরীকত অনুসরণ ছাড়া দুনিয়াতে আল্লাহ্তায়ালার দীদার ও মিলনের সম্ভাবনা না থাকলেও তাসাওউফের নীতিমালা অনুসরণ দ্বারা ইন্শাআল্লাহ্ পরকালের বেহেশতের আশা ও আল্লাহ্তায়ালার দীদার লাভের আশা করা যায়।

যিনি তাসাওউফের নীতিমালা পালন করে নাফ্সকে প্রশিক্ষণ দিয়ে পবিত্র করে উপযুক্ত পীরের সংস্রবে থাকেন, তিনি তরীকতে দ্রুত উন্নতি করে মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছে যাবেন। এমন কি এরূপ পবিত্র লোকদের একটি মাত্র ইত্তিহাদী তাওয়াজ্জুহর দ্বারা শেষ দরজায় পৌঁছাবার কথা শোনা যায়। উপযুক্ত শায়েখ এবং তাসাওউফে পরিপক্ক উপযুক্ত মুরীদের সম্মেলনেই এরূপ ঘটা সম্ভবপর।

www.pathagar.org

তাসাওউফ ও যিকির দ্বারা সর্ব অবস্থায় সাধনায় লিপ্ত থেকে পীরের তাওয়াজ্জুত গ্রহণ করার জন্য নিজেকে গড়ে তোলা দরকার। নিজে সাধনা লিপ্ত না থেকে দুনিয়ার পেছনে দৌড়ে শুধু পীরের তাওয়াজ্জুহ তাকে কামিল বানিয়ে দেবে, এরূপ দুরাশা করা উচিত নয়।

এ পুস্তকে এখানেই তাসাওউফ খন্ডের সমাপ্তি করা হলো, শায়েখের ইরাদত বা ইচ্ছা, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর ইচ্ছা ও আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছাতে তরীকতের ফানা হওয়া মানে এ পুস্তকে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত -সার হিসাবে তাসাওউফ খন্ডে বর্ণিত বিষয়াবলীতে আমল দ্বারা নিজকে ফানা করে দিতে হয় স্তরে স্তরে। তবেই অন্তর চোখে শায়েখের বরযখ, সুলুক, উরূয ও নুযুলে ফানাফিস শায়েখ, ফানাফির রাসূল ও ফানাফিল্লাহ্র ফায়েজসমূহ দেখতে ও বুঝতে পারা যায়। ফানাফিশ শায়েখের মাকামে শায়েখের ইরাদাতে ফানা মানে তাসাওউফ খন্ডে বর্ণিত তাসাওউফে ও তরীকতের শায়েখের ইরাদায় ফানা, ফানা ফির রাসূলের মাকামে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইরাদাতে ফানা মানে সুন্নাহ্তে ফানা এবং ফানাফিল্লাহ্র মাকামে ফানা মানে পাক কোরআনে বর্ণিত আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছাতে ফানা। ইরাদতের এ তিনটি ফানা মূলত একই, কেবল স্তরের ব্যবধান।

প্রত্যেক ঈমানদার লোকের মু'মিন মুসলমান হয়ে মরা উচিৎ, ঈমান নিয়ে মরাই কাম্য হওয়া উচিত। সেজন্য তাসাওউফ ও তরীকতের উপর সাধ্যানুযায়ী সাধনা করা পরিহার্য। আল্লাহ্তায়ালা বলেন- "অতএব যখনই অবসর পাও, সাধনা করো এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করো" ৯৪ঃ৭-৮।

প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করাকেই আধ্যাত্মিক সাধনা বলা হয়।

www.pathagar.org

তরীকত

"হে মানুষ! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট
পৌঁছানো পর্যন্ত কঠোর সাধনা করতে থাক,
পরে তুমি তাঁর সাক্ষাত লাভ করবে"। ৮৪ঃ৬।

www.pathagar.org

যিকির ও তরীকত

তাসাওউফের নীতি পালন, শরীয়তের নিষিদ্ধ ঘোষিত কাজ হতে বিরত থেকে ইসলামের স্তম্ভসমূহ পালন করে অন্য কোন দিকে মনোযোগ না দিয়ে এক আল্লাহ্‌র ইসমে যাত আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকিরে নিজকে বিলিয়ে দেওয়ার নাম তরীকত। যে ব্যক্তি অন্য পদার্থের স্মরণ হতে বিমূখ হয়ে সর্বক্ষণ আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকিরে মগ্ন থাকে, তাকে বলা হয় তরীকতের সূফী। তরীকতে প্রবেশ করলে দুনিয়ার যাবতীয় সম্মন্ধ ছেড়ে সর্বক্ষণ যিকিরে মত্ত থাকতে হবে। যেমন- আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন- "হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌র যিকির করবে, সকাল সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করবে"। ৯৩৩ঃ৪১-৪২।

তাসাওউফ বান্দাকে পরহেযগারী পর্যন্ত নিয়ে যায়, আর পরহেযগারীর শেষ সীমা ইখলাস ও সততা। তরীকতে আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্য তলব করা হয়, যার ফলে আল্লাহ্ প্রেম হাঁসিল হয়, যার শেষ সীমা স্রষ্টার হাকীকতের আদিম নূরে মিলন ও দীদার হাঁসিল করা। এমন চরম নৈকট্য ও মিলন আসে যে বান্দার হাত, মুখ, নড়াচড়া আল্লাহ্‌তায়ালার হাত, মুখ, নড়াচড়ায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। যেমন তিনি হাদীসে কুদসীতে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)কে জানিয়েছেন।

আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকিরই ইসমে আযম। যখন দীল-দেমাগ হতে আল্লাহ্ ভিন্ন যাবতীয় পদার্থ বা গায়েরুল্লাহ্‌কে বের করে দেয়া হয়, তখন এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

এজন্যই তরীকতের সাধনা। এ সাধনার শ্রেষ্ঠ কর্তব্য হলো মৌখিক যিকির, কলবী যিকির ও শ্বাসের সাথে যিকির। একটি শ্বাসও যেন যিকিরশূন্য ভাবে না যায় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। জাগ্রত অবস্থায় এরূপভাবে যিকির করলে ঘুমের মধ্যেও যিকিরের ব্যবস্থা আল্লাহ্‌তায়ালা করে দেন। যিকিরকারী যিকিরে তন্ময় হয়ে যিকির করতে করতে প্রেমাস্পদের মাঝে বিলীন হবে। যিকরকারী আল্লাহ্‌র খুশীতেই খুশী থাকবে, তাঁর সব কাছে রাজী থাকবে। এমন কি বালা-মুসিবতকেও আনন্দের সাথে গ্রহণ করবে। কারণ এটা তার বন্ধুর দ্বারা ঘটেছে।

আল্লাহ্‌তায়ালা ছাড়া কারো নিকট কিছু আশা করা যাবে না, কাউকে ভয় করা যাবে না, তকদীরে যা আছে তা ঘটবে। রিযিক তিনিই দেবেন, কারণ একমাত্র আল্লাহ্‌পাকই রিযিকদাতা। সকল কাজ আল্লাহ্‌তায়ালার দ্বারা ঘটে। এ বিশ্বাস বা আকীদা মনে বদ্ধমূল করে সর্বক্ষণ যিকির করতে হবে, সাথে সাথে ফরজ, সুন্নত

www.pathagar.org

আদায় করতে হবে। সমাজে বসবাস করতে হলে অন্যের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধৈর্য সহকারে শরীয়ত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে। শায়েখের সোহ্বতে ও খিদমতে থেকে যিকির করতে পারলে অধিকতর সুফল পাওয়া যাবে।

মনে অহংকার এলে বা নিজকে অন্য থেকে বড় মনে করলে যিকিরে বেশী সুফল দেখা দেবে না। নিজকে সব সময় হেয় মনে করতে হবে। যে বিষয় যিকির ভুলিয়ে দেয় তা আল্লাহ্র দুশমন, সে বিষয় মন থেকে পরিত্যাগ করতে হবে, নইলে আল্লাহ্র বন্ধু হওয়া যাবে না। কারণ বন্ধুর শত্রু যিকির কারীর শত্রু হওয়া উচিত। আল্লাহ্তায়ালার প্রেমাস্পদ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ), যিকিরের সাথে সাথে তাঁকে অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহ্তায়ালা বলেছেনঃ "তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতকে অধিক ভয় করে এবং অধিক আল্লাহ্র যিকির করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ"। ৩৩ঃ২১।

যিকির যদি শুধু মুখে মুখে করা হয় আর অন্তর গাফেল বা অমনযোগী থাকে তবে সহজে তা তাছির করেনা, উপকারও বেশী পাওয়া যায় না। তবে অন্য চিন্তায় সময় নষ্ট না করার চেয়ে উত্তম। মুখে ও অন্তরে যিকির করলে ফায়দা পাওয়া যায়, তবে সব চেয়ে বেশী সুফল পাওয়া যায় যদি মনযোগের সহিত অন্তরের সাথে কলবী যিকির করা হয়।

তরীকতে এমন কোন পদক্ষেপ নেই যা কোরআন ও সুন্নাহ্র বরখেলাফ হয়। তরীকত পরহেযগারীর নূরকে ঢেকে দেয় না, বাড়িয়ে তুলে এবং মানুষকে হারাম কাজ ও চিন্তা থেকে বিরত রাখে। খাঁটি তরীকতপন্থী যখন কথা বলেন আল্লাহ্তায়ালার পক্ষে কোরআন-সুন্নাহ মুতাবিক কথা বলেন, যখন কাজ করেন কোরআন-সুন্নাহ মুতাবিক কাজ করেন। কিছু চাইলে আল্লাহ্র কাছে চান, যখন চিন্তা করেন আল্লাহ্র কথাই চিন্তা করেন, সর্বক্ষণ তাঁকে সঙ্গী হিসাবে ভাবেন, হাজির-নাজির জানেন। তাঁরা সকল বস্তু হতে মন উঠিয়ে আল্লাহ্র উপরই ভরসা করেন, তাকেই বন্ধুরূপে ভাবেন। তাঁরা সর্বক্ষণ তাঁর যিকির করেন, যিকির ছাড়া কোন কিছুকেই ভালবাসেন না। ক্রমে যিকিরের ভালবাসা আল্লাহ্তায়ালার ভালবাসায় রূপান্তরিত হয়। যিকির তার সব গুনাহ ডুবিয়ে দেয়, যিকিরকারী খোদার সব কাজে রাজী থাকেন বলে দুনিয়ার যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা চলে যায়। আল্লাহ্ ছাড়া দুনিয়ার কোন কিছুকে প্রিয় বলে মনে করেন না। যিকির আল্লাহ্র প্রতি ভয় ও ভালবাসা সৃষ্টি করে, নিজেরও তা চাইতে হয়। তাঁরা নিয়ত ও

www.pathagar.org

অন্তরকে নাফ্স্ হতে হেফাজতে রেখে যিকির করেন। প্রবৃত্তি অন্তরে আধিপত্য করতে না পারলে লোকজন তার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না।

এই হলো সূফীদের যিকির ও তাদের রীতিনীতি। যারা তরীকতে এসে যিকির করবে তাদের এসব রীতিনীতি অনুসরণ করতে হবে, যদি সুফল পেতে চায়।

নিজে পবিত্র হয়ে আল্লাহ্তায়ালার দীদার, মিলন ও নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যেই তরীকতে আসতে হয়। এ মকসুদে পৌঁছাতে যা সাহায্য করে তাই তার লক্ষ্য হওয়া উচিত। পূর্বে বর্ণিত সূফীদের তরীকা অনুসরণ করে সর্বক্ষণ কায়মনোবাক্যে আল্লাহ্র যিকির করতে হবে যা তাকে লক্ষ্য পানে ধাবিত করবে। একমাত্র খোদার দরজায় আশ্রয় প্রার্থী হতে হবে, এ দরজা খুলে গেলে সব দরজা আপনা-আপনি খুলে যায়। যিকির ও রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর পায়রবী দ্বারাই এ দরজা খুলতে হয়। একটি কথা মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্ প্রেমিকগণ কখনও ভাবেন না যে, লোকে তার ইবাদত করুক। তাদের গালি দিলে বা অনিষ্ট করলে তারা মনে মনেও গোস্বা হন না। কারণ তারা সব সময় নিজেদের হীন মনে করেন। অহংকার গুনাহ আনে, ইবাদত বরবাদ করে দেয়। দুনিয়ার কামনা -বাসনা তারা ত্যাগ করে বলে শোক-দুঃখেও শান্তি লাভ করতে পারে। যিকিরকারী সূফীগণের এসব রীতিনীতির ছাঁচে নিজকে ফেলে যিকির করতে হবে।

পদস্খলনে তওবাহ্র দ্বারা শয়তান ও ওয়াসওয়াসার বিরুদ্ধে লড়ে পরহেয়গার হতে হবে। পরহেয়গার হয়ে কু-ধারণার সাথে লড়াই করে আল্লাহ্তায়ালার ওয়াদাসমূহের প্রতি ঈমান এনে তরকে দুনিয়া হয়ে কামনা-বাসনার সাথে লড়তে হবে। এগুলো মিটিয়ে আমিত্ব ও আকাঙ্ক্ষার সাথে লড়ে সাফল্য আনতে হবে। সাথে সাথে অবিরত যিকির করতে হবে, তবে এগুলো সহজে মিটানো যাবে।

সাধারণ ঈমানদারগণ দুনিয়া হতে নিরাশ না হওয়া পর্যন্ত সহজে আল্লাহ্তায়ালার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে চায় না। ঈমানদার সম্পদশালীগণ আপদ-বিপদ, রোগ-শোক দ্বারা জর্জরিত হয়ে সকল দরজা হতে যখন নিরাশ হয়, তখন বাধ্য হয়ে আল্লাহ্ অভিমূখী হয় এবং তাঁর আশ্রয়ে আসে। ঈমানদার আলেম, জ্ঞানী ও তত্ত্বজ্ঞ লোকেরা প্রথম হতেই আল্লাহ্ পাকের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। কারণ এসব জ্ঞানী মনীষিরা জানে যে, সত্যের পথে মানুষ নেই, আর মানুষে গড়া বিভিন্ন মতবাদেও সত্য নেই। পাশ্চাত্য দর্শন ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানে আছে নাফ্সকে বলিষ্ঠ করার এবং শয়তানকে খুশী করার জন্য বিভিন্ন উপায়-উপকরণ, যা নাসারা ও ইহুদীরা তাদের পরিবর্তিত ধর্মের সাথে খাপ খাইয়ে

www.pathagar.org

জনশক্তি হাত করার জন্য সৃষ্টি করেছে, যাতে শান্তিপূর্ণভাবে অবাধে শোষণ-জুলুম দুনিয়ার বুকে চালাতে পারে। তাই ঈমানদার জ্ঞানী ও হক্কানী আলেমগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রবৃত্তির উপাসকদের অনুকরণে ধ্বংস হয় না। তাঁরা তাসাওউফ ও তরীকতে দাখিল হয়ে যিকির করতে করতে এ পর্যায়ে পৌছেন যে, তাদের অন্তরে তওহীদ ছাড়া কিছু অবশিষ্ট থাকে না। তখন তিনি যা বলেন খোদার পক্ষ হতেই বলেন বা লিখেন। দুনিয়াদার আলেমরা সম্পত্তি, ক্ষমতা ও সম্মানের জন্য জনসাধারণকে এবং এমন কি তোষামোদ করতে গিয়ে শাসকদের পর্যন্ত বিভ্রান্ত করে।

ঈমানদার জ্ঞানীদের তত্ত্বজ্ঞ হতে হলে কোরআন ও হাদীস অধ্যায়ন করে সে গুলোর সাথে অর্থাৎ সত্যের সাথে সংগতি এনে মহাবিশ্বের এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে সে সবের সৃষ্টি ও পরিচালনা কৌশল সম্মন্ধে পর্যালোচনা ও চিন্তা-ভাবনা করতে হয়। সব কিছু পরস্পর সম্পর্কে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে তওহীদে বিলীন হয়ে আছে। সব কিছু স্পষ্টভাবে ও ইংগিত-ইশারায় কোরআন -সুন্নাহ্তে সংক্ষিপ্তভাবে আছে। সাথে সাথে আল্লাহ্তায়ালার ওয়াদাসমূহের কথাও চিন্তা করতে হবে। এতে ঈমানের দৃঢ়তা আসে। এ সাথে যিকির বাদ দিলে হবে না। তা হলে স্রষ্টা মেহেরবাণী করলে জ্ঞান কলবে ঢেলে দিবেন।

আল্লাহ্তায়ালার যিকিরে বান্দার চারদিকে জীবনীশক্তি ও নূরের স্রোতধারা প্রবাহিত হয়। যিকিরে নূর হাঁসিল হয়, যার দ্বারা তিনি সব কিছু দেখেন এবং তওহীদ মারফত আল্লাহ্কে পান। যিকির ও ইবাদতে মধুর স্বাদ অনুভব করা যায়, যা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। যিকিরে আসক্তি জন্মালে মৃত্যুর পরও তার প্রভাব থেকে যায়, বরং নাফ্সের ইখতিয়ার না থাকায় শতগুণ বৃদ্ধি পায়। দুনিয়াতেও নাফসের সাথে আত্মার সম্বন্ধ বিছিন্ন হলে আরাম ও মজা উপলব্ধি হয়। ইসমে যাতের যিকির করার যার ক্ষমতা আছে সে দুনিয়াতে উপায়হীন থাকে না, যে যিকির করতে অপারগ হয়, সেই উপায়হীন ভাবে সৃষ্টির মুখাপেক্ষী থাকে।

যিকির আল্লাহ্ পাকের সাথে মিলনের সেতু, দীদার ও নৈকট্যের উপায়, স্রষ্টার সাথে ভালবাসা স্থাপনের উপকরণ। যিকির দ্বারা আমল সহজ হয়, সাহস বৃদ্ধি পায়, রিয়া হতে মন পবিত্র হয়, নিয়তের বিশুদ্ধতা অর্জিত হয়। যিকিরের প্রভাবে মনে আল্লাহ্তায়ালার চিন্তা প্রবল হয়। যিকির উচ্চ মর্যাদা ও আল্লাহ্তায়ালার দিকে প্রত্যাবর্তনের সম্বল। নামায, কোরআন তেলওয়াত, তসবীহ-তাহ্লীল ইত্যাদিকেও যিকির বলা হয়।

www.pathagar.org

ফরজ, সুন্নত ও ওয়াজিব আমলসমূহ আখিরাতের মুক্তির জন্য পালন করতেই হবে। নফল নামায, কোরআন তেলাওয়াতে ও তসবীহ্ তাহলীল পাঠে আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকিরের মত নৈকট্য আসেনা বা নূরও হাঁসিল হয় না। কোরআন তেলাওয়াত ও তসবীহ পাঠ করে যতক্ষণ না আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকিরে নিজকে অভিষিক্ত ও মগ্ন রাখা না হয়, ততক্ষণ নূর হাঁসিল হয় না।

ফরজ, সুন্নত ওয়াজিব ইবাদত ও কোরআন তেলাওয়াতে এক জাতীয় নৈকট্য হাঁসিল হয়, তবে সেটা তত উপলব্ধি হয় না। তবে এতে সওয়াব হাঁসিল হয়, মৃত্যুর পর বোঝা যায় এবং আখিরাতে মুক্তি পাওয়া যায়। আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকিরে নৈকট্য ও নূর হাঁসিল হওয়ার কারণে নিষ্ঠা সহকারে ফরজ, সুন্নত আদায় করা যায়। দেখে শুনে মনের শান্তি এনে ইবাদত করা যায়। আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকির করে ফরজ, সুন্নত ও ওয়াজিব অবহেলা করলে পরকালে শাস্তি পেতে হবে। মুক্তি একমাত্র রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর পায়রবীতে। ফরজ, সুন্নত ও ওয়াজিব আদায়ের সাথে যিকির করতে হবে।

ইসমে যাতের যিকিরকারীগণ আল্লাহ্র নূরে নূরান্বিত হয়ে যান। যিনি আল্লাহ্র যিকির করেন, আল্লাহ্তায়ালাও তার স্মরণ করেন। আসমান, যমিন, বেহশত, দোযখের মালিক হয়ে তিনি যে ক্ষুদ্র অসহায় মানুষকে স্মরণ করেন, এটা তাঁর সীমাহীন মহত্ব ও দয়া, যাঁর বিরাটত্ব ও ব্যাপকতা পরিপূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। স্রষ্টার স্মরণের ফলে ক্রমে ক্রমে যিকিরকারী সংশোধিত হয়ে আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত হয়ে যায়। শর্ত হলো যিকির শুরুর পর ইচ্ছা করে পাপ না করা ও দোষ-ত্রুটিতে সব সময় তওবাহ্ করা।

দুনিয়ার লোকজন যাতে নিমগ্ন ও জড়িত, তা হতে পলায়ন করে নির্জনে যিকিরে ও ধ্যানে মশগুল থাকলে ও তাতে সুখ অনুভব করলে মানুষ ও সৃষ্টির প্রতি আসক্তি দূর হয়, খোদা প্রেম সেখানে বহাল হয়। যিকির বা ইবাদতে সুখ অনুভব করলে তা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁকে ছাড়া কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা না হলে দীদার লাভ সহজ হয়। মনে দুনিয়ার লোভ থাকলে আল্লাহ্ প্রেম দূরে চলে যায়।

তরীকত আর কিছুই শুধু নয়, অবিরত আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকির ও সব কিছু হতে মনকে ফিরিয়ে আল্লাহ্তায়ালার চিন্তা-ভাবনার দ্বারা মনকে সর্বক্ষণ তৎপর রেখে আবাদ করা এবং আল্লাহ্ ভিন্ন পদার্থ মনে না আনা। এজন্য মনকে সংরক্ষণ করা যাতে কোন আকাঙ্ক্ষা মনে স্থান নিতে না পারে।

www.pathagar.org

এ হালে যখন শায়েখের তাওয়াজ্জুহ্‌র দ্বারা কলবী যিকির শুরু হয়, তখনই আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্য শুরু হয়। কিন্তু মনে অন্যান্য সম্মন্ধ থাকার দরুন অন্তর চোখে কিছু দেখা যায় না। যখন সম্মন্ধ সকল দূর হয়, নাফ্‌স পরিষ্কার হয়ে যায়, সকল জঞ্জাল মন থেকে দূর হয়ে যায়, তখন অন্তর চোখে সব স্তর অনুযায়ী সব দেখা-শোনা শুরু হয়ে যায়। সব সময় শ্বাসের সাথে বা মনে মনে যিকির করলে শায়েখের তাওয়াজ্জুহ্‌ ছাড়াও কলবী যিকির জারী হয়।

কোরআন তেলাওয়াত ও তসবীহ-তাহলীল পাঠে একরকম নৈকট্য আসে, অন্তর চাখে তা দেখা না গেলেও মনে মনে ও স্বপ্নে-তা অনুভব করা যায়। কোরআন ও তসবীহ-তাহলীল পাঠে অনেক দেরীতে নৈকট্য আসে, কিন্তু তার স্থায়ীত্ব অধিক। আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ যিকিরে তাড়াতাড়ি নৈকট্য আসে, কিন্তু উদ্যম ও তৎপরতা বন্ধ করে দিলে তাড়াতাড়ি চলে যায়। সর্বদা যিকিরের তৎপরতা বজায় রাখতে হয়।

কোরআন তেলাওয়াত ও তসবীহ-তাহলীল পাঠে একরকম নৈকট্য আসে, অন্তর চোখে তা দেখা না গেলেও মনে মনে ও স্বপ্নে-তা অনুভব করা যায়। কোরআন ও তসবীহ-তাহলীল পাঠে অনেক দেরীতে নৈকট্য আসে, কিন্তু উদ্যম ও তৎপরতা বন্ধ করে দিলে তাড়াতাড়ি চলে যায়। সর্বদা যিকিরের তৎপরতা বজায় রাখতে হয়।

শ্বাসের সাথে আল্লাহ্‌ শব্দ নিয়ে হু শব্দ কলবে ছাড়লে অথবা আল্লাহ্‌ শব্দ কলবে ছেড়ে হু শব্দ শ্বাসের সাথে টেনে নিতে হয়। এতে কলবে মনে মনে আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ যিকিরের চেয়ে আগে অন্তরচোখে খোলে, কিন্তু এতে পরিশ্রম বেশী হয়। আল্লাহু শব্দ শ্বাসের সঙ্গে যিকির করা জালালী, কলবে আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ বললে আস্তে আস্তে কলব্‌ও আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ বলে। আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ যিকিরে শ্বাসের সাথে আল্লাহু যিকিরের চেয়ে দেরীতে অন্তরচোখ প্রস্ফূটিত হলেও এতে কিন্তু সুবিধা বেশী। এতে 'কল্‌ব আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ বলে' শুধু এই খিয়াল ও মনযোগ রাখলেই ক্রমে প্রথমে যিকির বক্ষদেশে, পরে বুক ও মাথায় যিকির করে, অবশেষে সর্বশরীরে যিকির ছড়িয়ে পড়ে। কারো কারো সর্বশরীরে যিকির জারীর পর অন্তরচোখ খোলে।

এ পুস্তকে তাসাওউফ খন্ডে বর্ণিত নীতিমালা পালন করে যিকির করলে এবং আল্লাহ্‌ ভিন্ন পদার্থ বা গায়রুল্লাহকে মনে স্থান না দিলে সর্বশরীর নূরানী হয়ে জড়দেহ ভিন্ন জড়দেহের আকৃতিতেই ভিন্ন একটি নূরীদেহ সংগঠিত হয়, যা অন্তর চোখে দেখা যায়। একে বরযখ বলে। এই নূরীদেহ উরূয করে বা ঊর্ধ

www.pathagar.org

দেশে যায়, নিম্নে অবতরণ করে ও সয়ের করে। আউলিয়াগণ ছাড়া মৃত্যুর পর সাধারণের জড়দেহ ধ্বংস হয়ে যায়, এই বরযখই আলমে বরযখে থাকে। আউলিয়াগণ এ বরযখের সাহায্যে জীবিত কালে যা দেখেন, মৃত্যুর পরও তাই দেখেন। তবে মৃত্যুর পর সেগুলো আরো স্পষ্ট ও তীক্ষ্ম হয়। এই বরযখই শায়েখের বরযখে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর বরযখে এবং আল্লাহ্তায়ালার সিফাতী ও যাতি নূরে মিলিত হয় বা মিশে যায়। এটাই স্রষ্টার সাথে মিলন, এভাবে বিভিন্ন স্তরে চরম নৈকট্য লাভ হয়। একথা মনের অনুভূতি বা কল্পনা নয়, বাস্তব সত্য। যিকিরেই এ সৌভাগ্য আনে।

কেউ যদি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর পায়রবী না করে নামায-রোযা না করে, শুধু সর্বক্ষণ আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকির করে তবু তার অন্তর-চোখ খুলতে পারে, যদি তরকে দুনিয়া হয়ে লোভ-লালসা ও কাম রিপুকে বশীভূত রাখতে পারে। নিয়ত সঠিক না হলেও এগুলো হুযুরের (সাঃ) অনুসরণ। অনুসরণের ফল দুনিয়াতে পাবে, নিয়ত সঠিক না হওয়ায় কোন সওয়াব পাবে না। হুজুর (সাঃ) এর পায়রবী ও শরীয়তকে আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টির নিয়তে পালন না করলে আখিরাতে মুক্তি পাবে না। দুনিয়াতেও প্রথম অবস্থায় অন্তরচোখে হেদায়েত আসতে পারে। না মানলে শয়তান কার্যকরী হবে। শয়তান তখন নাফ্সকে দিয়ে লোভ-লালসা ও অহংকারে ফেলে সব অন্ধকার করে ফেলবে।

শরীয়ত ছাড়া যে তরীকত হয় না, দলীল-প্রমাণের অনুকূলে বাস্তবে সংঘটিত দু'টো ঘটনার উল্লেখ করতে চাই, যদিও তরীকত অনুশীলনকারীদের জীবনে অহরহ এ জাতীয় ঘটনা ঘটছে। ঈমানদারদের জন্য এ দু'টো ঘটনাই যথেষ্ট।

ক্বদমীয়া তরীকার শায়েখ ও আমার পীর সাহেব কেবলা মহাত্মা মরহুম আবদুল (রহঃ) আনসারী (র) সাহেবের আত্মীয় জনৈক উকি সাহেব মৃত্যু শয্যায় ক্বদমীয়া তরীকায় দাখিল হয়ে পীর সাহেব কেব্লার মুরীদ হওয়ার জন্য বার বার তাগিদ দিয়ে খবর পাঠাচ্ছিলেন। এ অবস্থায় মুরীদ হয়ে কি ফল হবে ভেবে পীর সাহেব দেরী করছিলেন। অবশেষে আত্মীয়-স্বজনদের অনুরোধে উকিল সাহেবের আন্তরিক ইচ্ছা পূরণের জন্য তিনি উকিল সাহেবের শয্যাপাশে যান। ধরে বসাবার কথা বলায় উকিল সাহেবের ভক্ত ও খাদেম জনৈক হিন্দু ভদ্রলোক তাকে পিছন দিকে ধরে রাখেন। পীর সাহেব কেবলা তাওয়াজ্জুহর প্রতি মনোনিবেশ, একাগ্রতা ও বিশ্বাস আনতে বললেন। উকিল সাহেবের সাথে সাথে হিন্দু ভদ্রলোকও পীর সাহেবের কথা অনুযায়ী একাগ্রতা ও বিশ্বাস নিয়ে তাওয়াজ্জুহ্র প্রতি মনোনিবেশ করে।

www.pathagar.org

ফল দাঁড়ায় এই যে, তাওয়াজ্জুহর প্রভাবে আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছা সেই হিন্দু ভদ্রলোকের কলব্ও আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলতে থাকে। তিনিও সাথে সাথে তাতে মনোযোগী হন ও নিষ্ঠা সহকারে কল্বের অনুকূলে যিকির করতে থাকেন। তিন-চার বছর পর তার বরযখ হাসিল হয়ে যায়। কিন্তু তিনি পীর সাহেবকে বিষয়টা জানাননি। তিনি সেই বরযখের সাহায্যে লোকের রোগ-ব্যাধি ভাল করতে থাকেন এবং পীর সাহেবের মুরীদ বলে নিজেকে প্রচার করেন, অথচ পীর সাহেব মুরীদ করেননি।

বিষয়টি প্রতারণা মনে করে পীর সাহেব হিন্দু ভদ্রলোককে ডেকে তার মুরীদ দাবী করার জন্য কৈফিয়ত তলব করেন। উক্ত হিন্দু ভদ্রলোক বিস্তারিত জানান। তখন পীর সাহেব বললেন, আল্লাহ্তায়ালার সার্বজনীন দয়া ও রহমত ফায়েজ প্রাপ্ত লোকের উসিলায় তোমার উপর সাময়িকভাবে কার্যকরী হয়েছে মাত্র। আমার দেওয়া বা নেওয়ার কোন ইখতিয়ার নেই। তুমি যদি একে রাখতে চাও, এগিয়ে নিতে চাও তবে তোমাকে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর রিসালাতের স্বীকৃতি দিতে হবে এবং তাঁর পায়রবী করতে হবে। তবেই আল্লাহ্তায়ালাকে পাবে। নইলে তোমার উপর নাফ্স শয়তান কার্যকরী হয়ে তোমার সব কিছু ঢেকে দেবে, পূর্বের মত হয়ে যাবে। আল্লাহ্তায়ালা সব কিছুর জন্য নির্দিষ্ট কাল সবর করেন। এক আল্লাহ্তে স্বীকৃতিই যথেষ্ট নয়, শয়তানও এক আল্লাহ্কে স্বীকৃতি দেয়, কিন্তু তাঁর আদেশ-নিষেধ না মানার কারণে মুক্তি পাবে না। তুমি যা লাভ করেছো, তা আল্লাহ্র হেদায়েত ও রহমত যা তরীকতের প্রথম শ্রেণী মাত্র, আল্লাহ্তায়ালাকে পাওয়া অনেক দূরে।

হিন্দু ভদ্রলোক স্ত্রী, সন্তান, আত্মীয়-স্বজন ও সমাজ ছেড়ে মুসলমান হওয়া অসম্ভব বিবেচনা করে, মহামন্ত্র পেয়ে গেছে মনে করে উপদেশ গ্রহণ না করে পূর্ণ উদ্যমে মহামন্ত্র চালিয়ে যায়, কিন্তু কোন ফল হয়নি। বছর দুই এক পর তিনি আলো থেকে অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হন।

আরেক ঘটনা আল্লাহ্তায়ালা আমার জীবনে সংঘটিত করে শরীয়ত ছাড়া তরীকতে কোন ফায়দা নেই, শরীয়ত ছাড়া তরীকত নেই- এ আকীদাকে য়াকীনে পরিণত করে দেন।

একবার আমি কার্যোপলক্ষ্যে ময়মনসিংহ জিলার ভাটি অঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকায় যাই। সেখানে কজন আল্লাহ্ওয়ালা লোক আমাকে দাওয়াত করে তার বাড়ী নিয়ে যান। খবর পেয়ে একটি সতেরো-আঠারো বছর বয়সের ছেলে আমাকে দেখতে আসে। সে জানায় যে, তার বাড়ী ঢাকা জিলার দক্ষিণাঞ্চলে।

www.pathagar.org

সে আল্লাহ্তায়ালাকে পাওয়ার জন্য অধীর হয়ে বাড়ী-ঘর, মা-বাপ সবাইকে ছেড়ে এক বেশরা ফকীরের স্মরণাপন্ন হয়ে তার সাথে বহু জায়গা ঘুরে চার-পাঁচ বছর পর নিকটেই সেই ফকিরের বাড়ী এসে হাজির হয়। তখন এক ভদ্রলোক দয়া করে ছেলেটিকে তার বাড়ী নিয়ে আসেন এবং স্থানীয় হাইস্কুলে ভর্তি করে দেন। এখনও লেখা-পড়ার ফাঁকে ফাঁকে সেই ফকীরের কাছে যায়।

ফকীর নামায পড়ে না, রোযা রাখে না, কেবল আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকির করে। ছেলেটিকে বলেছে, "রোযা-নামায আলেমদের লাইন এবং আলেমরা ফকীরদের দেখতে পারে না। মওলবীরা রোযা, নামায পড়ে মা'রিফাত পায় না, এটা জাহেরী বিদ্যা। শুধু আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকির করা মা'রিফাতের লাইন। শরীয়ত ও মা'রিফাত সম্পূর্ণ আলাদা। তুমি শুধু আল্লাহু আল্লাহু যিকির কর, মা'রিফাত পেয়ে যাবে। অন্তরচোখ খোলা মানে মা'রিফাত হাঁসিল হওয়া।"

ছেলেটি জানালো, এ সব ফকীররা গাজা-ভাঙ খায়, তাকেও খেতে বলে। সে নেশাখোর হয়ে যাবার ভয়ে ওসব খায় না, ওরা পয়সা পেলেই ওসব খায়। মাসে দুয়েকবার বৈঠক করে দল বেঁধে বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে নেচে যিকির করে ও মারফতি গান গায়। পরে গাজা-ভাঙ খেয়ে নেশায় ঘুমায়।

সে ফকীরদের কাছ হতে মা'রিফাত পেয়েছে কিনা জিজ্ঞাসার জওয়াবে বললো-পাঁচ-সাত বছর ধরে ওদের পেছনে ঘুরে ও যিকির করে কিছুই পায়নি, তার অন্তরচোখ খোলেনি। সে এখন নিরাশ হয়ে গেছে।

ছেলেটিকে তরকে দুনিয়া সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও মা-বাবা, পরিবার-পরিজন পরিত্যাগ করে আল্লাহ্কে পাওয়ার জন্য উগ্রীব হওয়ার জন্য আমার মনপ্রাণ স্বাভাবিকভাবে স্নেহপ্রবণ হয়ে পড়ে, তার প্রতি মনযোগী হই এবং যিকির-আযকারের পদ্ধতি বলে দেই। তাকে রোযা-নামায পড়তে ও শরীয়ত মুতাবিক চলতে উপদেশ দেই এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে ভালবাসতে বলি।

এ ঘটনার বছর দু'য়েক পর তাকে অন্তর চোখে দেখতাম, যদিও তাকে ভুলে গিয়েছিলাম। মনে করলাম, সে হয়ত আমাকে ভালবাসে ও বিশ্বাস করে বলে এরূপ হচ্ছে।

অবশেষে সে একদিন অন্যের কাছ থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করে আমার ঢাকার বাসায় এসে হাজরি হয়ে বললো, "আমার অন্তরচোখ খুলে গেছে, সব সময় আপনার বরযখ পাচ্ছি। ফকীরের পিছনে এত বছর কাটিয়ে যা পাইনি, আপনার সাথে দুঘন্টা কাটিয়ে তা পেয়ে গেছি। অন্তরচোখে সেসব ফকীরদের দেখিনা,

www.pathagar.org

অথচ আপনাকে দেখি। তাই আমার ধারণা হয়েছে, আপনার দ্বারা আমার চোখ খুলেছে।"

আমি বললাম, আমার দ্বারা চোখ খোলেনি, আল্লাহ্তায়ালাই অন্তরচোখ দান করেছেন- তাঁর কাছে শোকর কর। অন্তরচোখ খোলার নাম মা'রিফাত হাঁসিল হওয়া নয়। মা'রিফাত বহুদূর।

আমি তাকে নামায পড়ে কিনা এবং ফরজ রোযা রাখে কিনা জিজ্ঞেস করায় বললো- মাঝে মাঝে নামায পড়ে এবং অনিয়মিত রোযা রাখে। রোযা-নামাযের বিশেষ তাগিদ দেওয়ায় বললো যে, তার রোযা- নামায ছাড়াই অন্তরচোখ খুলে গেছে, তাই রোযা-নামাযের কি দরকার।

বুঝলাম এখনও বেশরা ফকীরের প্রভাব রয়ে গেছে। তাকে জানালাম "অন্তরচোখ খোলা মানেই ধর্মে প্রবেশ নয়, রোযা-নামাযই আনুগত্যের প্রবেশদ্বার। শরীয়তের অনুসরণ ও রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর পায়রবী ছাড়া নাফ্স শয়তানের তাড়না হতে এবং নানা রূপ ধোঁকা হতে বাঁচার কোন বিকল্প নেই। শরীয়তের অনুসরণ ও পরহেয়গারী ছাড়া আধ্যাত্মিক সাধনায় সাফল্য আসবে না। শরীয়ত কঠোর ভাবে অনুসরণ না করলে নাফ্স সব নূর গ্রাস করে অন্ধকার করে ফেলবে। ফকিরী পাওয়া সহজ, রাখা কঠিন, শরীয়ত ছাড়া তা রাখা যায় না।"

সে আমার এ উপদেশ মানেনি। কিছু দিন পর প্রচুর যিকির করা সত্ত্বেও হৃদয় অন্ধকার হয়ে সাধারণে পরিণত হয়। শরীয়ত ছাড়া যে তরীকত নেই আমার এ বিশ্বাস দৃঢ় প্রত্যয় লাভ করে। এ ছাড়া অনেক তরীকতপন্থীকে লোভ-লালসা, সংসারাসক্তি ও মিথ্যা কথা বলার জন্য ও গর্ব-অহংকারের জন্য অন্তরচোখ বন্ধ হয়ে যেতে দেখেছি। তাই তরীকতপন্থীগণ সাবধান। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর জাহেরী-বাতেনি অনুসরণ ছাড়া তরীকতে উন্নতি নেই। এ পুস্তকের অধিকাংশই অভিজ্ঞতা লব্ধ ও পরীক্ষিত উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তরীকতপন্থী সাধকগণ অনুশীল করলে এর বাস্তবতা বুঝতে পারবেন।

রোযা-নামায পড়ে এবং অন্তরচোখও খোলা এরূপ লোক যদি কবীরা গুনাহ বার বার করে, কাম রিপুর অনুকূলে চিন্তা-ভাবনা করে, দুনিয়াদারী করতে গিয়ে লোভ-লালসায় পড়ে মিথ্যা ও প্রতারণায় লিপ্ত হয় এবং নিজকে বড় মনে করে অহংকার করে, তবে তার অন্তরচোখ বন্ধ হয়ে যায়। শরীয়ত অনুযায়ী না চললে ফকিরী পেলেও তা রাখতে পারে না। তখন শয়তান তার মনে এরূপ ধারণা নিক্ষেপ করতে থাকে যে, পীর সাহেব অন্তরচোখ দিয়েছিলেন, তিনিই ছিনিয়ে

www.pathagar.org

নিয়েছেন, নিজের দোষ না দেখে পীর সাহেব বা অন্যের দোষ দেখে। ইহা শিরকী ধারণা। এতে আত্মিক সম্পর্কে ছিন্ন হয়ে যায়। প্রত্যেক শায়েখ বা শিক্ষক চান তার মুরীদ বা ছাত্র উন্নতি করুক। পীর সাহেব নন, তাঁর উসিলায় আল্লাহ্তায়ালা অন্তরচোখ দান করেন। প্রবৃত্তির বিরোধীতা না করে অনুকূলে নাফরমানী করে শরীয়তের প্রতিকূলে কাজ করতে থাকলে নাফসের কালিমা সব ঢেকে দেয়। এ ভাবে আল্লাহ্তায়ালার অসন্তুষ্টির আইনই সব ছিনিয়ে নেয়। এজন্য বলা হয় ফকিরী পাওয়া সহজ, কিন্তু রাখা কঠিন। রাখতে হলে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)কে অনুসরণ করতে হয়।

তাযকিয়া নাফ্স না হলে কেউ যদি পীর-মুরিদীকে ব্যবসা স্বরূপ গ্রহণ করে তবে নাফ্স তাকে লোভ-লালসায় নিক্ষেপ করবে, আংশিক ইখলাস বিনষ্ট করে ফেলবে, আত্মা দুর্বল হয়ে ক্রমে অন্তরচোখ নষ্ট হয়ে যাবে এবং সাধারণে পরিণত হবে। তখন শুধু যিকিরে ফল দেবে না, যদি না তওবাহ্ করে নিজকে পরিপূর্ণ সংশোধন করে এবং আল্লাহ্ ভিন্ন পদার্থ মন থেকে বের করে।

তরীকতে দাখিল হয়ে কায়েম থাকতে হলে আমৃত্যু অবিরত আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকির ও আল্লাহ্তায়ালার চিন্তা-ভাবনা করতেই হবে। সাথে সাথে শরীয়ত অনুসরণ করলে সরল পথে থাকবে, শরীয়ত অবহেলা করলে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। তিনি পীর বা আল্লাহ্তায়ালার গুপ্ত পুরুষ যেই হউন।

পথভ্রষ্টতার আরেক শাখা হল মাযার পূঁজা। আল্লাহ্র কাছে না চেয়ে মাযারের বুযুর্গদের কাছে চাওয়া। অবশ্য যাদের অন্তরচোখ প্রস্ফূটিত, তারা সেই বুযুর্গকে দেখতে পান। যে যেই মাকামে আছে, সেই মাযারের বুযুর্গের যদি সেই মাকাম তার বা শেষ হয়ে থাকে তবে যিয়ারতকারী তার মাকামের ফায়েজ পেতে পারেন অর্থাৎ সেই মাকামের ফায়েজ পূর্ণ হতে পারে বা বুযুর্গের সাথে উরূয করতে পারেন, কিন্তু মৃত বুযুর্গ যিয়ারতকারীকে তরক্কী দিতে পারেন না, এ জন্য জীবিত বুযুর্গের দরকার। যেমন কেউ ফানাফিশ শায়েখের মাকামে আছেন, মৃত বুযুর্গ বাকাবিল্লাহর মাকামে থাকলেও যিয়ারতকারীর ফানাফিশ শায়েখের মাকামের ফায়েজ পূর্ণ হতে পারে, কিন্তু ফানাফির রাসূলের মাকামের তরক্কী দিতে পারবেন না। যার অন্তরচোখ খোলেনি তার যিয়ারত নসিব হবে না। দুনিয়ার জন্য কোন কিছু চাইলে কাজ হবে না, কারণ মৃত লোকের দোয়া কবুল হয়না। আল্লাহ্র কাছে না চেয়ে বুযুর্গের কাছে চাইলে শিরক হবে। অবশ্য মাযারের হেফাযত করলে, সম্মান করলে ও ওলীআল্লাহ্ হিসাবে ভালবাসলে ফায়দা হবে। বুযুর্গকে উসিলা করে আল্লাহ্র কাছে চাইলে দোয়া কবুল হতে পারে। মাযারকে যেমন

www.pathagar.org

পীঠস্থান রূপে পুঁজা করতে নেই, তেমনি অবহেলা করার মত বেয়াদবীও করতে নেই।

বিভ্রান্তির আরেকটি শাখা হল, মুর্শিদী, মারফতি, ভক্তিমূলক ও মরমী গান ইত্যাদি। আধুনিক বিভিন্ন জাতের গান শরীয়ত মুতাবিক নাজায়েয, এ ব্যাপারে ঐক্যমত আছে। কিন্তু মুর্শিদী, মারফতি, লালনগীতি ও বাউল ইত্যাদি ধর্মের আনুকুল্যে গাওয়া হয়। অনেকে একে সওয়াবের কাজ মনে করে বিভ্রান্ত হয়। অন্যান্য মতবাদের ধর্মে বা বিকৃত ঐশী ধর্মের অনুসারীগণ হৃদয়ের ভক্তিমূলক অনুভূতিকে ধর্ম বলে মনে করে। ঈমানের ব্যাপারে শুধু আল্লাহ্ প্রেমে মনের অনুভূতি আছে, কিন্তু এর পরিপূরক হিসাবে সাথে সাথে আছে ইবাদত, আছে আল্লাহ্র জন্য দুনিয়ার যাবতীয় কিছু হতে প্রেম মুক্ত হওয়া, দুনিয়া প্রেম, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী সহায়-সম্পত্তি সবকিছুর প্রতি আসক্তিশূন্য হওয়া। শুধু হৃদয়ে ভক্তিমূলক অনুভূতি সৃষ্টির জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর নিকট রিসালাত আসেনি, প্রভুর দাসত্ব শিক্ষা দেয়ার জন্য একক প্রভুকে চেনার জন্য ওহী নাযিল হয়েছে।

সারা জীবন কেউ ভক্তিমূলক ভাবের অনুভূতিতে আবদ্ধ থাকলে ও রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে অনুসরণ না করলে ও ইবাদত পালন না করলে তার আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছা দূরের কথা, শরীয়ত অনুসরণ না করার কারণে মুক্তির সম্ভাবনাই কম। আল্লাহ্-প্রেম শুধু ভক্তিমূলক অনুভূতি নয়, প্রভূর জন্য দাসের ত্যাগ-তীতিক্ষা, নিজের পার্থিব লোভ-লালসা ও স্বার্থত্যাগ এবং প্রভূর আদেশ-নিষেধ ও তার সন্তুষ্টিতে নিজ সত্তা বিলীন করাকে আল্লাহ্-প্রেম বলে। যা কিছু আল্লাহ্ হতে দূরে রাখে, সে সব প্রতিবন্ধকতা বর্জন করা আল্লাহ্র পথের যাত্রীদের জন্য অপরিহার্য। গান-বাজন্য হল অন্যতম প্রতিবন্ধক। আল্লাহ্-প্রেমিক কখনও সে সব প্রতিবন্ধকতার প্রাচীর নিজের সামনে রচনা করেন না। তিনি প্রভূ নির্দেশিত কার্যাবলী পালনেই ব্যস্ত থাকন। ইসলাম শুধু ভাববাদ নয়, ভাববাদ ও কর্মবাদের মিশ্রণ। ঈমানের কিছু অংশ ভাববাদ হলেও ইসলাম মূলত কর্মবাদ। মনে মনে অবিরত যিকির, নাফসের বিপরীত চলা, আল্লাহ্তায়ালার প্রসংশা ও চিন্তায় বিভোর থাকার নাম আলাহ্-প্রেম। নির্জনে আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকিরে মশ্ত হয়ে খোদার এক জন দাসরূপে তাঁর ফরজ, সুন্নত ও ওয়াজিব পালন এবং নিষিদ্ধ কাজ পরহেয, দুনিয়া ও আখিরাতের কামনা বাসনা হতে নির্লিপ্ত ও আসক্তিহীন হয়ে জীবন যাপন করার নাম তরীকত।

এর বিপরীতে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর তরীকা ছেড়ে আল্লাহ্তায়ালার আদেশ-নিষেধের গন্ডিতে না এসে ভক্তিমূলক মরমী, মুর্শিদী, কাওয়ালী, লালনগীতি

www.pathagar.org

গেয়ে ও শুনে কেউ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি পেতে পারে না, প্রেম তো দূরের কথা। কেউ একে আল্লাহ্-প্রেম মনে করলে তা মনগড়া কল্পনা ও নাফসের ধোঁকা মাত্র। যদি ভক্তিমূলক লালন, বাউল ও কাওয়ালী গেয়ে ও শুনে আল্লাহ্‌কে পেতে পারতো, তবে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তা বলে যেতেন, নবুয়ত-রিসালতের তিনি কোন কিছু গোপন করেননি।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সামনে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) এর প্রশস্তি ও প্রশংসামূলক গজল দুয়েকবার বাদ্যযন্ত্র ছাড়া গাওয়া হলে তিনি তা নিষেধ না করলেও সন্তুষ্টি প্রকাশ করেননি বরং তাঁর আচরণে অসন্তুষ্টি প্রকাশ পেয়েছে। প্রাচীন কালে সূফীদের এক সম্প্রদায় আল্লাহ্-প্রেম ও দাসত্বের সব শর্ত পালন করে কঠোর সাধনার দ্বারা নিজকে তাযকিয়া নাফ্‌স করে বাদ্যযন্ত্র ছাড়া আলাহ ও রাসূল প্রশস্তি কবিতা বা গজল আকারে নিজেরা গাইতেন বা শুনতেন। তাযকিয়া নাফ্‌স যার হয়নি, পূণ্যের চেয়ে পাপ যাদের বেশী, তাদের এতে প্রবেশাধিকার দিতেন না।

এটা ধারাবাহিকরূপে চিশতীয়া তরীকার ইমাম সুলতানুল আরেফিন হজরত খাজা মুইনউদ্দিন চিশতী (র) মাঝে মাঝে অনুশীলন করতেন। এটা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল। কোন সার্বজনীন ব্যাপার ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে অনুসরণ হল সার্বজনীন। ব্যক্তিগত ব্যাপারের বোঝাপড়া হবে আল্লাহ্‌র সাথে। সার্বজনীন ব্যাপারের ফয়সালা হবে আল্লাহ্‌তায়ালার আইন অনুযায়ী। বর্তমানে বাদ্যযন্ত্র সহকারে যে ভাবে মারফতি, মুর্শিদী, লালনগীতি ও কাওয়ালী গাওয়া হয় এবং যে ভাবে সর্বস্তরের লোকজন এতে যোগদান করে, তাতে আল্লাহ্‌তায়ালার অসন্তুষ্টি কামাই করে প্রবৃত্তির বাসনা পূরণ করে। সুন্নত জামাতের আকীদা মুতাবিক গান-বাজনা হারাম, হক্কানী-আলেমগণ এতে একমত।

অভিজ্ঞতায় দেখা যায় চিশতীয়া তরীকার যে সব বুযুর্গ গান-বাজনা ও কাওয়ালী না শুনেন তাদের ফায়েজ, যারা বাদ্যযন্ত্র সহকারে কাওয়ালী শুনেন তাদের চেয়ে বেশী হয়। যে জিনিসের উপর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সন্তুষ্ট নন এবং আল্লাহ্‌তায়ালাকে পাওয়ার অপরিহার্য উপকরণ নয় তা পরহেয করা কর্তব্য। অন্যান্য প্রায় সমস্ত তরীকার ইমামগণ ও তাঁদের অনুসারীরা তাসাওউফ ও যিকির দ্বারাই আল্লাহ্‌তায়ালার মিলন ও দীদার লাভ করেছেন, সেখানে এ সুলুকবিহীন পদার্থটির আমদানী না করলেই কি নয়? তরীকতের পথ গান-বাজনা নয়। এটাও এক জাতীয় বিভ্রান্তি। তবে আল্লাহ্ ও রাসূল (সাঃ) এর প্রশংসাগীতি

www.pathagar.org

বাদ্যযন্ত্র ভিন্ন কবিতা ও গযল মারফত গাওয়া হলে শরীয়তের দৃষ্টিতে আপত্তিজনক হয় না। আরেফগণ যিকির, ধ্যান, চিন্তা ও মুশাহিদার দ্বারা সর্বক্ষণ আল্লাহ্তায়ালার প্রেমরস হৃদয়ে বজায় রাখেন, তাদের গান দ্বারা প্রবৃত্তিকে আল্লাহ্ প্রেমে উজ্জীবিত রাখার দরকার পড়ে না।

আলোচনায় এটুকু বোঝা গেল যে, অবিরত কলবী বা আন্তরিক যিকির মা'রিফাত, দীদার ও মিলনের চাবিকাঠি। তবে শুধু যিকির নয়, শর্ত হলো ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নত পালন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর অনুসরণ, সংসারের প্রতি অনাসক্তি এবং দীল-দেমাগ হতে আল্লাহ্ ভিন্ন পদার্থ বের করা। তবেই তরীকতে ভিত্তি মজবুত হবে। এ শর্তগুলো ছাড়া শুধু আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকিরে অন্তরচোখ খুললেও বিভ্রান্তি আসে। অন্তরচোখ খোলাই মা'রিফাত হাসিল হওয়া নয়। আরো বহু মনযিল রয়েছে মকসুদে পৌঁছাতে। অন্তরচোখে বা ইল্হামে শরীয়ত বিরোধী বা নাফ্সের অনুকূলে কোন কিছু এলে তা গ্রহণযোগ্য নয় বা বিশ্বাসযোগ্য নয়। নাফ্স শয়তানের কারসাজি এর জন্য দায়ী। এজন্য নিজকে আরো সতর্ক ও সুক্ষদর্শী হতে হবে।

এভাবে নিজকে বাঁচাতে হবে, লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা ও নিজকে বিখ্যাত করার প্রলোভন হতে রক্ষা করতে হবে। নির্জন যিকির, আবশ্যক পরিমাণ পীরের সুহবতে থাকলে ইন্শাআল্লাহ্ আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে।

ইসমে যাতের যিকিরের এত ফজিলত যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। এ জন্যই আল্লাহ্তায়ালা বার বার যিকিরের তাগিদ করেছেন। ফরজ ইবাদতে নামায যেরূপ শ্রেষ্ঠ, তারপরই রোযা, তেমনি নফল ইবাদতের মধ্যে ইসমে যাতের আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকিরই শ্রেষ্ঠ, তারপরই দান-খয়রাত।

আল্লাহ্তায়ালা বলেন- "তোমার প্রভূর অনবরত যিকির কর, প্রত্যেক সকাল-সন্ধ্যায় তার প্রসংশা কর।" (সূরা আল ইমরান)

"তোমরা যখন সালাত সমাপ্ত করবে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে আল্লাহ্র যিকির কর।" ৫ঃ১০৩। সালাতই যদি শুধু যিকির হতো তবে এখানে আলাদাভাবে যিকিরের কথা বলা হতো না।

"যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ্র যিকির হতে বিমূখ হয়, আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান, তারপর সেই হয় তার সহচর।" (৪৩ঃ৩৬)

"হে বিশ্বাসীগণ। তোমাদের ছেলেমেয়ে ও ধন-সম্পত্তির প্রীতি যেন তোমাদের আমার যিকির হতে বিরত না রাখে, যে এরূপ করবে সে ক্ষতিগ্রস্থ হবে।" (সূরা আল-আহয়াব)

www.pathagar.org

"যে আমার যিকির হতে বিরত থাকে, সে দুনিয়াতে দুঃখের জীবন যাপন করবে, কিয়ামতে আমি তাকে অন্ধ অবস্থায় উঠাব।" (সূরা ত্বাহা)

হাদীসে কুদসীতে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন "যে ব্যক্তি আমার নিকট প্রার্থনা ত্যাগ করে আমার যিকিরে মনোনিবেশ করে, আমি প্রার্থনাকারীর চেয়ে তাকে অধিকতর দান করব।" হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ আরো বলেন, "যখন বান্দা আমার যিকির করে এবং আমার জন্য তার ঠোঁটদ্বয় নড়ে তখন আমি তার সাথে থাকি। যে আমার যিকির করে আমি তার সংগী হই।"

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হতে জেনেছি যে সাহাবীগণ আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকির করতেন- হযরত মোগাফ্ফাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল করীম (সাঃ) বলেছেন,- "আমার সাহাবীগণের মধ্যে আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকির আছে, আমার পর তারে হাস্যাস্পদ মনে করো না।" তিরমিযি, মেশকাত।

আল্লাহ্তায়ালা আরো বলেছেন- 'তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম যিকির কর এবং একনিষ্ঠভাবে তাতে মগ্ন হও।" ৭৩ঃ৮।

এ জন্য এ পুস্তকে তরীকত মুতাবিক ফরজ, সুন্নত এবং ওয়াজিব ইবাদতের সাথে সাথে আল্লাহ্ যিকিরকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। এটা অভিজ্ঞতা প্রসূতও বটে। অনবরত যিকির যে শরীয়ত সম্মত এবং ফজিলতপূর্ণ, বেহুদা ও অবজ্ঞাপূর্ণ নয় বরং কোরআন-হাদীস দ্বারা সমর্থিত, এতক্ষণে তা বুঝা গেল। আশা করি দলীল-প্রমাণ পেয়েও কেউ একে অবজ্ঞা ও অবহেলা করবেন না। আল্লাহ্তায়ালাকে সংগী ও বন্ধু রূপে পেতে হলে সর্বক্ষণ আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকির করা অপরিহার্য। অনবরত যে আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকির করতে অপারগ হবে, তার তরীকতে আসা উচিত নয়- দুর্ভাগ্য তার ললাট লিপি।

মুখে বা শ্বাসের সাথে আন্তরিক যিকির কলবী যিকিরে পরিণত হয়। কলবী যিকিরের ধ্যান করলে সর্বদেহে যিকির জারী হয়। তাসাওউফ খন্ডে বর্ণিত নীতিমালা পালন করলে এই যিকির নাফ্সে আম্মারার চারিত্রিক দোষসমূহ বিলীন করে শরীয়ত নির্দেশিত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর আদর্শের চারিত্রিক গুণাবলীতে রূপান্তরিত করে। যিকিরের ধ্যানে থাকলে শরীয়তের নির্দেশের উপর দৃঢ়ভাব পাবন্দ থাকা যায়। কলবী যিকির প্রাধান্য বিস্তার করলে প্রতিটি বস্তু ও কাজে আল্লাহ্তায়ালার নূরের তাজাল্লী দৃষ্টি গোচর হয়। যিকির রূহে প্রাধান্য বিস্তার করলে আল্লাহ্তায়ালার তওহীদে বিলীন হওয়া যায়। যিকির সর্ব অংগের প্রতিটি

www.pathagar.org

অণু-পরমাণুতে যখন প্রাধান্য লাভ করে তখন আমিত্ব বোধ থাকে না, সিফাতী নূরে বিলীন হয়, তখন নাফসের প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়।

কল্‌বী যিকিরে অনেক উপকার হয়। আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা ও তাঁকে পাওয়ার আকাঙ্খা জন্মে। আল্লাহ্ ভিন্ন সকল পদার্থ মন থেকে বের করা যায়, নামাযে একাগ্রতা জন্মে। কল্‌বী যিকির ছাড়া বদকারী, গুমরাহী ও খারাবীর বেষ্টনী হতে বের হওয়া অসম্ভব।

নাফ্‌স দু'টো স্থানে অবস্থান করে, দীলের অন্তঃস্থলে ও মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে। কল্‌বে যিকির জারী হলে নাফ্‌স কল্‌বের কিনারায় বা পাশে আসে। যিকির হৃদয়ের অন্তঃস্থলে জারী হয়ে স্থিতি লাভ করে যখন মাথার অভ্যন্তরে জারী হয়ে স্থায়ী হয়, তখন নাফ্‌স কপালে ও মাথার পিছনে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সর্বদেহে যখন যিকির জারী হয়, তখন নাফ্‌স তাযকিয়ার আগুনে দগ্ধ হলে পবিত্র হয়। এ অধ্যায়ে বর্ণিত পদ্ধতিতে যে যে তরীকারই থাকুন, যিকির করলে ও নিয়মনীতি মানলে ইনশাআল্লাহ্ তার ফায়েজ বেড়ে যাবে।

তরীকতে আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকিরের সাথে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে লা ইলাহা ইল্লালাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ-এ যিকির নফী ইছবাত হিসাবে করতে হয়। বিভিন্ন তরীকায় এর ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি নির্ধারিত আছে। সালেক যে পীর সাহেবের সুহ্‌বতে থাকবেন, তাঁর থেকে জেনে নিতে হবে। সে জন্য বিস্তারিত লিখা হলো না।

এ পুস্তকের তাসাওউফ খন্ডে যে সব রীতি-নীতি পালন করতে বলা হয়েছে, সব তরীকায় তা অভিন্ন, সব তরীকার সালেকগণকে তা পালন করতে হবে। এমন কি সর্বকালে সমস্ত নবীগণ তাদের সময়কার শরীয়ত পালন করে তাসাওউফের এসব রীতি-নীতি পালন করে নাফ্‌সের বিরোধিতা ও যুহ্‌দ এখতিয়ার করে রিয়াযত করে নবুয়ত পেয়েছেন।

আখেরী যমানায় সব শরীয়ত স্থগিত হয়ে শুধু রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর শরীয়ত অবশিষ্ট আছে। এ পুস্তকে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর শরীয়ত অনুসরণ করা হয়েছে। তরীকতের যিকির পদ্ধতি বিভিন্ন তরীকায় ভিন্ন ভিন্ন আছে, যুগোপযোগী অধিকতর সহজ হয়েছে বা হবে। কিন্তু তরকে দুনিয়া হতে হয় দীল-দেমাগ হতে আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য পদার্থ বের করার জন্য। সত্য কন, হারাম উপার্জন বর্জন ও নিজকে বড় মনে না করার রীতি সকল ওলীদের ছিল, আশা করা যায় ভবিষ্যতেও থাকবে।

www.pathagar.org

তরীকতে সর্বাধিক সময় যিকির ও ইবাদতে একনিষ্ঠভাবে নিজকে নিয়োজিত রাখতে হয়। দিনে হালাল রিযিক অন্বেষণ বা হিদায়েতের কাজে অধিকাংশ সময় চলে গেলে রাতে তা পূরণ করে নিতে হয়। রাত-দিনে চব্বিশ ঘন্টা হয়, তার মধ্যে অন্ততঃপক্ষে অর্ধেকের বেশী সময় আল্লাহ্ যিকিরে নিজকে নিমগ্ন রাখতে হয়। তাহলে তরীকতের নিয়ামতসমূহ লাভ করা সহজ হয়।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে সর্ব অবস্থায় আমাদের অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহ্তায়ালা পাক কোরআনে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাহাবীদের রাত্রি জাগরণ সম্মন্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছেন, "তোমার প্রতিপালক তো জানেন যে, তুমি জাগরণ কর, কখনও রাত্রির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কখনও অর্ধাংশ এবং কখনও এক তৃতীয়াংশ এবং জাগে তোমার সাথে যারা আছে তাদের একটি দলও এবং আল্লাহ্ই নির্ধারণ করেন দিবস ও রাত্রির পরিমাণ।" ৭৩ঃ২০।

প্রথম রাত সন্ধ্যা দশটা পর্যন্ত নামায ও যিকিরে অতিবাহিত করে ঘুমিয়ে রাত দু'টোর সময় উঠলে গ্রীষ্মকালে অর্ধেক রাত, শীতকালে দুই তৃতীয়াংশ হয়ে যায়। সামান্য যা বেশী হয় তা প্রথম রাতের খাওয়া ও শেষ রাতের মিস্ওয়াক ও অজুতে খরচ হয়ে যায়। এতে রাতে চার ঘন্টা ঘুমানো যায়। দিনে সুন্নত মুতাবিক দুপুরের খাবার পর কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিলে শরীরের জন্য বেশী অসুবিধা হয় না। ক্বদমীয়া তরীকার শায়েখ হযরত আবদুল (রহঃ) আনসারী (র) সাহেব কেবলা কোন অসুবিধা না থাকলে দুপুর বারোটার আগে মধাহ্নের খাবার শেষ করে ঘুমিয়ে দেড়টার সময় জামাতে মসজিদে জোহরের নামায পড়ে নিতেন। অসুবিধা থাকলে জোহরের নামায পড়ে ঘুমাতেন। এতে রাত জাগার অসুবিধা থাকে না।

এ অভ্যাস করতে হলে প্রথম প্রথম রাত দু'টোর সময় উঠার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হয় এবং দু'টোর সময় বা যে সময় প্রতিদিন উঠতে চায় সে সময় উঠিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ্তায়ালার কাছে ঘুমানোর আগে দোয়া করলে ইনশাআল্লাহ্ সে সময় আল্লাহ্পাক ঘুম ভাঙিয়ে দেবেন। তবে শর্ত হলো ঘুম ভাঙার সাথে সাথে তাকে উঠে পড়তে হব, প্রতিদিন একই সময় উঠতে হবে, এতে প্রথমে কিছুটা অসুবিধা মনে হলেও শেষে তার নির্দিষ্ট সময় রাত জাগার অভ্যাস হয়ে যাবে। যদি ঘুম ভাঙার পর আলসেমী করে না উঠে তবে এ অভ্যাস হবে না। লক্ষ্য রাখতে হবে নাফ্স শেষ রাতে ঘুমানোকে আবার অভ্যাসে পরিণত না করতে পারে।

www.pathagar.org

নবুয়ত ও তরীকতের ধারাবাহিকতা

হযরত আদম (আঃ) হতে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্তায়ালা একটি বংশগত ধারাবাহিকতার সাথে একটি হেদায়েতগত ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেছেন। তখন থেকেই ঈমানদারগণের মধ্যে হতে নবী-রাসূল ও অনুসরণকারীদের ওয়ালী আল্লাহ্ বা তাঁর তাবেদার বান্দার উদ্ভব ঘটিয়েছেন। নবী-রাসূল ও নায়েবে রাসূলদের ঈমানদারদের নেতা বানাচ্ছেন যাতে তারা আখিরাতের সর্বোচ্চ নিয়ামতসমূহ এবং শান্তি উপভোগ করতে পারেন।

আরেকটি ধারায় ঈমান প্রত্যাখানকারী, অত্যাচারী ও নাফরমানদের উদ্ভব ঘটাচ্ছেন, যারা কাফির, মুশরিক বা জালিমদের নেতৃত্ব দিচ্ছে। তাদের বড় বড় মিষ্টিভাষী প্রতারক ও প্রভাবশালীদের নেতা বানাচ্ছেন, যাতে তারা আখিরাতের সর্বোচ্চ শাস্তি ভোগ করতে পারে। কাফিরগণ চিরকাল প্রবৃত্তির অনুসারী। নবী-রাসূল ও আউলিয়াগণ আল্লাহ্তায়ালার আদেশ-নিষেধের অনুসারী। কাফির ও মুশরিকগণ শুধু দুনিয়া নিয়ে আছে। ঈমানদারগণ পরকালকে অগ্রাধিকার দিয়ে দুনিয়াতে তার অস্তিত্বের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু হিস্যা নেয়।

হযরত আদম (আঃ) হতে একটি নবুয়ত ও রিসালতের ধারা সর্বশেষ নবী রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পরে ওহী নিয়ে হযরত জিবরাঈল (আঃ) আর আসবেন না। আল্লাহ্তায়ালা নবুওতের ধারা বন্ধ করে দিলেও ওলীগণের নিকট সুসংবাদ নিয়ে রাসূলুলাহ (সাঃ) আসেন। এ ভাবে আল্লাহ্তায়ালা নবুওতের ধারাবাহিকতা বন্ধ করলেও বিলায়েতের ধারাবাহিকতা চালু করেছেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

এই ধারাবাহিকতায় প্রত্যেক নবী তাঁর পূর্ববর্তী কোন উলুল আযম পয়গম্বর বা রাসূলকে অনুসরণ বা শরীয়ত পালন করে নাফ্সের বিরোধিতা ও তরকে দুনিয়া হয়ে তাসাওউফের নীতিমালা পালন মারফত নবুওতের ফায়েজ তায় করলে আল্লাহ্তায়ালা যাকে ইচ্ছা নবী মনোনীত করেছেন। তারপর রিসালতের ফায়েজ তায় করলে আল্লাহ্তায়ালা যাকে ইচ্ছা রাসূল মনোনীত করেছেন। সকল রাসূলগণই নবী, কারণ রিসালতের ফায়েজ নবুওতের ফায়েযের পর আসে।

www.pathagar.org

সকল নবী রাসূল নন। কারণ নবুওতের ফায়েজ রিসালতের ফায়েযের আগে আসে। রিসালতের ফায়েযের পর খিলাফতের ফায়েজ আসে। তাই রাসূলগণ একাধারে নবী, রাসূল ও আল্লাহ্‌র খলীফা অর্থাৎ প্রতিনিধি বা দূত।

আল্লাহ্‌তায়ালা রাসূলগণের নিকট হযরত জিবরাঈল (আঃ) মারফত ওহী নাযিল করতেন। এভাবে উলুল আযম পয়গম্বরগণের নিকট কিতাব বা সহীফা নাযিল হয়েছে। সব নবী-রাসূলগণই পূর্ববর্তী রাসূলগণের কিতাব ও শরীয়ত অনুশীলন করে তাযকিয়া নাফ্‌স হয়ে নবী-রাসূল হয়েছেন। তাযকিয়া নাফ্‌সের পরই নবুয়ত ও রিসালতের ফায়েজ আসে।

সর্বশেষে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর আবির্ভাবের পর নবী-রাসূল হওয়ার দরজা বন্ধ হয়ে গেছে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর ও তার শরীয়তের অনুসারী হিসাবে রিয়াযত-মেহনত করে তাযকিয়া নাফ্‌স হওয়ার পর নবুয়ত ও রিসালতের ফায়েজ লাভ করেন। অবশ্য জন্মের পূর্বেই তিনি হাকীকতে মুহাম্মদীতে নবী হিসাবে ছিলেন। তিনি অন্যান্য নবী-রাসূলগণ (আঃ) থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিলেন।

আল্লাহ্‌তায়ালা অন্যান্য নবী-রাসূলগণ হতে রাসূল করীম (সাঃ)কে তিনটি অতিরিক্ত মাকাম আলাদাভাবে দান করেছেন। সেই তিনটি আধ্যাত্মিক মাকাম ছিল-তাঁর নিজের বৈশিষ্ট্য জানা, তাঁর ও আল্লাহ্‌তায়ালার মধ্যে সম্পর্ক এবং বিশ্ব সৃষ্টির সাথে তাঁর সম্পর্কের জ্ঞান। মাকাম তিনটি হল, ১। মাহ্‌বুবিয়াতে মুহাম্মদী, ২। হাকীকতে মুহাম্মদী ও ৩। আল্লাহ্‌তায়ালার পরিচয়ের মাকাম-হাকীকতে আল্লাহু জাল্লা শানুহু। এগুলো বিলায়েতের মাকাম বা রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এর প্রতি আল্লাহ্‌তায়ালার নিছক প্রেমের মাকাম।

রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এর উছীলায় তাঁর সৌভাগ্যবান উম্মতগণ তাঁর শরীয়ত, তাসাওউফ ও তরীকত অনুশীলন ও তাঁকে অনুসরণ করে এ তিনটি মাকাম লাভ করেন- যা পূর্বকালের নবী-রাসূলগণ পাননি। যার জন্য তারা আকাংখিত ছিলেন। কেবল হযরত ঈসা (আঃ) এর দোয়া কবুল হওয়ায় তিনি পুনরায় পৃথিবীতে এসে তাঁর উম্মত হিসাবে তাঁকে অনুসরণ করে এ তিনটি মাকাম লাভ করবেন।

হে সৌভাগ্যবান উম্মতে মুহাম্মদী। যা নবী-রাসূলগণ আল্লাহ্‌র কাছে চেয়েও পাননি, অর্থাৎ নবী না হয়ে তাঁর উম্মত হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু হতে পারেননি, আল্লাহ্‌তায়ালার সে মহা দান আখেরী যমানাতে জন্মসূত্রে আপনাদের উপর

www.pathagar.org

বর্ষিত হয়েছে বা নতুন মুসলমান হয়ে পেয়ে গেছেন, উম্মতে মুহাম্মদী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এ মহা দানকে হেলায় নষ্ট করবেন না, জীবনের প্রতিটি নিশ্বাসকে আল্লাহ্‌র যিকির ছাড়া বেহুদা খরচ করবেন না।

নবুয়ত ও রিসালাত আসবে না। নতুন কোন শরীয়ত আসবে না। জিবরাঈল (আঃ) নতুন অহী নিয়ে আসবেন না। এটুকু পরিবর্তন হলেও ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে যায়নি। নবী-রাসূল মনোনীত করা বন্ধ হলেও রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর উসীলায় নবুয়ত ও রিসালতের ফায়েজ বন্ধ হয়নি। ঐশী কিতাব, সহীফা যা রাসূলগণের নিকট নাযিল হত, কোরআনের পর এরূপ কোন ঐশী কিতাব, সহীফা নাযিল হবে না। সর্বশেষ নবী রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সময়ই নবুয়ত শেষ হয়ে মোহরাংকিত হয়ে গেছে। আর নবী-রাসূল আসবেন না। কিন্তু নবুয়ত ও রিসালতের ফায়েজ বর্তমান আছে, যা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মারফত মুহাম্মদী শরীয়তের অনুবর্তী হিসাবে তরীকত অনুযায়ী যারা রিয়াযত মেহনত করে তাযকিয়া নাফ্‌স হয়েছেন, তাঁরা লাভ করেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর নিকট দ্বীন, শরীয়ত এবং তরীকত নাযিল হয়েছিল। তরীকত শুধু ঈমান-য়াকীনের উপর নাযিল হয়। অদৃশ্য সত্য ও য়াকীনের উপর পাক কোরআনে বহু আয়াত নাযিল হয়েছে। অদৃশ্যে বিশ্বাসের নাম ঈমান। অদৃশ্য সত্যে সুদৃঢ় ঈমান আসার নামই ইয়াকীন।

ইয়াকীন তিন রকম বলে আল্লাহ্ পাক আমাদের জানিয়েছেন- ইলমুল ইয়াকীন, আয়নুল ইয়াকীন এবং হাক্কুল ইয়াকীন। কোরআন-হাদীস পড়ে বা শুনে যে অদৃশ্য সত্যে বিশ্বাস করা হয়, তাকে বলা হয় ইলমুল ইয়াকীন। এটা কম জোর ইয়াকীন। আমল দ্বারা সুদৃঢ় না হলে বিপদে, রোগে, শোকে ও মৃত্যু কষ্টে বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যেতে পারে। যেমন পাথরের উপর পতিত ধুলা-বালি ঝড়-ছঞ্ছায় উড়ে যায়। যে অদৃশ্য সত্য দেখে-শোনে ও গন্ধ অনুভব করে ভালভাবে উপলব্ধি ও হৃদয়ে গেঁথে নেওয়া হয়, তাকে বলা হয় আয়নুল ইয়াকীন। ফানাফিল্লাহ ব্যতীত আয়নুল ইয়াকীন হাঁসিল হয় না। আয়নুল ইয়াকীন দ্বারা যে অদৃশ্য সত্য দেখে শুনে নূরে ইলাহিতে নিজকে ডুবিয়ে বিলীন করে অদৃশ্য মহাসত্য আল্লাহ্‌তায়ালা ও তাঁর ওয়াদাসমূহে বিশ্বাস করা হয়, তাকে বলা হয় হাক্কুল ইয়াকীন। কম পদে বাকাবিল্লাহ্‌র মাকাম অতিক্রম না করলে হাক্কুল ইয়াকীন হাঁসিল হয় না।

www.pathagar.org

পাক কোরআন ও হাদীসে অদৃশ্য বিষয়ের উপর অসংখ্য আয়াত ও রেওয়ায়েত আছে। এগুলোর উপর আয়নুল ইয়াকীন ও হাক্কুল ইয়াকীন হাঁসিল করার জন্য যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, তাকে বলা হয় তরীকত। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর উপর নাযিলকৃত ফায়েজ সমূহের দ্বারাই তাকে শিক্ষিত করা হয়েছিল, স্রষ্টার সাথে মিলন ও প্রেম ও সমস্ত ফায়েজ দ্বারা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর উসিলায় তরীকতের ফায়েজসমূহ তাঁর উম্মতগণকে আল্লাহ্তায়ালা বখ্শীশ করেন। যারা একে অস্বীকার করবে তারা ঈমান বা অদৃশ্য সত্যকে অস্বীকার করলো। মুহাম্মদী শরীয়তের প্রাণ শক্তিই অদৃশ্যে বিশ্বাস বা তরীকত।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর জীবিত কালে আল্লাহ্তায়ালাকে পাওয়ার পদ্ধতি তরীকত নামে শাস্ত্রাকারে আখ্যায়িত ছিল না, কিন্তু ঈমান য়াকীনের ফায়েজরূপে বিদ্যমান ছিল। সাহাবীগণের পরবর্তী কালে আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছানুযায়ী অদৃশ্যে বিশ্বাসের বা ঈমান-য়াকীনের ও ফায়েজসমূহ আল্লাহ্তায়ালাকে পাওয়ার পদ্ধতি বা তরীকাকে সংক্ষেপে তরীকত নাম আখ্যায়িত করা হয়।

শুধু তরীকত ইসলাম নয়, এটা ঈমান, যা ইসলামের প্রাণ শক্তি। তরীকত ছাড়া ইসলাম ইখলাসের সাথে অনুসরণ করা যায় না, শরীয়ত পালন করা যায় না। আবার শরীয়ত ও ইসলামী জীবন পদ্ধতি ছাড়া তরীকত হয় না। তরীকত যেমন একাধারে শরীয়তে মুহাম্মদীর প্রাণ শক্তি, তেমনি মানবাত্মার বিকাশ শক্তি, সমৃদ্ধি ও পুষ্টিকারক সালসা বিশেষ। তরীকত ছাড়া মানবাত্মা আল্লাহ্ ও তাঁর সৃষ্টি-বিশেষ করে কিয়ামত উত্তর বিশ্ব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারবে না। ইখলাস যেহেতু তরীকত মারফত অর্জিত হয়, সেহেতু তরীকত ছাড়া শরীয়ত অনুসরণ করলে তাতে আন্তরিকতা আসে না, রিয়া সব ইবাদত বরবাদ করে ফেলে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইখলাস ও হাক্কুল ইয়াকীন অদৃশ্য সত্য দেখে - শোনে ও তাতে নিমগ্ন হয়েই অর্জন করেছিলেন। বই-পুস্তক বা পূর্ববর্তী কিতাবাদী পড়ে বা মানুষের নিকট শোনে অর্জন করেননি।

ইলমুল ইয়াকীন দ্বারা খুব কম লোকই ইখলাস অর্জন করতে পারে-মৃত্যুর পর দেখা যাবে সবই বিফল হয়েছে। তরীকত দ্বারা নিজ স্বভাবকে সংশোধন না করলে দেখা যাবে নাফ্স তাকে বিপথগামী করে রেখেছিল, প্রবৃত্তির স্বার্থেই সে কোরআন-সুন্নাহ্কে কাজে লাগিয়েছে, নিজকে লোকের কাছে গ্রহণযোগ্য করার মধ্যে তার প্রচেষ্টা নিবদ্ধ ছিল। প্রবৃত্তি ও মানুষের দাসত্বের মধ্যে তার জীবন

www.pathagar.org

কেটেছে। আল্লাহ্তায়ালার দাসত্বের মধ্যে নয়, যদিও নামায পড়েছে, রোযা রেখেছে, কিন্তু ইখলাসের অভাবে সব ব্যর্থ হয়েছে।

নবুওতের দরজা বন্ধ হয়েছে, কিন্তু আখেরী যমানাতে বিলায়েতের দরজা খোলা হয়েছে। বিলায়েত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর ছায়া। নবীরা যেমন তাযকিয়া নাফ্স হয়ে নবুয়ত পেতেন, বর্তমানে ওলীরা তাযকিয়া নাফ্স হয়ে বিলায়েত পান। কোরআন-সুন্নাহকে আল্লাহ্তায়ালা সংরক্ষিত রেখেছেন এবং ঐশী বাণীর সমাপ্তি কোরআনে ঘটিয়েছেন। বর্তমানে ঈমান-য়াকীনের উপর ও অদৃশ্য বিষয়াদির উপর তরীকত নাযিল হয় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর মারফত। সময়ের ব্যবধানে নাযিলকৃত তরীকার বিকৃতি ঘটলে আবার নতুন করে ভিন্ন ওলীদের নিকট নতুন তরীকা নাযিল হয়। পূর্বকালে নবীগণের সাথে জিবরাঈল (আঃ) মারফত যোগাযোগ করা হতো, এখন ওলীগণের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মারফত যোগাযোগ করা হয়। কিয়ামত পর্যন্ত ঐশী যোগাযোগের ধারাবাহিকতা বন্ধ হবে না ও নবুওতের ফায়েজ হতে ধরাবাসী বঞ্চিত হবে না। যখন পৃথিবীতে একজন লোকও তা গ্রহণ করবে না, তখনই কিয়ামতের ধ্বংস-ধ্বনী শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে। স্রষ্টার সাথে মানুষের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে এরূপ ঘটবে। হাদীসে আছে, "যখন একজন লোকও আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলার থাকবে না, তখন কিয়ামত হবে।" অর্থাৎ আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকির করার একজন লোকও যখন অবশিষ্ট থাকবে না, তখন কিয়ামত হবে।

www.pathagar.org

তরীকা নাযিল

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর ওফাতের পর হতে শুরু হয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সময়কে বলা হয় আখেরী যমানা। এ শেষ যমানাতে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বরযখে ওলীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন। ফানাফি'শ শায়েখের সুরতের ফায়েজ বা ফানাফি'র রাসূলের মাকাম হতেই এ যোগাযোগ শুরু হয়। সালেককে তিনি আত্মিক উন্নতির জন্য নানা ভাবে সাহায্য করেন। ফানাফি'র রাসূলের মাকামের শেষের দিকে আল্লাহ্র পথের যাত্রীকে তাঁর পবিত্র মহান বরযখে মিশিয়ে স্রষ্টার পবিত্র মহান নূরে নিয়ে যান। সালিকের সাথে সয়ের, উরূয, নযুল করেন।

যখন বান্দা বাকাবিল্লাহ্ বা তাওহীদের মাকাম অতিক্রম করে আ'বদিয়াতের মাকামে প্রবেশ করে আল্লাহ্তায়ালার আদেশ-নিষেধের হাকীকত জেনে সঠিকভাবে বন্দেগী করার উপযুক্ত হন, তখন আ'বদিয়াতের মাকামের শেষের দিকে তাযকিয়া নাফ্স হয়ে যান। তাযকিয়া নাফ্সের পরই বান্দা নবুওতের ফায়েজ লাভের উপযুক্ত হন। পূর্ববর্তী কোন তরীকায় দাখিল নাফ্সের পরই বান্দা নবুওতের ফায়েজ লাভের উপযুক্ত হন। পূর্ববর্তী কোন তরীকায় দাখিল হয়ে রিয়াযত- মেহনত করে কোন বান্দা যখন নবুয়ত, রিসালাত ও খিলাফতের ফায়েজ লাভ করেন, তখন অনাদী কালে যার ভাগ্যে তরীকতের ইমাম হওয়া নির্ধারিত আছে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর উপর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মারফত মুহাম্মদী শরীয়তের অধীনে তরীকা নাযিল করেন। যেমন পূর্বকালে কাউকে নবী-রাসূল মনোনীত করে জিবরাঈল (আঃ) মারফত দ্বীন নাযিল করা হতো।

সব তরীকার সমন্বয় করে জামেয়া তরীকা নাম দিয়ে তরীকা সৃষ্টি করা হয়, অনেকে মূল তরীকা হতে আলাদা হয়ে শাখা তরীকার প্রবর্তন করেন, এগুলো ছাড়া সকল মূল তরীকা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মারফত আল্লাহ্তায়ালা কর্তৃক নাযিলকৃত। আমাদের দেশে প্রচলিত কাদেরীয়া, চিশতীয়া, মুজাদ্দেদীয়া, নক্শবন্দীয়া ও ক্বদমীয়া তরীকা নাযিলকৃত তরীকা।

যার কাছে তরীকা নাযিল করা হয়, তাঁকে সেই তরীকার ইমাম বলা হয়। তরীকার ইমামের প্রবল ফায়েজ থাকে, তার মুরীদগণের অনেককে খুব তাড়াতাড়ি কামিল-মুকাম্মিল করে দিতে পারেন। মানবতার পূর্ণতা বা উৎকর্ষতা সাধন কামিল-মুকাম্মিলের দ্বারা ঘটে, যা সিদ্দীকগণের গুণ। তারপর সাধারণতঃ চার সিঁড়ি বা সিলসিলার পর পর চারজন খলীফা পর্যন্ত এ ফায়েজ পরিপূর্ণ

www.pathagar.org

থাকে। চার পুরুষে সাধারণতঃ এক শত বছর হয়। তারপর সিলসিলার শায়েখদের ফায়েজ কমে আসে। সিলসিলায় বা সিঁড়ির মধ্যস্থতায় শায়েখ যত বেশী হয় ফায়েজ তত কমে আসে। সেজন্য একশত বছর পর একজন মুজাদ্দিদ আসেন।

ফায়েজ কমতি হওয়ার কারণ সময়ের দূরত্বের কারণে তরীকাতে নানা আজে-বাজে জিনিস মিশে বিকৃতি ঘটে। রিয়াযত-মেহনত কম হয়। ফলে সয়ের, সুলুক, বাজে জিনিস মিশে বিকৃতি ঘটে। রিয়াযত-মেহনত কম হয়। ফলে সয়ের, সুলুক, উরূয, নযুল পূর্ণভাবে থাকে না। শায়েখের ঘাটতি থাকলে মুরীদেরও ঘাটতি থাকে। শায়েখের যত মাকাম অতিক্রম করা আছে, মুরীদ সাধাণতঃ এর বেশী তরক্কী পায় না। সত্যিকার শায়েখ অবশ্য এ জন্য তার উপরের মাকামের শায়েখের নিকট মুরীদকে পাঠান।

বর্তমান কালে অধিকাংশ শায়েখ এ নীতি পালন করেন না। ফলে দেখা যায় পুরানো তরীকাতে বাকাবিল্লাহ্‌র উপরের ফায়েজ অধিকাংশ শায়েখের নেই। এমন কি বর্তমানে দেখা যায় যে, বেশীর ভাগ শায়েখেরই কেউ ফানাফিশ শায়েখ, কেউ ফানাফির রাসুল, কেউবা ফানাফিল্লাহ্‌ পর্যন্ত ফায়েজকে শেষ ফায়েজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ বাকাবিল্লাহ্‌ বা তওহীদের মাকামে তাযকিয়া নাফ্‌স প্রবল হয়ে সাধারণ অবস্থা প্রাপ্তির সম্ভাবনা থেকে যায়।

সাহাবীগণের অধিকাংশ নবুওতের মাকামের ফায়েজ প্রাপ্ত ছিলেন। শ্রেষ্ঠ সাহাবীগণের অনেকে শুধু নবুওতের ছায়া ছিলেন না, রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এর ছায়া স্বরূপ ছিলেন। এখন নবীর আগমন বন্ধ হলেও, নবুওতের ফায়েজ বন্ধ হয়নি। ঈমান এনে মুসলমান হওয়ার পরই নবুওতের ফায়েজ শুরু হয়, তরীকতের সাহায্যে নবুওতের মাকামে গেলে এর পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে। নবীদের মর্তবা বেশী, তারপর সাহাবীদের, তারপর তরীকার ঈমামগণের, এরপর অন্যান্য ওলীগণের মর্তবা। নবুওতের মাকাম অতিক্রম করলে নবীগণের পায়ের নীচ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। নবুওতের মাকামের পর আরো তিনটি অতিরিক্ত মাকাম আছে, যা খাস ভাবে রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)কে দান করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এর উসীলায় সেগুলো অতিক্রম করলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এর পায়ের নীচ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে এবং হাবিবে আল্লাহ্‌র ছায়া হতে পারে।

রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এর বংশধরদের মধ্যে অর্থাৎ হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত হুসেন (রাঃ) এর বংশধরদের মধ্যে যারা তরীকার ইমাম হয়েছেন ও তাঁদের কাছে নাযিলকৃত তরীকার যারা অনুসারী তারাই সাধারণতঃ এ মর্যাদা লাভ

www.pathagar.org

করেন। এ সকল তরীকা পাক পানজাতনের সাথে সম্পর্কিত। যেমন এ দেশে প্রচলিত কাদিরীয়া, চিশতীয়া ও কুদমীয়া তরীকা। শ্রেষ্ঠ সাহাবীদের সাথে সম্পর্কিত তরীকার ইমামগণ ও তাঁদের তরীকার অনুসারীরা এ তিন মাকাম তায় করতে চাইলে শ্রেষ্ঠ সাহাবীগণ দ্বারা হযরত আলী (কা) কে মধ্যস্থ ধরে পাক পানজাতনের সাথে সম্পর্ক গড়ে এ মর্যাদা পান বা পেতে পারেন। সহচর হিসাবে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে অনুকরণ ও ত্যাগ স্বীকারের কারণে হযরত আবু বকর (রাঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত, তারপর পর্যায়ক্রমে হযরত ওমর (রাঃ), হযরত উছমান (রাঃ) এবং হযরত আলী (কা) শ্রেষ্ঠ বলে সুন্নত জামাতের আকীদা। আমাদেরও এতে বিশ্বাস করতে হবে। তবে তাঁদের প্রত্যেকের আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিল। হযরত আলী (কা) আধ্যাত্মিক জ্ঞানে বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিলেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজকে জ্ঞানের শহর ও হযরত আলী (রাঃ) কে সে শহরের দরজা বলে উল্লেখ করে গেছেন। তিনিই বিলায়েতের দরজা। বিলায়েত লাভই ওলীগণের কাম্য।

এ পুস্তকে বিস্তারিত আলোচনায় পাক পানজাতনের গুরুত্ব ও মর্যাদা বর্ণনা করা হবে যাতে সত্য উদঘাটন হয়। তাতে আবার কেউ যেন শীআ মাযহাবের মত মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে পথভ্রষ্ট না হন। আবার পাক পানজাতনের সঠিক মর্যাদা ও গুরুত্ব না দিলে ঈমান ও দ্বীনে লোকসান হবে। শীআদের আকীদা হলো, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর কোন হক ছিল না খলীফা বলে স্বীকার করে না, সবাই হযরত আলী (কা) কে ঠকিয়ে খলীফা হয়েছেন, বলে বিশ্বাস রাখে। এ পদের জন্য একমাত্র যোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন হযরত আলী (কা)। তাঁরা এ জন্য ইসলামী খিলাফতই মানে না, পাক পানজাতন ছাড়া সব সাহাবীদের পথভ্রষ্ট বলে মনে করে। হযরত আলী (কা) কে খলীফা হিসাবে নয়, প্রথম ইমাম হিসাবে মানে। এগুলো সীমা লংঘন এবং স্পষ্ট গোমরাহী। এ গোমরাহী থেকে পানাহ্ চাই। আমরা সুন্নত জামাতের আকীদায় বিশ্বাসী। খিলাফত ও সাহাবীগণ ইসলামের ব্যাপারে আমাদের অনুকরণ ও অনুসরণের আদর্শ। তরীকতে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের জন্য এবং আল্লাহ্তায়ালাকে পাওয়ার জন্য বিশেষ করে আল্লাহ্তায়ালা ও রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সাথে যে বিশেষ সম্পর্ক যথাঃ- তিনি প্রথম সৃষ্টি, সৃষ্টি ও সৃষ্টি পরিচালনার মাধ্যম ও স্রষ্টার হাবীব, এ জ্ঞান নবুওতের উর্ধ্বে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর জন্য খাস-উল-খাস। এ জ্ঞান রাজ্যে ঢুকতে হলে তার দরজা স্বরূপ হযরত আলী কারামাল্লাহু ওয়াজহাহুর মাধ্যমে তথা পাক পানজাতনের নিসবত ছাড়া উপায় নেই। তাই তরীকতে পাক

www.pathagar.org

পানজাতনের নিসবতই শ্রেষ্ঠ নিসবত। এটাই হযরত আলী (কা) এর বৈশিষ্ট্য। জাহেরী জীবনে ও খিলাফতে হযরত আলী (কা) তথা পাক পানজাতনের ত্যাগ, তীতিক্ষা অপরিসীম। হযরত ফাতিমা যুহরা (রাঃ) ছাড়া এ পরিবারের বাকী চারজনই শাহাদত প্রাপ্ত। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) শাহাদতের মর্যাদা পেয়েছেন বলে আলেমগণ একমত। ইহুদীরা ষড়যন্ত্র করে খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করে দাওয়াত করে তা হুজুর (সাঃ)কে খাইয়েছিল, সেই বিষের প্রতিক্রিয়া আল্লাহ্তায়ালা স্থগিত রেখেছিলেন, মৃত্যুকালে প্রকাশ পেয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সহ এ পরিবার দুনিয়ার জীবন ধ্বংস করে আখিরাতের জীবন গড়েছিলেন। মোট কথা আমাদের খিলাফত ও সমস্ত সাহাবীগণকে মানতে হবে, আবার পাক পানজাতনকেও মানতে হবে। সবাইকে ভালবাসতে হবে, শ্রদ্ধা করতে হবে কাউকে হেয় মনে করা যাবে না।

শায়েখের অভাবে পূর্বতন তরীকার অনেকগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কিছু তরীকা এখনও প্রচলিত আছে আল্লাহ্র মেহেরবাণীতে। এসব পুরনো তরীকার ইমাম সাহেবগণ তাদের অনুসারীদের যা বলে গেছেন বা কেউ কেউ লিখে গেলেও সময়ের ব্যবধানে তা বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে। যেসব পুস্তক প্রচলিত আছে সেগুলোও যে অবিকৃত আছে তার প্রমাণ নেই। বড় পীর হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র) কর্তৃক লিখিত বলে প্রচলিত "গুনিয়াতুত্তালেবীন" নামক একটি পুস্তকের বঙ্গানুবাদে লিখা আছে যে, ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পুত্র ইসহাক (আঃ) কে কুরবানী করতে গিয়ে দুম্বা কুরবানী করেন। গুনিয়াতুত্তালেবীন পুস্তকের "ঈদুল আযহা ও কুরবানী অধ্যায়ে লিখিত আছে, "সায়েরা যথা সময় একজন পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। এই ছেলের নাম রাখিলেন ইসহাক।"

"ইসহাক বড় হইলে একদিন পিতা তাহাকে লইয়া আরাফাতে পৌঁছালেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) পুত্র ইসহাককে বলিলেন- তোমাকে কুরবানী করার জন্য আমি স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়াছি।"

"হযরত ইবরাহীম (আঃ) যখন পুত্র ইসহাকের গলদেশে ছুরি রাখিলেন, তখন প্রত্যাদেশ আসিল- হে ইবরাহীম। পুত্রকে কুরবানী করিও না।"

কোরআন ও হাদীস মুতাবিক সমগ্র মুসলিম জাহানের আলেম ও সাধারণ মুসলমানগণ জানে হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর বড় ছেলে বিবি হাজেরার সন্তান, হযরত ইসমাঈল (আঃ)কে কুরবানী করতে গিয়ে অলৌকিকভাবে দুম্বা কুরবানী করা হয়। আল্লাহ্তাআলার মর্জি মত। এই তাসাওউফ সংক্রান্ত পুস্তকে ইহুদীদের আকিদা ভরে দেওয়া হয়েছে এবং ইহুদী আকীদার সন্নিবেশ করা

www.pathagar.org

হয়েছে। মুসলমানদের আকিদা হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর নাম বাদ দিয়ে যার বরাত দিয়ে এ কাজটি করা হয়েছে তিনি তাঁর যমানায় শ্রেষ্ঠ ওলী ও মুজাদ্দিদ ছিলেন, যিনি ইসলামের সঞ্জীবনী শক্তিরূপে কাজ করে গেছেন, যাঁর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের থাকবে। তিনি কোন অবস্থায়ই ইসমাঈল (আঃ)কে কুরবানীর বদলে ইহুদীদের আকীদা হযরত ইসহাক (আঃ) এর বদলে দুম্বা কুরবানী করা হয়েছিল, এ কথা কিছুতেই লিখতে পারেন না। ইসলামের দুশমনরা হয় উক্ত পুস্তকে একথা যুক্ত করে আসল জিনিসের রদবদল করেছে, নইলে এ পুস্তকই বড় পীর সাহেবের রচনা নয়, যদিও পুস্তকে অন্য সকল বিষয় সঠিক আছে।

কোরআন, হাদীস এবং ফিকাহ্‌র ব্যাপার চর্চা হয় এবং আলিমগণ সদা সচেতন ও সতর্ক থাকার দরুন এগুলোতে ইসলামের দুশমনরা কোন রদবদল করতে সাহস পায়নি। সর্বজন মান্য বুযুর্গদের কম প্রচলিত পুস্তকে যার প্রকাশনা হয়ত বহু বছর বন্ধ ছিল সেরূপ কিতাবে রদবদল করতে সাহ্‌স পেয়েছে যাতে বুযুর্গের নামের উপর ভুল আকীদা চালিয়ে দেওয়া যায়। অন্যে লিখে তাঁদের নাম চালিয়ে দেওয়া বিচিত্র নয়।

বলছিলাম তরীকতে বাজে জিনিস মিলে ফায়েজ কমে যায়। কাদেরীয়া তরীকার কোন সালিক যদি এই বই পড়ে বড় পীর সাহেব লিখেছেন মনে করে ইসমাঈল (আঃ) এর বদলে ইসহাক (আঃ)কে কুরবানী দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল বলে বিশ্বাস করে তবে কাদেরীয়া তরীকার ফায়েজও তিনি বেশী পাবেন না। কারণ তিনি মিথ্যা আকীদা গড়ে নিলেন। ইসমাইল (আঃ) এর কুরবানীর ঘটনার সময় ইসহাক (আঃ) এর জন্মই হয়নি। ইসমাঈল (আঃ) এর উপাধি যাকীহুল্লাহ ছিল, এটাও তার প্রমাণ। তরীকায় পুস্তকের দ্বারা বা অপরিপূর্ণ শায়েখের দ্বারা আজেবাজে জিনিস মিশ্রিত হয়। ফলে ফয়েয কমে যায়। তাসাওউফের কোন কিতাবে আল্লাহ্‌তায়ালাকে পাশ্চাত্যের আস্তিক দার্শনিকদের মতানুযায়ী নির্গুণ বলা হয়েছে, অথচ সুন্নত জামাতের আকীদা হল আল্লাহ্‌তায়ালা সর্বগুণের অধিকারী। এভাবে তরীকতকে বিকৃত করা হচ্ছে। ফলে পুরনো তরীকাগুলোতে ফায়েজ কমে গেছে, বা সময়ের ব্যবধানে ফায়েজ কমতে কমতে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যে তরীকাগুলোতে কম বিকৃতি হয়েছে, সেগুলো টিকে আছে।

বিগত চৌদ্দশত হিজরী শতাব্দীতে কুদমীয়া তরীকা বাংলাদেশের ঢাকা জিলার সিরাজদিখান থানার পাউসার গ্রামের অধিবাসী হযরত সৈয়দ আমজাদ

www.pathagar.org

আলী শাহ (র) সাহেবের উপর নাযিল হয়। তিনি কলিকাতা মাদ্রাসার মুহাদ্দিস ও হযরত সূফী ফতেহ আলী শাহ (র) -এর মুরীদ ছিলেন। তাঁর উপর ক্বদমীয়া তরীকা নাযিল হয়। তাঁর উপর তরীকা নাযিলের ব্যাপারটি ফারসী ভাষায় তাঁর রচিত "কাশফুল আসরার' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করে গেছেন সংক্ষিপ্ত আকারে। তরীকতের বিস্তারিত বিষয়াদি সিলসিলা পরম্পরায় এখনও বিস্তারিত বজায় আছে তাঁর অনুসারীদের মধ্যে। উৎসাহী তরীকতপন্থী সালেক ও পাঠকদের অবগতির জন্য "কাশফুল আসরার' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হলো।

ক্বদমীয়া তরীকার ইমাম হযরত সৈয়দ আমজাদ আলী শাহ (র) সাহেব তাঁর কাশফুল আসরার গ্রন্থে বলেন- "আমার প্রাথমিক ছয়ের-সুলুকের সময় আপন শায়েখ সূফী ফতেহ্ আলী মরহুম মগফুরের নিকট ফায়েজ প্রাপ্ত হতাম। তাঁর তাওয়াজ্জুহর দ্বারা নক্শবন্দীয়া, মুজাদ্দেদীয়া, কাদেরীয়া ও চিশতীয়া তরীকার ফায়েজ হাঁসিল করি। সেই সৌভাগ্যযুক্ত সময়ে রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যিয়ারত হাঁসিল করি। তিনি হেদায়েতের বাণীতে এরশাদ ফরমাইলেন- তোমাকে আমার কদম দান করলাম। এ ফায়েজ পীরের মধ্যস্থতা ছাড়াই দান করেন। যখন এ ফায়েযের কথা পীরের নিকট প্রকাশ করি, তিনি জযবে এসে বললেন- এটা আ'তায়ী ও ইজতেবায়ী ফায়েজ। আপনাকে মকবুল মনোনীত করে এ ফায়েজ দান করা হয়েছে। আল্লাহ্র শোকর করুন।"

"তেরশত হিজরীর জমাদিউল আউয়ালের ৮ম তারিখ রবিবার হাবিবে খোদা এ অধম বান্দাকে- 'হে আমার কদম' বলে সম্বোধন করেন। এ মাসের নয় তারিখ (পরদিন) সোমবার রাতে মুরাকাবার সময় মহান আল্লাহ্তায়ালা নিজ কুদরতের ভাষায় ফরমালেন- "আমার হাবিবের উসিলায় তোমাকে ক্বদমীয়া তরীকা দান করলাম। এর নাম ক্বদমীয়া তরীকা রাখলাম।"

"ক্বদমীয়া তরীকা দান করার পর যখন আল্লাহ্তায়ালার রহমত এ ফকিরের অনুকূল হল তখন জমাদিউল আওয়াল মাসের নয় তারিখ সোমবার রাতে হাবিবে খোদা ও ফকিরের প্রতি বিশেষ তাওয়াজ্জুহ করেছিলেন, সেই তাওয়াজ্জুহতে পীর মুর্শিদ হতে যে এনাবতি ফায়েজ হাঁসিল করেছিলাম, তা আমার নিকট হতে পৃথক হয়ে প্রত্যেক তরীকার ইমামের দিকে চলে গেল। চার তরীকার চার ইমাম রাসূল (সাঃ) এর সামনে চারখানি নূরী খামের উপর চারটি আসনে বসা ছিলেন।"

"এ তারিখের পর নতুনভাবে বায়আত করিয়ে হুজুর (সাঃ) মৌখিক ও আন্তরিক শিক্ষা শুরু করলেন। তেরশ হিজরীর ৯ই জমাদিউস সানি বুধবার রাত

www.pathagar.org

পর্যন্ত নয় মাকামের ছয়ের, সুলুক, উরূয ও নযুল সুষ্ঠুভাবে আড়ম্বরের সাথে শেষ করালেন এবং খিলাফতের ফায়েজ দ্বারা ভূষিত করে তাঁর পবিত্র জবানে ফরমাইলেন- তুমি আমার খলীফা, এখন হতে আমার উম্মতগণকে ক্বদমীয়া তরীকার দিকে আহ্বান কর।"

'তেরশ হিজরী গত হওয়ার পর তেরশ এক হিজরীর মহররম মাসের দশ তারিখ সোমবার রাতে মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে এক মজলিসের আয়োজন করা হয়। একটু পরই মজলিস অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় রাসূল করিম (সাঃ) শাহী তখতের উপর সভাপতির আসনে ছিলেন, সমস্ত আম্বিয়ায়ে আযম ও আউলিয়ায়ে কেরাম নিজ নিজ স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন। সভা পরিপূর্ণ হয়ে গেলে রাসূল করিম (সাঃ) নিজ পবিত্র জবানে ফরমাইলেন, 'আজ রাতে এ সভা এজন্য অনুষ্ঠিত হয়েছে যে, এ ব্যক্তিকে এক নতুন তরীকায় তালীম-তালকিন করেছি, তাঁর জন্য ও তাঁর অনুগামীদের জন্য আল্লাহ্তায়ালা অনাদি কাল হতে যে বিলায়েত গচ্ছিত রেখেছিলেন, তা তাঁকে দান করেছি। এখন আশা করি আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে রহমতের ফায়েজ দান করবেন। খোদার দরগায় এ কামনা আশা করে দোয়া করছি, আপনারা শরীক হউন। পবিত্র মুখে এ কালাম শরীফ ফরমিয়ে হাত উঠিয়ে আল্লাহ্তায়ালার দরবারে আবেদন-নিবেদন শুরু করলেন। অন্যান্য আম্বিয়া কেরাম ও আউলিয়াগণ আপন আপন পবিত্র মুখে আমিন! আমিন!! ছুম্মা আমিন!!! ফরমাচ্ছিলেন। এ ফকির দোয়া কবুল হবার জন্য হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইলাম। দোয়া করিবা মাত্র তা কবুল হয়ে গেল (অর্থাৎ চিহ্নসমূহ প্রকাশ হল)"।

তরীকাসমূহ যে রাসূল মকবুল (সাঃ) মারফত নাযিল হয় এবং সেগুলোর নাম পর্যন্ত আল্লাহ্তায়ালা নির্ধারণ করে দেন, তা একজন নাযিলকৃত তরীকার ইমামের ভাষ্যে শুনলেন। মনগড়া ভাবে কোন ওলী আল্লাহ্ই তরীকার প্রবর্তন করতে পারেন না, কারণ প্রত্যেক তরীকার ছয়ের, সুলুক, উরূয, নযুল ও নূরের রং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও স্বতন্ত্র। এ তরীকার বৈশিষ্ট্য অন্য তরীকার সাথে মিশ্রিত হয় না। হয়ত কিছু সাদৃশ্য থাকতে পারে। প্রত্যেক তরীকার মাকামসমূহের যিকির, ফায়েজ ও নূরে পৃথক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যেমন নূরের কথা ধরা যাক, কাদেরীয়া তরীকার নূরের রং হলদে মিশ্রিত লাল, চিশতীয়া তরীকার রং সূর্যালোকের মত। নক্শবন্দীয়া তরীকার নূরের রং সাদা, মুজাদ্দেদীয়া তরীকার নূরের রং সাদা মিশ্রিত সবুজ আর ক্বদমীয়া তরীকার নূরের রং হল সবুজ মিশ্রিত লাল। শাখা তরীকা যেহেতু কোন নাযিলকৃত তরীকা নয়, মূল তরীকার সাথে যদি সম্পর্ক

www.pathagar.org

থাকে তবে সেই মূল তরীকার রং পাবে, সম্পর্ক না থাকলে ফানাফিশ শায়েখ পর্যন্তই এর সমাপ্তি, জামেয়া তরীকার অবস্থাও এরূপ। আল্লাহ্তায়ালাই ভাল জানেন। শাখা তরীকা ও জামেয়া তরীকা তরীকতের লাইনচ্যুত। তবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে যারা অনুসরণ করেন, আল্লাহ্তায়ালা তাদের বঞ্চিত করেন না।

মনগড়াভাবে প্রতিষ্ঠিত কোন তরীকায় ধারাবাহিকভাবে তরীকতের ফায়েজ সমূহ ও নূরে ইলাহী আসতে পারে না। তবু যদি কোন অপরিপূর্ণ সূফী তা করেন ও তাসাওউফের রীতি-নীতি কঠোর ভাবে পালন করেন ও মুরীদদের শিক্ষা দেন তবে ফানাফিশ শায়েখের মাকামের ফায়েজ হয়ত পেতে পারেন, এর উপরের মাকামের ফায়েজ পাবেন কিনা আমার জানা নেই। প্রবর্তনকারীর জন্য এটা একটা সাংঘাতিক বিপদজ্জনক পদক্ষেপ।

কোন নাযিলকৃত তরীকার সাথে কোন বিষয়ে বা যিকির আযকারে যদি অন্য তরীকার সাদৃশ্য থাকে, তবে তাকে যেন কেউ শাখা তরীকা বলে মনে না করেন। কারণ এতে একজন যবরদস্ত আল্লাহ্র ওলী, তরীকার ইমাম ও তাঁকে প্রদত্ত আল্লাহ্র মহা দানকে হেয় ও তুচ্ছ মনে করা হয়। নবীদের মধ্যে যেমন পার্থক্য করে কাউকে হেয় মনে করা উচিত নয়, প্রত্যেককে স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মনে করা যায়, তেমনি তরীকার ইমামগণও সমপর্যায়ের ওলী, তাদের ছোট-বড় পার্থক্য না করে তাদের আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে মনে করলে ঈমানের উপর খারাপ প্রতিক্রিয়া হয় না।

ক্বদমীয়া তরীকার বুযুর্গগণ মনে করতেন যে, আল্লাহ্তায়ালা যার ভাগ্যে বিলায়েত নির্ধারিত করে রেখেছেন, তিনি এ তরীকায় আসবেনই। এ জন্য প্রচার প্রপাগান্ডা বা মুরীদ বাড়াবার কোন কোশেশ্ করতেন না। যারা শুধু আল্লাহ্তায়ালাকে পেতে চায় তাদেরই মুরীদ করতেন। এ জন্য দুনিয়াদারী লোকেরা তারে সংস্পর্শে যেতেন না, গেলেও রিয়াযত মেহনতের ভয়ে পৃথক হয়ে যেতেন। এ জন্য এ তরীকার বেশী প্রচার -প্রসার হয়নি বলে কেউ যেন একে শাখা তরীকা ও নাযিলকৃত তরীকা নয় বলে মনে না করেন।

একশ বছর আগে ক্বদমীয়া তরীকা নাযিলের সময় এ তরীকা নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে। বিগত একশ বছরে এ তরীকায় বহু গওছ, কুতুব ও ওলী আল্লাহ্ হয়েছেন। সদ্য নাযিলকৃত তরীকা বলে শায়েখের মধ্যস্থতা কম হওয়ায় এতে ফায়েজ বেশী ও কম পরিশ্রমে তরীকতের মাকামাতগুলো অতিক্রম করা

www.pathagar.org

যায় এবং নূরে ইলাহী অধিক পরিমাণে লাভ করা যায় দেখে সব সন্দেহমূলক প্রশ্নের সমাপ্তি কয়েক বছরের মধ্যেই ঘটে যায়। সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশের মাটিতে একমাত্র নাযিলকৃত তরীকার ইমাম শুয়ে আছেন। ঢাকার মুনসীগঞ্জ জিলার সিরাজদিখান থানার অন্তর্গত পাউসার গ্রামে আড়ম্বরহীন অবস্থায় তাঁর মাযার শরীফ অবস্থিত। দুনিয়াতেও যেরূপ আড়ম্বরহীন অবস্থায় থাকতে ভালবাসতেন মৃত্যুর পরও দুনিয়াতে তাই আছেন।

বাংলাদেশের লোকদের রহস্যাবৃত তরীকত সম্মন্ধে আদি-অন্ত সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না, এখনও আছে বলে মনে হয় না। ক্বদমীয়া তরীকার ইমাম ও সৈয়দ আবদুল কাদির জিলানী (র) এর বংশধর সৈয়দ আমজাদ আলী শাহ (র) সাহেবের বদৌলতে ও সিলসিলা পরম্পরা শিক্ষায় তরীকতের অস্পষ্ট রহস্যাবৃত্ততা ও বিভ্রান্তিমূলক ধারণা হতে মুক্ত হয়ে একটি স্পষ্ট নির্মল শরীয়ত অনুমোদিত ধারণায় আসতে পেরেছি। আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে, তাঁর অনুগামী খলিফাগণকে, তাঁদের অনুসারী এবং তাঁর বংশধরগণকে রহমত ও বরকত দান করুন। উপযুক্ত শায়েখগণের মারফত ক্বদমীয়া তরীকাকে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের মুক্তি ও আল্লাহ্র ওলী বানাবার উসীলা স্বরূপ করে রাখুন। আমীন।

ক্বদমীয়া তরীকায় মা'রিফাতের সর্বশেষ মাকাম আল্লাহু জাল্লা শানুহুর হাকীকতের মাকাম শেষ ও সম্পূর্ণ না করা পর্যন্ত এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর নির্দেশ না পেলে কাউকে খিলাফত দেওয়া হয় না, এমন কি নবুওতের মাকামে খিলাফতের ফায়েজ লাভ করলেও নয়। মরহুম শায়েখ হযরত আবদুল মুনীম আনসারী (র) সাহেব কেবলা পর্যন্ত এ নীতিমালা কঠোর ভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। সব তরীকা ও ধর্মে সময়ের ব্যবধানে দোষ-ত্রুটি দেখা দেয়; ক্বদমীয়া তরীকাও কালের ব্যবধানে এর থেকে বাদ পড়বে না। এ কারণেই আল্লাহ্তায়ালা নতুন তরীকা যুগে যুগে নাযিল করেন, যেমন পূর্বকালে নবুয়ত নাযিল করা হত। যে মনোনীত সৌভাগ্যবান উম্মতের উপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মারফত তরীকা নাযিল হয়, তিনিই নতুন তরিকার ইসমে যাতের যিকির, নফী-ইলবাত, ছয়ের, সুলুক, উরূয ও নযুল ইত্যাদি শিক্ষা দেন, আবার তরীকার ইমামকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শিক্ষা দেন।

তরীকার সমস্ত মাকামের ফায়েজ ও নূর যা আল্লাহ্তায়ালা নির্ধারণ করে রেখেছেন, তা মাকাম মুতাবিক ক্রমে ক্রমে দান করেন রিয়াযত- মেহনত ও নিয়ম-নীতি পালন করা অনুযায়ী। অবশেষে মনযিল মকসুদ অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার অনাদি আদিমত্বের নূরে ফানা হওয়া যায়।

www.pathagar.org

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জীবিত অবস্থায়ই সাহাবাদের অনেককে এ সকল নিয়ামত বন্টন করে গেছেন, সাহাবারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর খলিফা ছিলেন। হুযুরের (সাঃ) নিকট দ্বীন, শরীয়ত ও তরীকত তথা পূর্ণ ইসলাম নাযিল হয়েছিল। তিনি জীবিত অবস্থায়ই সাহাবীগণকে সে সব শিক্ষা দিয়ে গেছেন কাজে, কথায় ও আচরণে। তাঁর এবং সাহাবীগণের ইন্তিকালের পর তাবেইনগণের সময় হতে তরীকা নাযিল শুরু হয়। প্রকাশ্য আমলের ব্যাপারতো কোরআন-সুন্নাহ্তেই সংরক্ষিত আছে। কি পদ্ধতিতে সেগুলো আমল করতে হবে যাতে ইখলাস পয়দা হবে, আল্লাহ্ ভিন্ন পদার্থের আকর্ষণ মন থেকে উঠে যাবে, যার ফলে নূরে ইলাহী কলবে আসবে এবং আত্মীক উন্নয়ন ঘটবে-তাই তরীকতের বিষয়বস্তু। যদি বলা বা মনে করা হয়, এসব নবুওতে ছিল না, তবে নবুয়ত অসম্পূর্ণ ছিল বলে ভাবা হয়, যা কুফরীর নামান্তর। কেবল ফাসিকগণই পাপের কারণে এরূপ মনে করতে পারে।

একটি কথা প্রচলিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হতে সিনা-বসিনা মারফতি বিদ্যা চলে এসেছে। কথাটা অবশ্য সত্য। কিন্তু যে ভাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হতে শাজরা-নামা টানা হয়, তা সঠিক নয়। এভাবে শাজরা-নামা টানা হলে মনে হয় প্রত্যেক শতাব্দীতে নতুন নতুন তরীকা নাযিল করে তরীকতের ইমামদের কাছে যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মারফত নতুন ফায়েজ ও নূরে ইলাহী আল্লাহ্তায়ালা বখশিশ করে ঈমানের প্রাণরস দ্বারা ভূলোককে সঞ্জীবিত করেন, তার কোন বালাই নেই। ইসলাম ভিন্ন অন্য কোন ঐশী ধর্মে আখেরী যমানাতে ঈমানের উপর তরীকা নাযিল হয় না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নবুয়ত-রিসালাত যে কিয়ামত পর্যন্ত চালু আছে, এটাও তার প্রমাণ।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পূর্ববর্তী যমানাতে নবুওতের ক্ষেত্রে যেরূপ হতো তেমনি বর্তমানে প্রত্যেক আল্লাহ্র পথের যাত্রী তার পূর্ববর্তী কোন তরীকার ঈমাম সাহেবকে অনুসরণ করে সে অনুযায়ী রিয়াযত-মেহনত করে নিজকে তাযকিয়া নাফ্স করে আল্লাহ্র ওলী হতে পারেন। তাঁদের মধ্য হতে কাউকে আল্লাহ্তায়ালা মনোনীত করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মারফত তাঁর উপর তরীকা নাযিল করেন। যার ফলে সেই তরীকার ফায়েজ সিনা-বসিনা চলতে থাকে। এক পর্যায়ে উপযুক্ত শায়েখের অভাবে তা নিঃশেষ হয়ে যায়। আবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মারফত নতুন তরীকা নাযিল হয় এবং ফায়েজ সিনা-বসিনা চলতে থাকে।

তরীকার ইমামগণ পূর্ববর্তী যে সকল তরীকা অনুসরণ করতেন সেগুলো সহ শাজরা-নামা টানা হলে তা অবশ্য সাহাবীগণ হয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পর্যন্ত যাবে,

www.pathagar.org

এটা সঠিক। কিন্তু নূরে ইলাহী বা ফায়েজ সোজাসুজি এভাবে আসে না। যদি আসতো তবে সব তরীকা একই হতো, সয়ের, সুলুক এবং নূরের রং একই থাকত, কোন বৈশিষ্ট্য থাকত না। ফায়েজ সিনা-বসিনা চলে তরীকার ইমাম সাহেব হতে নিম্নবর্তী তাঁর অনুসারীদের মধ্যে। ইমাম সাহেব সোজাসুজি ফায়েজ ও নূরে ইলাহী পান রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হতে। নতুন তরীকার ফায়েজ ইমাম সাহেবের কল্‌বে দেওয়ার পূর্বক্ষণে পূর্ববর্তী তরীকাসমূহের ফায়েজ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় এবং পূর্ববর্তী ইমাম সাহেব বা ইমাম সাহেবগণের নিকট তা চলে যায়। ফায়েজ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হতে আসে ঠিকই, তবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ওফাতের পর সিলসিলা অনুযায়ী সিনা-বসিনা ফায়েজ আসে না। নতুন তরীকা বখশীশের সময়ই পূর্ববর্তী তরীকাসমূহের ফায়েজমুক্ত করেই আল্লাহ্‌তায়ালা নতুন তরীকার আনকোরা নতুন ফায়েজ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মারফত দান করেন। তাই নাযিলকৃত তরীকাসমূহের ইমাম সাহেব হতেই সিনা-বসিনা ফায়েজ প্রবাহিত হয় বলে, তারা হয় অজ্ঞতাবশতঃ বলে, নতুবা তারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বরযখে জীবিত, সক্রিয় এবং উম্মতের আত্মিক উন্নতির জন্য চেষ্টারত আছেন, এ সত্যে সংশয়ী। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে সাধারণ মৃত আত্মার মত মনে করে, যার মৃত্যুর পর কোন করণীয় নেই। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর উপর এরূপ সংশয়পূর্ণ আকিদা হতে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ চাই। আওলীয়ারাও বরযখে সক্রিয় এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নির্দেশের অপেক্ষায় আছেন অথবা নির্দেশ মুতাবিক জীবিত উম্মতের আত্মিক উন্নতির জন্য চেষ্টারত আছেন।

মানুষের মধ্যে একমাত্র পবিত্র সত্তা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ধরাপৃষ্ঠে জন্মের পূর্বেই (সৃষ্টির পূর্বে নন) নবীগণের আত্মিক উন্নতির জন্য চেষ্টারত ছিলেন, জন্মের পূর্বেই নবী-রাসূল ছিলেন, রাসূলদের খিলাফত দিতেন, ওফাতের পর তাঁর উম্মতদের আত্মিক উন্নতি ও বিভিন্ন আধ্যাত্মিক পদ বিতরণ করেন আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছানুযায়ী। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে এসব বৈশিষ্ট্য দেওয়ার কারণে অনেক আধ্যাত্মিক সাধক রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে মৃত বলতে নারাজ।

খিযির (আঃ) শ্রেষ্ঠ সাহাবীগণ ও ওলী আল্লাহ্‌দের মত বরযখে জীবিত ও সক্রিয় যিনি সেই মাকামে আছেন তরক্কী দিতে না পারলেও তার সেই মাকামের ফায়েজ পূর্ণ করে দিতে পারেন। আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছাতে বিলীন আছেন, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তিনি দোয়া করলে কবুল হয়। তিনি নবী না হলেও তার

www.pathagar.org

নবুওতের মাকামের ফায়েজ আছে। তিনি উম্মতে মুহাম্মদীকে ভালবাসেন এবং শরীয়তে মুহাম্মদীকে অনুসরণে উৎসাহ দেন। তিনি আল্লাহ্তায়ালার লস্করদের সর্দার। তিনি নবী নন এ কারণে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নবুওতে অন্য নবীর নবুয়ত কার্যকরী থাকতে পারে না, তবে তিনি আল্লাহ্তায়ালার খলীফা, সেই হিসাবে মুসা (আঃ) এর পূর্ব হতেই পাক পানজাতনের খলীফা। পৃথিবীতে জীবিত ওলীদের মধ্যে যমানার গওসের দায়িত্ব পালনের যোগ্য লোক না থাকলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছায় খিযির (আঃ)কে গওসিয়াতের দায়িত্বে রাখেন। এ জন্য অনেকে তাকে জীবিত বলে মনে করেন। আল্লাহ্তায়ালা কোরআনে জানিয়েছেন-সকল প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। তাই আমাদের বিশ্বাস করতেই হবে যে, জড় দেহ থেকে সব আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করা হবে। এতে দেহ মরে যায়, আত্মা অমর থাকে। খিযির (আঃ) বা যে কোন মানুষের থেকে রেহাই নেই। তবে যারা জীবিত কালে নাফ্স থেকে আত্মার মুক্তি ঘটাতে পারেন, ঈমান নিয়ে মরলে তাঁদের আত্মা বরযখে জীবিত থাকে। খিযির (আঃ) জীবিত কালে আবদাল ছিলেন এবং জ্ঞানী ছিলেন, ইল্মে লাদুন্নীর জ্ঞান ছিল, মরার পরও তাই আছেন। উম্মতে মুহাম্মদীর আবদালগণের মৃত্যুর পর এ অবস্থা হয়। তবে খিযির (আঃ)কে মরতবার দ্বারা আল্লাহ্তায়ালা বৈশিষ্ট্য মন্ডিত করেছেন যাতে তিনি গওসের দায়িত্ব পান।

জগতের ভাল-মন্দ প্রথমে আল্লাহ্তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট পৌছান। তিনি পাক পানজাতনের মাধ্যমে গওসে যমানের কাছে পৌছান। গওসে যমান তখন কুতুব, আবদাল, আওতাদ ও আফরাদের কাছে পৌছান। এগুলো পদ, কামালিয়াত নয়। উপযুক্ত কামেল ওলীদের প্রতি পদগুলো বিতরণ আল্লাহ্তায়ালার মহা দান, আর কামালিয়াত অর্জন সাপেক্ষ। পরবর্তীতে এ পুস্তকে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। যাতে অস্পষ্টতার কারণে শরীয়ত বিরোধী আকীদার সৃষ্টি না হয়।

www.pathagar.org

তরীকতে মাকামসমূহ

আধ্যাত্মিক উন্নতি হঠাৎ চলে আসে না, ধাপে ধাপে আসে। মাকামের পর মাকামে আসে। আল্লাহ্তায়ালা পাক কোরআনে বলেছেন, "নিশ্চয়ই তোমরা ধাপে ধাপে আরোহন করবে।" ৮৪ঃ১৯।

পার্থিব বিদ্যায় যেমন শ্রেণীর পর শ্রেণী অতিক্রম করতে হয়, তেমনি তরীকতে মাকামের পর মাকাম অতিক্রম করে যেতে হয়। মাকাম অনুযায়ী নূরে ইলাহী লাভ করতে হয়, নূর অনুযায়ী সয়ের-সুলূক হয় এবং বান্দার মনোভাবের পরিবর্তন হয়। মাকাম শেষ হলে সেই মাকাম মুতাবিক উরূয ও নযুল হয়। উরূয বলে ঊর্ধ্বদেশে গমনকে, যার সর্বোচ্চ পর্যায় হল আল্লাহ্তায়ালার অনাদি নূর, যা জড় ও নূরী সৃষ্টি জগত ও আরশ আজীমের বহু ঊর্ধ্বে, তা হলো আল্লাহ্তায়ালার হাকীকতের নূর, যা গুপ্ত ভান্ডার হিসাবে বিদ্যমান। আর নযুল বলে নিম্নে অবতরণকে, যার শেষ সীমা হলো তাহতাচ্ছরা। ফানাফিশ শায়েখের মাকাম শেষ হলেই তাহতাচ্ছরা পর্যন্ত নযুল হয়ে যায়। কিন্তু উরূযের পরিধি ধাপে ধাপে বাড়ে, মাকাম অনুযায়ী তরীকতের সর্বশেষ মাকাম হাকীকতে আল্লাহু জাল্লা শানুহুর মাকামে গিয়ে অনাদি নূরে শেষ হয়।

তরীকতে মাকামলিয়াতের নয়টি মাকাম বা ক্লাস আছে। মাকামগুলো পর্যায় ক্রমে আছে, একটি শেষ করে অন্যটিতে যেতে হয় বা ধারাবাহিকভাবে আসে, ধারাবাহিকতা অতিক্রম করা যায় না অথবা এক মাকাম বাদ দিয়ে অন্য মাকামে যাওয়া যায় না। তবে ফানাফিশ শায়েখের মাকামে সব মাকামের আক্স বা ছায়াপাত ঘটতে পারে। যেমন কোন কোন সূফী বলেছেন, পরের জিনিস আগে আসে। শায়েখের ফায়েজ অন্যান্য মাকামে প্রবল থাকলে ফানাফিশ শায়েখের মাকামে এ রূপ হতে পারে। শুধু সুনির্দিষ্ট একটি তরীকায় এরূপ হয় না, শায়েখ পরম্পরায় তরীকা নিস্তেজ না হলেই যে কোন তরীকায় এরূপ হবে।

তরীকতের মাকামগুলো হলোঃ ১। ফানাফিশ শায়েখ ২। ফানাফির রাসূল ৩। ফানাফিল্লাহ্ ৪। বাকাবিল্লাহ্ বা তাওহীদ ৫। আ'বদিয়াত ও মা'বুদিয়াত ৬। আম্বিয়ায়ে উলুল আযম ৭। মাহবুবিয়াতে মুহাম্মদী ৮। হাকীকতে মুহাম্মদী ৯। হাকীকতে আল্লাহু জাল্লা শানুহু বা আল্লাহ্তায়ালার যাতের মা'রিফাত অর্থাৎ পরিচয়ের গুঢ়তত্বের মাকাম।

www.pathagar.org

মাকামগুলোর সংক্ষেপ সার নীচে দেওয়া হলো একটি একটি করে। সালেকগণ মাকামগুলো অতিক্রম করার সময় বিস্তারিত জানতে ও দেখতে পারবেন আল্লাহ্তায়ালা ইচ্ছা করলে, যদি তিনি তাসাওউফ ও তরীকতের নিয়ম কানুনের উপর রিয়াযত-মেহনত করেন এবং আল্লাহ্তায়ালার মেহেরবাণীর উপর ভরসা রাখেন ও আল্লাহ্ ভিন্ন সকল আকর্ষণ হতে নিজকে মুক্ত রাখতে পারেন।

১। ফানাফিশ শায়েখ

ফানাফিশ শায়েখের মাকামে শায়েখের মুহব্বত, ইচ্ছা ও সুরতে বিলীন হতে হয়। ফানাফিশ শায়েখের মাকামে সালিকের তরীকতের লাইনে প্রাথমিক অবস্থান বলে খুবই কঠিন। তার দীল ও দেমাগ শারিরীক ও মানসিক কালিমায় ভরপুর থাকে, কল্ব অন্ধকার থাকে।

এ অবস্থায় কোন আল্লাহ্র বান্দা যদি মনে করেন কোরআন-সুন্নাহ মেনে নবী রাসূল, সাহাবা কিরাম ও আউলিয়াগণের অনুসারী হয়ে অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার নেক বান্দাদের অনুসারী হয়ে চলবেন, সে জন্য তিনি যদি দুনিয়ার মুহব্বত ত্যাগ করে আল্লাহ্তায়ালাকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হন এবং এ জন্য সকল দুঃখ- কষ্ট, চেষ্টা ও পরিশ্রম করার জন্য মানসিকভাবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন তখন তার কর্তব্য হলো একজন শায়েখের সুহবতে যাওয়ার জন্য মনস্থির করা। যে শায়েখকে অনুসরণ-অনুকরণ করা যাবে, এরূপ কামিল মুকাম্মিল শায়েখের অনুসন্ধান করা উচিত। ইখলাসের সাথে শরীয়তের পাবন্দ এবং যাকে অনুসরণ করলে আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য, মিলন ও দীদার পাবে বলে মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, এমন শায়েখের অনুসন্ধান করতে হবে। যার মুখে দুনিয়াদারী কথার চেয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কথা বেশী এবং লোকদের আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) এবং আখিরাতের দিকে আকৃষ্ট করার দিকে বেশী মনযোগী, তাঁদের মধ্যে যাঁকে বিলায়েতপ্রাপ্ত বলে বিশ্বাস হবে এবং তরীকতের লাইনে শ্রেষ্ঠ বলে মনে হবে তার কাছে মুরীদ হয়ে তাঁর নৈকট্য ও সুহবতে থাকতে হবে।

পীরের শ্রেণী ও যোগ্যতা সম্মন্ধে এ পুস্তকে আলোচনা করা হয়েছে। মনযোগী বুদ্ধিমানগণ জাহেরী ভাবেও যাচাই করতে পারবেন। তবে কারামত ও ইসতেদরাজ দেখে আকৃষ্ট হয়ে ইখলাস বা আন্তরিকতার সাথে শরীয়ত ও সংসারের প্রতি তাঁর অনাসক্তি না দেখলে প্রতারিত হওয়ার আশংকা আছে। উপহার গ্রহণ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সুন্নত বিধায় উপহার গ্রহণে কাউকে সংসারের প্রতি আসক্ত বলে ধরা যাবে না। তবে মুরীদের সহায়-সম্পত্তির খোঁজ-খবর নেওয়াতে আগ্রাহান্বিত দেখলে সংসারাসক্তি আছে বলে ধরতে হবে।

www.pathagar.org

উপহার গ্রহণ করে নিজের সর্বনিম্ন প্রয়োজন মিটিয়ে তা আল্লাহ্‌র রাহে দান করে দিতে হবে। দেখতে হবে তিনি উপহারের প্রতি নর্ভিরশীল না আল্লাহ্‌র প্রতি। কারামত দেখে আকৃষ্ট না হয়ে বিলায়েত দেখে আকৃষ্ট হতে হবে। কাউকে শায়েখ হিসাবে গ্রহণ করলে মুরীদের প্রাথমিক কর্তব্য হলো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের মুহব্বত ছাড়া শায়েখের মুহব্বত অধিক পরিমাণে মনে রাখা। মুরীদের মকসুদ হলো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের মুহব্বত। শায়েখের মুহব্বত সেই মুহব্বতের উসীলা বা উপলক্ষ্য মাত্র। শায়েখের উপর বিশ্বাস ও মুহব্বত রাখতে হবে, নইলে ফায়েজ যাবে না। এজন্য তরীকতের বুযুর্গগণ নিজ শায়েখকে শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ বলে মনে করতে বলেছেন।

মহব্বতের ফায়েজ পূর্ণ হলেই আসে ইরাদতের ফায়েজ। ইরাদত হলো ছোট বেলা হতে অসংশোধিত প্রবৃত্তির অনুকুলে যে ভাল-মন্দ স্বভাব গড়ে উঠেছে তা পরিত্যাগ করে আল্লাহ্‌তায়ালার রহমানী স্বভাব গ্রহণ করা। আল্লাহ্‌তায়ালার স্বভাব গ্রহণ করতে হলে শায়েখ ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইচ্ছার উপর অগ্রসর হতে হয়। যেহেতু শায়েখের ইচ্ছা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা, যা পাক কোরআনে ব্যক্ত হয়েছে, রাসূল (সাঃ) এর ইচ্ছা যা সুন্নাহ্‌তে প্রকাশিত হয়েছে তাতে বিলীন হওয়া। সেজন্য কোরআন-সুন্নাহ মুতাবিক শায়েখের ইচ্ছাতে মুরীদের ইচ্ছা বিলীন করতে হবে, প্রাধান্য দিতে হবে এবং শায়েখের ইচ্ছা গ্রহণ করে সে অনুযায়ী চলতে হবে। শায়েখ তাকে অবশ্যই কোরআন-সুন্নাহ্ মুতাবিক চলতে বলবেন ও সর্বক্ষণ যিকির করতে বলবেন। তবে কোন আমল আগে করতে হবে, কোন আমল পরে করতে হবে সময় উপযোগী তা বলবেন, সে অনুযাযী আমল করতে হবে। অবিরত যিকিরকে চিরসাথী করে নেওয়া শায়েখের ইচ্ছার অন্তর্গত। এভাবে শায়েখের ইচ্ছাতে নিজকে বিলীন করতে হবে।

এ জন্য প্রয়োজন শায়েখের সুহবত বা সংগ লাভ এবং শায়েখের খিদমত। এক আলোকিত আত্মা অন্য আত্মাকে যেমন আলোকিত করে তেমনি খারাপ লোকের সঙ্গ গ্রহণ করলে ও তাকে মুহব্বত করলে আত্মা কলুষিত হয়ে যায়। ফায়েজ প্রাপ্ত বলে শায়েখকে মুহব্বত করলে, তাঁর সংগে থাকলে ও খিদমত করলে শায়েখের ফায়েজ তাকে তাছির করবে। শায়েখ যেন সালিকের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এরূপ আচার-আচরণ করতে হয়। শায়েখ মনে মনে বিরক্ত হলেও ফায়েজ বন্ধ থাকে। ইহাই তরীকতের আদব। তাই শায়েখকে অতীব আদব ও সম্মান করা জরুরী। শায়েখের সামনে সংসারিক কথা-বার্তা না বলে মনে মনে কল্‌বী যিকির করতে হয়।

www.pathagar.org

যদি শায়েখ কাছে না থাকেন, অনুপস্থিত থাকেন তবে কলবী যিকিরের সাথে শায়েখের চেহারার প্রতি খিয়াল রাখলে শায়েখ উপস্থিত থাকলে যেরূপ ফায়েজ পাওয়া যায়, সেরূপ ফায়েজ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তবে উপস্থিত শায়েখের মুহব্বত সালিকের প্রতি থাকে বলে তাতে বেশী ফায়েজ পাওয়া যায়। এজন্য ঘন ঘন শায়েখের কাছে না গেলে নাফ্স শয়তান কার্যকরী হয়ে ফায়েজ প্রাপ্তি বন্ধ করে দিতে পারে।

শায়েখের চেহারার প্রতি খিয়াল রাখা শরীয়ত বিরুদ্ধ হয় না। কারণ যাকে মুহব্বত করা হয় তার চেহারা খিয়ালে এলে তা শির্ক হয় না, যতক্ষণ শায়েখকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে (সাঃ) পাওয়ার উপলক্ষ্য মনে করা হয়। এখানে আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আল্লাহ্তায়ালা। কোরআন- সুন্নাহ্র আদেশ-নিষেধ অমান্য করে শায়েখের কোরআন-সুন্নাহ বিরোধী আদেশ পালন করলে শায়েখের ইবাদত হবে, এটা শির্ক হবে। শায়েখ যেন উপাস্য না হয়। ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল নামাযের সময় ইচ্ছা করে শায়েখের চেহারা খিয়াল করলে শির্ক হতে পারে। কারণ এখানে রুকু-সিজদার প্রশ্ন আছে। আল্লাহ্তায়ালার তাবেদার বান্দা হয়ে তাঁকে পাওয়ার জন্য শায়েখকে মুহব্বত করছে, নামায ছাড়া অন্য সময় মুহব্বতের কারণে তাঁর চেহারা খিয়ালে আনলে বা এলে দুষণীয় নয়। সাহাবীরা নামায ছাড়া অন্য সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কথা চিন্তা করতেন না, এ কথা ভাবাই যায় না। আর চিন্তা করলেই চেহারা খিয়ালে আসবে।

শায়েখের মজলিসে শায়েখের উপস্থিতিতে কল্বী যিকির ছাড়া নফল ইবাদত বা তসবীহ পড়া উচিত নয়, এতে শায়েখের ইরাদার বিপরীত হয়। তবে শায়েখ অনুমতি দিলে পড়া যায়।

শায়েখের আচার-আচরণে কোন বিষয় যদি শরীয়ত বিরোধী বলে মনে হয়, তবে নির্জনে শায়েখকে তা জানাতে হবে। যদি মুরীদের ভুল হয় তবে শায়েখ তা জানিয়ে দেবেন, আর শায়েখের ভুল হলে শায়েখ সাবধান হয়ে যাবেন। কিন্তু শায়েখ যদি শরীয়ত বিরোধী আচরণ বা কার্য আকড়িয়ে থাকেন এবং বার বার শরীয়ত বিরোধী কার্যে লিপ্ত হন তবে এরূপ শায়েখের সুহবত ছেড়ে দিতে হবে। কারণ এরূপ শায়েখ হতে তরীকতের ফায়েজ লাভ করা যাবে না। কারণ, শায়েখের ফায়েজ থাকলে শরীয়ত বিরোধী কাজের অনুশীলন করতো না। এটা অপরিপূর্ণ শায়েখের লক্ষণ। যিকিরে অন্তর্চোখ খুললেই কেউ কামেল হয়ে যায় না, যতক্ষণ না তাওহীদ বোঝে, আল্লাহ্তায়ালার মুহব্বত, ইরাদতে বিলীন না হয় এবং শরীয়তের হাকীকত অবগত হয়ে তাযকিয়া নাফ্স না হয়।

www.pathagar.org

শায়েখের সুহবতে থাকতে হলে অনুমতি নিতে হয়। মিথ্যা কথা না বলে, হারাম না খেয়ে শরীয়ত মুতাবিক চললে এবং নিজকে নিকৃষ্ট মনে করে শায়েখের সুহবত ইখতিয়ার করে সর্বক্ষণ আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকির করলে এবং শায়েখের খিদমত করলে ইন্‌শাআল্লাহ্ মুহব্বত ও ইচ্ছাতে বিলীন হওয়া যায়, তখন অর্ন্তচোখ খুলে সুরতে বিলীন হওয়া যায়।

আল্লাহ্তায়ালাকে পাওয়ার উসিলা হিসাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে পেতে হলে তাঁর নায়েব শায়েখকে ভালবাসতে হবে, তাঁর ইচ্ছায় বিলীন হতে হবে। আল্লাহ্তায়ালাই প্রকৃত মাহবুব, মাহবুবের মাহবুব হলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নায়েব ও মুরীদের শিক্ষক তথা মুর্শিদের মুহব্বত অন্তরে স্থাপন করতে হবে। কারণ তার উপলক্ষ্যে আল্লাহ্তায়ালা তরীকতের ফায়েজসমূহ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মারফত বখশিশ করবেন।

ফানাফিশ শায়েখের মাকাম শেষ হলে যতটুকু সুষ্ঠুভাবে তা সমাপ্ত হয়েছে সে অনুযায়ী মুরীদের সয়ের ও উরূয-নযুল হবে। এ মাকামে আরশ আজীম পর্যন্ত উরূয হয় এবং পাতাল তাহ্তাচ্ছারা পর্যন্ত নযুল হয়। আগুন, বাতাস, পানি ও মাটির দ্বারা যে সব দেহ গঠিত, যা আল্লাহ্তায়ালার গুণাবলীর ছায়া- সয়েরে সে সব জিনিস অন্তরচোখে আসে। আত্মাদের সাথে দেখা-সাক্ষাত হয়। কবরের অবস্থা দেখা যায়। সূফীগণ ও সয়েরকে সয়রে আলমে নাসূত বা সয়রে আলমে উনসুর বলেন। জড় জগত নূরের সাহায্যে দেখা যায়। এতে আল্লাহ্তায়ালা যে সৃষ্টিকর্তা এ গুণাবলী প্রকাশ পায়। এ মাকামে যা কিছু প্রকাশ পায় বা দৃষ্টি গোচর হয় সেসব নিয়ে চিন্তা- ভাবনা ও ধ্যান করতে করতে আরেফীনের পর্যায়ে যাওয়া যায়। শায়েখের তাওয়াজ্জুহ ছাড়া উরুয ও সয়ের সঠিক হয় না। ফানাফিশ শায়েখের মাকামে সব মাকামের ছায়াপাত ঘটে। এ মাকামে ত্রিশ হাজার শারীরিক ও মানসিক কালিমার পরদা কাটে। এ জন্য এ মাকাম কঠিন। এতে অবিরত যিকির এবং পূর্ণ উদ্যমে রিয়াযত-মেহনত করতে হয়। এ মাকামে ঘাটতি থাকলে পরবর্তী মাকামসমূহের ফায়েজ পরিপূর্ণ হয় না। ফানাফিশ শায়েখের মাকামই তরীকতের ফায়েজসমূহের ভিত্তিমূল। ফানাফিশ শায়েখের মাকাম অতিক্রম করলেও শায়েখের সুহবত ছাড়তে নেই, তাহলে অন্য মাকামসমূহের ফায়েজ পাওয়া যাবে না।

২। ফানাফির রাসূল

ফানাফিশ শায়েখের মাকামের পরবর্তী মাকাম হলো ফানাফির রাসূল। আল্লাহ্তায়ালার মুহব্বত ছাড়া সকল মুহব্বত দূর করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর

www.pathagar.org

মুহব্বত হৃদয়ে যেমন কায়েম করতে হয়, তেমনি আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছা ছাড়া সকল ইচ্ছা বা ইরাদা বিলীন করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ইচ্ছাতে নিজকে বিলীন করতে হয়। সুন্নাহতে রসুলুল্লাহর (সাঃ) ইচ্ছা ব্যক্ত হয়েছে এবং এছাড়া তিনি যদি কাশ্ফ, ইলহাম বা স্বপ্নে কিছু ব্যক্ত করেন সেটাও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ইচ্ছা। এ মাকামে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে যোগাযোগ হয়, তিনি যে সালিককে কতদূর মুহব্বত করেন তা বোঝা যায়।

এ মাকামের সয়ের-সুলূক আরশ আজীম হতে আলমে আরওয়াহ্র শেষ সীমা পর্যন্ত। সূফীগণ একে আলমে আমর ও মালাকূতের সয়ের বলে থাকেন।

৩। ফানাফিল্লাহ

সালিকের অন্তরে আল্লাহ্তায়ালার মুহব্বত ও ইরাদা ছাড়া সকল মুহব্বত ও ইরাদাকে বিলুপ্ত করে দেওয়ার নাম ফানাফিল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্র ইচ্ছা ও ইরাদাতে নিজকে ফানা করে দিতে হয়। বান্দার উপর ফি'লী তাজাল্লী হয়। যার উপর ফি'লী তাজাল্লী হয়, তিনি নিজকে অস্থিত্বহীন মনে করেন। এ জন্য সূফীরা এ মাকামকে ফানাফিল্লাহ্ বলেন। বাকাবিল্লাহ্তে সিফাতি তাজাল্লী হয়, সিফাতি তাজাল্লী শক্তিশালী বলে ফি'লী তাজাল্লীকে বিলুপ্ত করে দেয়, তখন বান্দা অস্তিত্ব অনুভব করে এবং নিজকে আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত বলে মনে করে। দৃশ্যমান জড় জগত, অদৃশ্য নূরী ও আত্মার জগত ফি'লী নূর দ্বারা সৃষ্ট।

অন্তরচোখের নজরে সমস্ত পদার্থই ফানা দেখা যায়। ধ্যানের সাথে নজর করলে আল্লাহ্র দিকে ও আল্লাহ্ পর্যন্ত সয়ের হয়। আলমে আরওয়াহ থেকে তওহীদ পর্যন্ত সয়ের হয়। সূফীরা এ সয়েরকে সয়েরে ইলাল্লাহ ও সয়েরে ফিল্লাহ বলেন।

ফানা ফিল্লাহ্র মাকামে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ফায়েজ লাভ হয়। একটি মুহব্বতে বিলীন, অন্যটি ইরাদায় বিলীন। প্রথমে আল্লাহ্তায়ালার মুহব্বতে নিজকে বিলীন করতে হয়, অন্য সমস্ত মুহব্বত দীল-দেমাগ থেকে দূর করে দিতে হয়। এ ফায়েজ পরিপূর্ণ হলে বান্দা মযযুব হয়ে যায়। যাকে ইচ্ছা করেন আল্লাহ্তায়ালা মযযুব করেই রেখে দেন। মযযুব কোন পীর বা শিক্ষক হতে পারে না। তার কাছে এরূপ কোন আশা-ভরসা করা উচিত নয়। আল্লাহ্র মুহব্বত ও কল্বী যিকির ছাড়া তাঁর বুদ্ধি-বিবেচনা বিলুপ্ত হয়। বুদ্ধি বিলুপ্তির কারণে তাঁর উপরও শরীয়তের হুকুম কার্যকরী নয়। কিন্তু নামায পড়ার মত হুশ বজায় থাকলে এবং ইচ্ছা করে নামায না পড়লে শক্ত গুনাহ্গার হবে।

www.pathagar.org

আল্লাহ্তায়ালা এ অবস্থায় কাউকে মযযুব করেই রেখে দেন, অধিকাংশই এ ফায়েযে কিছুকাল অবস্থান করে তা অতিক্রম করে যান। মুহব্বতের ফায়েজ যেন বন্দেগী বহির্ভূত করতে না পারে এ খিয়াল রাখতে হবে। মযযুবের কারামত জাহির হতে পারে, সে জন্য কেউ যেন মযযুবকে অনুসরণ করে শরীয়ত বহির্ভূত ব্যক্তিতে পরিণত না হয়। মযযুবকে ভালবাসতে হয়, কিন্তু তাঁকে অনুসরণ করা যায় না।

ফানাফিল্লাহ্র মাকামে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ফায়েজ হলো আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছাতে নিজের সকল ইচ্ছা বিলীন করা বা বিসর্জন দেওয়া। আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছা, যা কোরআনে ব্যক্ত হয়েছে সে ইচ্ছাতে নিজকে ফানা করা, নিজের কোন ইচ্ছা থাকবে না। এ ফায়েজ পরিপূর্ণ হলে বান্দা আবদালে পরিণত হয়। তখন বান্দার যেমন নিজস্ব ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা থাকবে না, তেমনি নাফ্স ও বুদ্ধির কোন ইখতিয়ার থাকবে না। যা কিছু করবে আল্লাহ্র ইচ্ছায় করবে। আবদালিয়াত আল্লাহ্তায়ালার মহা দান, তিনি যাকে খুশী এ নিয়ামত দান করেন। এতে পীর বা অন্যের কোন হাত নেই।

অনেকে নাফ্সকে পরিশোধিত করে তাযকিয়া নাফ্স হওয়ার পর অনেক উপরের মাকামে অবশ্য আবদালিয়াত পান, যা আল্লাহ্র দান ও অর্জন সাপেক্ষ দু'টোই। ফানাফিল্লাহ্তে দশ হাজার পরদা কাটে।

মুহব্বত ও ইবাদত এ দু'টি ফায়েজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে, একটি আলাদা অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে, যাতে সালিকগণ উপকৃত হতে পারেন।

৪। বাকাবিল্লাহ্

ফানাফিল্লাহ্তে রূহ যখন তার সাথে যাবতীয় সম্বন্ধ ও হিজাব হতে মুক্ত হয়, তখন বাকাবিল্লাহর ফায়েজ পীরের উসীলায় আসতে থাকে। এ হালে বান্দার আমিত্ব বোধ থেকে যায় অর্থাৎ নাফ্স অজ্ঞতা ও অস্বীকারত্ব ঘটতে দেয় না। এমতাবতাস্থায় আমিত্ব দূর করার জন্য সংগ্রাম ও সাধনার দরকার।

রিয়াযত-মেহনত, নফী ইসবাত যিক্র ও পীরের তাওয়াজ্জুহ্র ফলে ধীরে ধীরে হিজাব দূর ও অন্তর আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য পদার্থের সম্বন্ধ মুক্ত হলেই শক্তিশালী সিফাতী তাজাল্লীর দ্বারা আমিত্ব বোধ বিলীন হয়।

যতক্ষণ বান্দার আমিত্ব বোধ থাকে এবং সিফাতী নূরে মিলন ঘটে তখন বান্দা নিজকে ছাড়া কিছু দেখে না, জানে না, আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্ব ছাড়া কোন জ্ঞান থাকে না। এ হালে নিজকেই আল্লাহ্তায়ালা বলে মনে করে।

www.pathagar.org

এটা সাময়িক হাল। বান্দা এরূপ মনে করলেই আল্লাহ্তায়ালা হয়ে যায় না। নূরে মিলনের কারণে নাফসের এ হাল হয়। এখানেই মনসূর হাল্লাজ (র) ভুল করে বসেন এবং পরীক্ষায় পড়ে যান। এ ফায়েযে অনেক সূফী ভুল করেছেন। আমিত্ব বোধ থাকার কারণে দুষ্ট নাফ্স এটা সত্য বলে ধারণায় নিয়ে আসে। সাময়িক মিলন যদি জোরদার হয় তবে অলৌকিক অনেক কিছু জাহির হতে পারে। তার উপর আমিত্ব বোধ থাকলে এরূপ মনে করা স্বাভাবিক, নইলে মিলনে ফাঁক রয়ে গেল। এটা ওয়াহ্দাত নয়, ওয়াহ্দাতের পূববর্তী ফায়েজ।

নিজকে আল্লাহ্ মনে করা কোরআন ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদীসের বিরোধী। কিন্তু এখানে বান্দা ইচ্ছা করে মনগড়া ভাবে নিজ স্বার্থের জন্য এরূপ বলছেন না। তিনি নিজকে বান্দা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে নামায, রোযা ও শরীয়ত পালন করছেন, নিজের স্বার্থের জন্য নয়, বেখবরি ও নিজ উপলব্ধির ভুলে এরূপ মনে করেন ও বলে ফেলেন। ইচ্ছাকৃত ভাবে নিজকে আল্লাহ্ মনে করা ও বলা অবতারবাদে বিশ্বাস করা বুঝায়। অবতারবাদের জন্ম বোধ হয় এভাবেই হয়েছিল, কারণ তখন কোরআন ও সুন্নাহ্র মত সত্যের গাইড লাইন ছিল না।

নিজের স্বার্থের জন্য না হলে সাময়িক ভাবে এরূপ মনে করা ও বলা ক্ষমাযোগ্য। কিন্তু অবতারবাদে বিশ্বাস শির্ক ও কুফর। তওবাহ্ না করলে আল্লাহ্তায়ালা শির্ক ও কুফ্র মাপ করবেন না বলে ওয়াদাবদ্ধ। হুঁশ আসার পরই এ জন্য তওবাহ্ করা উচিত। অনেক সূফী হালের উপর ইজতিহাদ করে গেছেন, অথচ ইজতিহাদ কোরআন-সুন্নাহ্র উপর হওয়া উচিত সর্ব অবস্থায়। "আমিই আল্লাহ্" অবতারবাদে বিশ্বাসী সূফীরা কোরআন-সুন্নাহ্ মুতাবিক পথভ্রষ্ট এবং তরীকত হতে বিচ্ছিন্ন। এরূপ ফানাফিল্লাহ্তে গিয়ে অবতারবাদে বিশ্বাস হওয়া সূফীর ফায়েজ থাকে, না চলে যায়, আমি স্পষ্টভাবে বলতে পারছিনা। কারণ এরূপ বিশ্বাসী কোন সূফীর সাথে সাক্ষাত হয়নি বা নিজেরও কোন অভিজ্ঞতা নেই। তবে আমার ধারণা, ফায়েজ থাকে না এবং শয়তান কার্যকরী হয়। ব্যক্তিগত ভাবে কারো প্রতি দয়ালু আল্লাহ্তায়ালা তার মৃত্যুর সময় দয়া পরবশ হয়ে এর থেকে তওবাহ্ করিয়ে মাফ করে দিতে পারেন।

সকল হিজাব, আল্লাহ্ ভিন্ন পদার্থের সাথে সম্মন্ধ এবং আমিত্ব বোধ বিলুপ্ত হওয়ার পরই রূহ নিজের আসলের দিকে ঊর্ধ্বগামী হয়। প্রবল সিফাতী তাজাল্লীতে সালিক বিভূষিত হয়ে যায়। তখন বান্দার অন্তর দৃষ্টিতে উপলব্ধি হয় যে, যাবতীয় পদার্থের অস্তিত্ব আল্লাহ্ পাক হতে হয়েছে। "আমিই আল্লাহ্"-এ ভাবধারার বিলুপ্তি ঘটে।

www.pathagar.org

যাবতীয় পদার্থের অস্তিত্ব আল্লাহ্ পাক হতে হয়েছে, এ উপলব্ধিকে ফারসীতে হামাউস্ত বলে সূফীরা বলে থাকেন।

আল্লাহ্তায়ালা দ্বারা সৃষ্ট কর্তৃত্বের প্রবল গুণ, যা হতে যাবতীয় বস্তু বিভিন্ন গুণ হতে বিভিন্নভাবে বিকাশ লাভ করেছে। সে সমস্ত গুণাবলী একত্র হয়ে মিশে এক হয়ে যায়। সেই একত্ব অবস্থা বান্দার উপর তাজ্জালী করে। এ সিফাতী তাজাল্লীর প্রবল গুণে বান্দার অন্তর দৃষ্টিতে এক আল্লাহ্ ছাড়া কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। এ অবস্থায় অনেক সূফী বলে গেছেন- "আমি যে দিকেই তাকাই ইয়ারের চেহারা দেখি।"

আমিত্ব বোধ থাকলে বা নিজকে আল্লাহ্ মনে করতে থাকলে ওয়াহ্দাতের ফায়েজ আসে না। ওয়াহদাত এ অবস্থাকে বলা হয়, যখন এক ভিন্ন দ্বিতীয় নেই- এ অবস্থা প্রকাশ পায়, তখন আমিত্ব বোধ থাকে না। ওয়াহ্দাতে শুহূদী ও ওজুদীর ফায়েযে, সিফাতী তাজাল্লীর বিকাশে আমি ও তিনির পার্থক্য দূর হয়ে যায়। তখন মনে হয় সবই তিনি। আগে মনে হতো- সবই আমি, এখন মনে হবে- সবই তিনি। এ হালে অনেক ওলী আল্লাহ্ বলেছেন- 'তাঁকে পেলে আমাকে পাই না, আর আমাকে পেলে তাঁকে পাইনা, বান্দা ও আল্লাহ্তায়ালার মাঝে এ প্রেমের খেলা চলে। বস্তুজগত সৃষ্টির পূর্বে যে সিফাতী নূর সৃষ্টি করেছিলেন এবং কিয়ামতে বস্তুজগত ধ্বংস হয়ে যে সিফাতী নূরে সব কিছু বিলীন হবে, সেই সিফাতী নূরের একত্ব। সেই নূর শক্তি অবস্থায় আছে, যা অন্তর জগতে দেখা যায়, কিয়ামতে বহির্জগতে সংগঠিত হবে। এ নূরের বিকাশ অবস্থাই বিশ্ব প্রকৃতি। বিশ্ব প্রকৃতির মত এ নূরও সৃষ্ট এবং অফুরন্ত। কিয়ামতে এ নূর যাতী নূরে বিলীন হবে। এ মাকামে সিফাতী নূরের তওহীদে বিলীন হতে হয়। স্রষ্টার যাতী সত্তার অনাদী অপরিবর্তনশীল নূরের তওহীদে হাকিকতে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর মাকামে গিয়ে ফানা হতে হয়, সেটাই মনজিলে মকসুদ।

সিফাতী নূরের তওহীদে ওসল বা মিলন, ফানা ও বাকা বিলায়েতের ফায়েজ নয়। পরবর্তীতে এ নিয়ে আলোচনা করব। বাকাবিল্লাহর ফায়েজ হল তওহীদের ফায়েজ। অনেক সূফী ফানা- বাকাকে বিলায়েতের শর্ত মনে করে বাকাবিল্লাহর ফায়েজকে বিলায়েত বলে মনে করেন।

৫। আবদিয়াত ও মা'বুদিয়াত

তওহীদের মাকামের পরই এ দাসত্বের মাকাম শুরু হয়। আল্লাহ্তায়ালার সৃষ্টি কর্তৃত্ব, বিক্রম, চির অভাবহীনতা, সার্বভৌমত্ব, চিরস্থায়ীত্ব ও প্রতিপালক হিসাবে তিনিই একমাত্র ইবাদত বন্দেগীর যোগ্য। তওহীদে আমি ও তিনির

www.pathagar.org

খেলা চলে। কিন্তু 'আবদিয়াতে আমি বান্দা, নগন্য গোলাম তিনি প্রভূ, সার্বভৌমত্বের মালিক। তওহীদ শিক্ষা দিয়ে 'আবদিয়াতে আনা হয়। এ মাকামে প্রভূ আল্লাহ্তায়ালার শান প্রবলভাবে প্রকাশ পায়, ফলে বান্দার বে-খবরী ও আত্মবিস্মৃতি ঘটে থাকে অস্থায়ীভাবে। একে মা'বুদিয়াত বলে।

পিতার পৃষ্ঠের মায়ের ছাতির এক ফোটা পানির মিলন হতে মানুষের অস্তিত্ব জাহির হয়। যা মূলতঃ কিছুই নয়, খুব তুচ্ছ। আসলে স্রষ্টার বদওলতে আমাদের অস্তিত্ব। মানুষ খুবই দুর্বল, অসহায়, অবুঝ, বোকা, বিবেকহীন। কেউ কৃতজ্ঞ আর অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ। নিজের আমলের দিকে নজর দিলে তার আকৃতি-প্রকৃতি সৌন্দর্য্য ও শান- শওকত কিছুই নয় বলে মনে হবে। স্রষ্টার সাহায্য ছাড়া সে কিছুই করতে পারে না, কিছুই হতে পারে না।

'আবদিয়াতের মাকামে আল্লাহ্তায়ালা ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হুকুম-আহকাম বা আদেশ-নিষেধের উপকার, সুবিধা ও সৌন্দর্য্য বোঝা যায়। কেন আদেশ- নিষেধ করা হয়েছে? আদেশের সৌন্দর্য্য কি? নিষেধের কদর্যতাই বা কি? ইত্যাদি গুঢ় তত্ত্ব বোঝা যায়। শরীয়ত পালনের আত্মিক ও আন্তরিক উপকার ও স্বাদ উপলব্ধি করা যায়।

ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নতে মুয়াক্কাদা ও নফল ইবাদত, সদকা, পরোপকার ইত্যাদি যে কোন ভাল কাজ দ্বারা আল্লাহ্তায়ালার সাথে যোগাযোগ, সম্পর্ক ও নৈকট্য লাভ হয়। এ সব বিষয়াদি অন্তরচোখে দেখা যায়।

এ মাকামে কোরআন তিলাওয়াত, সালাত, সওম, ফরজ ইবাদত এবং কোরআন ও কা'বার হাকীকত জানানো হয়। এ জন্য অনেকে একে হাকীকতের মাকাম বলেন। আসলে এটা হাকীকতের মাকাম নয়, দাসত্ব ও প্রভূত্বের মাকাম। হাকীকতের মাকাম বললে ইবাদতের হাকীকতের মাকাম বলা যায়, সৃষ্টির হাকীকতের মাকাম নয়। অনেক সূফী একে বিলায়েতের শেষ মাকাম বলেছেন, বিলায়েতকে নবুওতের নীচে রাখার উদ্দেশ্যে। হাকীকতে মুহাম্মদী হলো সৃষ্টির হাকীকতের মাকাম, যা নবুওতের মাকামেরও উপরে। হাকীকতে মুহাম্মদী হতে সব কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে। 'আব্দিয়াতের মাকামকে হাকীকতের মাকাম বললে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বাণী "আমি আল্লাহ্ হতে এবং আমা হতে বিশ্ব জগত সৃষ্টি হয়েছে।' এ হাদীসের সাথে সামঞ্জস্য হয় না এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বাণীর প্রতি মূল্য ও গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

শরীয়তে বান্দাকে পাকাপোক্ত করে এবং শরীয়তের প্রতি প্রবল আকর্ষণ সৃষ্টি করে এ মাকামের শেষ পর্যায়ে নাফ্সকে সম্পূর্ণ কালিমামুক্ত করে রূহ হতে

www.pathagar.org

কলুষতা দূর করে ইমামতের গুণে ভূষিত করা হয়। একে তাযকিয়া নাফ্স বলে। তাযকিয়া নাফ্স না হওয়া পর্যন্ত নবুওতের ফায়েজ হাসিলের উপযুক্ত হয় না, মানুষও কামিল হয় না।

তাযকিয়া নাফ্স হলে নাফ্স হতে রূহের মুক্তি ঘটে। রূহ সম্পূর্ণ মুক্ত হলেই নবুওতের ফায়েযে অংশ গ্রহণ করা যায়, নইলে অংশ গ্রহণ করা যায় না।

তাযকিয়া নাফ্স হলেই আবার মিলন বা ওসল লাভ হয়। এখান থেকেই ওসলে শহুদিয়া যাতীর আরম্ভ, কলবে যাতী নূর উদ্ভাসিত হয়। নবুওতের ফায়েযের শেষ সীমা ওসলে শহুদিয়া যাতী। তাযকিয়া নাফসের পূর্বক্ষণে হাকীকতে কা'বার সময়ই যাতী তাজাল্লী হাঁসিল হয় এবং সাথে সাথে নাফ্স তাযকিয়া হয়ে যায়। জীবনের নিরাপত্তা আসে। যেমন পাক কোরআনে বলা হয়েছে, "যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে জুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদের জন্য, তারাই সৎপথ প্রাপ্ত।"

পার্থিব স্বার্থ সিদ্ধির জন্য শরীয়ত বিরোধী সব কাজই জুলুম। আল্লাহ্তায়ালার মাফের ফলে বান্দা সাধনার দ্বারা তাযকিয়া নাফ্স হয়ে বেকসুর হয়ে যায়। তাযকিয়া নাফ্সের চিহ্ন কাশফে বরযখকে বা স্বপ্নে নিজকে কা'বাতে প্রবেশ করতে দেখা যায়। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে- 'যে কা'বাতে প্রবেশ করল, সে নিরাপদ হলো।'

নাফ্স পবিত্র হলে বান্দার ভিতরের শয়তান পবিত্র হয়ে যায়। তখন নাফ্স শয়তান মিলে তাকে ইবাদতে সাহায্য করে। কিন্তু শয়তান তীক্ষ্ম নজর রাখে। শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ করলেই শয়তান আবার তৎপর হয়। তাযকিয়া নাফ্স হলে বান্দা ইবাদতে তথা শরীয়ত পালনে খুবই মজা পায়। শরীয়ত বিরোধী কাজের চিন্তাও তার মন ও মস্তিষ্কে আসতে পারে না। কোন আকাঙ্ক্ষা উঁকি দিতে পারে, তাই সাবধান থাকতে হয়। 'আবদিয়াতের মাকামকে বিলায়েতের মাকাম বললে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বৈশিষ্ট্য থাকে না। অন্যান্য নবী রাসূলগণ হতে তাঁর যে বৈশিষ্ট্য ছিল সেটাই বিলায়েত।

৬। আম্বিয়াউলুল আযম

আম্বিয়া উলুল আযমের মাকামকে আম ভাবে নবুওতের মাকাম বলা হয়। নাফ্সের কালিমা ও সম্মন্ধাদি দীল ও মস্তিস্কের এবং উহাদের পার্শ্বদেশ হতে সম্পূর্ণ দূরীভূত হতে হবে, তিল পরিমাণ বাকী থাকা পর্যন্ত নবুওতের মাকামের সয়ের হাঁসিল হবে না। আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য ও মিলনের সময় গুপ্ত খবর,

www.pathagar.org

সুক্ষ্মতত্ত্ব ও নানা অলৌকিক ব্যাপার ঘটে থাকে। নবুওতের মাকামে মিলনে নবুওতের বহু সুক্ষ্মতত্ত্ব প্রকাশ পায়।

যদিও এখন অর্থাৎ শেষ যমানাতে নবুয়ত দান করা হবে না, তবু এ মাকাম শেষ করে যারা ইল্‌মে জাহির বাতিনে অংশগ্রহণ করেন, তাঁরা বনী ইসরাইলের নবীদের মত বলেই রাসূলুল্লাহ উল্লেখ করে গেছেন। যে সব উম্মতে মুহাম্মদী নবুওতের ফায়েজ লাভ করেছেন, তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ কথা বলেছেন। নবুয়ত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পর্যন্ত এসে খতম হয়ে গেলেও নবুওতের ফায়েযে অংশগ্রহণ করা যায়।

নবুওতের মাকামে নবুওতের ফায়েজ ছাড়া রিসালাত, ইল্‌মে বাতিনী, ইল্‌মে লাদুন্নী ও খিলাফতের ফায়েজ লাভ করা যায়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর শরীয়ত ও তরীকত দ্বারা এ সকল ফায়েজ লাভ হয়। তরীকতের ইমাম, মুজতাহিদ ইমাম এবং তাদের শ্রেষ্ঠ অনুসারীদের ভাগ্যে এ সকল ফায়েজ লাভ হয়েছে বা হচ্ছে। পূর্ববর্তী রাসূলগণ এবং তাঁদের বিশেষ উম্মতগণের ভাগ্যে এই প্রাপ্তি ঘটত। সাহাবীগণ, তরীকার ইমামগণ ও মুজতাহিদ ইমামগণ সত্যিকারের নায়েবে রাসূল।

পূর্ববর্তী রাসূলগণ এ মাকামেই হাকীকতে মুহাম্মদী ও শ'রবে মুহাম্মদী হতে খিলাফত ও ফায়েজ পেতেন এবং পরস্পরের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হতো। এ কারণে নবুওতের মাকামে উলুল আযম পয়গম্বরগণের সাথে উম্মতে মুহাম্মদীর ওলীগণের যোগাযোগ হয় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মারফত প্রদত্ত ফায়েজ দ্বারা।

নবুওতের এ মাকামে জাহেরী-বাতেনী ইল্‌ম পূর্ববর্তী নবীদের ভাগ্যে ঘট্‌ত, বর্তমানে ওলীদের ভাগ্যে ঘটে। এ মাকামে ইল্‌মে লাদুন্নীর জ্ঞান হয়।

এ মাকামে খিলাফতের ফায়েজ লাভ করা যায়। খিলাফত প্রতিনিধিত্ব বা অন্যের স্থলাভিসিক্ত হওয়া বুঝায়। আল্লাহ্‌তায়ালা সর্বপ্রথম নূরে মুহাম্মদী ও নূরে আহমদী সৃষ্টি করলেন, যা মিলিত ভাবে হাকীকতে মুহাম্মদী হলো। এ হাকীকতে মুহাম্মদী হতে হযরত আলী (কা), হযরত ফাতিমা যুহরা (রাঃ), হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত হুসেন (রাঃ) এর হাকীকত সৃষ্টি করলেন। এ ভাবে পাক পানজাতনের হাকীকত সৃষ্টি করে এই মিলিত হাকীকতসমূহকে সমস্ত পদার্থের মূল ও আসল সৃষ্টি করে এই মিলিত হাকীকতসমূহকে সমস্ত পদার্থের মূল স্থায়ীত্বের বা আসল করে পাক পানজাতনকে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর খিলাফত দ্বারা বিভূষিত করেন। সেই হতে পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণসহ বর্তমানে আউলিয়াগণ পাক পানজাতনের খিলাফত লাভ করেন।

www.pathagar.org

পূর্ববর্তী রাসূলগণ পাক পানজাতনের খিলাফত লাভ করে আল্লাহ্তায়ালার খলিফা হতেন এ মাকামে। বর্তমানে উম্মতে মুহাম্মদীর যারা এ মাকামে খিলাফতের ফায়েজ লাভ করেন তাদের মধ্য হতে আল্লাহ্তায়ালা যাদের ইচ্ছা তাঁর খিলাফতের পদসমূহ পাক পানজাতনের মাধ্যমে দান করেন। পাক পানজাতনের মাধ্যমে যমানার গাওছ হন, গওছে যমানের পর আফরাদ, আবদাল, আওতাদ, রিজালুল গায়ের প্রভৃতি পদ আছে।

সমগ্র সৃষ্টি পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীলতা দু'রকম -ভাল ও মন্দ। সবরকম ভাল-মন্দ আল্লাহ্তায়ালা হতে প্রকাশ পায়। যদি ভাল হয় তবে হাকীকতে মুহাম্মদী (সাঃ) তা হাকীকতে ফাতিমা (রাঃ) এর দিকে এবং মন্দ হলে আলী (কা) এর হাকীকতের দিকে সোপর্দ করেন। ভাল-মন্দ মিলিত-মিশ্রিত ভাবে হাসান (রাঃ) ও হুসেন (রাঃ) এর হাকীকতে পৌঁছে এবং এ দুই হাকীকতের মধ্যস্থতায় গওছে যমানের দিকে চলে আসে। গওছে যমান হতে আফরাদের নিকট। পরে আফরাদ হতে আবদাল, আবদাল হতে পরে রিজালুল গায়ের এবং রিজালুল গায়ের হতে ছরযহঙ্গনে দরগাহ ও অবশেষে সৃষ্টি জগতে পৌঁছে। যার ভাল হবার হয়, যার মন্দ হবার হয়। আল্লাহ্র রহমত ও গযব এভাবে সৃষ্ট জগতের উপর অবতীর্ণ হয়।

পাক পানজাতনের সাথে সম্পর্কিত তরীকার বুযুর্গগণ সাধারণত এ সব পদ পেয়ে থাকেন। শ্রেষ্ঠ সাহাবীগণের সাথে সম্পর্কিত তরীকার বুযুর্গগণ শ্রেষ্ঠ সাহাবীগণের মধ্যস্থতায় হযরত আলী (কা) এর সাথে সম্পর্কিত হয়ে এ পদ পেতে পারেন। রূহানী জগতে হযরত আলী (কা) এর সাথে শ্রেষ্ঠ সাহাবগণ সম্পর্ক গড়ার ব্যাপারে মধ্যস্থতা করলে শ্রেষ্ঠত্বের কোন লাঘব হয় বলে কেউ যেন মনে না করেন। সাহাবীগণের প্রত্যেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। খিলাফতের পর্যায় ক্রমে প্রত্যেকের মরতবা সঠিক স্থানেই রাখতে হবে। তবে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে আহলে আবার বিশেষত্ব অনস্বীকার্য। তবে প্রত্যেক তরীকার ইমাম এবং মুজাদ্দিদে মায়াতকে কুতুবে ইরশাদ বলা হয়।

নবুওতের ফায়েযের শেষে আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য ও ওসল বা মিলন ঘটে। বাকা বিল্লাহতে যে ওসল হয় তা ওসলে শহুদিয়া সিফাতী বা সিফাতী নূরে মিলন। এ মাকামে যে ওসল ঘটে তা হলো ওসলে শহুদিয়া সিফাতী বা সিফাতী নূরে মিলন। এ মাকামে যে ওসল ঘটে তা হলো ওসলে শহুদিয়া যাতী। এ ওসল যাতী নূরে। নবুওতের মাকামে সব নূরই যাতী নূর। নবুওতের মাকাম এখানেই

www.pathagar.org

শেষ। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর যমানাতে নবুওতের মাকাম হতেই বিলায়েত আরম্ভ হয়ে আল্লাহু জাল্লা শানুহুর হাকীকতের মাকামে শেষ হয়েছে। যারা নবুওতের মাকাম তায় করেছেন তারা তত টুকু বিলায়েতের ফায়েজ লাভ করেছেন, যত টুকু নবুওতের মাকামে বিলায়েতের ছায়া পাত ঘটেছে। এর উপরের তিন মাকামে যে যত টুকু তায় করেছেন তত টুকু বিলায়েতের ফায়েজ লাভ করেছেন। এ সম্মন্ধে পরে বিলায়েতের অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। জগতের আদি হতে অন্ত পর্যন্ত আল্লাহ্তায়ালার খিলাফত পাক পানজাতনের মধ্যস্থতায় আসে। আল্লাহ্র খিলাফত মানে পাক পানজাতনের খিলাফত।

৭। মাহবুবিয়াতে মুহাম্মদী

আল্লাহ্তায়ালা হাকীকতে মুহাম্মদী সর্ব প্রথম সৃষ্টি করেন। হাকীকতে মুহাম্মদী প্রকাশ করে, সেই নূরের প্রতি মুহব্বতের নজরে তাকান ও তাওয়াজ্জুহ দিয়ে মুহব্বত এল্কা করেন, সেই ফায়েজই মাহবুবিয়াতে মুহাম্মদী। এই ফায়েযের দ্বারা তিনি মাহবুবুল্লাহ্ ও হাবীবুল্লাহ্ হয়েছেন। এই ফায়েজ উচ্চতর, উৎকৃষ্টতর ও গৌরবযুক্ত। ইহা অন্যান্য নবী-রাসূলগণের পাওয়ার কথা নয়। এ ফায়েজ নবুয়ত ও রিসালাতের ফায়েযের ঊর্ধ্বে। এই ফায়েজ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জন্য খাস, অন্যান্য নবীগণ শরীক নন।

জনাব রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অন্যান্য নবী-রসুলগণ হতে তাঁর বৈশিষ্ট্যের কথা তাঁর পবিত্র মুখে নিজেই বর্ণনা করে গেছেন সাহাবীগণের কাছে। যেমন তিনি বলেছেন "তোমাদের কথা-বার্তা ও বিস্মিত হওয়া ঠিক ঠিক শুনেছি। আল্লাহ্তায়ালা ইব্রাহীম (আঃ)কে খলীল রূপে গ্রহণ করেছিলেন, তিনি সেরূপ হয়েছিলেন। মূসা (আঃ)কে গুপ্তভাষীরূপে গ্রহণ করেছিলেন, তিনি সেরূপ হয়েছিলেন এবং আদম (আঃ)কে সফিয়্যুল্লাহ রূপে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আমি হাবীবুল্লাহ (প্রেমাস্পদ), এতে কোন সন্দেহ নাই।"

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীগণকে এবং সাহাবীগণের মাধ্যমে আমাদের জানিয়েছেন- "কিয়ামতের দিন আমিই সর্ব প্রথম কবর হতে বের হবো। যখন তারা দূতরূপে যাবেন, তখন আমি খুতবা পাঠ করবো। যখন সবাইকে একত্র করা হবে, আমি তাদের প্রধান ব্যক্তি হবো, যখন হিসাবে ধরা পড়বেন, আমি তাদের সুপারিশকারী হবো, যখন নিরাশ হবেন, আমি সুসংবাদবাহী হবো। লেওয়ায়ে হাম্দ অর্থাৎ সুখ্যাতির ঝাণ্ডা সেদিন আমার হাতে থাকবে। আমি আদম সন্তানদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হবো। এতে আমার নিজের কোন গর্ব নেই।"

www.pathagar.org

আরো বলেছেন, "বেহেশ্‌তের ভূষণ হতে একটি ভূষণ পরবো, তারপর আরশের ডানদিকে দাঁড়িয়ে থাকব। আমি ব্যতীত আর কারো সে মাকামে দাঁড়াবার ক্ষমতা, যোগ্যতা ও সম্মান নেই।"

ইহা মাকামে মাহমুদা। আল্লাহ্‌তায়ালা রাসূলুল্লাহকে পাক কোরআনে বলেছেন-"অনতিবিলম্বে আপনার প্রতিপালক আপনাকে মাকামে মাহমুদায় পৌছাবেন।"

হাদীস মারফত আমরা আরো জানতে পারি যে, মাকামে মাহমুদার জন্য অন্যান্য নবীগণ আফসোস করবেন। উসিলা বেহেশতের একটি স্থানের নাম, এর একমাত্র যোগ্য বান্দা হবেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)। যারা মাকামে মাহমুদা ও উসিলা লাভের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জন্য দোয়া করবে, তারা হিসাবে ধরা পড়লে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের সুপারিশকারী হবেন। আযান দেওয়ার সময় আযানের শব্দগুলো মনে মনে মুয়াজ্জিনের সাথে পড়ে আযান শেষে দোয়া পড়তে হয়।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে হাবীবুল্লাহ্‌ রূপে গ্রহণ করে আল্লাহ্‌তায়ালা খাস করে তাঁকে নবুওতের মাকামের পর আরো তিনটি মাকাম দান করেন, যা অন্যান্য নবীদের দান করেননি। সেগুলো হলো মাহবুবিয়াতে মুহাম্মদী, হাকীকতে মুহাম্মদী ও হাকীকতে আল্লাহু জাল্লা শানুহু। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর উসিলায় তাঁর সৌভাগ্যবান যোগ্য উম্মতে মুহাম্মদী এসব ফায়েজ পেতে পারেন বা পাচ্ছেন।

এ মাকামে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বৈশিষ্ট্য বোঝা যায়, যা মানব কল্পনার বাইরে। তাঁর শান-শওকত শাহরে দেখা যাবে, যখন অসহায় মানবমন্ডলী পেরেশান অবস্থায় থাকবে, তখন তিনিই একমাত্র আশার আলো, তখন স্রষ্টা তাঁর সুপারিশ ছাড়া কারো কথা শুনবেন না। মানবমন্ডলীর একমাত্র নেতা হিসাবে তাঁর পুনরুত্থান হবে। কোন মানুষের সাথে রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এর তুলনা হতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রতি ভালবাসায় তাঁর পরিবারবর্গকে বা পাক পানজাতনকে অতুলনীয় গৌরব ও মহত্ব আল্লাহ্‌তায়ালা দান করেছেন। এ মাকামে পাক পানজাতনের হাকীকত এভাবে দেখা যায়- গৌরব ও মহত্বের তখ্‌তের উপর রাসূল করীম (সাঃ) উপবিষ্ট আছেন। হুজুর (সাঃ) এর ডান দিকে সৈয়দা ফাতেমা (রাঃ) উপবিষ্টা, বাম দিকে হযরত আলী আসাদুল্লাহ কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু উপবিষ্ট। ডান বাহুর সামনে হযরত হাসান (রাঃ) এবং বাম বাহুর সামনে হযরত হুসেন (রাঃ) নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট আছেন। কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের উপর সালাম ও দরূদ বর্ষিত হউক।

www.pathagar.org

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন- "যে হাসান ও হুসেনকে ভালবাসবে, তাকে আল্লাহ্তায়ালা ভালবাসবেন।"

আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) আরো বলে গেছেন, "যে আমাকে, এই দু'জনকে, বলে ইমাম হাসান (রাঃ) ও ইমাম হুসেন (রাঃ) এর দিকে ইশারা করলেন এবং এ দু'জনের মাতা-পিতাকে (অর্থাৎ পাক পানজাতনকে) ভালবাসবে জান্নাতুল ফিরদৌসে তার স্থান হবে।"

পাক পানজাতনের গৌরব ও মহত্ত্ব ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

৮। হাকীকতে মুহাম্মদী

হাকীকতে মুহাম্মদী হল নূরে মুহাম্মদী ও নূরে আহ্মদীর মিলিত প্রকাশ। আল্লাহ্ ছাড়া দৃশ্য-অদৃশ্য যা কিছু বিদ্যমান আছে সবই নূরে মুহাম্মদী হতে প্রকাশ লাভ করেছে। নূরে মুহাম্মদীর উপকরণ দ্বারা বিবর্তনে ও আল্লাহ্তায়ালার আদেশ দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন- 'আমি আল্লাহ্র নূর হতে আর সৃষ্টি জগত আমার নূর হতে পয়দা হয়েছে।'

সবুজ আভাযুক্ত লাল রংয়ের নূর হল নূরে মুহাম্মদী, যা নূরী জগত ও জড় জগতকে পরিবেষ্টন করে আছে। এর আকৃতি এত বিশাল যে, অন্তরদৃষ্টি পর্যন্ত এর আদি-অন্ত বুঝতে পারে না, যদিও সকল সৃষ্ট বস্তুর আদি-অন্ত আছে। এ নূরের সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য বর্ণনাতীত। এ নূরের সত্তাসার নূরে আহমদী।

এই হাকীকতে মুহাম্মদী হলো আল্লাহ্তায়ালার প্রথম সৃষ্টি। তখন আল্লাহ্তায়ালার হাকীকত গুপ্ত ভান্ডার রূপ নূর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। হাকীকতে মুহাম্মদী সৃষ্টি করে আল্লাহ্তায়ালা যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রতি মুহব্বতের নজর করেন তখন আল্লাহ্তায়ালার ইশ্ক সে নূরে প্রবলাকার ধারণ করে অস্থির হয়ে কাঁপতে থাকে এবং এক অংশ পৃথক হয়ে পড়ে ও কাঁপতে থাকে। আল্লাহ্তায়ালা হাকীকতে মুহাম্মদীর মধ্যস্থতায় রহমতের নজর নিক্ষেপ করায় তা ধৈর্যশীল ও স্থির হয়ে নারী জাতির স্বরূপ প্রকাশ পায়, সেই আকৃতি হলো হযরত ফাতেমাতুয যুহরা (রাঃ) এর। একই ভাবে হাকীকতে মুহাম্মদীর প্রতি নজর ও তাওয়াজ্জুহ দিয়ে আরেক অংশ পৃথক করে ফেললেন এবং তা থেকে হযরত আলী (রাঃ) এর আকৃতি সৃষ্টি হয়। তখন আবার তৃতীয় বার হাকীকতে মুহাম্মদীর প্রতি নজর ও তাওয়াজ্জুহ্ দিলেন, ফলে আরেক অংশ পৃথক হয়ে দু'ভাগ হলো। প্রথম ভাগের দ্বারা হযরত হাসান (রাঃ) এর আকৃতি প্রকাশ হলো যার মাথা থেকে নাভী পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর আকৃতির মত। দ্বিতীয় ভাগ হতে যে সরুত প্রকাশ পেল, তাঁর নাভী হতে পা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর

www.pathagar.org

আকৃতির মত, ইহা হুসেন (রাঃ) এর হাকীকতের আকৃতি। জড় জগতেও এরূপ হয়েছিল।

এভাবে হাকীকতে মুহাম্মদী হতে পাক পানজাতনের অবশিষ্ট চারজনের হাকীকত সৃষ্টি হলো। সৃষ্টির আদি হলো পাক পানজাতনের হাকীকত। আর পাক পানজাতনের সৃষ্টির মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সৃষ্টি সর্ব প্রথম। এ পাক পানজাতনকে সৃষ্টির আসল ও মূল করে সমগ্র সৃষ্টির হাকীকতসমূহ প্রকাশ করেন। সে সব হাকীকত থেকে নুরী ও বাস্তব জগত বিবর্তন ও আদেশে ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়। বিস্তারিত বলা সম্ভব নয়, যারা এ মাকাম অতিক্রম করবেন তারা জানতে পারবেন।

হাকীকতে মুহাম্মদীর ফায়েজ মাহবুবিয়াতে মুহাম্মদীর ফায়েযের মধ্যস্থতায় আসে, আবার হাকীকতে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর ফায়েজ হাকীকতে মুহাম্মদী ছাড়া পাওয়া যায় না।

পাক পানজাতনের হাকীকত ও ফযিলত সম্পর্কে হুজুর (সাঃ) হাদীস বলে গেছেন। যেমন তিনি বলেছেন- "আলী আমা হতে হন এবং আমি তিনি হতে হই।" এর মর্ম হলো রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হাকীকত হতে হযরত আলী (কা) সৃষ্টি হয়েছেন এবং হযরত হাসান (রাঃ) ও হুসেন (রাঃ) সমগঠন ও ঐক্যের দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মত, যারা হযরত আলী (কা) হতে পয়দা হয়েছেন। হযরত আলী (কা) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সন্তান ছিলেন না বা তিনিও হযরত আলী (কা) এর সন্তান ছিলেন না, তবু এরূপ বলার কারণ হাকীকতে হুজুর (সাঃ) থেকে হযরত আলী (কা) সৃষ্টি হওয়ায় এরূপ বলেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন- "ফাতিমা আমার অংশ।" তাঁর আরো সন্তান ছিল, কাউকে তাঁর অংশ বলে উল্লেখ করেন নি। ফাতিমাতুয্ যুহরা (রাঃ) কে অংশ বলার কারণ তিনি হুজুর (সাঃ) এর হাকীকতের নূর হতে সৃষ্টি হয়েছেন। পুরুষদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যেমন সর্বপ্রথম বেহেশতে যাবেন, তেমনি মেয়েদের মধ্যে হযরত ফাতিমা (রাঃ) সর্ব প্রথম বেহেশতে যাবেন ও মেয়েদের সর্দার হবেন। পাক পানজাতনে জগতের ভাল যা কিছু হয়, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সব কিছু তাঁর কাছে সোপর্দ করেন বলে তাঁর আরেক নাম খায়রুন্নেছা। এ জন্য স্ত্রীলোকদের মধ্যে তাঁর স্থান সবার উপরে ও অগ্রগণ্য হবে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলে গেছেন- "আমি আল্লাহ্তায়ালার সৌন্দর্য্যের দর্পণ এবং হাসান ও হুসেন আমার সৌন্দর্য্যের দর্পণ।"

এর চেয়ে প্রশংসা ও মর্যাদা আর হতে পারে না। আল্লাহ্তায়ালার নূরী ও জড় জগত সৃষ্টি করতে যতটুকু জ্ঞান, গুণ, দয়া ও ক্ষমতার দরকার হয়েছে, এবং

www.pathagar.org

তাঁর স্বভাব সৌন্দর্য্যের নিশ্চয়ই আকৃতি আছে, যদিও তাঁর যাতী সত্তার কোন আকৃতি নেই। আল্লাহ্তায়ালার সেই সৌন্দর্যের প্রতিকৃতির আকৃতি হলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আর সেই সৌন্দর্যের নিশ্চয়ই আকৃতি আছে, যদিও তাঁর যাতী সত্তার কোন আকৃতি নেই। আল্লাহ্তায়ালার সেই সৌন্দর্যের প্রতিকৃতির আকৃতি হলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আর সেই সৌন্দর্যের আকৃতির অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ আকৃতির প্রতিকৃতি হলেন, হাসান (রাঃ) এর মাথা হতে নাভী পর্যন্ত এবং হুসেন (রাঃ) এর নাভী হতে পা পর্যন্ত এবং এ দুয়ের সমন্বয় ও ঐক্যের ফলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর আকৃতি। সৌন্দর্য্যের দর্পণবলার কারণ দর্পণোসলের ছায়া পড়ে, আর ছায়া আসল নয়, আবার আসল হতে পৃথকও নয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞান, গুণ ও স্বভাব সৌন্দর্যের ছায়া। সেই ছায়ার ছায়া হলেন হযরত হাসান এবং হযরত হুসেন (রাঃ)।

কোরআনে যে আমানতের কথা বলা হয়েছে তা হলো পাক পানজাতনের অবশিষ্ট চার জনের হাকীকত হাকীকতে মুহাম্মদীর দ্বারা যখন সৃষ্টির সূচনা করেন তখন আল্লাহ্তায়ালা যে হাকীকতে মুহাম্মদীর প্রতি মুহব্বতের নজরে তাকান ও তাঁর মুহব্বত হাকীকতে মুহাম্মদীর প্রতি এল্কা করেন, সেই হুরে রাসূল হলো এ আমানত। হাকীকতে মুহাম্মদীকে প্রেমময় করায় সমগ্র সৃষ্টিতে তা পরবর্তীতে ব্যাপ্ত হয়ে যায়। হুব্বে রাসূল রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রতি প্রেম হলো সেই আমানত, যা আসমান-যমিনের প্রতি পরবর্তীতে পেশ করা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রতি প্রেম করা মানে আল্লাহ্তায়ালার একটি গুণ লাভ করা, আর আল্লাহ্তায়ালাকে প্রেম করা মানে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর একটি গুণ অর্জন করা।

হাকীকতে মুহাম্মদী এবং সে হাকীকত হতে অন্য চার জনের হাকীকত জাহির করায় সমগ্র পাক পানজাতনকে ভাল না বাসলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রতি ভালবাসা পূর্ণ হবে না।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে ভালবাসতে হলে তিনি যা ভালবাসতেন তা ভালবাসতে হবে, যেমন আল্লাহ্তায়ালার দাসত্ব বা বন্দেগী। বন্দেগীকে যে ভালবাসে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কেও সে ভালবাসে এবং আমানত রক্ষা করে। যে বন্দেগী করে না, সে আমানতে খিয়ানত করে নাফ্স শয়তানের ধোঁকায়।

মাহবুবিয়াতে মুহাম্মদীতে যেমন পাক পানজাতনকে দেখানো হয়, এর শান-শওকত বোঝা যায়, শাহরে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর শান, মানব জাতির নেতৃত্ব ও সর্বোচ্চ মর্যাদা জানা ও দেখা যায়, তেমনি এ মাকামে সৃষ্টির সূচনা লগ্ন তথা পাক পানজাতনের সৃষ্টি দেখা ও বোঝা যায়। বিভিন্ন সৃষ্টির হাকীকত জানা যায়।

www.pathagar.org

৯। হাকীকতে আল্লাহু জাল্লাশানুহু

মাহবুবিয়াতে মুহাম্মদীর ফায়েজ লাভ করলে এ ফায়েযে নিজকে নিমগ্ন করলে হাকীকতে মুহাম্মদীর ফায়েজ দান করা হয়। হাকীকতে মুহাম্মদীতে নিমগ্ন হলে হাকীকতে আল্লাহু জাল্লা শানুহু পর্যন্ত উরূয হয়। যখন এ ফায়েজ বান্দার ভাগ্যে নসিব হবে, তখন ফানা দেখা দেবে।

এ মাকামে ফানা এরূপ ভাবে প্রকাশিত হয় যে, যাতী তাজাল্লী হাকীকতে মুহাম্মদীর ফায়েযের নূর, রং, অবস্থা, লক্ষণ ও প্রকৃতিকে ফানা করে দেয়। রং বিহীন, রূপ বিহীন ও প্রকাশ বিহীন নূরে পরিণত হয়ে হাদীস কুদসীতে বর্ণিত- "আমি গুপ্ত ভান্ডার ছিলাম।" অর্থাৎ নিজকে প্রকাশের পূর্বে হাকীকতে মুহাম্মদী সৃষ্টি এবং সেই হাকীকতের মাধ্যমে সকল গুণাবলীসহ মহাবিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে শুধু গুপ্ত ভান্ডার হিসাবে অবস্থান করতেন- সেই অবস্থার উদ্ভব হয়। আল্লাহ্ ছাড়া সকল কিছুর বিলুপ্তি ঘটে। সালিক সেই গুপ্ত ভান্ডার রূপ নূরে বা অনাদি অপরিবর্তনীয় তওহীদে বিলীন বা ফানা হয়ে যায়।

এ মাকামে ফানাতে সালিকের সর্বাংগ যাতী সত্তার নূরে তাজাল্লী হয়ে যায়। বাকা এভাবে হাসিল হয় যে, তিনি যা কিছু দেখেন, যা কিছু জানেন তা আল্লাহ্র হতে দেখেন ও জানেন। সালিকের নড়াচড়াকে আল্লাহ্তায়ালার নড়াচড়া বলে দেখবে ও জানবে। নিজ অস্তিত্বকে ভূলে আল্লাহ্তায়ালার মধ্যে দেখবে ও জানবে। তখন নিজের জ্ঞানে নয় আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে আল্লাহ্তায়ালার পরিচয় বা মা'রিফাত লাভ করবে।

এ জন্য হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন- 'রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহ্তায়ালার মধ্যে অবস্থান করতেন।' রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হাদীসে কুদসীতে বলেছেন- মহান আল্লাহ্তায়ালা বলেন, "আমার বান্দা ইবাদতের দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করতে চায়। নৈকট্য লাভের জন্য মুহব্বতে নফল ইবাদতও করে। এরূপ বান্দাকে আমি ভালবাসি। তারপর যখন তাকে ভালবাসি তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যার দ্বারা সে শুনে, চোখ হয়ে যাই, যার দ্বারা সে চলাফেরা করে।" কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, "আমি তার অন্তর হয়ে যাই, যার দ্বারা সে কথাবার্তা বলে।"

এ মাকামে আল্লাহ্তায়ালার নূরে ফানা হয়ে এ হাদীসে কুদসী অনুযায়ী বাকা লাভ করে। এ মাকামে আসলে ফানাই বাকা অর্থাৎ নিজের জ্ঞান ফানা হয়ে যায়। আল্লাহ্র জ্ঞান ছাড়া কিছু অবশিষ্ট থাকে না। হাদীসে কুদসী অনুযায়ী নিজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে সালিক মনযিল মকসুদে পৌঁছে তরীকতের মাকামের সমাপ্তি ঘটায়। যেহেতু আল্লাহ্তায়ালা অসীম, তেমনি তাঁর জ্ঞানরাজিও অসীম।

www.pathagar.org

তখন বান্দা আল্লাহ্তায়ালার মধ্যে অবস্থান করে যতটুকু সম্ভব জ্ঞান অর্জন করে, কিন্তু তার সমাপ্তি হয় না।

এ অধ্যায়ে তরীকতের এ মাকামাতসমূহের ফায়েযের বর্ণনা ক্বদমীয়া তরীকার ইমাম মাহবুবে রহমানী সৈয়দ আমজাদ আলী শাহ (র) সাহেবকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মৌখিক ও আন্তরিক শিক্ষা যে নূরে ইলাহীর দ্বারা দিয়েছেন, তা কাশফূ'ল আসরার নামক ফারসী পুস্তিকায় উল্লেখ করে গেছেন। তাঁর কাছে নাযিলকৃত ক্বদমীয়া তরীকার সিলসিলার খলিফাগণ তাঁদের অনুসারীদের মৌখিক ও আন্তরিক শিক্ষা দিয়েছেন। এই পুস্তক এ অধম কর্তৃক এ তরীকার সিলসিলার খলিফা হযরত আবদুল (রহঃ) আনসারী (র) ও সর্বোপরি তরীকার ইমাম মাহবুবে রহমানী সাহেবের অনুসারী হিসাবে কাশফুল আসরার অবলম্বনে লিখিত হয়েছে, এ আশায় যাতে আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টি ও হুজুর পাকের কদম মুবারক পেতে পারি। বোঝার সুবিধার জন্য সহজ করার চেষ্টা করেছি, এতে আমার কোন কৃতিত্ব আছে বলে মনে করি না। সকল কৃতিত্ব ও প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার, তাঁর রাসূলের এবং রাসূল (সাঃ) এর নায়েব তরীকার ইমাম সাহেবের। ফায়েজসমূহকে সন্দেহ করে কেউ আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টি ও নিয়ামত হতে বঞ্চিত হবেন না, এগুলো সত্য। সঠিকভাবে অনুসরণ করলে এগুলো লাভ করা যাবে ইনশাআল্লাহ্।

বোঝার সুবিধার জন্য এ মাকামের ফায়েযের পর্যালোচনা দরকার যাতে ইসলাম ও তরীকত সম্বন্ধে ঈমানদারগণের ধারণা স্বচ্ছ থাকে।

ফানাফিল্লাহ ও বাকা বিল্লাহ্তে যে ফানা-বাকা হয় তা তাওহীদের সিফাতী নূরে বিলীন হয়ে এবং তা সিফাতী নূরে বিভূষিত হয়ে নিজকে অস্তিত্ববান করা। আর এ মাকামে ফানা-বাকা হওয়া মানে আল্লাহ্তায়ালার অনাদি আদিম নূরে অর্থাৎ গুপ্ত ভান্ডার রূপ নূরে চিরতরে নিজকে বিলীন করে দেওয়া। যদিও বান্দার দেহ ও বরযখ থাকে, তবু সে অংগ-প্রত্যংগ ও তৎপরতাকে আল্লাহ্তায়ালা নিজের অংগ-প্রত্যংগ ও তৎপরতা বলে ঘোষণা দিচ্ছেন। পার্থক্য শুধু স্রষ্টা ও সৃষ্টির; নিরাকার ও সাকারের, এ ছাড়া কোন পার্থক্য থাকছে না। আল্লাহ্তায়ালার হয়েই তিনি সব কিছু করেন, বলেন ও চিন্তা করেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর এ অবস্থা ছিল। তাঁর উসিলায় তাঁর সৌভাগ্যবান উম্মতদের তাঁর ছায়া হিসাবে এ অবস্থা হতে পারে।

কিন্তু বাকা বিল্লাহতে তাওহীদের সিফাতী নূরে ফানা বাকা হয়ে বান্দা জানতে পারে না যে, তিনি আল্লাহ্তায়ালার সৃষ্ট সিফাতী নূরের তাওহীদে বা একত্বে ফানা-বাকা লাভ করেছেন, আল্লাহ্তায়ালার একত্বে বিলীন হয়ে অস্তিত্ব লাভ

www.pathagar.org

করেছেন, আল্লাহ্তায়ালাতে নয়, তাঁর অনাদি আদিমত্বের একত্বে নয়। সৃষ্ট নূরে বিলীন, আর অনাদি আদিমত্বের তাওহীদে বা একত্বের নূরে বিলীন হওয়া এক কথা নয়। তাই সিফাতী নূরের ফানা-বাকায় বিলায়েতের সম্ভাবনার সূচনা হয়, বিলায়েত লাভ হয় না। আল্লাহ্তায়ালার সিফাতী নূরের তাওহীদে বিলীন হওয়া আর আল্লাহ্তায়ালাতে বিলীন হওয়া এক কথা নয়।

তরীকতপন্থীগণের আরেকটি বিভ্রান্তি হতে সাবধান! পাশ্চাত্য আস্তিক্যবাদী দার্শনিকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেকে আল্লাহ্তায়ালাকে নির্গুণ বলেছেন। তাঁরা আরশের উপর সিফাতী নূরের তাওহীদের একটি অবস্থাকে রূপ, রং ও প্রকাশ বিহীন দেখে লা মাকাম বলে সুমহান সত্তাকে নির্গুণ বলেছেন। গুপ্ত ভান্ডার রূপ অবস্থাকেও এরূপ বলতে পারেন। কেউ হাহুদ, কেউ লা মাকাম বলেছেন। বাকা বিল্লাহ্তে তাওহীদের শেষ পর্যায়ে ও গুপ্ত ভান্ডার রূপ নূরে এ অবস্থার সৃষ্টি হয় বর্ণনার অস্পষ্টতার কারণে এবং এ অধমের জ্ঞানের অভাবে তা সঠিক ধরতে পারিনি। কিন্তু কোন অবস্থাতেই ইসলামী আকীদা, শরীয়ত ও তরীকত অনুযায়ী আল্লাহ্তায়ালাকে নির্গুণ বলা বা মনে করা যাবে না। আল্লাহ্তায়ালার কোন অবস্থাই নির্গুণ হতে পারে না।

পাশ্চাত্য আস্তিক্যবাদী দার্শনিকদের মধ্যে হেগেল আল্লাহ্তায়ালার স্বরূপ সম্পর্কে অনেকটা সত্যের কাছাকাছি। তার মতবাদকে Panentheism বা সর্বধরেশ্বরবাদ বলে। তিনি ইশ্বরকে Absolute বা পরমব্রহ্মা বলে সেই ইশ্বর বা পরমব্রহ্মাকে নির্গুণ বলে ইশ্বরকে ধর্ম নিরপেক্ষ করেছেন। তাদের বিভ্রান্তিমূলক আরবীতে হাহুত বা লা মাকাম বলে সর্বগুণের অধিকারী সুমহান সত্তাকে নির্গুণ বলেছেন। আল্লাহু জাল্লা শানুহুর গুপ্ত ভান্ডার রূপ অর্থাৎ তাওহীদ অবস্থাকে হাহুত, লা মাকাম ইত্যাদি যে যেরূপ বোঝে সেরূপ নামকরণ করতে পারে, কিন্তু কোন অবস্থাকেই নির্গুণ বলা যাবে না। যা অসত্য ও আকীদা বিরোধী ধারণা হবে। এ মুর্খতা ও আকীদা বিরোধী ধারণা হতে আল্লাহ্তায়ালার নিকট পানাহ চাই। পাক পানজাতনের সাথে সম্পর্ক না থাকায় গুপ্ত ভান্ডার নূরের প্রান্ত দেশ পর্যন্ত উরূয করতে গিয়ে তাতে প্রবেশ করতে না পেরে কেউ হয়তো বিভ্রান্তিমূলক ধারণা আনতে পারেন।

সুন্নত জামাতের আকদি মুতাবিক আল্লাহ্তায়ালা নির্গুণ সত্তা নন, তিনি সকল গুণের অধিকারী। এ আকীদা শরীয়ত এবং তরীকত অনুযায়ী মহা সত্য। কারণ আল্লাহ্ সকল গুণের আধার রূপে অবস্থান করছিলেন বা এখনও করেন। শক্তিও একটি গুণ। নির্গুণ কোন কিছু থেকে গুণ প্রকাশ হতে পারে না। এটা বিবেক, আকীদা ও সত্য বিরোধী বিভ্রান্তিমূলক আনুমানিক ধারণা মাত্র। কোরআন-

www.pathagar.org

সুন্নাহর সত্য ছেড়ে কোন মুসলমানের উচিত নয় বিভ্রান্ত পাশ্চাত্য দার্শনিকদের দ্বারস্থ হওয়া ও তাদের সাথে পদচারণা করা।

আল্লাহ্তায়ালা অপ্রকাশিত অবস্থায় শুধু গুপ্ত ভান্ডাররূপে অবস্থান করছিলেন। এখন তিনি প্রকাশ্যরূপে এবং গুপ্ত ভান্ডাররূপে আছেন। তাঁর অনাদি আদিমত্বের গুপ্ত ভান্ডার রূপের পরিবর্তন হয়নি। কেবল তাঁর অনন্ত গুণাবলীর কিছু প্রকাশ হয়েছে। তার গুণরাজি প্রকাশিত হলেও তিনি অপরিবর্তনীয় আছেন। সকল পরিবর্তনশীলতার ঊর্ধ্বে তিনি। এখন তিনি প্রকাশ্য ও গুপ্ত, সৃষ্টির পূর্বে তিনি শুধু গুপ্ত ছিলেন। তাঁর অনাদি গুপ্ত অবস্থা এখনও বহাল আছে। তাঁর অনুরূপ গুণাবলী সৃষ্টি করে তার গুণাবলীর অপ্রত্যক্ষ প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

যদি আল্লাহ্তায়ালার অনাদি আদিম একত্ব রূপ গুপ্ত ভান্ডার রূপ অবস্থাকে নির্গুণ বলা যায়, তবে পাশ্চাত্যের দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের এ কথা বলার সুযোগ হবে যে, আকস্মিকভাবে প্রাকৃতিক নিয়মে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, পরবর্তীকালে তা থেকে গুণসহ বিশ্ব প্রকৃতি সৃষ্টি হয়েছে। কারণ এখনই বলছে যে, আকস্মিক ভাবে মহাশক্তির সৃষ্টি হয়েছে, যা থেকে বিশ্ব প্রকৃতি সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ বিশ্ব প্রকৃতি সৃষ্টির পূর্বেই প্রকৃতি মহাশক্তি সৃষ্টি করে ফেলেছে, এ অদ্ভূত তত্ত্বে বিবেকবান মানুষ কি ভাবে কি রূপে বিশ্বাসী হতে পারে?

আল্লাহ্তায়ালাকে নির্গুণ বলে দার্শনিকগণ বহুবিধ সমস্যায় পড়েছেন, সাথে সাথে বিজ্ঞানীরাও। সত্যে বিশ্বাস করলে সমস্যা থাকে না। সত্য হলো, আল্লাহ্তায়ালার গুণরাজির দুই অবস্থাঃ শক্তি অবস্থা ও বিকাশ অবস্থা। গুপ্ত ভান্ডার রূপ অবস্থা হল শক্তি অবস্থা, আর বিশ্ব প্রকৃতির প্রকাশ হল বিকাশ অবস্থা।

সুন্নত জামাতের আকীদা হলো, শক্তিও আল্লাহ্তায়ালার অন্যতম গুণ অর্থাৎ শক্তি গুণরাজির অন্যতম।

সমস্ত গুণরাজি নিয়ে গুপ্ত ভান্ডার হিসাবে তিনি মহাশক্তিরূপে বিরাজমান ছিলেন। পরবর্তীকালে বিবর্তনের এক পর্যায়ে তিনি আলমে জবরূত বা শক্তি জগত সৃষ্টি করেন। যা থেকে জড় মহাবিশ্ব সৃষ্ট হয়েছে। এটি সৃষ্ট শক্তি, এর সন্ধান বিজ্ঞানীরা পেয়ে একে মহাশক্তি বলছে। বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত তথাকথিত মহাশক্তি সেই গুপ্ত ভান্ডার রূপ অনাদি মহাশক্তির আদেশ ও ইচ্ছায় এ শক্তিজগত সৃষ্ট, যার থেকে পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে। অনাদি গুপ্ত ভান্ডাররূপ মহাশক্তি সৃষ্ট, যার থেকে পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে। অনাদি গুপ্ত ভান্ডাররূপ মহাশক্তি সকল প্রকার পরিবর্তনশীলতা ও সৃষ্টিশীলতা থেকে মুক্ত। কিয়ামতে বস্তু বা জড় জগত শক্তি জগতে বিলীন হবে, শক্তি জগত সিফাতী নূরে বিলীন হবে, সিফাতী

www.pathagar.org

নূর যাতী নূরে বিলীন হবে, যাতী নূরকে তার বস্তু নিচয় সহ গুপ্ত ভান্ডার রূপ নূরে নিজের মধ্যে টেনে নেবেন। এতে গুপ্ত ভান্ডার রূপ নূরের কোন রূপ পরিবর্তন হবে না, যেমন সৃষ্টির সময় পরিবর্তন হয়নি, বিকাশ কালেও হয়নি, সৃষ্ট জগত লয় হলেও সে নূর অপরিবর্তনীয় থাকবে। কারণ সে নূর সৃষ্টিশীলতার পরিবর্তন থেকে মুক্ত।

গুপ্ত ভান্ডারের আদেশে তাঁর অনুরূপ গুণাবলীর দ্বারা হাকীকতে মুহাম্মদী সৃষ্টি হয়ে তাঁর আদেশ ও ইচ্ছায় সৃষ্ট নূরী ও জড় জগত স্তরে স্তরে বিকাশ লাভ করেছে। তাঁর এবং হাকীকতে মুহাম্মদীর গুণাবলীর অনুরূপ গুণাবলী সৃষ্টি করার জন্য সিফাতী নূর সৃষ্টি করেছেন, সিফাতী নূর ও জড় জগতকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য পূর্বেই যাতী নূর সৃষ্টি করেছেন। বিভিন্ন বস্তু নিচয় ও গুণাবলীর মাধ্যমে স্রষ্টার গুণাবলী তাঁর আদেশ ও ইচ্ছায় বিকাশ লাভ করেছে। গুপ্ত ভান্ডার অপরিবর্তনীয় থেকেই সব কিছু সৃষ্টি করে তাঁর গুণাবলী প্রকাশ করেছেন। এভাবে তিনি প্রকাশিত হয়েছেন। তিনি সৃষ্টিতে বিলীন হননি বা হবেন না। সৃষ্টি তাঁর মধ্যে বিলীন আছে প্রকাশের মাধ্যমে, আবার কিয়ামতে তাঁর মধ্যেই বিলীন হবে। সৃষ্টি তাঁর থেকে পৃথক নয়, প্রতিটি কণা, অণু-পরমাণুতে তাঁর উপস্থিতি বিরাজমান। যারা তাওয়াজ্জুহ বোঝে, তাদের কাছে বিষয়টা পরিস্কার হবে মুরীদের গ্রহণযোগ্য ক্ষমতা থাকলে শায়েখের অনুরূপ গুণাবলী মুরীদকে দিতে পারেন, তেমনি আল্লাহ্তায়ালা নূর সৃষ্টি করে তাওয়াজ্জুহর দ্বারা নূরকে স্তরে স্তরে অনুরূপ গুণাবলী দিয়েছেনে।

হাকীকতে আল্লাহু জাল্লা শানুহুর মাকাম বুঝলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কার্যাবলী ও তাঁর বাণীসমূহ সহজেই বোঝা যায়। তাঁর উসিলায় নাযিলকৃত পাক পানজাতনের সাথে সম্পর্কিত তরীকার ইমাম সাহেবগণ এ সকল ফায়েজ লাভ করেন এবং তাদের উসিলায় তাদের অনুসারী উম্মতগণ রিয়াযত, মেহনত ও সঠিক অনুসরণ অনুযায়ী মাকামাতসমূহ অতিক্রম করেন।

এ সর্বশেষ মাকামে ফানা-বাকা হাসিল করে আল্লাহ্তায়ালাতে নিমজ্জিত হওয়ার পর আল্লাহ্তায়ালা যাকে ইচ্ছা বিলায়েতের জন্য মনোনীত করেন। যিনি বিলায়েত পান, তিনি পরী বা শিক্ষক হন। তিনি লোকজনকে ইসলাম ও তরীকত শিক্ষা দেন, নবুওতের কাজ ও প্রচার করেন। এ মাকামে ফানা-বাকা লাভ করলেই বিলায়েতের ফায়েজ পায়, বিলায়েতের ফায়েজ পাওয়া আর বিলায়েত পাওয়া ভিন্ন জিনিস, যেমন নবুয়ত পাওয়া আর নবুওতের ফায়েজ পাওয়া ভিন্ন জিনিস। উম্মতে মুহাম্মদী নবুওতের ফায়েজ পায়, কিন্তু নবুয়ত পাবে না। এ মাকামে ফায়েজপ্রাপ্তদের মধ্য হতেই আল্লাহ্ কাউকে বিলায়েত দান করেন। যিনি

www.pathagar.org

বিলায়েত পান তিনিই আল্লাহ্তায়ালার মনোনীত পীর। মনোনীত এ পীরের মুরীদগণ তাঁকে মৃত্যুর সংকট সময়, শাহরের সংকটে ও পুলসিরাতের সংকটে কাছে পাবে। মুরীদ তাসাওউফের নীতিমালা অনুযায়ী চললে এবং তরীকত অনুযায়ী রিয়াযত-মেহনত করলে এবং এ পীরের সুহ্বতে থেকে তাওয়াজ্জুহ নিলে অতি সহজেই তরীকতের মাকামসমূহ অতিক্রম করতে পারবে এবং স্তরে স্তরে নূরে ইলাহী অর্জন করতে পারবে।

এ মাকাম শেষ করে বাকা হাঁসিলের পর যাকে খুশী আল্লাহ্তায়ালা জনসমুদ্রে মিশে যেতে বলেন। তিনি অজ্ঞাত ভাবেই জনসাধারণের মাঝে বসবাস করেন এবং গুপ্ত পুরুষ হিসাবে বিভিন্ন আধ্যাত্মিক পদে নিযুক্ত থাকেন। তিনি নিজকে গোপন রাখেন, লোকজন হতে ঝামেলামুক্ত থাকেন। স্রষ্টার প্রেমসুধা পান করে দুনিয়াতে থেকেই আখিরাতের অমর জীবনের স্বাদ উপলব্ধি করেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলে গেছেন-'মরবার পূর্বে মরে যাও।' মানুষ মরে গেলে লাশের কোন ইখতিয়ার থাকে না। এ মাকামে ফানা-বাকা লাভ করলে নাফসের সকল ইখতিয়ারের বিলুপ্তি ঘটে, যা নাফ্স মরার নামান্তর। আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছা ও ইখতিয়ার ছাড়া কিছুই থাকে না, যা কিছু করে আল্লাহ্র ইখতিয়ারেই করে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নবুয়ত ও রিসালাত ছাড়াও আল্লাহ্তায়ালার প্রেমাস্পদত্ব ছিল। অন্যান্য নবীগণের আল্লাহ্তায়ালার প্রেমাস্পদত্ব ছিল না। বন্ধুত্ব ও প্রেমাস্পদত্ব ভিন্ন জিনিস। বন্ধুত্ব হলো আমি আল্লাহ্তায়ালাকে ভালবাসব, আল্লাহ্তায়ালা আমাকে ভালবাসবেন। নবুওতের মাকামে উলুল আযম পয়গম্বরগণের বিশেষ করে হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর এ বন্ধুত্ব ছিল। আর প্রেমাস্পদত্ব হলো, আল্লাহ্তায়ালা ভালবেসে যাবেন প্রতিপক্ষ কতটুকু ভালবাসল সেটা বিচার্য্য নয়, ভালবাসার ব্যাপারে আল্লাহ্তায়ালাই অগ্রনী ভূমিকা পালন করেন। এখানে আশেক আল্লাহ্তায়ালা। একে বলা হয় প্রেমাস্পদত্ব। সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জন্য খাস, যা নবুওতের ফায়েযের উপরে। এ প্রেমাস্পদত্ব মাহবুবিয়াতে মুহাম্মদী, হাকীকতে মুহাম্মদী ও আল্লাহু জাল্লা শানুহু -এ তিনটি মাকামে প্রকাশ পেয়েছে। নবুওতের মাকামে নবীগণ আল্লাহ্র বন্ধু হয়েছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নবুওতের মাকামে আল্লাহ্তায়ালার বন্ধু ও প্রেমিক হওয়ার পর খাস করে এ তিন মাকাম অতিক্রম করে তাঁর ও স্রষ্টার মাঝে যে প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের সম্পর্ক তা জেনেছেন। তিনি প্রেমাস্পদ ও স্রষ্টা প্রেমিক। নবুয়ত-রিসালাত তো তিনি পেয়েছেনই, তার উপর তিনি প্রেমাস্পদ এটাই তাঁর বিলায়েত। নবুয়ত-রিসালাত শেষ হয়ে গেলেও তাঁর বিলায়েত কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে। তাঁর উসিলায় তাঁর আওলাদ ও সৌভাগ্যবান উম্মতগণ বিলায়েত পাবেন।

www.pathagar.org

তরীকতের শায়েখ

কৃদমীয়া তরীকার ইমাম সাহেবকে জনাব রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তরীকতের সকল মাকাম তথা ফানাফিশ শায়েখ হতে নবম মাকাম হাকীকতে আল্লাহু জাল্লা শানুহু-এর মাকাম তায় করিয়ে খিলাফত দান করেন। এতে বিলায়েতের ফায়েজ পূর্ণ হয়, কিন্তু বিলায়েত প্রাপ্তি বুঝায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত আলী (কা) স্বপ্নে বা কাশফে বায়আত না করবেন, ততক্ষণ বিলায়েত প্রকাশ পাবে না। তারপর হযরত আলী (কা) তাকে স্বপ্নে বায়আত করেন।

তাই এই তরীকার ইমাম সাহেব তরীকতের সমস্ত মাকাম তায় না করা পর্যন্ত কাউকে খিলাফত দেননি। ইমাম সাহেবকে অনুসরণ করে এ তরীকার শায়েখগণ সমস্ত মাকাম তায় না করা পর্যন্ত খিলাফত দিতেন না। মরহুম মহাত্মা আবদুল মুনীম আনসারী (র) সাহেব পর্যন্ত এ নীতি কঠোরতার সাথে পালন করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নির্দেশ ছাড়া নিজ দায়িত্বে কোন পদক্ষেপ নিতেন না। তিনি ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসে সিলেট শহরে ইন্তেকাল ফরামন। তাঁর মাজার শরীফ সিলেট শহর হতে দশ মাইল দূরে জালালপুর গ্রামের পূর্বভাগে অবস্থিত।

সমস্ত তরীকার বিশেষ করে পাক পানজাতনের সাথে সম্পর্কিত তরীকাগুলোর প্রাথমিক অবস্থায় এই নীতিই ছিল। কালের আবর্তনে তরীকা পুরানো হয়ে ফায়েজ কমে যায়।

তরীকার ফায়েজ কমে গেলে শায়েখের তাওয়াজ্জুহর চেয়ে তাসাওউফের নীতিমালা অনুযায়ী রিয়াযত-মেহনত বেশী করতে হবে, সাথে সাথে সিলসিলার শায়েখও থাকতে হবে। যারা তাসাওউফের নীতিমালা অনুযায়ী রিয়াযত-মেহনত না করে বা শরীয়তের রীতি-নীতি পালন ছাড়াই শুধু শায়েখের তাওয়াজ্জুহতে সব হাঁসিল হয়ে যাবে বলে মনে করে ও দুনিয়াদারীতে মশগুল থাকে, শায়েখের ফায়েজ সে গ্রহণ করতে পারবে না, তরীকতে তার উন্নতি হবে না, নাফ্স প্রবল হওয়ার কারণে শায়েখের তাওয়াজ্জুহ্ তাকে তাছির করবে না। উত্তম রূপে তওবাহ্ করলে এবং বার বার তওবাহ্ করে তওবাহ্তে কায়েম থাকাই এর ঔষধ।

শায়েখের উসিলা ও শিক্ষায় মুরীদের বা আল্লাহ্র পথের যাত্রীর ফায়েজ অর্জন করতে হবে। যেমন মাদ্রাসা বা স্কুল-কলেজ শিক্ষক যত শিক্ষিত ও সুদক্ষ ইউক না কেন ছাত্র তাঁর নির্দেশ মুতাবিক পড়াশুনা না করলে শিক্ষার জন্য উদ্যম প্রচেষ্টা না থাকলে যেমন ফেল করে, তরীকতের সাধন ক্ষেত্রও অনুরূপ।

www.pathagar.org

শায়েখের মাধ্যমে ফায়েজ গ্রহণের জন্য নিজকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আনুগত্য ও অবিরত যিকির করতে হবে।

পূর্বে বলা হয়েছে 'আবদিয়াতের মাকাম অতিক্রম করালে হাকীকতে কা'বার ফায়েজ অতিক্রম করলে তাযকিয়া নাফ্সের ফায়েজ আসে এবং নাফ্স সম্পূর্ণ তাযকিয়া হয়ে যায়। নাফ্স তাযকিয়া হলেই নবুওতের ফায়েযের উপযুক্ত হয়ে যায়। নবুওতের মাকামে ফানা হলেই মানুষ কামিল হয়ে যায়। শ্রেষ্ঠ সাহাবীগণের সাথে সম্পর্কিত তরীকার শায়েখগণ এই মাকাম অতিক্রম করলে মুরীদগণকে শর্তহীনভাবে খিলাফত দেন। এর পূর্বে বাকাবিল্লাহ বা আরো নীচের মাকামে তারা শর্তযুক্ত এজাযত দিতেন, শর্ত হল নাফসের ধোঁকা ও দুনিয়ার স্বার্থ যেন কোন অবস্থায়ই না আসে।

নাফ্স তাযকিয়া হয়েই নবুওতের মাকামে ফানা হতে হয়। ফলে তাযকিয়া নাফ্সের জন্য শয়তান এ সব বুযুর্গের সুরত ধারণ করতে পারে না বলে শয়তান এ সকল বুযুর্গের সুরত বা বরযখ ধারণ করে মৃত্যুর সময় বা অন্য সময় মুরীদকে ধোঁকা দিতে পারে না। নবুওতের মাকামে ফানা হলে তিনি নবীগণের উত্তরাধিকারী হয়ে যান। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ছাড়া যে কোন উলুল আযম পয়গাম্বর বা রাসূলের পায়ের নীচ পর্যন্ত পৌঁছেন এবং তিনি নবুওতের জ্ঞানে জ্ঞানী হন। তিনি শরীয়ত ও তরীকত মারফত লোকজনকে দ্বীন ও আল্লাহ্তায়ালার দিকে আহ্বানের উপযুক্ত হন। এজন্য শ্রেষ্ঠ সাহাবীগণের সাথে সম্পর্কিত তরীকার শায়েখগণ এ মাকামে খিলাফত দান করেন। উলুল আযম পয়গাম্বরদের পায়ের নীচ পর্যন্ত পৌঁছেন বলে এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদীস 'আমার উম্মতের কতক লোক বনী ইসরাইলদের নবীদের মতই।' এ হাদীস অনুযায়ী অনেক সূফী ও আলেম বলে গেছেন যে, বিলায়েত নবুয়তের ছায়া। কিন্তু এতেও যদি মনে করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর নবুওতের ছায়া, তবে সঠিক হয়। আর যদি মনে করা হয় পূর্ববর্তী নবীগণের নবুওতের ছায়া, তবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর বৈশিষ্ট্য বাদ পড়ে। বিলায়েত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর গুণাবলীর ছায়া বললে সঠিক হয়। নবুয়ত-বিলায়েত ফায়েযে অন্যান্য নবী-রাসূলগণ অংশ নিয়েছেন, কিন্তু বিলায়েত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জন্য খাস।

পাক পানজাতনের সাথে সম্পর্কিত তরীকার বুযুর্গগণ গুপ্ত ভান্ডার রূপ অনাদি আদিম নূরে বা তাওহীদে ফানা হয়ে হাদীসে কুদ্সী অনুযায়ী বান্দার অংগ প্রত্যঙ্গের নড়াচড়া, ইচ্ছা ও সব কিছু আল্লাহ্তায়ালার হয়ে যাওয়াকে পরিপূর্ণ মানব বা কামিল-মুকাম্মিল হওয়া বুঝেন। প্রাচীন যুগের বড় পীর সাহেবসহ বহু বুযুর্গের এবং ক্বদমীয়া তরীকার ইমাম সাহেবেরও অভিমত তাই ছিল। অর্থাৎ

www.pathagar.org

হাকীকতে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর মাকাম অতিক্রম না করা পর্যন্ত বিলায়েতের ফায়েযের সমাপ্তি হয় না বা উচ্চতর বিলায়েতের ফায়েজ পাওয়া যায় না। তার উপরও শর্ত আছে যে, বিলায়েতের ফায়েজ পাওয়া আর বিলায়েত পাওয়া ভিন্ন জিনিস। যাকে আল্লাহ্তায়ালা বিলায়েতের জন্য মনোনীত করেছেন, তার চিহ্ন হলো হযরত আলী (কা) তাঁকে বায়আত করবেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পূর্বাহ্নেই তাঁকে সুসংবাদ দিবেন। নবুওতের মাকামে এরূপ হয় না।

এরূপ বিলায়েত প্রাপ্ত বুযুর্গ হলেন আল্লাহ্তায়ালার মনোনীত শায়েখ বা পীর। নবী-রাসূলগণকে যেমন আল্লাহ্তায়ালা সর্বক্ষণ সাহায্য-সহায়তা করেছেন, এরূপ আল্লাহ্তায়ালার মনোনীত পীরকেও তিনি সর্বক্ষণ সহায়তা করেন। এই মনোনীত পীর সাহেবকে মুরীদ মরণকালে, কবরে, হাশরে ও পুলসিরাতের সংকট মুহূর্তে কাছে পাবেন। তিনি তাকে সংকট হতে উদ্ধার করবেন।

হাকীকতে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু পর্যন্ত ফায়েজ লাভ করলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কদম বা পা মুবারকের নীচ পর্যন্ত যাওয়া যায়। নবুওতের মাকামের ফায়েযে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পা মুবারক পাওয়া যায় না, অন্যান্য নবীদের পা মুবারক পর্যন্ত যাওয়া যায়।

যাদের কাশফ তীব্র ও তীক্ষ্ণ যার সাহায্যে মুরীদের কলবের অবস্থা জানতে পারেন এবং সংশোধনের যোগ্যতা রাখেন এবং কুরান-সুন্নাহ্র জ্ঞানে ও আমলে অভিজ্ঞ, তারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পথে লোকদের আহবান করেন আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য, তারা আপন শায়েখের বা বরযখে পূর্ববর্তী কোন শায়েখের এজাযতে পীর বা শায়েখ হতে পারেন। এতে দায়িত্ব থাকে শায়েখের নিজের, আল্লাহ্তায়ালার নয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুকরণে ডাকতে পারলে তিনি নবুওতের কাজ করলেন বলে আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে পুরস্কার দিবেন। নাফ্স শয়তানের ধোঁকায় দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পথহারা হলে পুরস্কারের বদলে তিরস্কার পেতে পারেন। আর হাকীকতে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর মাকাম অতিক্রম করার পর যিনি বিলায়েত পেয়ে আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশে পীর হন, সে দায়িত্ব আল্লাহ্তায়ালার বলে শায়খকে সর্বক্ষণ খাসভাবে সাহায্য করা হয়।

শায়েখ পরিপূর্ণ মাকামাতসমূহের অধিকারী হউন বা অপরিপূর্ণ ফায়েযের অধিকারী হয়ে নিজে অসম্পূর্ণ থাকুন, শায়েখ অনুযায়ী তাঁদের অনুসারী বা মুরদগণের মধ্যে তা প্রকাশ পাবে। কামিল-মুকাম্মিল শায়েখের মুরীদগণের মধ্যে একাধিক কামিল-মুকাম্মিল হবেন। শুধু কামিল শায়েখের মুরীদগণের মধ্যে একাধিক কামিল হবেন।

www.pathagar.org

শায়েখের কামিল হাল থাকলে মুরীদের কামিল হাল প্রকাশ পায়, অসম্পূর্ণ মুরীদের তরক্কী হতে থাকে যদি তাসাওউফ ও তরীকতের নীতিমালা অনুসরণ করেন। শায়েখ যদি নাকিস্ বা অপরিপূর্ণ থাকেন ও ইখলাস পূর্ণমাত্রায় অর্জন করতে না পারেন বা বিনষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, তবে নাকিস মুরিদের হাল বিদূরিত হয়ে যায়। তবে আল্লাহ্তায়ালা যদি কোন মুরীদের উপর বিশেষ দয়া করেন, তবে পীরের অসম্পূর্ণতা মুরীদের হালকে প্রভাবিত করতে পারে না। এরূপ খুব কম মুরীদের ভাগ্যে ঘটে থাকে। তবে যে সকল মুরীদ কঠোরভাবে শরীয়ত ও তাসাওউফের নীতিমালা অনুসরণ করেন তাদের উপরই আল্লাহ্তায়ালার রহমত থাকে।

শায়েখের ও মুরীদের কারো পক্ষেই শরীয়ত, তাসাওউফ ও তরীকতের নীতির বাইরে যাওয়া উচিত নয়, গেলে ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রেহাই নেই। শায়েখের এমন কোন উদাহরণ স্থাপন করতে নেই, যা শরীয়ত ও তরীকত অনুমোদন করে না। নইলে সবার জন্য খারাবী আসবে। শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার ত্যাগ করে দীনতা, হীনতা ও স্রষ্টার দাসত্বের মধ্যে থাকা দরকার। যে শায়েখের তায্কিয়া নাফ্স হয়নি, তাঁর খুব সাবধানে পদক্ষেপ করা উচিত, যাতে নাফ্স শয়তান ডাকাতি করতে না পারে। সর্বদা হৃদয়কে সংরক্ষণ করে ইখলাস ঠিক আছে কিনা দেখতে হবে।

কামিল বা কামিল-মুকাম্মিল শায়েখের মুরীদ হয়েও কেউ যদি শায়েখের সাহচর্যে না থাকে, তাসাওউফ ও তরীকতের রিয়াযত-মেহনত না করে ও সর্বক্ষণ যিকিরে লিপ্ত না থাকে, তবে শায়েখের প্রভাব বেশী পড়বে না। এরূপ অমনযোগী অলস মুরীদ তরীকত দ্বারা বেশী লাভবান হয় না। এখানে শায়েখের করনীয় বেশী কিছু নেই, তাকে উপদেশ দেওয়া ছাড়া। মুরীদ এক বিঘৎ অগ্রসর হলে শায়েখের উসিলায় আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছায় তিনি এক হাত অগ্রসর হবেন। যিনি যতটুকু অগ্রসর হবেন শায়েখের উসিলায় তিনি দ্বিগুণ পথ অগ্রসর হতে পারবেন। যিনি মোটে অগ্রসর হবেন না, বিপরীত চলবেন, তার জন্য শায়েখের উসিলা কি কাজ করবে? তিন বঞ্চিত হবেন।

কেউ কেউ কারামত দেখে বা দোয়া কবুল হবে মনে করে নেয়ায় উন্নতি ও বিপদমুক্ত হওয়ার জন্য শায়েখের দোয়ার প্রার্থী হয়। আবার অনেকে শায়েখের কাছে ভবিষ্যতবাণী তলব করে-যেমন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে কাফির ও মুশরিকগণ দাবী করত। এ সম্মন্ধে আল্লাহ্পাক কোরআনে কি ঘোষণা করেছেন তা অনুধাবন করতে হবে।

www.pathagar.org

আল্লাহ্তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলেছেন- "বল, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত নিজের ভাল-মন্দের উপর আমার কোন অধিকার নেই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানতাম তবে তো আমি প্রভূত কল্যাণ লাভ করতাম, কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না। আমি তো শুধু মুমিন সম্প্রদায়ের সতর্ককারী ও সুসংবাদবাহী।" ৭ঃ১৮৮।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্বন্ধে যদি অদৃশ্যের ব্যাপারে এরূপ হয়, তবে ওলী আল্লাহ্ বা তাঁর নায়েবের অবস্থা কি হতে পারে? তবে আল্লাহ্তায়ালা দয়া করে যাকে ভাল-মন্দের বিষয় জানান, তাই তিনি জানতে পারেন। সেটা ব্যক্তিগত ব্যাপারে, এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা শিরক ও আদবের খেলাপ।

শায়েখ হলেন, নাফ্সকে কিভাবে পবিত্র করে আল্লাহ্তায়ালার মিলন ও দীদার লাভ করা যায়, তা শিক্ষা দেওয়ার শিক্ষক ও তরীকতের শিক্ষাগুরু। তরীকত শিখাতে গিয়ে কিভাবে নিষ্ঠা সহকারে শরীয়ত পালন করতে হয়, তা তাঁর আচার-আচরণ ও জীবন পদ্ধতি দিয়ে বুঝিয়ে দেন। কিন্তু দুনিয়ার উন্নতি ও দুনিয়া কামাই করতে গিয়ে এবং গর্ব-অহংকারে বা পাপের ফলে মানুষ আপদ-বিপদে জড়িত হয়, তা হতে উদ্ধার পাবার জন্য অথবা মেয়ের বিয়ে, নিজের বা ছেলের চাকুরী, ব্যবসা, মামলা-মুকদ্দমা, রোগ-শোকের জন্য শায়েখের নিকট প্রার্থনা বা দোয়া চাওয়ার জন্য যাওয়া উচিত নয়। প্রার্থী এমন এক ব্যক্তির নিকট দুনিয়া চাইল, যিনি দুনিয়াকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জন্য ঘৃণা করেন। এতে সত্যিকার শায়েখ কি সন্তুষ্ট হতে পারেন? শায়েখ মনে মনে বিরক্ত হলেও ফায়েজ থেকে বঞ্চিত হওয়া স্বাভাবিক। অবশ্য রোগ আরোগ্যের জন্য কোন কোন শায়েখকে আল্লাহ্তায়ালা বিশেষ ক্ষমতা দেন, সেটা আলাদা বিষয়।

শায়েখকে মজলিসে তাঁর কথা শোনার জন্য যেতে পারে। যদি শায়েখের উসিলায় আল্লাহ্ তাকে বিপদ মুক্ত করেন, এ নিয়তেও যেতে পারে। তবে তার আরজি শায়েখকে বলার দরকার নেই, উসিলা দিয়ে আল্লাহ্তায়ালার কাছেই বলা উচিত। এতে যদি তার তকদীরে থাকে, ইনশাআল্লাহ্ কাজ হয়ে যাবে। যে তওবাহ্ করে, তার জন্য সাধারণতঃ শায়েখের দোয়া কবুল হয়। তবে শিক্ষকের কাছে ছাত্র যেমন একটি নিয়তেই যায়, যা হলো জ্ঞান অর্জন। তেমনি শায়েখের কাছে একটি নিয়তেই যাওয়া উচিত, তা হলো কিভাবে নিজে পবিত্র হয়ে আল্লাহ্তায়ালাকে পাবে। মনে রাখা দরকার যে, তার মত শায়েখও আল্লাহ্র নিকট অসহায় বান্দা ও আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী। ইচ্ছা করলে সেও শায়েখের মত হতে পারে যেমন ছাত্র শিক্ষক হতে পারে।

www.pathagar.org

অন্ধকার ও নূরের পর্দা

তরীকতের বহু রহস্য যখন উদ্‌ঘাটন করা হচ্ছে, যাতে এর হেয়ালী ও গোপনীয়তার সুযোগ নিয়ে বেশরার ফকির ও প্রতারকগণ দোকানদারী করে মুমিন জনগণকে বিভ্রান্ত করে ঈমান নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে না পারে, সে জন্য অন্ধকার ও নূরের পর্দা সম্পর্কেও হাদীস মুতাবিক আল্লাহ্‌তায়ালা ও রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মধ্যে যে সত্তর হাজার অন্ধকার ও নূরের পর্দা ছিল, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দরকার। কারণ এ পর্দা সকল তরীকতের বিষয়বস্তু।

নূর দ্বারা অন্ধকার পর্দা কাটে, পরে আবার নূরই পর্দা স্বরূপ থাকে। নূর এমন এক পদার্থ যা তাপবিহীন, আলোকময় ও প্রখর উজ্জ্বল। দুধ ও বকের পালকের চেয়েও সাদা, পরে বিভিন্ন রং মিশ্রিত হয়ে আরো সুন্দর ও লাবণ্যময় হয়। নাফসের রং হলো কয়লার মত কাল, নূর হাঁসিল না হলে আমরা চোখ বুজলে যে রূপ অন্ধকার দেখি, সেটাই হলো নাফসের রং। পরে আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকিরে নাফ্‌স বিভিন্ন রং ধরে অবশেষে সাদা নূর হাঁসিল হয়। নূর বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে। অসংখ্য রকম, বিভিন্ন রং ও আকারের নূর আছে। তবে সূফীগণ নূরসমূহকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করেছেন- যথা ১। যাতী নূর ২। সিফাতী নূর ৩। ফি'লী নূর। এ তিন প্রকার নূরই সৃষ্ট। এ তিন প্রকার নূর দ্বারাই তিন স্তরের বস্তু নিচয় ও ফিরিশ্‌তা সৃষ্টি করেছেন এবং সিফাতী নূর দ্বারা সিফাতী নূরের ফিরিশ্‌তা ও বস্তু নিচয় পয়দা করেছেন। ফি'লী নূর দ্বারা জড়জগত সৃষ্টি করেছেন। এ তিন জাতীয় নূর ছাড়া আল্লাহ্‌তায়ালার যাতী সত্তার অনাদি আদিমত্বের নূর আছে, যা রূপ, রং ও প্রকাশ বিহীন অবস্থায় আছে, যা সৃষ্ট নয় এবং সকল প্রকার পরিবর্তনশীলতা হতে মুক্ত, গুপ্ত ভান্ডার রূপে বিরাজমান, যা অযৌগিক নূরে মুহাম্মদী আছে যা সৃষ্টির উৎস।

যাতী নূর আল্লাহ্‌তায়ালার সবচেয়ে নৈকট্য প্রাপ্ত নূর। এ জন্য একে সূফীগণ যাতী নূর বলে থাকেন। যাতী নূরের বৈশিষ্ট্য হলো, এই নূর সিফাতী নূর, সিফাতী নূরের বস্তু নিচয় ও জড় পদার্থের উপর পড়লে তা বিলীন করে নেয় বা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এটা এন্টি পদার্থ। বিজ্ঞানীরা এন্টি পদার্থ আবিষ্কারের জন্য খুবই ব্যস্ত ও পেরেশান অবস্থায় আছে। যাতী নূরও যৌগিক, তবে কম যৌগিক। আল্লাহ্‌তায়ালা অনাদি আদিমত্বের নূরের অনুরূপ বা ছায়া হিসাবে নূরে মুহাম্মদী

www.pathagar.org

সৃষ্টি করে তার সত্তাসার হিসেবে রাসূল করিম (সাঃ)-এর নূরী শরীর সৃষ্টি করলেন। যা নূরে মুহাম্মদীতে প্রদত্ত আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞান, গুণ ও সৌন্দর্য্যের আকৃতি। এজন্য আল্লাহ্তায়ালা হাদীসে কুদ্সীতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে তাঁর সৌন্দর্য্যের দর্পণ বলে উল্লেখ করেছেন। এভাবে নূরে মুহাম্মদী ও নূরে আহমদীর মিলিত প্রকাশ হাকীকতে মুহাম্মদী হলো। হাকীকতে মুহাম্মদীতে তাওয়াজ্জুহ্ দিয়ে প্রেম বা ইশ্ক এল্কা করে পাক পানজাতনের হাকীকত অবশিষ্ট চারজনের সৃষ্টি করেন। জ্ঞান, গুণ, সৌন্দর্য, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হো এবং পাক পানজাতনের অবশিষ্ট চারজনের চেহারা আল্লাহ্তায়ালা মুহব্বতের তাওয়াজ্জুহ্ দ্বারা সৃষ্টি করেন। তাওয়াজ্জুহ্ দ্বারাই নূরে মুহাম্মদীতে জ্ঞান, গুণ, সৌন্দর্য্য, দর্শন, সৃজন, জীবন, ইচ্ছা, বাকশক্তি এবং অস্তিত্ব ইত্যাদি দান করেন। নূরীকণা মিশ্রিত করে যৌগিক করে পাক পানজাতনের হাকীকত সৃষ্টি করেন এবং সৃষ্টির মূল হিসাবে সাব্যস্ত করেন।

আল্লাহ্তায়ালা হাকীকতে মুহাম্মদী হতে অর্থাৎ নূরে মুহাম্মদী হতে আরো যৌগিক করে যাতী-নূরের সৃষ্টি করেন বা প্রকাশ ঘটান এবং পাক পানজাতনের হাকীকতের দ্বারা যাতী নূর মারফত তামাম সৃষ্টির হাকীকত সৃষ্টি করেন। সে সব হাকীকত হতে যাতী নূরের বস্তু নিচয় ও ফিরিশ্তাগণের সৃষ্টি হয়। বীজ হতে ক্রম বিকাশে যেরূপ বৃক্ষ হয়, সেরূপ হাকীকতে মুহাম্মদী ও পাক পানজাতনের হাকীকত সমগ্র সৃষ্টির বীজ স্বরূপ। পাক পানজাতনের হাকীকত হতে যাতী নূরের দ্বারা যে সব হাকীকত সৃষ্টি হয়েছে, তাও সৃষ্টির বীজ স্বরূপ- যা থেকে তামাম নূরী, রূহী ও জড় জগত ধাপে ধাপে ক্রম বিবর্তনে প্রকাশ পেয়েছে বা বিকাশ লাভ করেছে। যাতী নূর কম-বেশী সৃষ্টির বীজ স্বরূপ, আবার ধ্বংস বা বিলীন কেন্দ্রও বটে। আযরাইল (আঃ) ও ইসরাফিল (আঃ) যাতী নূরের ফিরিশতা। যাতী নূরের সংস্পর্শে অন্য নূর বা পদার্থ যাতী নূরে বিলীন হয়ে যায়। সূফীগণ অবশ্য নূরে মুহাম্মদীকেও যাতী নূর বলেন। আল্লাহ্তায়ালার নিকটবর্তী নূর হিসাবে আসলে দু'টো এক নয়, নূরে মুহাম্মদী যাতী নূর হতে কম যৌগিক।

যাতী নূরকে আরো যৌগিক করে আল্লাহ্তায়ালা নিজের বিভিন্ন গুণরাজির নূরীকণা মিশিয়ে সিফাতী নূর সৃষ্টি করেন। যাতী নূর হতে সিফাতী নূর সৃষ্টি করলেও সিফাতী নূরকে এমন কৌশলে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, পরিবর্তিত যাতী নূর সিফাতী নূরের অন্য অংশকে বিলীন করার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে এবং একটি ভিন্ন নূরে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। যদিও এ নূর যাতী নূরের সংস্পর্শে গেলে যাতী নূর একে টেনে নেয়। সিফাতী নূর দ্বারা সিফাতী নূরের বস্তু নিচয় ও

www.pathagar.org

ফিরিশতাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। সিফাতী নূর দ্বারা সিফাতী নূরের ভিন্ন ভিন্ন গুণরাজিকে একত্র করে তওহীদ বা একত্ব সৃষ্টি করা হয়েছে। তার নিম্নে বিভিন্ন গুণরাজি হতে বিভিন্ন বস্তু সকল সৃষ্টি করা হয়েছে। নূর যত যৌগিক হয়েছে, ততই পর্দা বেড়েছে। স্তরে স্তরে যত আকৃতি হয়েছে, ততই পর্দা বেড়েছে।

ফি'লী নূরকে সৃষ্টি করা হয়েছে সিফাতী নূরকে আরো যৌগিক করে। ফি'লী নূর দ্বারা আত্মাদের জগত বা আলমে আরওয়াহ সৃষ্টি করা হয়েছে। ফি'লী নূরের বৈশিষ্ট্য হলো এ নূর প্রবল হলে বান্দা নিজকে অস্তিত্বহীন মনে করে। ফি'লী নূর প্রাণীর জন্য খুব আরামদায়ক। ফি'লী নূরের সাথে শক্তি কণা মিশ্রিত করে জড় জগত সৃষ্টি করা হয়েছে।

যাতী নূর থেকে সিফাতী নূর এবং সিফাতী নূর থেকে ফি'লী নূর সৃষ্টি হলেও কোন নূরের ভান্ডার কমতি হয়ে যায় না। চক্রাকারে সব কিছু ঠিক থাকে। যেমন পদার্থ থেকে শক্তি হয়। উৎসে বিলীন হওয়ার কারণে এরূপ হয়। আবার উৎস থেকে অন্য প্রক্রিয়ায় ফিরে আসে। আর শক্তি থেকে পদার্থ হয়। সিফাতী নূর যাতী নূর হয়। যাতী নূর সিফাতী নূর হয়। এই যে ধাপে ধাপে নূর যৌগিক করা হয়েছে এবং সে সব নূর দ্বারা বিভিন্ন বস্তু নিচয় সৃষ্টি করা হয়েছে, সবই পর্দা। নূরী জগতে নূরের পর্দা, জড়জগতে অন্ধকার পর্দা। জড়জগতে ও নূরী জগতে যে সব জিনিস মনকে আকর্ষণ করে, সেগুলোও পর্দা। কোন দিকে মনকে আকৃষ্ট না করে শুধু আল্লাহ্কে চাইলে, আল্লাহ্র প্রতি সে আকর্ষণ বজায় রাখতে পারলে তাঁর সন্নিকটে পৌছা যায়। জড় জগতে সংসারের আকর্ষণ, নূরী জগতে বেহেশত ও বিভিন্ন নূরী বস্তুর আকর্ষণ, কারামত জাহির হলে কারামতের আকর্ষণ ইত্যাদি সব কিছু পর্দা। যিকিরে, আল্লাহ্র প্রতি প্রেম ও ভয়ে এবং শরীয়তের বিধান পালন করলে পর্দা কাটে, আবার কারো পর্দা বাড়ে, নূর আসতে দেয় না। জড় জগতে সংসারের আসক্তির পর্দা, জড়বস্তুসমূহের পর্দা, ঈমান না আনলে মনে হয় জড়ই সব কিছু, এ সবই পর্দা। নূরী জগতেও বিভিন্ন সৃষ্টি ও সেসবের মোহিনী সৌন্দর্য এবং গুণ ও শক্তির বিচিত্র মনমুগ্ধকর ক্রিয়াকলাপও পর্দা। সাধককে এ সব পর্দায় আবদ্ধ না হয়ে আল্লাহ্কে পেতে হলে সব কিছু মন হতে ছেড়ে রকেটের বেগে অগ্রসর হতে হয়।

'আবদিয়াতের মাকামে তাযকিয়া নাফ্স হলেই কল্বে যাতী নূর আসতে থাকে। নাফ্স দগ্ধীভূত হয়ে যায়। জীবনের নিরপাত্তা আসে। বার বার শরীয়ত বিরোধী কবিরা গুনাহ করতে থাকলে অথবা বুযুর্গীর অহংকার আসলে তাযকিয়া নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যাতী নূর কলবে নিয়ে ঈমানের সাথে মরতে

www.pathagar.org

পারলে জাহান্নামের আগুন তার সংস্পর্শে এলে নিভে যাবে অর্থাৎ বিলীন হবে। সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র মানুষই যাতী নূর কলবে ধারণ করতে পারে। শুধু মাত্র মানুষই স্রষ্টাকে প্রেম করতে পারে। যাতী ও সিফাতী নূরের ফিরিশতারা কেবল আল্লাহ্‌কে ভয় করতে পারে। মানুষ ভয় করে আবার প্রেমও করতে পারে। ভয়ের ফলে আল্লাহ্‌র অফুরন্ত নিয়ামত পেয়ে প্রেম করতে শুরু করে। এখানেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। ফিরিশতারা আল্লাহ্‌তায়ালার অনাদি অযৌগিক নূরে যেতে পারে না, মানুষ সেখানে যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ওছিলায় মানুষ এ শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য পেয়েছে। তার ওছিলায় অন্য সৃষ্টি সিফাতী নূরের অংশ বিশেষ অর্থাৎ জ্ঞান-গুণ লাভ করতে পারে বলে তিনি রহমাতুল্লিল আলামিন হয়েছেন।

সিফাতী নূর লাভ করলে মানুষ আল্লাহ্‌তায়ালার গুণে গুণান্বিত হয়, ইখলাস পয়দা হয়, অল্প ইবাদতেও অধিক সুফল আনে। ফলে পাপের চেয়ে পূণ্য বেশী হয়। সিফাতী নূর এভাবে তাকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিতে এনে সকল পাপ হতে মুক্তি দেয়, পাপ পূণ্যে পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ নাফসের কালিমা নূরে পরিণত হয়।

সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, 'আমার ও আল্লাহ্‌তায়ালার মধ্যে সত্তর হাজার পরদা ছিল।' হাকীকতে যিনি চৈতন্যময় নূর ছিলেন বা আছেন, কিন্তু সৃষ্টি কৌশলরূপে আল্লাহ্‌তায়ালার মকবুল হিসাবে আত্মারূপে আলমে আরওয়াহতে আসেন এবং আদম (আঃ) এর মাধ্যমে মা আমেনার গর্ভে জড়দেহী হিসাবে জন্ম নেন। তখন তিনি ও আল্লাহ্‌তায়ালার মধ্যে সত্তর হাজার পর্দার ব্যবধান রচিত হয়ে যায়। তাঁহার পাক জবানে তাঁর ও আল্লাহ্‌তায়ালার মধ্যে সত্তর হাজার পর্দার কথা বলেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহ্‌তায়ালার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ও মকবুল বান্দা, তাঁর নিশ্চয়ই বিশেষত্ব আছে সাধারণ মানুষ হতে। তাঁরই সত্তর হাজার পর্দা থাকলে জড়দেহী হিসাবে উম্মতের পর্দা নিশ্চয়ই বেশী আছে। নইলেতো তিনি সাধারণ মানুষ হয়ে গেলেন, বিশেষত্ব রইল না। তিনি মানব রূপে জন্ম নিলেও অসাধারণ মানুষ ছিলেন।

শ্রেষ্ঠ আউলিয়াগণ বিশেষ করে কৃদমীয়া তরীকার ইমাম মাহবুবে রহমানী হযরত সূফী সৈয়দ আমজাদ আলী শাহ (র) সাহেব তাঁর রেসেলা 'কাশ্‌ফুল আস্‌রারে'- এ বলেছেন- "আমার আন্তরিক কল্‌বী জ্ঞানে এটাই বুঝেছি যে, সত্তর হাজার পর্দা ছাড়া উম্মতের আরো বিশ হাজার পর্দা আছে। তার মধ্যে দশ হাজার শারিরীক এবং দশ হাজার মানসিক পর্দা। এই পর্দাসমূহ রাসূলুল্লাহ

www.pathagar.org

(সাঃ) এর ছিল না, কেননা তিনি শারিরীক ও মানসিক কালিমা হতে পবিত্র ছিলেন। এই বিশ হাজার পর্দা ফানাফিশ শায়েখের মাকামের অন্তর্গত।"

ক্বদমীয়া তরীকার ইমাম সাহেবের এ কথা যে মহাসত্য, তা তাঁর শ্রেষ্ঠ অনুসারীগণ উপলব্ধি করেন। উম্মত হতে সর্ব বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর শ্রেষ্ঠত্ব শরীয়ত দ্বারা প্রমাণিত হয়। এ ব্যাপারেও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ছিল। উম্মতের পর্দার সঠিক সংখ্যা ইমাম সাহেব এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ অনুসারীগণ দেখে, শুনে ও বুঝেই বলে গেছেন। অন্যেরা ইচ্ছা করলে রিয়াযত-মেহনত করে নিজেরাই বুঝতে পারবেন। সন্দেহ করে দুর্ভাগ্যের শিকার হবেন না।

সত্তর হাজার এবং বিশ হাজার উম্মতের মোট নব্বই হাজার পর্দা বা প্রতিবন্ধক আছে। এগুলো অতিক্রম করতে পারলে আল্লাহ্তায়ালা পর্যন্ত পৌছা যাবে। এ পর্দাগুলো তরীকতের মাকাম অনুযায়ী বিভক্ত। প্রত্যেক মাকাম অতিক্রম করলে সে মাকামের মধ্যে অবস্থিত পর্দাসমূহ অতিক্রম করে সেই মাকাম তায় বা অতিক্রম করতে হয়। এ সত্তর হাজার পর্দার মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর চল্লিশ হাজার অন্ধকার পর্দা এবং ত্রিশ হাজার নূরী পর্দা ছিল। আর উম্মতের ষাট হাজার অন্ধকার পর্দা তার ত্রিশ হাজার নূরী পর্দা আছে। এই নব্বই হাজার পর্দা তরীকতের নয়টি মাকামে এভাবে বিভক্ত, যথা-ফানাফিশ্ শায়েখের মাকামে ত্রিশ হাজার পর্দা বিদ্যমান। এ ত্রিশ হাজার শারিরীক-মানসিক পর্দা কাটাতে পারলে শায়েখের মাকাম অতিক্রম করা যায়। এজন্য এ মাকাম কঠিন। পূর্ণ উদ্যমে এ মাকাম অতিক্রম করতে পারলে অন্যান্য মাকাম অতিক্রম করা সহজসাধ্য হয়ে যায়।

ফানাফির রাসূলের মাকামে দশ হাজার পর্দা, ফানাফিল্লাহ্ত দশ হাজার এবং বাকা বিল্লাহ্তে দশ হাজার এই মোট ষাট হাজার পর্দা হল অন্ধকার পর্দা। বাকাবিল্লাহর মাকাম পর্যন্ত তায় হলে সমস্ত অন্ধকার পর্দা বিদূরিত হয়ে যায়। এর পূর্বে দীল নূরানী হলে কেউ যেন মনে না করে যে তার অন্ধকার পর্দা কেটে গেছে, কারণ নূরের প্রভাবে অন্ধকারও আলোকিত দেখা যায়।

এরপর নূরী পর্দাসমূহ একের পর এক আসতে থাকে। এ ত্রিশ হাজারী নূরী, পর্দা এভাবে বিভক্ত, যথা-'আবদিয়াতে ছয় হাজার, নবূওত বা আম্বিয়া উলূল আযমে ছয় হাজার, মাহবুবিয়াতে মুহাম্মদীতে ছয় হাজার, হাকীকতে মুহাম্মদীতে ছয় হাজার ও আল্লাহু জাল্লা শানুহুতে ছয় হাজার-এই মোট ত্রিশ হাজার নূরী পর্দা হলো। ষাট হাজার অন্ধকার ও ত্রিশ হাজার নূরী পর্দা মিলে সর্বমোট নব্বই হাজার পর্দা হলো।

www.pathagar.org

এ পর্দাসমূহ কাটলে কেবল খালেক ও মখলুকের পর্দা বাকী থাকে। যা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাটেনি, কোন সৃষ্টির কাটবে না। কাটলে সৃষ্টি স্রষ্টার আসনে বসত। পর্দাসমূহ ভালভাবে কাটলে মিলন ও দীদার এখ্‌তিয়ারীতে হয়, নইলে বেইখতিয়ারী থেকে যায়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ওছিলায় এরূপে শেষ পর্যন্ত যাওয়া যায়।

মনে মনে পাপাসক্তি, অন্যের প্রতি হিংসা- বিদ্বেষ এবং সংসারে নিজ স্বার্থ চিন্তায় মানসিক কালিমা বাড়ে, আর পাপ সংগঠিত করলে শারিরীক ও মানসিক কালিমা দু'টোই বাড়ে। কারণ কোন না কোন শারিরীক অংগকে পাপ সংগঠনে কাজে লাগায়। এতে পর্দা ভারী ও মজবুত হয়।

তাওহীদে আস্থা রেখে আল্লাহ্‌তায়ালার উপর ভরসা করে আল্লাহ্ ভিন্ন পদার্থ মন থেকে দূর করে দিতে পারলে, আল্লাহ্‌র চিন্তা ও অনবরত যিকির করলে পর্দা কাটে। যে যাকে ভালবাসে, যার সাথে প্রেম করে, তাঁর চিন্তাই সব সময় করে, তার ইচ্ছাকে নিজের ইচ্ছাতে পরিণত করে। সমভাবাপন্ন না হতে পারলে প্রেম হয় না। আল্লাহ্‌তায়ালাকে ভালবাসতে পারলে ইবাদত, যিকির ও শরীয়ত পালন সহজ হয়ে যায়। ফানাফিশ শায়েখের মাকামে উদ্যম ও পরিশ্রম করে ত্রিশ হাজার অন্ধকার পর্দা না কাটলে এ হাল আসে না পূর্ণ উদ্যম ও অবিরত চেষ্টায় এ ত্রিশ হাজার পরদা দূর করা যায়। ইবাদত ও যিকিরে পর্দা কাটে, গুনাহ করলে বা অহংকার করলে ও মিথ্যা কথা বললে পরদা বাড়ে। সংসারাক্তিতে নিজ স্বার্থে চিন্তাভাবনা করলে মানসিক কালিমা বেড়ে পর্দাসমূহ ভারী ও মজবুত হয়। শরীয়ত বিরোধী কাজ করলে পরিশ্রমে বেশী সুফল দেয় না, শায়েখের তাওয়াজ্জুহ ধরে রাখতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জড় দেহী হিসাবে পর্দাগুলো অপসারণ করে নবুয়ত ও রিসালতের মাকামে যেয়ে হযরত জিবরাঈল (আঃ) এর সাক্ষাত পেতে হয়েছিল, অবশেষে তাঁর হাকীকতের সাথে মিলিত হয়েছিলেন। সেখান হতে আল্লাহ্‌তায়ালার হাকীকতের অনাদি অপরিবর্তনশীল নূরে ফানা-বাকা লাভ করেছিলেন, তখন কেবল খালেক ও মাখলুকের পর্দা বাকী ছিল। আল্লাহ্‌তায়ালার জ্ঞান ও গুণ আকৃতি ধারণ করার কারণে সৃষ্টি ও সৃষ্টির কার্যাবলী স্তরে স্তরে পর্দা স্বরূপ হয়ে গেছে। আকৃতি কোনটা নূর ও কোনটা জড়ের দ্বারা হয়েছে, এসব আকৃতির কার্যাবলীও পর্দা।

www.pathagar.org

দীদার - এ- ইলাহী

মানব জীবনের পরম ও চরম কাম্য হলো দীদার -এ-ইলাহী। শুধুমাত্র এই একটি উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করেছেন যে, তিনি তাদের তাঁর পরিচয় দিবেন, দীদার দিবেন। মানুষ সৃষ্টি করতে গিয়ে নূরী ও জড় জগত সৃষ্টি করেছেন এবং এ দু'টো জগতে যা কিছু আছে তার সব কিছুই মানুষের কাজে লাগিয়েছেন। এভাবে মানুষের প্রতি তাঁর প্রেমের বর্হিপ্রকাশ ঘটিয়েছেন।

দীদার-এ-ইলাহী বুঝতে হলে নিজকে বুঝতে হবে। নিজকে বুঝতে হলে জড় দেহকে, নাফ্সকে ও আত্মাকে বুঝতে হবে। জড় দেহকে বোঝার জন্য ডাক্তারী বিদ্যাই যথেষ্ট, নাফ্সকে বোঝার জন্য এ পুস্তকের তাসাওউফ অধ্যায়ে নাফ্স সম্মন্ধে বলা হয়েছে। জড় দেহ নাফ্সসহ ধবংস হবে, একমাত্র আত্মা চিরস্থায়ী। আত্মাতেই আল্লাহ্তায়ালার গুণরাজি বিকাশ লাভ করে স্রষ্টার দীদারের উপযোগী হয়। আত্মা সম্মন্ধে ধারণায় ভুল হওয়ার কারণে মানুষ অবতারবাদী হয় মানুষকে আল্লাহ্র অংশ মনে করে। আত্মাতে আল্লাহ্তায়ালার গুণাবলী বিকাশ লাভ করায় সে আল্লাহ্তায়ালার বহু ক্ষমতা লাভ করে বলে এরূপ ধারণা হয়। আল্লাহ্তায়ালার অনুগত বান্দা সূফীদের মধ্যে অনেকে এরূপ মনে করে বিভ্রান্ত হন এবং শরীয়ত ও তরীকতকে পৃথক মনে করেন। সে জন্য আত্মা সম্মন্ধে প্রয়োজনীয় আলোকপাত হওয়া দরকার। এরপর দীদার সম্মন্ধে আলোচনা করা হবে।

প্রথমেই জেনে রাখা ভাল যে, আল্লাহ্তায়ালা পরমাত্মা নন। পাক কোরআনে সূরা নূরে আল্লাহ্তায়ালা নিজ পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন যে, তিনি আসমান ও যমিনের নূর। তিনি পরমাত্মা বা সব চেয়ে বড় আত্মা বলে নিজকে উল্লেখ করেছেন বলে কোরআন বা হাদীসের কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই। তাসাওউফ সংক্রান্ত বা অন্য বিষয়ের কোন কোন পুস্তকে এরূপ উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। যারা বলেন, তিনি সাকুল্য সৃষ্টির পরমাত্মা, তারা সঠিক বলেন না। দার্শনিকদের অনেকে এরূপ ভুল বলেন, কারণ দার্শনিকদের কোন সত্যের মাপকাঠি নেই বলে অনুমান, কল্পনা ও যুক্তিতে যা আসে, তাই তারা বলে বা লিখে যায়।

সকল আত্মাই আল্লাহ্তায়ালার আদেশে সৃষ্ট। আত্মা হলো জীবনী শক্তি, জড় ও সুক্ষ্ম দেহকে চৈতন্যময় রাখার শক্তি। শক্তিকে যেমন দেখা যায় না, অনুভব

www.pathagar.org

করা যায়, তেমনি আত্মাকে দেখা যায় না। চরম ক্ষমতাশালীর আদেশকে কেউ দেখতে পারে না, কিন্তু তার প্রভাব অনুভব করতে পারে। সমগ্র সৃষ্ট শক্তি যে সার্বভৌম শক্তির আদেশে উন্মুখ হয়ে প্রতীক্ষমাণ আছে, সেই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিকের আদেশ। সেই আদেশ কত শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। সেই মহাশক্তিশালীর আদেশকে আত্মায় রূপান্তরিত করে তা অত্যন্ত হেয় ও সবচেয়ে নিকৃষ্ট নাফ্সের সাথে বন্ধন যুক্ত করে দেওয়া হয়। সেই বন্ধন হতে মুক্ত হওয়ার জন্য তাঁর দাসত্বকে একমাত্র উপকরণ করা হয়েছে। শুধু ভয় ও প্রেমের সাথে দাসত্ব করতে পারলে সহজেই সে বন্ধন হতে মুক্তি লাভ করে।

আত্মার বাহন যেমন জড় দেহ, তেমনি জড় দেহের অনুরূপ আরেকটি সুক্ষ্ম দেহ আছে, সেটাও আত্মার বাহন। আত্মাসহ সুক্ষ্ম দেহ হতে পৃথক হলেই দেহ লাশে পরিণত হয়। মূল সূক্ষ্ম দেহ বা বরযখ হতে বিভিন্ন শাখা বরযখ হতে পারে, সেগুলোও আত্মা হতে শক্তি লাভ করে। শাখা বরযখ আল্লাহ্তায়ালার এক রহস্য। জাগ্রত অবস্থায় শাখা বা ছায়া বরযখ অন্যত্র দেখা দিলে অনেক সময় আত্মা তা জানতে পারে না।

আত্মা আল্লাহ্তায়ালার অংশ নয়। আল্লাহ্তায়ালার বিভিন্ন গুণাবলী আত্মাতে মিশার ফলে আত্মা আল্লাহ্র শক্তিতে শক্তিমান হয় বলে অনেক সূফী আত্মাকে আল্লাহ্র অংশ বলেছেন, কেউ কেউ স্বয়ং আল্লাহ্ বলেছেন। যা চরম বিভ্রান্তি। তাওহীদে সিফাতী নূরে ফানা হলেও আমিত্ব বোধ বজায় থাকলে এরূপ মনে হয়, তাই বলে এটা সত্য নয়। অজ্ঞতার কারণে বা ফানার ফলে আল্লাহ্তায়ালার অনেক ক্ষমতা আত্মায় মিশার ফলে অনেকে হালের উপর ভুল ইজতিহাদ করে এরূপ কথা বলেছেন। আল্লাহ্তায়ালা স্বয়ং সত্তা বা ওয়াজিবুল অজুদ। স্বয়ং সত্তা কখনও বস্তু সমন্বয় হতে পারে না। যা অবিভাজ্য। সৃষ্টিশীলতা থেকে মুক্ত আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর হাকীকতের গুপ্ত ভান্ডার রূপ অনাদি আদিমত্বের নূর অবিভাজ্য। সে নূর সৃষ্ট নয়, সৃষ্ট নূরই কেবল বিভাজ্য। স্বয়ং সত্তা সমন্বয় বা সংমিশ্রণের অংশ হলে, ওয়াজিবুল অজুদ অংশসমূহের মুখাপেক্ষী হয়ে যেত। যা অংশসমূহের মূখাপেক্ষী তা ওয়াজিবুল অজুদ নয়। সার্বভৌম ক্ষমতা ও গুণাবলীর মালিক আল্লাহ্তায়ালা তাঁর নিরাকার অস্তিত্বকে বিসর্জন দিয়ে সৃষ্টিতে বিকশিত হয়ে বিলীন হয়ে যায় নি এবং সৃষ্টিকে তাঁর অংশী করেন নি। স্বয়ং সত্তারূপে তাঁর নিরাকার অনন্ত অস্তিত্ব বজায় রেখেই আদেশ, তাওয়াজ্জুহ্ ও ইচ্ছার দ্বারা সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। স্বয়ংসত্তা বা ওয়াজিবুল অজুদ এরূপ সত্তাকেই বলা হয়, যা

www.pathagar.org

অন্য কিছুর মুখাপেক্ষী নয়। যা কিছু অন্য কিছুর মুখাপেক্ষী তাই সৃষ্ট, যা সৃষ্ট তা কখনও ওয়াজিবুল অজুদ হতে পারে না।

আত্মাকে যদি আল্লাহ্‌র অংশ বা আল্লাহ্ বলা হয়, তবে সৃষ্টিকে স্রষ্টা বলা হয়। অথচ সৃষ্টির পূর্বে স্রষ্টা থাকা জরুরী, কারণ পূর্ববর্তী অস্তিত্ব না থাকলে পরবর্তী অস্তিত্ব কি ভাবে সৃষ্টি হবে।

আল্লাহ্‌তায়ালা পাক কোরআনে বলেছেন, "আত্মা আমার আদেশ।" আদেশ আদেশদাতা হতে বিচ্ছিন্ন নয়, তাই বলে আদেশ কোন অস্তিত্ব নিলেও তা আদেশদাতা বা আদেশদাতার অংশ হয়ে যায় না। আত্মাকে আল্লাহ্ বা তাঁর অংশ বললে স্রষ্টার এ ঘোষণামূলক কালাম মিথ্যা হয়ে যায়। এরূপ বলা বা মনে করা সম্পূর্ণ ভুল, যা অবতারবাদ বা অংশীবাদের নামান্তর। আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, আল্লাহ্‌তায়ালা স্বয়ং সম্পূর্ণ ও কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন।

অন্যান্য সৃষ্টির মত আত্মা স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়, মুখাপেক্ষী। ক্ষুধা-তৃষ্ণা পেলে খাদ্য ও পানীয়ের মুখাপেক্ষী, রোগ হলে আরোগ্যের মুখাপেক্ষী। পানি, মাটি ও তাপের মুখাপেক্ষী না হয়ে এক মুহূর্ত তার চলে না। আত্মা না থাকলে লাশের জন্য এগুলোর কার হয় না। মৃত্যুর পরও আত্মা আরাম-আয়েশের ও শাস্তি দূর করার এবং পুরস্কার ও আল্লাহ্‌র দয়ার মুখাপেক্ষী থাকে, জীবিত লোকের দোয়া মুখাপেক্ষী থাকে। বেহেশতেও নিত্য নতুন নেয়ামতের ও দীদারের মুখাপেক্ষী থাকবে। দীদার পেলেও নির্দৃষ্ট সময় পর দীদার থাকবে না, এর প্রভাব যখন কিছুটা চলে যাবে, তখন আবার দীদারের জন্য পেরেশান থাকবে। অর্থাৎ সব সময় আত্মা আল্লাহ্‌আলার মুখাপেক্ষী আছে ও থাকবে, কারণ আত্মা অন্যান্য সৃষ্টির মত সর্বাবস্থায় মুখাপেক্ষী আছে ও থাকবে, কারণ আত্মা অন্যান্য সৃষ্টির মত সর্বাবস্থায় মুখাপেক্ষী আছে ও থাকবে। আত্মা কোন অবস্থায়ই অভাবহীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারবে না। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা সর্বাবস্থায় অভাবহীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ।

আত্মাকে স্বয়ং আল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র অংশ মনে করা বিবেক ও আকীদা বিরোধী। এ মতবাদ সম্পূর্ণ বাতিল, মিথ্যা, কুফ্‌রী ও শিরকী মতবাদ। এ সব বাতিলপন্থীগণ 'যত কাল্লা তত আল্লাহ্' বলে নিজেরা ঈমান হারা হয় এবং অন্যদেরও ঈমান হারা করে।

আত্মা আল্লাহ্‌র মুহব্বতে ও ইচ্ছাতে বিলীন হলে তাওহীদে সিফাতী নূরে বিলীন হয়, তখন আল্লাহ্‌তায়ালার গুণে গুণান্বিত হয়, ফলে আল্লাহ্‌র ক্ষমতায় ক্ষমতাবান হয়। তখন বান্দার দ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালা ইচ্ছা করলে দুনিয়ার

www.pathagar.org

কার্যকারণ ছাড়া যে কোন কাজ করিয়ে নিতে পারেন। এ ক্ষমতা পেলেও আত্মা আল্লাহ্ হয়ে যায় না, আল্লাহ্তায়ালার গুণে গুণান্বিত হয় মাত্র। যাতী নূরে ফানা হতে পারলে এ অবস্থা অনেকটা স্থায়ী হয়। আর আল্লাহ্তায়ালার গুপ্ত ভান্ডার রূপ নূরে ফানা হয়ে হাদীসে কুদসী অনুযায়ী বান্দার হাত-মুখ ইত্যাদি আল্লাহ্তায়ালার হাত -মুখে পরিণত হয় বলে যে বর্ণনা করা হয়েছে, এ অবস্থার উদ্ভব হয়। এ অবস্থায় অনেক সূফী বলে ফেলেছেন-যে আমাকে দেখেছে, সে আল্লাহ্তায়ালাকে দেখেছে। এ কথাটার সঠিক অর্থ হলো -যে আমাকে দেখেছে, সে আল্লাহ্তায়ালার গুণরাজির আকৃতি দেখেছে। কারণ আল্লাহ্ পাক তাঁর গুণরাজি হতে পৃথক নন। তাই বলে বান্দা আল্লাহ্ হয়ে যায় না বা আল্লাহ্র অংশ হয় না। এগুলো সাময়িক হালের জযবা অবস্থায় বলা কথা মাত্র। হাল বিদূরিত হলে তাঁরা তওবাহ্ করে নিতেন।

দীদার, মিলন ও নৈকট্যের সময় আল্লাহ্তায়ালার গুণাবলী আত্মাতে গিয়ে মিশে, ফলে আত্মা আল্লাহ্তায়ালার গুণে বা শক্তিতে শক্তিশালী হয়। ভুল না বোঝার জন্য আত্মা সম্বন্ধে বলা হলো। এখন দীদারের আলোচনায় আসা যাক।

মে'রাজে তিনি কি প্রভূকে দেখেছেন? এর জওয়াবে রাসূলুলাহ্ (সাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) এর নিকট বলেছেন যে, "আল্লাহ্তায়ালার কোন আকৃতি নেই যে তাঁকে দেখা যাবে।"

অন্যত্র তিনি সাহাবীদের বলেছেন যে, "তোমরা পরকালে বেহেশতে এরূপ স্পষ্টভাবে আল্লাহ্তায়ালাকে দেখবে যেমন পূর্ণিমার চাঁদকে দেখে থাক।" দু'টো হাদীস সহীহ হলেও আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় পরস্পর বিরোধী। আসলে তা নয়।

হযরত আলী (কা) বলেছেন যে, তিনি আল্লাহ্তায়ালাকে দেখেছেন। ইমাম আবু হানিফা (র) বলেছেন, তিনি বহুবার আল্লাহ্তায়ালাকে দেখেছেন।

আল্লাহ্তায়ালা অসীম ও অনন্ত সত্তা। যা সসীম, সীমাবদ্ধ, ও অনন্ত নয় সেই সসীম সত্তাই আকৃতি ধারণ করতে পারে। অসীম ও অনন্ত হলেই তা নিরাকার হতে বাধ্য। সুন্নত জামাতের আকীদা এই যে, আল্লাহ্তায়ালা অসীম, অনন্ত ও নিরাকার। এ কথা সত্য ও সুনিশ্চিত যে, আল্লাহ্তায়ালা সীমার মধ্যে আবদ্ধ নন, তাঁর কোন আকৃতি নেই, তিনি সর্বত্র বিরাজমান। তাই হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদীস, যাতে তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ্তায়ালার কোন আকৃতি নেই, তা মহাসত্য।

www.pathagar.org

আবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একদিন উপস্থিত সাহাবীগণের নিকট বলেছেন যে, পরকালে মু'মিনগণ পূর্ণিমার চাঁদের মত করে আল্লাহ্তায়ালাকে দেখতে পাবে বা তাদের দীদার নসিব হবে। দেখার প্রশ্ন এলেই সুরত বা আকৃতির প্রশ্ন আসবে, আর আকৃতির প্রশ্ন এলেই সীমাবদ্ধতার প্রশ্ন আসবে। স্রষ্টাকে সসীম, সীমাবদ্ধ ও আকৃতি বিশিষ্ট মনে করলেই ইসলামী আকীদা ধুলিসাৎ হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদীস পরস্পর বিরোধী বলে প্রমাণিত হবে। হাদীসসমূহ মিথ্যা ও পরস্পর বিরোধী প্রমাণ করতে পাশ্চাত্যের অনেক প্রাচ্যবিদ কয়েক শতাব্দী যাবত বিফল প্রচেষ্টায় রত আছে। তারা এতে প্রমাণ খুঁজে পাবে।

আখিরাতে আল্লাহ্তায়ালাকে যদি সুরতে দেখা যায় অর্থাৎ দীদার লাভ হয়, তবে দুনিয়াতে কেন দীদার নসিব হবে না? দুনিয়াতে সুরতশূণ্য অবস্থায় আছেন, আখিরাতে সুরত ধারণ করবেন-এরূপ ভাবাও সঠিক হবে না, কারণ আল্লাহ্তায়ালা পরিবর্তনশীলতার উর্ধ্বে বলে সুন্নত জামাতের আকীদা। এখনও তিনি যেরূপ, আখিরাতেও সেরূপ আকার বিহীন নিরাকার থাকবেন। তবু হাদীস মুতাবিক আখিরাতে নিরাকার থেকেও দীদার নসিব হবে, এখন যেরূপ নিরাকার থাকা সত্ত্বেও ওলীআল্লাহ্গণের দীদার নসিব হচ্ছে।

তিনি নিরাকার, তবু আখিরাতে দীদার নসিব হবে। এটাই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর উপরোক্ত দু'টো হাদীস মুতাবিক মহাসত্য। তবে আকারবিহীন মহান সত্তার দীদার কিভাবে সম্ভবপর এ প্রশ্নের জওয়াব কিছুটা জটিল।

ব্যক্তির জ্ঞানের সাথে সেই জ্ঞান অনুযায়ী গুণ থাকলে সেই জ্ঞান আকৃতি ধারণ করে আমদের মনে। অন্তরচোখ খোলা সূফীগণ তা দেখতে পারেন। এ ব্যাপারে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণ একমত এবং তাদের অনুসারী পাশ্চাত্য দার্শনিকদের অধিকাংশ একমত পোষণ করে। স্তরে স্তরে পর্দা অপসারিত হলে সত্য ও জ্ঞানের বাস্তব আকৃতি দেখা যায়। কারণ সত্য ও বাস্তবে বিশ্বাস করার নাম জ্ঞান। স্রষ্টা ও সৃষ্টির জ্ঞান শ্বাশত, যদি তা সত্য ও বাস্তবের সাথে মিলে, যা কোরআন ও হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে। কোরআন ও সুন্নাহ্ ছাড়া এ দুনিয়াতে কোন সত্য নেই, সত্যের কোন মাপকাঠিও নেই। এ সত্যে দৃঢ় বিশ্বাস করার নাম জ্ঞান।

আল্লাহ্তায়ালার যাতী সত্তার কোন আকৃতি নেই, থাকতে পারে না, কারণ তিনি অনন্ত ও অসীম। তাঁর জ্ঞান সমগ্র সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে আছে, কিন্তু সৃষ্টি

www.pathagar.org

তাঁর জ্ঞানকে পরিবেষ্টন করতে পারে না। প্রতিটি জড় কণা বা এটম যেমন আসমান- জমিনের অর্থাৎ জড় জগতের নমুনা, তেমনি প্রতিটি মানুষ সমগ্র সৃষ্টির নমুনা, সব রকম উপাদান দিয়ে তার দেহ গঠিত, জড় জগতের উপাদান জড় দেহে জাগ্রত এবং নূরী জগতের উপাদান সুপ্ত। স্রষ্টার আদেশ-নিষেধ দ্বারা নাফ্স যত বশীভূত হবে, নূরী জগতের উপাদান তত বিকশিত হবে।

আল্লাহ্তায়ালা সকল জ্ঞান, গুণ, শক্তি ও সৌন্দর্য্যের ভান্ডার বা আধার হিসাবে প্রকাশ বিহীন অনন্ত ও অসীম নূর হিসাবে শুধু মহাশক্তি রূপে অবস্থান করছিলেন। তারপর তিনি তাঁর গুণাবলীর নিদর্শনাদির দ্বারা তাঁর অস্তিত্ব বা অজুদের প্রকাশ ঘটাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি নিরাকার, কিন্তু তাঁর জ্ঞান ও গুণ আকার প্রাপ্ত হয়েছে সৃষ্টিতে। মানুষ আকার প্রাপ্ত, কিন্তু তার জ্ঞান নিরাকার। তাঁর আপন গুপ্ত ভান্ডাররূপ নূরের অনুরূপ নূরে মুহাম্মদী সৃষ্টি করলেন। সেই নূরে মুহাম্মদী তার গুপ্ত ভান্ডার রূপ নূরের ছায়া হলো। আল্লাহ্তায়ালার ছায়া হওয়ার কারণে তাঁর শক্তি ও গুণাবলী ধারণ করার উপযোগী হলো। শক্তি ও সৌন্দর্য যেহেতু তার গুণাবলীর অন্তর্গত সেজন্য আলাদাভাবে তা উল্লেখের প্রয়োজন পড়ে না, তবু বোঝার সুবিধার জন্য উল্লেখ করা হচ্ছে। তারপর সৃষ্টির জন্য যতটুকু গুণাবলী প্রয়োজন তা সে নূরে মনযোগ বা তাওয়াজ্জুহ মারফত দান করেন। তুলনামূলকভাবে রহমানী ও রব্বানী গুণাবলী বেশী দান করেন। তাওয়াজ্জুহ দিয়ে মুরীদকে পীরের গুণাবলী দান করলে যেমন পীরের গুণাবলীর কমতি হয় না বা মুরীদ পীর হয়ে যায় না, স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে, অথচ পীরের গুণাবলী ধারণ করে পীরের অনুরূপ গুণে গুণী হয়। তেমনি আল্লাহ্তায়ালা ও নূরে মুহাম্মদীর সম্পর্কটা তদনূরূপ হয়ে যায়।

নূরে মুহাম্মদীর সত্তাসার হিসাবে তাওয়াজ্জুহ মারফত সেই নূরে মুহাম্মদীর উপাদান দ্বারা যে নূরী সুরত প্রকাশ করেন তাঁকে নূরে আহ্মদী বলা হয়। এই নূরে মুহাম্মদী ও নূরে আহ্মদীর মিলিত প্রকাশকে হাকিকিতে মুহাম্মদী বলা হয়, যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। হাকীকতে মুহাম্মদীতে তিনি বিশেষ ভাবে তার প্রেম তাওয়াজ্জুহ মারফত এল্কা করেন। সমস্ত গুণাবলী হতে এ প্রেম এত বেশী এল্কা করেন যে, হাকীকতে মুহাম্মদী এতে অস্থির ও আল্লাহ্ প্রেমে পেরেশান হয়ে যায়। আল্লাহ্তায়ালার নিজের প্রতি যে প্রেম আছে, সেই প্রেম হাকীকতে মুহাম্মদীকে দান করেন। এ অস্থির অবস্থায় তাঁর সবর নামক গুণটি তাওয়াজ্জুহ

www.pathagar.org

মারফত দান করে সেই অস্থির অবস্থার অবসান ঘটান। সবর ও পরবর্তীতে জড় জগতে নাফ্স সৃষ্টি না করলে মানুষ ও জীবজানোয়ার আল্লাহ্ প্রেমে খাওয়া-দাওয়া ও কাজ-কর্ম ছেড়ে দিয়ে দিশেহারা অস্থির অবস্থায় থাকত।

হাকীকতে মুহাম্মদীতে প্রেম এল্কা করেই পাক পানজাতনের হাকীকত সৃষ্টি করেন। পাক পানজাতনের হাকীকত আল্লাহ্তায়ালার খাস মুহব্বতের সৃষ্টি। স্রষ্টা নিজকে নিজে যে মুহব্বত করতেন সেই মুহব্বত দ্বারা পাক পানজাতনের হাকীকতের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সেই পাক পানজাতন দ্বারা সৃষ্টির হাকীকতসমূহ সৃষ্টি করে সৃষ্টির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। হাকীকতে মুহাম্মদীতে তাঁর নিজের প্রতি নিজে যে প্রেম করতেন বা করেন তাই তাওয়াজ্জুহ্ মারফত এল্কা করেন। ফলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে নিজের মতই ভালবাসেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রতি আল্লাহ্তায়ালার মুহব্বত সৃষ্টির প্রতি আমানত স্বরূপ হয়ে যায়। কোরআনে যে আমানতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলো হুব্বে রাসূল (সাঃ)।

আল্লাহ্তায়ালার গুপ্ত আন্ডার রূপ অনাদি আদিম নূরের অনুরূপ নূরে মুহাম্মদী সৃষ্টি করায় চিরন্তন একটি পর্দা সৃষ্টি হলো, তা হলো স্রষ্টা ও সৃষ্টির। একজন সৃষ্টি করেছেন, অন্যজন অনুগ্রীহিত। গুপ্ত ভান্ডারের কোন উপকরণ দ্বারা নূরে মুহাম্মদী সৃষ্টি করলে তা আল্লাহ্তায়ালার অংশ হয়ে যেত, এতে এ পর্দাকে গুণাবলী অর্জন করে অপসারণ সম্ভব হতো এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টিতে পার্থক্য থাকত না। স্রষ্টার আদেশ দ্বারা নূরে মুহাম্মদী সৃষ্টি করে তাওয়াজ্জুহর দ্বারা তার গুণরাজি এল্কা করায় সৃষ্টির পক্ষে স্রষ্টার সাকুল্য পর্দা বিশেষ করে স্রষ্টা ও সৃষ্টির পর্দা অপসারণ করা সম্ভব নয়।

হাকীকতে মুহাম্মদী সৃষ্টির পর সেই হাকীকতের মধ্যস্থতায় পাক পানজাতন সৃষ্টি করে নূরে মুহাম্মদীর উপকরণ, তাঁর আদেশ ও তাওয়াজ্জুহর দ্বারা যাতী নূর সৃষ্টি করেন এবং সেই যাতী নূর দ্বারা পাক পানজাতনের হাকীকতের মধ্যস্থতায় অসংখ্য হাকীকত সৃষ্টি করেন এবং যাতী নূরের ফিরিশতা ও বস্তু নিচয় সৃষ্টি করেন। আল্লাহ্তায়ালার গুণাবলী যা তাওয়াজ্জুহর মাধ্যমে নূরে মুহাম্মদীতে এসেছিল, তা সুপ্ত হিসাবে যাতী নূরে আছে। বিভিন্ন গুণাবলীর পরিমাণ নির্দৃষ্ট করে বিভিন্ন নূরীকণা মিশ্রিত করে নূরে মুহাম্মদী হতে যাতী নূরকে আরো যৌগিক করেন। যদিও সূফীগণ দু'টোকেই যাতী নূর বলেন। দু'টোকেই যাতী নূর বলার কারণ অন্য যে কোন নূর বা পদার্থ এ নূরদ্বয়ের সংস্পর্শে এলে তা বিলীন হয়ে যায় বা ধ্বংস হয় অর্থাৎ যাতী নূর তা টেনে নেয়। হযরত জিবরাঈল (আঃ) সিফাতী নূরের সৃষ্ট বলে মে'রাজে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাথে সিফাতী নূরের

www.pathagar.org

শেষ সীমানায় এসে বলেছিলেন যে, আরো অগ্রসর হলে তিনি জ্বলে যাবেন। এ জন্য এবং আলাহতায়ালার নিকটবর্তী নূর বলে এ নূরদ্বয়কে যাতী নূর বলা হয়, যদিও এ নূরদ্বয় সৃষ্ট। কিয়ামতে এ নূরও আল্লাহ্তায়ালা তাঁর যাতী সত্তার গুপ্ত ভান্ডার রূপ নূরে টেনে নেবেন।

যাতী নূরের দু'টো ধাপ শেষ হওয়ার পর যাতী নূরের উপাদান দ্বারা সিফাতী নূর সৃষ্টি করেন এবং সিফাতী নূরে যাতী নূরের সুপ্ত সিফাতী নূরের কণাসমূহের বিকাশ ঘটান এবং যাতী নূর হতে বেশী যৌগিক করেন। সৃষ্টিতে তার গুণাবলী যা দিয়েছেন, অর্থাৎ তা মিলিত ও মিশ্রিত একাকার করে যাতী নূরের উপাদান দ্বারা গুপ্ত ভান্ডার রূপ নূরের মত তার গুণরাজীর তাওহীদ সৃষ্টি করেন, যা তাঁর গুণাবলীর অজুদ হয়ে যায়। সিফাতী নূরের দ্বারা সিফাতী নূরের ফিরিশতা ও বস্তু নিচয় সৃষ্টি করেন।

সিফাতী নূরের ধাপের পর আসে ফি'লী নূরের স্তর। সিফাতী নূরকে আরো যৌগিক ও বৈশিষ্ট্যময় করে ফি'লী নূর সৃষ্টি করা হয়। ফি'লী নূর দ্বারা এ নূরের ফিরিশতা, আত্মা ও জড় জগত সৃষ্টি হয়েছে।

ফি'লী নূরের ধাপের পরই শক্তি জগত। ফি'লী নূরের কণার সাথে শক্তি কণা মিশ্রিত করে পরমাণু সৃষ্টি করা হয়েছে। পরমাণু হতে জড় জগত সৃষ্টি হয়েছে। সমগ্র সৃষ্টি তাঁর জ্ঞান ও গুণের নামাবলী। দীদার বোঝার সুবিধার জন্য প্রধান প্রধান ধাপগুলো উল্লেখ করা হলো।

সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞান ও গুণের অভিব্যক্তি, আর মানুষ হলো সেই সৃষ্টিতে প্রদত্ত আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞান, গুণ ও সৌন্দর্যের মিলিত আকৃতি। আল্লাহ্তায়ালার মত তাঁর গুণাবলীও অনন্ত বলে তাঁর সমস্ত গুণাবলীর কোন আকৃতি হতে পারে না। তাই কোন মাখলুক তাঁর সমস্ত গুণাবলী পেতে পারে না বা সমস্ত গুণাবলীর কোন সুরত বা আকৃতি হতে পারে না। তাঁর পূর্ণাঙ্গ গুণাবলীর কোন দৃষ্টান্ত নেই। মানুষকে স্রষ্টা সমগ্র সৃষ্টির নমুনা স্বরূপ করেছেন, সৃষ্টির সব রকম উপাদান প্রকাশ্য ও সুপ্ত ভাবে দিয়েছেন। জড়ের মধ্যে নূর সুপ্ত ভাবে আছে, তেমনি নূরের মাঝেও জড় সুপ্ত ভাবে আছে, এমন ভাবে জড় ও নূরী কণিকাকে যৌগিক করা হয়েছে। মানুষকে জড় দেহ দেওয়া হয়েছে এবং জড় জগত সর্ব নিম্ন ধাপে বা স্তরে আছে। আল্লাহ্তায়ালার দীদার লাভ করতে হলে সর্ব নিম্ন ধাপ হতে সর্বোচ্চ ধাপে যেতে হবে। এজন্যই তরীকতের সাধনা। পূর্ববর্ণিত ফানাফিশ শায়েখের মাকাম হতে আল্লাহু জাল্লা শানুহুর হাকীকতে যেতে হবে।

www.pathagar.org

নূরে মুহাম্মদী নূরী জগত ও জড় জগতকে পরিবেষ্টন করে আছে। আবার আল্লাহ্তায়ালা একই সাথে নূরে মুহাম্মদী এবং প্রতিটি নূরী ও জড় কণিকাকে পরিবেষ্টন করে আছেন।

আল্লাহ্তায়ালার যাতী সত্তা অসীম ও অনন্ত হওয়ার কারণে কোন আকৃতি নেই। কিন্তু তাঁর সৃষ্টি আকার প্রাপ্ত। নূরী জগতে ও জড় জগতে তাঁর সৃষ্টি বিভিন্ন জ্ঞান ও গুণাবলীর জন্য বিভিন্ন আকার প্রাপ্ত। সেগুলো আল্লাহ্তায়ালার বিভিন্ন গুণের ও জ্ঞানের আকৃতি। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলে গেছেন- 'আমি আল্লাহ্তায়ালার সৌন্দর্য্যের দর্পণ।' অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞান ও গুণের সৌন্দর্যের আকৃতি। পূর্বের আলোচনায় বোঝা গেছে যে, সৃষ্টিতে আল্লাহ্তায়ালা যে জ্ঞান ও গুণ প্রয়োগ করেছেন তারই মিলিত আকৃতি ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর। যারা তরীকতের শেষ মাকাম হাকীকতে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর মাকামে ফানা-বাকা লাভ করেন, তাঁরাও রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর ছায়া হিসাবে আল্লাহ্তায়ালার সৃষ্টির মধ্যে প্রদত্ত জ্ঞান ও গুণের সৌন্দর্য্যের আকৃতি হয়ে যান। আল্লাহ্তায়ালা নিজেই হাদীসে কুদসীতে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, বান্দার হাত, মুখ, কান ইত্যাদি তাঁর হাত, মুখ, কানের আকৃতি হয়ে যায়। আল্লাহ্তায়ালার হাত, মুখ, কান, পা, ইত্যাদি সব কিছু তাঁর গুণ, কারণ তিনি তো নিরাকার; তার যাতী সত্তার কোন আকৃতি নেই। তখন যদি কেউ মনে মনে তাঁকে আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞান গুণের আকৃতি মনে করে তাঁকে আল্লাহ্তায়ালা বলে, তবে তা একেবারে বেঠিক হবে না। বেঠিক ও মিথ্যা হবে, যদি আল্লাহ্তায়ালাকে আকারধারী মনে করে সেই আকৃতির অনুরূপ আকৃতি মনে করে অথবা স্বয়ং ওয়াজিবুল অজুদ বা স্বয়ং সত্তা বলে মনে করে। কারণ এরূপ শরীরধারী আত্মা কখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ বা মুখাপেক্ষীহীন হতে পারে না। যা এ অধ্যায় পূর্বেই আত্মা সম্পর্কে বলা হয়েছে। এরূপ হওয়া মানে আল্লাহ্তায়ালার স্বভাবের গুণরাজির রঙে রঞ্জিত হওয়া বোঝায়। আল্লাহ্তায়ালা যেহেতু তাঁর গুণরাজী হতে পৃথক নন, সে অর্থে তাঁকে আল্লাহ্তয়ালা মনে করলে বেঠিক হবে না। তবে সর্ব অবস্থায় শরীয়তের আদব এবং আল্লাহ্তায়ালার প্রতি আদব ও বন্দেগী বজায় রাখতে হবে। আর যিনি এ গুণরাজী লাভ করেন, তিনি নিজকে সর্বদা দাস রূপে ভাবেন এবং নিজকে সবার চেয়ে নিকৃষ্ট মনে করেন। এরূপ আল্লাহ্তায়ালার গুণরাজীর অধিকারী বান্দাকে আল্লাহ্তায়ালা বলা বা মনে করা বাস্তবের বিপরীত। বরং এটাই বাস্তব যে, সর্ব অবস্থায় আল্লাহ্তায়ালা প্রভূ এবং আত্মা দাস। এ দাসত্বের জ্ঞান পূর্বাহ্নে আবদিয়াতের মাকামে দান করেই সেই বান্দাকে ধীরে ধীরে তাঁর গুণে গুণান্বিত করেন।

www.pathagar.org

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, হাকীকতে মুহাম্মদীতে অর্থাৎ সৃষ্টিতে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর নিজের প্রতি যে প্রেম ছিল, সেই প্রেম এল্কা করেন। মানুষ যখন রাসূলুলাহ্ (সাঃ) কে অনুসরণ করে তাযকিয়া নাফ্স হয়ে নবুওতের ফায়েজ লাভ করে, তখন আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞান ও গুণের আকৃতি ধারণ করে অর্থাৎ তাঁর জ্ঞান ও গুণের আকৃতি শরীরের সাথে এক হয়ে যায়। আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞান ও গুণে রঞ্জিত হয়ে যায়। তখন যাতী নূরের তাজাল্লী হতে থাকে। সিফাতী নূর দ্বারা যে সব গুণাবলী অর্জন করেছে যাতী তাজাল্লীর দ্বারা সে সব গুণাবলীকে স্থায়ী ও সুস্থির করে দেয়, সে সব গুণাবলী স্থায়ীত্ব ও স্থিতি লাভ করে। সিফাতী নূরকে যাতী নূর টেনে নেয়। তখন যাতী নূর ও সিফাতী নূরে আল্লাহ্তায়ালা প্রদত্ত জ্ঞান ও গুণাবলী এবং কামালিয়াতের সমষ্টি হিসাবে একটি সুরত প্রকাশিত হয়. যাকে শহুদিয়া অজুদিয়ে যাতী বলা হয়। আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য প্রাপ্ত বলে যেমন যাতী নূর বলা হয়, এ যাতী নূরের সুরত অধিকতর নৈকট্য প্রাপ্ত বলে শহুদিয়া অজুদিয়ে যাতী বলা হয়। জ্ঞান, গুণ বা কামালিয়াতের সমষ্ঠির আকৃতি মানুষের আকৃতিতে প্রকাশ পায়। কেউ একে আল্লাহ্তায়ালা বলেন, কেউ কেউ বলেন আল্লাহ্তায়ালার হাকীকতে ফানা-বাকা প্রাপ্ত কোন আউলিয়ার সুরত বা আকৃতি। একে অনেকে আল্লাহ্তায়ালার দীদার বলে মনে করেন। কারণ এতে মিলন বা ওসলের ফলে নবুওতের সুক্ষ্ম তত্ত্বাদি প্রাকশ হতে শুরু করে। আসলে এ সুরত আল্লাহ্তায়ালার নয় বা কোন আত্মারও নয়। বরং আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞান, গুণ ও কামালিয়াতের একটি ঐক্যবদ্ধ সুরত অথবা অবস্থা, যা বান্দার আত্মার সাথে মিলিত হয়। ওসলের ফলে আত্মাকে ঐশ্বর্য্যশালী করে। যাতী নূরের তাজাল্লীর ফলে এরূপ হয়।

নবুওতের মাকামে আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞান ও গুণের আকৃতি ও মানুষের জড় দেহের আকৃতি এক হয়ে বান্দা কামিল বা পূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু রাসূলুলাহ্ (সাঃ) কে অন্যান্য রাসূলগণ হতে এমন কি সমগ্র মানবমন্ডলী হতে বেশী বৈশিষ্ট্যময় করা হয়েছে, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তাহলো স্রষ্টার নিজের প্রতি নিজের যে প্রেম ছিল সেই মুহব্বত হাকীকতে মুহাম্মদীর প্রতি তাওয়াজ্জুহ মারফত এল্কা করে পাক পানজাতন সৃষ্টি করেন। তা 'তরীকতের মাকামসমূহ' অধ্যায়ে হাকীকতে মুহাম্মদীর ফায়েজ বর্ণনা কালে বলা হয়েছে। রাসূলুলাহ্ (সাঃ) কে ভালবেসে বা মুহব্বত করে একজন নবুওতের মাকাম তায় করতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা যে রাসূলুলাহ্ (সাঃ) কে মুহব্বত করেন, সে মুহব্বতের আকার-প্রকার কি, তা নবুওতের মাকামে বা তার নিম্নবর্তী মাকামে নেই। আল্লাহ্-

www.pathagar.org

তায়ালার এ মুহব্বত রাসূলুলাহ্ (সাঃ) এর জন্য খাস-উল-খাস। এ ফায়েজ মাহবুবিয়াতে মুহাম্মদী, হাকীকতে মুহাম্মদী ও হাকীকতে আল্লাহু জাল্লা শানুহুর মাকাম ত্রয়ে বিভক্ত। এ মাকাম ত্রয় তায় না করলে আল্লাহ্ ও রাসূলুলাহ্ (সাঃ)কে ভালবাসা পূর্ণ হয় না এবং সৃষ্টিতে প্রদত্ত আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞান ও গুণের সম্পূর্ণ উপলব্ধি হয় না। বান্দা যখন রাসূলুলাহ্ (সাঃ) এর উসিলায় এ মাকাম ত্রয় সম্পূর্ণ অতিক্রম করে, তখন সৃষ্টিতে প্রদত্ত আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞান ও গুণের আকৃতির সাথে মিশে যায়। তখন হাকীকতে মুহাম্মদীতে আল্লাহ্তায়ালা যে নিজকে নিজে মুহব্বত করতেন এবং সেই মুহব্বত তাওয়াজ্জুহ মারফত এল্কা করেছিলেন, বান্দা সেই মুহব্বত বা আমানত নিয়ে আল্লাহ্তায়ালার কাছে প্রত্যাবর্তন করে। আল্লাহ্তায়ালা তখন নিজকে ভালবাসতে গিয়ে অর্থাৎ তাঁর গুণরাজীকে ভালবাসতে গিয়ে বান্দাকে ভালবাসেন এবং সে মুহব্বত এত প্রবল যে, বান্দার হাত, মুখ, পা ইত্যাদিকে তার হাত, মুখ, পা হয়ে যায় বলে ঘোষণা করেন। আল্লাহ্তায়ালার আকৃতি নেই, তবু পাক কোরআনে তার হাত, পা ও মুখের কথা বলেছেন, তা হলো তার গুণের ও জ্ঞানের আকৃতি। আশা করি সালিকগণ ও পাঠকগণের দীদার সম্পর্কে একটা ধারণা হয়েছে। ইহা হলো আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞান, গুণ ও সৌন্দর্যের মিলিত আকৃতি দর্শন।

বাকাবিল্লাহ্র মাকামেও সুন্দর মানবাকৃতি দেখা যায়। সূফীগণ একে শহুদিয়া অজুদিয়ে সিফাতী বলে থাকেন। অবশ্য ভুলক্রমে কেউ কেউ একে অজুদিয়ে যাতী মনে করেছেন, কেউ কেউ আল্লাহ্তায়ালা মনে করেছেন, কেউ কেউ আল্লাহু জাল্লা শানুহুর হাকীকতে ফানা-বাকা প্রাপ্ত ওলীর আকৃতি বা সুরত মনে করেছেন, কেউ বা নিজের মিসায়েলী আকৃতি বলে মনে করেছেন। যারা শহুদিয়া অজুদিয়ে যাতী মনে করেছেন, তারা ভুল করেছেন। যারা এ আকৃতিকে আল্লাহ্তায়ালার যাতী সত্তার আকৃতি মনে করেছেন, তারাও ভুল করেছেন। কারণ যাতী সত্তার কোন আকৃতি নেই, তবে তাঁর জ্ঞান ও গুণের আকৃতি মনে করে যারা আল্লাহ্তায়ালার দীদার বলেছেন, তাদের নিয়ত ও মনোভাব সঠিক হলেও উক্তি করা সঠিক নয়, কারণ এতে যারা এর সঠিক অর্থ না জানে তারা যাতী সত্তার আকৃতি আছে বলে মনে করবে। এতে করে তাদের আকীদা বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তরীকত শরীয়ত হতে আলাদা মনে করবে। এসব বিভ্রান্তির জন্য এসব লাগামহীন উক্তিই দায়ী।

www.pathagar.org

আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্ব বা অজুদ জড় জগত ও নূরী জগত দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। জড় জগত নিত্য পরিবর্তনশীল এবং ধ্বংসশীল। এর উৎস মূল রয়েছে ফি'লী নূরের মাধ্যমে সিফাতী নূরে।

আল্লাহ্তায়ালার বিভিন্ন গুণাবলী হতে মহাবিশ্বের বিভিন্ন বস্তু বিকাশ লাভ করেছে। এর সমস্ত উৎসমূল সিফাতী নূরে অবস্থিত। সেই সিফাতী নূরের স্তরে সিফাতী নূর ভিন্ন কিছু নেই। এক ছাড়া দ্বিতীয় কিছু নেই। সালিক প্রকৃতিপুঞ্জসহ সিফাতী নূরে নিজকেও বিলীন দেখতে পায়। এই যে একত্ব, তাকে বলা হয় তওহীদে অজুদিয়ে সিফাতী। প্রথমতঃ জড় ও প্রাণী জগত অন্তর চোখে বিলুপ্ত হয়ে যায়। একত্বের নূরে বা তাওহীদের নূরে নিজেও ফানা হয়ে যায়। জড় ও প্রাণী জগতে আল্লাহ্তায়ালার ভিন্ন ভিন্ন গুণাবলী হতে যে সব বিভিন্ন সত্তা অস্তিত্ব লাভ করেছিল, সেই গুণাবলী একত্র হয়ে সিফাতী নূরে পর্যবশীত হয়ে সালিকের উপর তাজাল্লী করতে থাকে। তখন সালিক আল্লাহ্তায়ালার গুণে গুণান্বিত হয়ে নিজকেই আল্লাহ্তায়ালা বলে মনে করতে থাকে, যতক্ষণ অস্তিত্ব বোধ থাকে।

সালিকের অস্তিত্ব বোধ বিলুপ্ত হলে দেখে ও উপলব্ধি করে যে, সব কিছু আল্লাহ্তায়ালা হতে সৃষ্টি হয়েছে। অবশেষে দেখে ও উপলব্ধি হয় যে, এক আল্লাহ্ ছাড়া কিছুই নেই। একে বলা হয় ওসলে অজুদিয়ে সিফাতী। অর্থাৎ তাওহীদের সিফাতী নূরে বান্দার মিলন ঘটে। তাওহীদের এ সিফাতী নূরকেই সূফীগণ বিবেচনা করেন আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্ব হিসাবে। শরীয়তের সাথেও মিলে যায়, আল্লাহ্তায়ালা নিরাকার ও আসমান-জমিনের নূর।

আসলে তাওহীদের এ সিফাতী নূর হলো সৃষ্ট, যদিও তার গুণাবলী সৃষ্ট নয়, যা তাওয়াজ্জুহ্ মারফত আল্লাহ্তায়ালা নূরে মুহাম্মদী তথা হাকীকতে মুহাম্মদীকে বখশীশ করেছেন। হাকীকতে মুহাম্মদীর মধ্যস্থতায় যাতী নূর দ্বারা তাওহীদের এ সিফাতী নূরের বিকাশ ঘটিয়েছেন। ইহা হলো আল্লাহ্তায়ালার হাকীকতের অনাদি আদিমত্বের গুপ্ত ভান্ডার রূপ তাওহীদের নূরের অনুরূপ তাওহীদের সিফাতী নূর। একটি অপরিবর্তনশীল অনাদী ও অনন্ত কাল পর্যন্ত বজায় থাকবে। অন্যটি কিয়ামতে যাতী নূরে বিলীন হবে, যখন স্রষ্টা লিখিত কাগজের তাড়ার মত সৃষ্টিকে গুটিয়ে নেবেন। এক পর্যায়ে যাতী নূরকেও তাঁর যাতী সত্তার গুপ্ত ভান্ডার রূপ নূরের অস্তিত্বে টেনে নেবেন। কারণ সমগ্র সৃষ্টি তখন তাঁর মধ্যে বিলীন হবে, একমাত্র তিনিই থাকবেন, আর কেউ থাকবে না। তার নিরাকার অস্তিত্বের এ সব কোন নিদর্শন থাকবে না। নূরী, প্রাণী ও জড় জগত তাঁর নিরাকার

www.pathagar.org

অস্তিত্বের নিদর্শন। সৃষ্টির বিচিত্র অস্তিত্বের মাঝে নিদর্শনাদির দ্বারা এ রকম প্রকট ভাবে তাঁর নিরাকার অস্তিত্ব ঘোষণা করছেন। জড় জগত ও প্রাণী জগত নতুনত্ব ও পরিবর্তনশীলতার জন্য নশ্বর বা ধবংসশীল। আর নূরী জগত আল্লাহ্তায়ালার তাজাল্লীর গুণে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী। কিয়ামতে নূরী জগতের যা খুশী বজায় রাখতে পারেন, যা খুশী বিলীন করে পুনরায় সৃষ্টি করতে পারেন।

তাওহীদ দু'প্রকার, একটি হলো গুপ্ত ভান্ডার রূপ অনাদি অনন্ত চিরস্থায়ী তাওহীদের যাতীসত্তার নূর। অন্যটি হলো, সেই অনাদি আদিমত্বের যাতী সত্তার নূরের অনুরূপ সিফাতী নূর, যা আল্লাহ্তায়ালা হতে পৃথক নয় এবং তাঁর তাওয়াজ্জুহ মারফত তার গুণাবলীর দ্বারা অভিষিক্ত। এ সিফাতী নূর যাতী নূরে বিলীন যোগ্য, যেমন তাঁর সমগ্র সৃষ্টি বিলীন যোগ্য।

আশা করি তাওহীদে অজুদিয়ে সিফাতী এবং তাওহীদে অজুদিয়ে যাতীর ধারণা স্পষ্ট হয়েছে। গুপ্ত ভান্ডার রূপ নূরের অনুরূপ সিফাতী নূর হওয়ায় কেউ একে প্রতিবিম্বও বলে থাকেন, আবার এ নূরের সত্তাসার ও সিফাতী নূরের সমষ্টি যা বিশেষ আকৃতিতে দেখা যায়, তাকেও প্রতিবিম্ব বলা হয়। আসলে এ দু'টোই দু'টো অবস্থা যা আল্লাহ্তায়ালার যাতীসত্তা ও আকৃতি নয়। এ সিফাতী অজুদিয়ে আত্মার মিলন হয় এবং আকৃতি এসে আত্মাতে মিশে যায়। ফলে আত্মা শক্তিশালী হয় এবং নিজের বাতিনী সুরত বা বরযখ খুবই সৌন্দর্য মন্ডিত হয়, অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার গুণাবলীতে বিভূষিত হয়। বাকাবিল্লাহতে সালিকের সিফাতী নূরে চরম নৈকট্য লাভ হয়। ফলে সালিকের দ্বারা অনেক অলৌকিক ঘটনার প্রকাশ হতে পারে, যা কেবল আল্লাহ্তায়ালার দ্বারাই ঘটা অনেক অলৌকিক ঘটনার প্রকাশ হতে পারে, যা কেবল আল্লাহ্তায়ালার দ্বারাই ঘটা সম্ভবপর।

নবুওতের মাকামে শহুদিয়া অজুদিয়ে যাতীর আবির্ভাব হয় এবং যাতী নূরের সমষ্টির প্রতিবিম্ব বা আকৃতি দেখা যায়। এ সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এ বিশেষ আকৃতি আরো সৌন্দর্য মন্ডিত ও লাবণ্যময়, যা যাতী নূরের সত্তাসার ও আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞান, গুণ ও কামালিয়াতের সমষ্টির আকৃতি, যাতী সত্তার আকৃতি নয়। নবুওতের মাকামে তাওহীদে অজুদিয়ে যাতী দেখা যায় না। সে নিরাকার অজুদে মিলন হয় হাকীকতে আল্লাহু জাল্লা শানুহুর মাকামে। নবুওতের মাকামে এ অভাব থেকে যায়, আগের দিনের নবী রাসূলগণেরও এ অভাব ছিল।

www.pathagar.org

কেবল মাত্র সারওয়ারে কায়ানাত (সাঃ)এর জন্য এটা খাস করে রাখা ছিল। এর বিস্তারিত পূর্বেই বলা হয়েছে, এ অনাদি অপরিবর্তনীয় নিরাকার অজুদে একমাত্র তিনিই ফানা হয়েছিলেন। অবশ্য তার উসিলায় পাক পানজাতনের অপরাপর সদস্যগণ, তাঁদের আওলাদ ও সে আওলাদের অনুসারীগণ ফানা-বাকা লাভ করেন এবং তাদের দেহধারী অজুদকে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর অজুদ বলে হাদীসে কুদসীতে বলেছেন।

আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞান, গুণ, কামালিয়াত ও সৌন্দর্যের আকৃতি আছে। যেমন রাসূলুলাহ্ (সাঃ) বলেছেন- 'আমি আল্লাহ্তায়ালার সৌন্দর্যের দর্পণ।' মানুষ যখন নিজ প্রবৃত্তির সাথে সংগ্রাম করে অসৎ স্বভাবকে সৎ স্বভাবে, অসৎ চরিত্রকে সৎ চরিত্রে পরিণত করে 'আবদিয়াতের মাকামে তাযকিয়া নাফ্স হয়ে যায় এবং আল্লাহ্তায়ালার গুণ ও জ্ঞানসমূহ লাভ করে, তখন সে আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞান ও গুণের আকৃতি যে অজুদ তার অনুরূপ চরিত্রে সৌন্দর্য লাভ করে। তাহলে সে পরিপূর্ণ মানব হয়। এ পুস্তকে এ জন্য বলা হয়েছে যে, শুধু তাসবীহ-তাহলীল পাঠে কেউ কামিল হতে পারে না, যদি না তার চরিত্র সুন্দর হয়। নবুওতের মাকামে আত্মার উপর যাতী তাজাল্লী হয়ে সে সৌন্দর্যকে স্থায়ী ও আরো লাবণ্যময় করে। হাকীকতে আল্লাহু জাল্লা শানুহুর নিরাকার অজুদে ফানা হয়ে পরিপূর্ণ ভাবে আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞান ও গুণের রঙে রঞ্জিত হয়ে যায়। সে সৌন্দর্যের কিছুমাত্র বাকী থাকে না, যতটুকু তিনি সৃষ্টিকে দিয়েছেন। রাসূলুলাহ্ (সাঃ) তাই নিজকে আল্লাহ্তায়ালার সৌন্দর্যের দর্পণ বলে উল্লেখ করে গেছেন।

হাকীকতে মুহাম্মদীতে রাসূলুলাহ্ (সাঃ) আল্লাহ্তায়ালার যে জ্ঞান, গুণ, কামালিয়াত ও সৌন্দর্যের আকৃতি ধারণ করেছিলেন, তাতে স্বাতন্ত্র এনে লওহে মাহফুযে যে চিত্র অংকিত হয়েছিল, তা দেখে ফিরিশতারা আদম (আঃ)এর আকৃতি গঠন করেছিলেন। এভাবে রাসূলুলাহ্ (সাঃ) আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞান ও গুণের আকৃতির ছায়া হয়েছিলেন, যা মূলতঃ আল্লাহ্তায়ালার ছায়া। ছায়া হওয়ার কারণ আল্লাহ্তায়ালার তাওয়াজ্জুহ মারফত নূরে মুহাম্মদীর সত্তাসার হয়ে তিনি আকৃতি ধারণ করেছিলেন, আর আদম (আঃ) হলেন রাসূলুলাহ্ (সাঃ) এর ছায়া, যা লওহে মাহফুযে স্বাতন্ত্র এনে অংকিত হয়েছিল আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছায়। আল্লাহ্তায়ালার ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান ও গুণ হতে ভিন্ন ভিন্ন দেহধারী আকৃতি হয়েছে। নূরী জগত, আত্মার জগত ও জড় জগতে যে আকৃতি আমরা দেখতে পাই, তা হাতী হতে সামান্য কীট-পতংগ পর্যন্ত, বিরাট আকৃতির নীহারিকা-সূর্য থেকে

www.pathagar.org

পরমাণু পর্যন্ত, বটবৃক্ষ থেকে শেওলা পর্যন্ত সাকুল্য আকৃতি আল্লাহ্তায়ালার বিভিন্ন জ্ঞান ও গুণের আকৃতি। আর সৃষ্টিতে প্রদত্ত তাঁর সাকুল্য জ্ঞান ও গুণের সমষ্টিগত আকৃতি হলো রাসূলুলাহ্ (সাঃ) এর আকৃতি। নূরী স্তরে নূরী বিরাট আকৃতির আরশ আজিম ও ফিরিশতা হতে নিয়ে সুক্ষ্ম নূরী কণা সদৃশ ফিরিশতাও আছে। স্তরে স্তরে সাকুল্য আকৃতি মহান স্রষ্টার ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান ও গুণের বিভিন্ন আকৃতি। জগত নতুনত্বের কারণে নশ্বর আর আধ্যাত্মিক নূরী জগত তাঁর তাজাল্লীর গুণে অবিনশ্বর। রং ও তাঁর গুণ ও জ্ঞান। রং দ্বারা সব কিছু সৌন্দর্য মন্ডিত হয়েছে। সৌন্দর্যকে প্রকট করার জন্য প্রয়োজন মত কিছু কুৎসিত আকৃতিও দেওয়া হয়েছে। আকৃতি বা সুরত সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা দেওয়া হলো যাতে সব কিছুকে আল্লাহ্ বলা না হয়, তবে কোন কিছুই আল্লাহ্ হতে পৃথক নয়। কারণ তাঁর জ্ঞান ও গুণ তাঁর থেকে পৃথক নয়।

বাকা বিল্লাহতে সিফাতী নূরের সত্তাসার সমষ্টিগত আকৃতি, নবুওতের মাকামে যাতী নূরের সমষ্টিগত আকৃতি ও হাকীকতে আল্লাহু জাল্লা শানুহুর মাকামে সৃষ্টিতে প্রদত্ত তামাম জ্ঞান, গুণ ও মাকালিয়াতের আকৃতি তিন স্তরের। আকৃতি দর্শনকে আল্লাহ্তায়ালার দীদার বললে এবং আল্লাহ্তায়ালা নিরাকার-এ আকিদা রাখলে শরীয়তের নযরে আপত্তি থাকে না, যদি আপত্তি থাকতো তবে হযরত আলী (রাঃ) ও ইমাম আবু হানিফা (র) আল্লাহ্তায়ালাকে দেখেছেন, এ কথা বলতেন না। রাসূলুলাহ্ (সাঃ) আখিরাতে আল্লাহ্তায়ালাকে দেখা যাবে বলে ইসলামী আকীদার ভিত্তি স্বরূপ করতেন না। তরীকতের যে তিনটি স্তরে যথা বাকাবিল্লা হতে সিফাতী নূরের স্তরে, নবুওতের মাকামে যাতী নূরের স্তরে এবং হাকীকতে আল্লাহু জাল্লা শানুহুর যাতী সত্তার স্তরে আল্লাহ্তায়ালার দীদার নসিব হয়- এ কথা বললে, আমাদের ভুল হবে না। কিন্তু ভুল হবে এবং শরীয়ত লংঘিত হবে যদি সেই আকৃতিকে আল্লাহ্তায়ালার যাতীসত্তার আকৃতি বা আত্মা বলে মনে করা হয়, কারণ সকল আত্মাই সৃষ্টি। মনে করতে হবে, এগুলো আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞান ও গুণের আকৃতি। সূরা নূরে আল্লাহ্তায়ালা নিজেই বলেছেন, আল্লাহ্ আসমান ও জমিনের নূর। বাকাবিল্লাহতে সিফাতী নূরের সমষ্টিতেই আল্লাহ্তায়ালাকে আসমান-জমিনের নূর হিসাবে দেখা যায়। আল্লাহ্তায়ালাকে পরমাত্মা ভাবা শরীয়তের পরিপন্থী, সত্যের সাথে এর কোন সামঞ্জস্য দেখা যায় না। বিভিন্ন মতবাদের ধর্ম ও পাশ্চাত্য দার্শনিকদের ধারণা ও অনুমান-কল্পনা হতে এ ধারণা মুসলমানের ধর্ম-বিশ্বাসে আমদানী করা হয়েছে যে, আল্লাহ্তায়ালা পরমাত্মা বা মহাবিশ্বের আত্মা। তারা কোরআন এড়িয়ে

www.pathagar.org

যাওয়ার ফলে আত্মা ও নূরের পার্থক্য করতে পারেননি। আল্লাহ্তায়ালাকে দেহধারী মনে করলেও ভুল হবে, শরীয়ত লংঘিত হবে।

আল্লাহ্তায়ালার হাকীকতের দীদার লাভ করাই হলো মানব জীবনের একমাত্র কামনা। কারণ এতে দেহ ও আত্মা পরিপূর্ণ ভাবে যাতী সত্তার অনাদি নূর দ্বারা তাজাল্লী হয়ে যায়। আল্লাহ্তায়ালা খালেক এবং বান্দা মখলুক, এ ছাড়া ব্যবধান থাকে না। আল্লাহ্তায়ালাও বান্দাকে তাঁর সম্পূর্ণ নিজের করে নেন। বান্দার হাত, মুখ, চোখ, পা ও অন্তকরণকে তার হাত, মুখ, চোখ, পা, অন্তকরণ ও তার চলা-ফেরাকে নিজের বলে ঘোষণা করেছেন, যা হাদীসে কুদসীতে রাসূলুলাহ্ (সাঃ) কে জানিয়েছেন। তবে আত্মা সৃষ্ট বলে বান্দা আল্লাহ্ হয়ে যায় না। হাকীকতের এ মিলন বা ওসলকে ওসলে অজুদিয়ে যাতী বলা হয়।

রাসূলুলাহ্ (সাঃ) আখিরাতে যে দীদারের কথা বলেছেন তা আর স্পষ্ট হবে। পাক পবিত্র হওয়ার পর যারা দীদারের যোগ্য হবে, সে সব বেহেশতীরা চর্মচোখে আল্লাহ্তায়ালাকে দেখবে। দুনিয়াতে এ দীদার যাদের হয় তাঁরা অন্তর চোখে দেখে থাকেন, যা কলবে উদ্ভাসিত হয়। কারণ মু'মিনের দীল আল্লাহ্র আরশ বলে আত্মা তা দেখে। দুনিয়ার এ দীদার অন্তরগত ও ব্যক্তিগত, আর আখিরাতে বেহেশতের দীদার সমষ্টিগত ও যোগ্য বেহেশতীদের জন্য সার্বজনীন, যা তাঁরা সমষ্টিগত ভাবে চর্মচোখে দেখবে এবং তা বহির্জগতে ঘটবে। দুনিয়াতে তা অন্তর জগতে হয়। দুনিয়ার মত মনোগত হবে না, বাস্তবে হবে।

কোরআন, হাদীস, তরীকত ও ইসলামী আকিদার সাথে সামঞ্জস্যের উপর ইজতিহাদ করে এ কথা বলা চলে যে, আখিরাতের দীদারও আল্লাহ্তায়ালার হাকীকতের দীদার হবে, যাতী সত্তার নয়, কারণ তার যাতী সত্তা অনন্ত এবং অসীম হওয়ার কারণে নিরাকার। আল্লাহ্তায়ালাই ভাল জানেন।

সৃষ্টিতে প্রকাশিত আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞান ও গুণ আকৃতি লাভ করেছে, তা নূরী, রূহী বা জড় যে আকৃতিই হউক, প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন নাম গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন স্তরের সমষ্টির আকৃতিকে অনেকে আল্লাহ্তায়ালা বলেন এই মনে করে যে, তাঁর জ্ঞান ও গুণ হতে আল্লাহ্ পৃথক নন। আসলে এই সমষ্টিগত আকৃতি আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞান ও গুণের একটি অবস্থা, যা বান্দার আত্মাকে শক্তিশালী ও আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত করে বা পরিচালিত করে আর আল্লাহ্তায়ালা সর্ব অবস্থায় নিরাকার, অনন্ত ও সর্বব্যাপী। তাঁর আকৃতি আছে মনে করলে একটি স্থানে সীমাবদ্ধ হয়ে যান, সর্বব্যাপী অনন্ত থাকার ধারণার বিপরীত হয়ে যায়, যা ইসলামী আকীদা এবং বিবেক বিরোধী।

www.pathagar.org

বিলায়েত

আল্লাহ্তায়ালা সৃষ্টির সূচনা লগ্নে তাঁর নিজের প্রতি যে প্রেম ছিল তা হাকীকতে মুহাম্মদীর প্রতি তাওয়াজ্জুহ মারফত এল্কা করে পাক পানজাতন সৃষ্টি করে সৃষ্টির সূচনা করেন। সেই মুহব্বত লাভ করার নাম হলো বিলায়েত লাভ করা। হাকীকতে আল্লাহু জাল্লা শানুহুতে বান্দা যখন ফানা হয়, তখন বান্দার নিজের বলে কিছু থাকে না, আল্লাহ্ময় হয়ে যায়, স্রষ্টার এল্কাকৃত নিজের প্রতি নিজের প্রেম আবার তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করে বান্দা রূপে। যে মুহব্বতে তিনি তাঁকে আপন করে নেন, তা হলো বিলায়েত। সৃষ্টির পূর্ব অবস্থায় ফিরে যায়, আল্লাহ্তায়ালা অপরিবর্তনীয় বলে বান্দা সেই প্রেম লাভ করে।

এ বিলায়েতের ফায়েজ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ছাড়া অন্য কোন নবী-রাসূলগণের ভাগ্যে ঘটেনি। কিয়ামতের দিন এ ফায়েযের জন্য অন্যান্য নবী-রাসূলগণ আফসোস করবেন। এতে বোঝা যায় যে এ ফায়েজ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জন্য খাস ছিল এবং তা নবুয়ত-রিসালতের ঊর্ধ্বে ছিল।

সর্বপ্রথম আল্লাহ্তায়ালা তাঁর নিজের প্রতি নিজের যে প্রেম ছিল তা হাকীকতে মুহাম্মদীর প্রতি এল্কা করেন এবং এল্কাকৃত মুহব্বতের তাওয়াজ্জুহর দ্বারা পাক পানজাতন সৃষ্টি করে সৃষ্টির সূচনা করেন। তার পর পাক পানজাতনসহ হাকীকতে মুহাম্মদীকে খিলাফত দ্বারা ভূষিত করেন অর্থাৎ হাকীকতেই নবুয়ত দান করেন। হাকীকতে মুহাম্মদী পাক পানজাতনের অন্য চারজন সদস্যের মধ্যস্থতায় আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছায় সে খিলাফত পরিচালনা করেন। এ জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলে গেছেন- "আদম (আঃ) যখন কাদামাটিতে, তখনও তিনি নবী"। স্রষ্টার প্রেম তাঁকে বখশীশ করার কারণে তিনি হাকীকতেই নূরী জগতে নবী হন। আল্লাহ্তায়ালা শুধু তার নিজের প্রতি আশেক ছিলেন, হাকীকতে মুহাম্মদীর প্রতি সেই প্রেম এল্কা করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রতি স্বাভাবিক নিয়মেই আশেক হয়ে যান। যে জন্য আল্লাহ্তায়ালা হাদীসে কুদসীতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলেছেন যে, 'তোমাকে সৃষ্টি না করলে আমি আসমান-জমিন কোন কিছুই সৃষ্টি করতাম না।' তা হলে বেহেশত, দোযখ, আরশ, কুরসী, আসমান, জমিন, নূরী, রূহী, জড়, উদ্ভিদ ও প্রাণী জগত সৃষ্টির কারণ হলো রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সৃষ্টি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রতি স্রষ্টার এই যে মুহব্বত, এর নামই বিলায়েত। নবুয়ত বিলায়েতের বহু নিম্নে। নবুয়ত সৃষ্টির

www.pathagar.org

জন্য, বিলায়েত আল্লাহ্তায়ালার জন্য। যেখানে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সৃষ্টি না হলে কিছুই সৃষ্টি হতো না। সৃষ্টি না হলে নবুওতের প্রশ্নই আসতো না। পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ কেউ যে এই মর্যাদা পান নি, তা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এ ফায়েজ যদি নবুওতের মাকামে থাকত, তবে সব রসুলগণ তা পেতেন। মাহবুবিয়াতে মুহাম্মদী ও হাকীকতে মুহাম্মদীতে তা প্রকাশ পেয়েছে, নবুওতের মাকামে নয়।

তারপর মাকামে মাহমুদা ও বেহেশতের উসিলা একমাত্র রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ই পাবেন তাও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, সুন্নত জামাতের আলেমগণ এতে একমত। হাশরে সমগ্র মানবমন্ডলীর নেতা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হবেন, এতেও কোন দ্বিমত নেই। মাহবুবিয়াতে মুহাম্মদীর মাকামে তা প্রকাশ পায়। নবুওতের মাকামে নয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট বেহেশতের চাবি থাকবে, তিনিই সর্ব প্রথম বেহেশতের দ্বারা উদ্ঘাটন করবেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে এ সব নিয়ামতসমূহ বা মর্যাদাসমূহ এককভাবে দান করার কারণ আল্লাহ্তায়ালার প্রেম তাঁর হাকীকতের উপর বর্ষিত হয়েছে এবং আল্লাহ্তাআলা নিজকে প্রেম করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রতি আশেক হয়ে গেছেন। এগুলো নবী-রাসূল হওয়ার কারণে। এটাই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর বিলায়েত। আত্মা হিসাবে নবুওতের মাকাম তায় করে তিনি নবী-রাসূল হয়েছেন, আর মাহবুবিয়াতে মুহাম্মদী, হাকীকতে মুহাম্মদী ও হাকীকতে আল্লাহু জাল্লা শানুহুর মাকাম ত্রয় অতিক্রম করে তাঁকে ও আল্লাহ্তায়ালাকে জেনেছেন। এ মাকাম ত্রয় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর বিলায়েতের মাকাম, তাঁর প্রেমাস্পদত্বের মাকাম। নবুওতে নবী হওয়ার দরজা বন্ধ হলেও বিলায়েত কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

নবুয়ত-রিসালাত ছাড়াও আল্লাহ্তায়ালার সাথে আরেকটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল, সেটা ছিল প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের সম্পর্ক। হাদীসে কুদসীতে ইলহাম মারফত আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে কত দূর মুহব্বত করেন তা জানাতেন এবং তরীকতের শেষ মাকাম ত্রয়ের মারফত সে সব দেখাতেন এবং তাকে স্রষ্টা আপন যাতী সত্তার নূরে টেনে নিয়ে গেছেন। আল্লাহ্র চোখে তিনি দেখেছেন, আল্লাহ্র কানে শুনেছেন, তাঁর কথা-বার্তা ও আচরণ আল্লাহ্রই কথা-বার্তা ও আচরণের রূপান্তরিত হয়ে যায়। একদা এক সাহাবী তাঁকে নিবেদন করেন- হুজুর আপনিতো মানুষ, রাগের সময় যে সব কথা-বার্তা বলেন, তাও কি আমরা হাদীস হিসাবে লিপিবদ্ধ করব? জওয়াবে জানালেন যে, এ মুখ হতে সত্য ব্যতীত কিছু বের হয় না। অর্থাৎ হাকীকতে আল্লাহু জাল্লা শানুহুতে ফানা হয়ে সর্বদা তিনি তাতেই অবস্থান করতেন। বিলায়েতের জন্য তাঁর এরূপ অবস্থা হয়েছিল।

www.pathagar.org

বিলায়েতের জন্য তাঁর কাছে ইলহাম আসত, যা তিনি হাদীসে কুদসীতে বলে গেছেন, তা ছিল তাঁর জন্য খাস। আর নবুওতের কারণে তাঁর কাছে ওহী আসত, যা ছিল সার্বজনীন। উম্মতের নিকট ইলহাম থেকে ওহীর দাম বেশী। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট ইলহামের দাম অপরিসীম। কারণ প্রেমিক আল্লাহ্তায়ালা আর প্রেমাস্পদ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ দু'জনের খুবই ঘনিষ্ট সম্পর্ক, যাকে বিলায়েত বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। বিলায়েতের এ তিনটি মুহব্বত ও হাকীকতের মাকাম নবুওতের ফায়েযের উপরে। যদি উপরে না হবে তবে এর জন্য অন্যান্য নবীগণ শাহরে আফসোস করবেন কেন? আর এ তিনটি মাকাম পাবার জন্য ইসা (আঃ) আবার দুনিয়াতে আসবেন কেন? তাঁর তো নবুয়ত এবং রিসালাত ছিলই। তিনি পুনরায় দুনিয়াতে আসবেন এ বিলায়েতের জন্য। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর উসিলায় তাঁর উম্মতগণ বিলায়েতের এ মাকাম ত্রয় পেতে পারেন।

আল্লাহ্তায়ালার কি অপূর্ব কৌশল ও মেহেরবাণী যে, আখেরী যামানায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে নবী করে নবুওতের দরজা বন্ধ করে দেন, অথচ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বিলায়েত চালু রাখেন, যা নবুওতের মাকাম তায় না করা পর্যন্ত পাওয়া যায় না। ফলে নবুয়ত শেষ হলেও নবুওতের ফায়েজ অব্যহত থাকে। বিলায়েত দ্বারাই নবুওতের ফায়েজ সঞ্জীবিত থাকে। কোন উম্মত নবীগণের মর্যাদা পাবে না, যদিও বিলায়েতের ফায়েজ নবুওতের ফায়েযের উপরে। এজন্য নবুওতের ফায়েজ তায় করলে উম্মতে মুহাম্মদীর ওলীগণ পূর্ববর্তী উলুল আযম পয়গাম্বর সাহেবদের যে কোন একজনের পায়ের নীচ পর্যন্ত পৌছেন। আর বিলায়েতের ফায়েজ তায় করলে নবীগণের নেতা জনাব রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পায়ের নীচ পর্যন্ত পৌছেন। এভাবে বিলায়েত মারফত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে শ্রেষ্ঠ নবী করা হয়েছে এবং উম্মতে মুহাম্মদীকে শ্রেষ্ঠ উম্মত করা হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, বিলায়েত নবুওতের ছায়া। তাঁরা মনে করেছেন, ওলীগণ বা উম্মত যখন নবীগণের সমকক্ষ হতে পারবেন না এবং বিলায়েত ওলী অর্থাৎ উম্মতগণ পান তখন এ সত্য ধারণা থেকে তাঁরা ইজতিহাদ করে বলেছেন যে, বিলায়েত নবুওতের ছায়া। আসলে বিলায়েত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ছায়া- তিনিই একমাত্র নবী যার নবুয়ত ও বিলায়েত দু'টোই ছিল। আর বিলায়েত হলো আল্লাহ্তায়ালা যে মুহব্বত বা প্রেম তাঁর নিজের প্রতি আছে তাই হাকীকতে মুহাম্মদীর উপর আমানত রেখেছিলেন- সেই প্রেম এবং বিলায়েতের পূর্বোল্লিখিত তিনটি মাকামে তার বর্হিপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। অন্য কোন নবী-রাসূলগণকে তা

www.pathagar.org

দান করা হয়নি। দলীল ও হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিত। কেউ তা অস্বীকার করলে বা বিলায়েতের ফায়েজকে নবুওতের ফায়েযের নীচে বা সমকক্ষ বললে তা হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না এবং যা হাদীসের বিরুদ্ধে হয় তা শরীয়তেরও বিরুদ্ধে বাস্তবের সাথে মিলে না এ কারণে যে, নবুওতের মাকাম তায় করে কোন ওলী রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পায়ের নীচ পর্যন্ত পৌঁছেছেন বলে দাবী করেন নি, বরং পূর্ববর্তী রাসূলগণের পায়ের নীচ পর্যন্ত পৌঁছেছেন বলে জানিয়েছেন। উক্ত বিলায়েতের তিন মাকাম তায় করা ওলীগণ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কদম মুবারক পর্যন্ত পৌঁছেছেন বলে জানিয়েছেন।

ক্বদমীয়া তরীকার ইমাম সাহেব তাঁর 'কাশফুল আসরার' নামক রেছালায় বলেছেন-'মাহবুবিয়াতে মুহাম্মদী, হাকীকতে মুহাম্মদী ও হাকীকতে আল্লাহু জাল্লা শানুহু-এই মাকাম তিনটিকে তা'লীম ও ইরশাদের সময় হুজুর আকরাম (সাঃ) বিলায়েতের শেষ সীমা বলে স্থির করেছেন। পূর্ববর্তী ওলীগণ এই তিন মাকামের ফায়েজসমূহকে সমস্তের নামে অংশের নামকরণ রূপে বিলায়েত নবুওতের উপর বলে উল্লেখ করেছেন।"

ক্বদমীয়া তরীকা নাযিলের সময় এই তরীকার ইমাম হযরত সৈয়দ আমজাদ আলী শাহ (র)এর নিকট রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তরীকতের শেষ তিনটি মাকামকে বিলায়েতের শেষ বলে উল্লেখ করেছেন, তবে এর প্রথম কোথায়? এই চিন্তা আমাদের করতে হবে।

ঈমান আনার পরই নবুওতের ফায়েজ শুরু হয় এবং নবুওতের মাকামের ফায়েযে এর পরিপূর্ণতা আসে। আগের যামানায় এ মাকামে ফায়েযের পরিপূর্ণতা এলে কাউকে নবী হিসাবে মনোনীত করা হতো অথবা কাউকে ওলী হিসাবে রেখে দেওয়া হতো। বর্তমানে আখেরী যামানাতে ঠিক তেমনি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে কোন কিছুকে মুহব্বত করলে বিলায়েতের ফায়েযের সূচনা হয় এবং হাকীকতে আল্লাহু জাল্লা শানুহুর মাকামে ফানা-বাকা হলে বিলায়েতের ফায়েযের পরিপূর্ণতা আসে এবং তখন যদি আল্লাহ্‌তায়ালা তাকে ভালবাসেন তবে বান্দার হাত, মুখ, চোখ, পা, অন্তকরণ ও চলাফেরা ইত্যাদিকে নিজের বলে গ্রহণ করেন। আল্লাহ্‌তায়ালার হাকীকতে ফানা-বাকা হয়ে বিলায়েতের পূর্ণ ফায়েজ প্রাপ্ত হলেই বিলায়েত প্রাপ্ত হলেন বোঝা যায় না। এ মাকামে আল্লাহ্‌তায়ালা যদি তাঁকে ভালবাসার পাত্র হিসাবে মনোনীত করেন, তবে বিলায়েত প্রাপ্ত হলেন বলে বোঝা গেল। তাঁর চিহ্ন হলো হযরত আলী (রাঃ) তাঁকে বায়আত করবেন। হযরত আলী (কা) বায়আত করলেই বোঝা গেল তিনি বিলায়েত প্রাপ্ত হলেন। নবুয়ত

www.pathagar.org

পাওয়া এবং নবুওতের ফায়েজ পাওয়া যেমন এক কথা নয়, তেমনি বিলায়েতের ফায়েজ পাওয়া ও বিলায়েত পাওয়া এক কথা নয়। বিলায়েত পেলে আল্লাহ্পাক তাঁকে মাহবুব উপাধী দেন।

এর একটি বাস্তব উদাহরণ দিচ্ছি। ক্বদমীয়া তরীকার ইমাম সাহেব হযরত সৈয়দ আমজাদ আলী শাহ (র) যখন বিলায়েতের শানে বরযখে উপরের মাকামের সালিকের অন্তরচোখে ধরা দেন, তখন তাঁর পেশানী বা কপালে মাহবুবে রহমানী, বক্ষদেশে হাবিুল্লাহ্ এ উপাধীগুলো লেখা থাকে। এই হলো বিলায়েত প্রাপ্ত ওলী ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ছায়া। বান্দার হাত, মুখ, চোখ, পা, অন্তকরণ আল্লাহ্র হয়ে যায় না, তাঁর এ সমস্ত উপাধীই তার প্রমাণ। পথহারা সূফীরা যাই বলুক, আত্মা কখনও আল্লাহ্ হতে পারে না আবার আল্লাহ্তায়ালা পরমাত্মা নন, তিনি নূর।

হযরত নবী করিম (সাঃ) এক সহীহ্ হাদীসে বলে গেছেন- "আমি জ্ঞানের শহর আর আলী এর দরজা।" এর অর্থ জ্ঞানের শহর বলতে তিনটি বিলায়েতের মাকাম বুঝিয়েছেন। আল্লাহ্তায়ালার হাকীকতে ফানা-বাকা না হলে আল্লাহ্তায়ালার পরিচয়ের বা মা'রিফাতের জ্ঞান আসে না। তেমনি হাকীকতে মুহাম্মদীর মাকাম তায় না করলে সব কিছু কিভাবে সৃষ্টি করা হলো, সে জ্ঞান লাভ করা যায় না। আবার মাহবুবিয়াতে মুহাম্মদীর মাকাম তায় না করলে হাশরের জ্ঞান হয় না। হাশরের জ্ঞান না হলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যে আল্লাহ্র মাহবুব ও জ্ঞান হয় না। আল্লাহ্তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বিলায়েতের এ তিনটি মাকাম বকশিশ করে এ সকল জ্ঞান দান করেছিলেন বলে তিনি নিজকে জ্ঞানের শহর বলে উল্লেখ করেছেন। আর আলী (কা) কে সে শহরের দরজা বলে উল্লেখ করার কারণ হযরত আলী (কা) এর সাথে সম্পর্ক বা নিসবত না গড়ে কেউ এ মাকাম তিনটিতে প্রবেশ করতে পারে না। অর্থাৎ বিলায়েত পায় না। পাক পাঞ্জাতনের সাথে সম্পর্ক বা নিস্বত না থাকলে আল্লাহ্তায়ালা তাকে বিলায়েত দেননা। আর হযরত আলী (কা) এর হাতে স্বপ্নে বা কাশফে বায়আত না হলে বিলায়েত প্রকাশ হয় না। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর সাথে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর অনেক সাদৃশ্য আছে। ইব্রাহীম (আঃ) এর বংশধর হতে আল্লাহ্তায়ালা বহু নবী-রাসূলগণের উদ্ভব ঘটিয়েছেন, তেমনি কিয়ামত পর্যন্ত যুগে যুগে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পাক পাঞ্জাতনের আওলাদগণ তথা আহলে বাইত হতে অধিকাংশ তরীকার ইমাম মনোনীত করে তরীকা নাযিল করেছেন বা

www.pathagar.org

করবেন। পাক পানজাতনের সাথে সম্পর্কিত তরীকার ইমাম ও তাদের অনুসারীগণই বিলায়েতের জন্য মনোনীত হন। কারণ বিলায়েতের তিন মাকাম পাক পানজাতনের সাথে সম্পর্কিত বা নিস্‌বতওয়ালা তরীকার জন্য সুনির্দৃষ্ট।

যামানার গাউস, আবদাল, আওতাদ প্রভৃতি পাক পানজাতনের খিলাফতের পদসমূহ পাক পানজাতনের সাথে সম্পর্কিত তরীকার বুযুর্গগণ পেয়ে থাকেন। বর্তমানে চার তরীকা এক সাথে অনুসরণ করা হয়, যাদের আধ্যাত্মিক পদ বা দায়িত্ব দেওয়া হয় তাঁরা চার তরীকা অনুসরণ করলেও অন্তরচোখে দেখতে পারবেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে আধ্যাত্মিক দায়িত্ব দেওয়ার সময় কিছু সংখ্যক বুযুর্গদের মজলিস করে সবার সামনে দায়িত্ব দেন। সে বুযুর্গদের প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন তাঁরা সবাই পাক পানজাতনের সাথে সম্পর্কিত তরীকার মাশায়েখ। এতে আমার বক্তব্যের সারবত্তা ও সত্যতা সম্পর্কে বুঝতে পারবেন।

নবুওতের ফায়েজ বিলায়েতের ভিত্তি মূল। কেউ নবুওতের ফায়েজ তায় না করে বিলায়েতের ফায়েযে যেতে পারবে না। নবুওতের মূল্য অপরিসীম। এ নবুওতের মাকাম তায় করে লক্ষাধিক নবী-রাসূল হয়েছেন, যারা আল্লাহ্‌র তাওহীদ ও একত্বের প্রতি মানুষকে আহবান জানিয়েছেন, এক আল্লাহ্‌র দাসত্ব করতে বলেছেন। এ মাকাম তায় করে রাসূলগণ আল্লাহ্‌র খলিফা মনোনীত হয়ে পাক পানজাতনের খিলাফত লাভ করেছেন, জাহেরী, বাতেনী ও ইলমে লাদুন্নী লাভ করেছেন। খিজির (আঃ) ইলমে লাদুন্নী পেয়েছেন, ফানাফিল্লাহতে আবদালিয়াত পেয়ে এ মাকামে আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছায় পাক পানজাতনের খিলাফত পেয়ে হিজবুল্লাহ বাহিনীর নেতা হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ মাকামে দাঁড়িয়ে মানুষকে তাওহীদ ও আল্লাহ্‌র দাসত্বের জন্য আহবান জানিয়েছেন।

এ মাকামে কতদূর বিলায়েত পাওয়া যায়? এ মাকাম বিলায়েত শূণ্য নয়, যদি বিলায়েত শূণ্য হতো তবে ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌র বন্ধু হতে পারতেন না। কারণ বন্ধুত্ব বিলায়েত শূণ্য হতে পারে না, যদিও এটা কামালিয়াতের মাকাম।

পূর্বেই বলা হয়েছে মুহব্বত হলো বিলায়েতের ফায়েযের মূল উপাদান, ভয় হলো দাসত্বের ভিত্তি। মুহব্বত দুই রকম-আল্লাহ্‌র প্রতি মুহব্বত আর বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র মুহব্বত। বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র মুহব্বত হলো বিলায়েতের ভিত্তি। নবুওতের মাকাম পর্যন্ত আল্লাহ্‌তায়ালার মুহব্বত পাওয়া কতগুলো শর্তের উপর নির্ভর করে। দয়া তো সর্বব্যাপী। "যারা ঈমান আনে ও সৎ কর্ম করে তাদের

www.pathagar.org

জন্য দয়াময় সৃষ্টি করবেন ভালবাসা।" ৯৪ঃ৯৬। এ ভালবাসা আল্লাহ্‌র প্রতি বান্দার ভালবাসা।

'আল্লাহ্‌ তওবাহ্‌কারীকে ভালবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদের ভালবাসেন।' ২ঃ২২২।

'আল্লাহ্‌ সৎ কর্ম পরায়ণদের ভালবাসেন।' ৫ঃ৯৩।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন-'আল্লাহ্‌ আমাকে ভালবাসেন বলে আমাকে ভালবাস।'

পাক কোরআন ও হাদীসে আল্লাহ্‌তায়ালাকে ভালবাসার অনেক আয়াত ও রেওয়ায়েত আছে। এ কাজগুলো করলে বা শর্তসমূহ পালন করলে আল্লাহ্‌তায়ালা ভালবাসবেন। যতদিন শর্তসমূহ পালিত হবে ততদিন ভালবাসবেন। সমস্ত কিছুর ভালবাসা পরিত্যাগ করে এমন কি নিজের প্রাণ, সন্তান-সন্ততি, ধনসম্পত্তি ও দুনিয়ার ভালবাসা পরিত্যাগ করে আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলকে ভালবাসতে হবে। আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন মাহবুব নেই। এই বাক্যে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ফানা ফিল্লাহতে মোটামুটি এ ফায়েজ পূর্ণ হয়। পরিপূর্ণ হলে বান্দা মযযুব হয়ে যায়, ইরাদতের ফায়েজ এলেই মযযুবত্ব ছুটে যায়। এ ফায়েজ পরিপূর্ণ হলেই হবে না, স্থায়ী ভাবে থাকতে হবে। স্থায়ী ভাবে রাখতে হলে- সবর, শোকর, তাওয়াক্কুল, তরকে দুনিয়া, আল্লাহ্‌তায়ালার সব কাজে রাজী থাকা ইত্যাদি কতগুলো মানসিক ঐশ্যর্য ও আল্লাহ্‌তায়ালার গুণাবলী অর্জন করতে হয়। তাওহীদে সিফাতী অজুদী ও শহুদিয়ে সিফাতী অজুদীতে মিলন হলে এ অবস্থাসমূহ আত্মার সাথে মিশে, ফলে স্থিরতা আসে। কিন্তু নাফ্‌স এ গুণাবলী ও মুহব্বতকে স্থায়ী হতে দেয় না। গাফিলতি, শরীয়ত বিরুদ্ধ কাজের জন্য বা আল্লাহ্‌তায়ালা ভিন্ন অন্য কোন কিছুর প্রতি আকর্ষণে তা চলে যেতে পারে, সে জন্য একে বিলায়েতের মাকাম বলা যায় না।

নবুওতে শহুদে অজুদিয়ে যাতীতে মিলন হলে যাতী তাজাল্লীর গুণে এ সব গুণাবলী ও মুহব্বত স্থায়ী হয়। আল্লাহ্‌তায়ালা ছাড়া কোন কিছুর আকর্ষণ না থাকা, আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন পদার্থ মনে না আসা, তাঁর ইচ্ছা ছাড়া নিজস্ব কোন ইচ্ছা মনে না থাকা এবং আল্লাহ্‌তায়ালার সকল কাজে মনে কোন আপত্তি না আসা এবং আজীবন তাতে কায়েম থাকা হলো বিলায়েতের শর্ত। যত দিন এ সব শর্ত বজায় রেখে নৈকট্যে থেকে আল্লাহ্‌র প্রেমে নিজকে নিমজ্জিত রাখতে

www.pathagar.org

পারবেন, ততদিন আলাহতায়ালা সন্তুষ্ট থাকবেন। আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টি আর প্রেম ভিন্ন জিনিস। সন্তুষ্টিতে বেহেশত লাভ হয়, আর প্রেমে দীদার ও মিলন লাভ হয়। নবুওতের মাকামে ফায়েযে একটি ঘাটতি থেকে যায়, তা হলো ওসলে ওজুদিয়ে যাতী অর্থাৎ যাতী সত্তার নূরে তাওহীদে মিলন ঘটেনা। ফলে পরিপূর্ণতায় কিছু কমতি থাকে। ফলে উপরোক্ত শর্তগুলো ব্যহত হতে পারে। নবুওতের মাকামে বিলায়েতের ফায়েযের কিছু অংশ বিশেষ আছে।

হযরত ইউনুস (আঃ) আল্লাহ্তায়ালার বিধানে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, ফলে তিনি বিলায়েত থেকে সরে গিয়েছিলেন। কিন্তু নবুয়ত কাটা যায় নি, মাছের পেটে থেকে তওবাহ্ করে সে আংশিক বিলায়েত ফিরে তাঁর আংশিক বিলায়েত সঠিক ছিল, ছেলের প্রতি মুহব্বত থাকায়, সে মুহব্বত দূর করে আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য ছেলেকে কতওবাহ্নী করতে উদ্যত হওয়ায় আল্লাহ্তায়ালা তাকে তাঁর বন্ধু করে নেন। তাই নবুওতের ফায়েযে বিলায়েতের অংশ বিশেষ আছে, ইহা নবুওতের ফায়েযের সর্বোচ্চ অবস্থা। বন্ধু হওয়া আর প্রেমাস্পদ হওয়া এক কথা নয়। প্রেমাস্পদ হওয়া হলো বিলায়েত আর প্রেমাস্পদত্বের মধ্যে বন্ধুত্ব যত টুকুই স্থান দখল করে আছে, নবুওতে তত টুকু বিলায়েত আছে।

বিলায়েতে তিনটি মাকামই হলো অন্যান্য নবীদের থেকে রাসূলুলাহ (সাঃ) এর বৈশিষ্ট্য। এ তিনটি মাকাম তথা বিলায়েত অস্বীকার করলে রাসূলুলাহ (সাঃ) এর বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করা হয়। কেউ যেন মনে না করেন যে নবুওতের মাকাম তথা অন্য নবীদের হেয় করে রাসূলুলাহ (সাঃ) এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করছি। নবীদের মধ্যে উচ্চ-নীচ ভেদা-ভেদ আনা অন্যায়, তবে রাসূলুলাহ (সাঃ) নিজেই বিনা গর্ব- অহংকারে তাঁর বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণনা করে গেছেন। বিলায়েতের এ তিন মাকাম সেই বৈশিষ্ট্য বহন করে। নবীর যদি বিলায়েত না থাকে তবে উম্মতের বিলায়েত আসতে পারে না। কারণ নবীর ছায়া হল তাঁর উম্মত।

নবুওতের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে অর্থাৎ নূতন নবী আসবেন না, কিন্তু হুজুর (সাঃ) এর বিলায়েত কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে, বিলায়েতের ফায়েজ প্রাপ্ত ওলীদের মধ্যে যাকে খুশী আল্লাহ্তায়ালা বিলায়েত দান করবেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পাক পানজাতনের সাথে সম্পর্কিত তরীকার ওলীগণ ছাড়া বিলায়েত দান করা হয় না এবং আলী (কা) কে বিলায়েতের দরজা করা হয়েছে। এবং বিলায়েতের তিনটি মাকাম শুধু পাক পানজাতনের সাথে সম্পর্কিত

www.pathagar.org

তরীকাগুলোকে বকশিশ করা হয়েছে বা হবে। তবে শ্রেষ্ঠ সাহাবীগণ হতে যে তরীকাগুলো নাযিল হয় সে সব তরীকাগুলোকে বিলায়েতের তিন মাকামের ফায়েজ দেওয়া হয় না, তাতে কি সাহাবীদের মর্যাদা ম্লান হয় বলে মনে হয় না? এবং হজরত আলী (কা) এর মর্যাদা তাঁদের বেশী বলে মনে হয় না?

বুদ্ধিমান মেধাবীর এ টুকু মনে হওয়া উচিত নয়। কারণ এ পুস্তকে তরীকতের বর্ণণা দেওয়া হচ্ছে মাত্র, সমগ্র ইসলামের নয়। শুধু তরীকত ইসলাম নয়-যা ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর ঈমান ইসলামের পাঁচ রোকনের একটি জরুরী ও অত্যাবশ্যকীয় রোকন। সুন্নত জামাতের আকীদা এবং এ জামাতের আলেমগণ একমত যে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) শ্রেষ্ঠ ও এক নম্বর উম্মত। তারপর পর্যায়ক্রমে হযরত ওমর (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ)। এ ইজমা বা ঐক্যমত ভাঙার চেষ্টা করা অন্যায়। সমগ্র ইসলামের দৃষ্টি ভঙ্গিতে এ হলো শ্রেষ্ঠ সাহাবীগণের মর্যাদা। তবে একেক সাহাবীর একেক রকম বৈশিষ্ট্য ছিল।

হযরত আলী (কা) এর বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি ছিলেন জ্ঞানের দরজা অর্থাৎ বিলায়েতের প্রবেশ পথ, যা রাসূলুলাহ (সাঃ) নিজকে জ্ঞানের শহর ও আলী (কা) কে তার দরজা বলে উল্লেখ করে গেছেন। বিলায়েতের উক্ত তিনটি মাকাম তাঁকে নিস্‌বত না ধরলে পাওয়া যাবে না।

রাসূলুলাহ (সাঃ) বলে গেছেন যে, "আল্লাহ্‌তায়ালা যে সমস্ত জিনিস আমার সিনায় দিয়েছেন, আমি যথাযথভাবে আবু বকরের সিনায় দিয়ে দিয়েছি।" তাতে মনে হয়, হয়ত বিলায়েত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) ও শ্রেষ্ঠ সাহাবীদের (রাঃ) দান করেছেন, কিন্তু সে বিলায়েত হযরত আলী (কা)-এর নিসবত ছাড়া প্রকাশ হবে না। কারণ তিনিই একমাত্র বিলায়েতের দরজা। তাই শ্রেষ্ঠ সাহাবীগণের সাথে সম্পর্কিত তরীকাগুলো নবুওতের মাকাম পর্যন্ত ফায়েজ পায়। বিলায়েতের তিন মাকামের ফায়েজ পাক পানজাতনের নিসবত ছাড়া প্রকাশিত হয় না। যদি প্রকাশিত হয়, তবে হযরত আলী (কা) পাক পানজাতনের বৈশিষ্ট্য থাকে না। হযরত আলী (কা) যে জ্ঞানের দরজা এ হাদীস এবং পাক পানজাতন সম্পর্কে বেশ কিছু হাদীস মিথ্যা হয়ে যায়।

শ্রেষ্ঠ সাহাবীগণের (রাঃ) সাথে সম্পর্কিত তরীকার কোন কোন ওলী নবুওতের মাকামের ফায়েযের আংশিক বিলায়েতকে সমগ্র বিলায়েত মনে করে

www.pathagar.org

বা অংশকে সমষ্টি মনে করে নবুওতের ফায়েজ ও তাঁর সন্নিহিত স্থানের ফায়েজ বর্ণনা কালে ইজতিহাদ করার সময় যে সব মন্তব্য করেছেন, উদাহরণ স্বরূপ তাওহীদ দু'বার, এক বার সিফাতী নূর ও অন্য বার যাতী সত্তার অনাদি আদিম গুপ্তভান্ডার রূপ নূরে; তাঁরা শুধু সিফাতী নূরের তাওহীদ বলেছেন এবং সিফাতী তাওহীদকে যাতী তাওহীদ মনে করেছেন, আবদিয়াতের মাকামকে বিলায়েতের শেষ বলেছেন, অথচ আবদিয়াতের শেষ পর্যায়ে তাযকিয়া নাফ্স হয়। ইত্যাদি কিছু কিছু ইজতিহাদ পাক পানজাতনের সাথে সম্পর্কিত তরীকার ওলীদের সমগ্র বিলায়েত বর্ণনার সাথে মিলে না। ইজতিহাদে না মিললেও ফায়েযের ব্যাপারে নবুওতের ফায়েজ পর্যন্ত দু'সম্প্রদায় একই আছেন। তাই পাক পানজাতনের সাথে সম্পর্কিত তরীকার কামলিয়াত ও বিলায়েতের ধারণার সাথে শ্রেষ্ঠ সাহাবীদের সাথে সম্পর্কিত তরীকার বুযুর্গদের ধারণার কিছুটা পার্থক্য আছে।

বিলায়েতের অধ্যায় বর্ণনায় জনসাধারণ ও তরীকার প্রাথমিক শিক্ষার্থী এবং যারা তরীকায় দাখিল হওয়ার জন্য চিন্তা-ভাবনা করছেন, তাঁদের একটা বিভ্রান্তি আসতে পারে যে, শ্রেষ্ঠ সাহাবীদের সাথে সম্পর্কিত তরীকায় দাখিল না হয়ে পাক পানজাতনের সাথে সম্পর্কিত তরীকায় দাখিল হয়ে যাওয়াই উৎকৃষ্ট। এ জন্য এই অধম বিলায়েতের অধ্যায় লিখতে অনেক ইতঃস্তত করেছি, তরীকতের এ শীর্ষচূড়া লিখব কি না। না লিখলে তরীকতের বর্ণনা অসম্পূর্ণ থাকে এবং অসম্পূর্ণতার জন্য আরো বিভ্রান্তির আশংকায় এ অধ্যায় লিখতে বাধ্য হলাম। ইসলামের শীর্ষচূড়া খিলাফত, খিলাফতের শীর্ষস্থানীয় হলেন হযরত আবু বকর (রাঃ) আর তরীকতের শীর্ষচূড়া হলো বিলায়েত, বিলায়েতের মধ্যে উম্মতের শীর্ষস্থানীয় হলেন হজরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু। যদিও এ অধ্যায় লিখার যোগ্যতা আমার আছে বলে মনে করি না। বিলায়েত নিয়ে মাশায়েখগণ চিন্তাভাবনা করেন, আর সাধারণ লোক কারামতের উপর জোর দেয় এবং সেটাই বড় মনে করে।

মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন যে, পাক পানজাতনের সাথে সম্পর্কিত তরীকার প্রায় অধিকাংশ তরীকা যেমন রাসূলুলাহ (সাঃ) এর বংশধরদের কাছে আল্লাহ্তায়ালা নাযিল করেছেন, তেমনি শ্রেষ্ঠ সাহাবীদের সাথে সম্পর্কিত তরীকাও যখন প্রয়োজন মনে করেছেন আল্লাহ্তায়ালাই নাযিল করেছেন। দু'জাতীয় তরীকাতেই বৈশিষ্ট্য আছে এবং রাসূলুলাহ (সাঃ) মারফত নাযিল

www.pathagar.org

হয়েছে। দু'জাতীয় তরীকার দ্বারাই নিজকে পবিত্র করা যায়, তাযকিয়া নাফ্স হওয়া যায়। তাযকিয়া নাফ্স্ হলেই নবুওতের ফায়েজ আসে। নবুওতের ফায়েজ পূর্ণ হলে সালিক যদি বিলায়েত লাভ করতে উচ্চাকাংখী হন, তবে শ্রেষ্ঠ সাহাবী যার নিস্বতের উপর তরীকা নাযিল হয়েছে, তাঁর কাছে অথবা রাসূলুলাহ (সাঃ) এর কাছে এবং সর্বোপরি আল্লাহ্তায়ালার কাছে বিলায়েতের তিন মাকামের আবেদন জানালে সালিকের তক্দীরে বিলায়েত থাকলে তাঁরা আলী (কা) এর সাথে অর্থাৎ পাক পানজাতনের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারেন। বিলায়েত প্রাপ্ত কোন ওলীর সন্ধান জানা থাকলে তিনিও তাঁর তরীকায় দাখিল করিয়ে এ তিন মাকাম তায় করিয়ে দিতে পারেন। শায়েখ পাওয়া গেলে শেষোক্ত পদ্ধতিই উত্তম।

যারা তরীকায় দাখিল হতে চান, তাঁদের তরীকা দেখার চেয়ে শায়েখ দেখা জরুরী। শায়েখ কামিল ও তাঁর বেশী ফায়েযের উপর মুরীদের তরক্কী নির্ভর করে। পাক পানজাতনের সাথে সম্পর্কিত হলেই চলবে না, যদি শায়েখের ফায়েজ বেশী না থাকে। পাক পানজাতনের সাথেই সম্পর্কিত হউক, আর শ্রেষ্ঠ সাহাবীগণের সাথে সম্পর্কিত হউক, শায়েখ উপযুক্ত হলে মুরীদ বঞ্চিত হবেন না, যদি রিয়াযত-মেহনত করেন। যারা তকদীরে যা আছে, তা পাবার জন্য সেই অনুযায়ীই কাজ করবেন, এতে কারো হাত নেই।

অনেকে বলেন, আল্লাহ্তায়ালাতে ফানা-বাকা হওয়ার নামই বিলায়েত। কথাটা সত্য, কিন্তু না বুঝলে এতেও বিভ্রান্তি আছে। বাকাবিল্লাহর মাকামে তাওহীদের সিফাতী নূরে ফানা-বাকাকে আল্লাহ্তায়ালায় ফানা-বাকা বলে, আবার নবুওতের মাকামে ওসলকেও অনেকে আল্লাহ্তায়ালাতে ফানা-বাকা বলেন, এ সব স্তরের ফানা-বাকাতে বিলায়েত হাঁসিল হয় না। আল্লাহু জাল্লা শানুহুর হাকীকতে অর্থাৎ গুপ্তভান্ডার রূপ নূরে ফানা-বাকাকেই সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্তায়ালার হাকীকতে ফানা-বাকা বলা চলে। তখনই বিলায়েতের ফায়েজ লাভ হয়। তখন আল্লাহ্তায়ালা বান্দাকে কবুল করলেই বিলায়েত লাভ হয় এবং হযরত আলী (রাঃ) বায়আত করেন। রাসূলুলাহ (সাঃ) এর উসিলায় তাঁর উম্মতকে আল্লাহ্তায়ালা এ মর্যাদা দেন। সার্বিক ইসলামের দৃষ্টি ভঙ্গিতে বিলায়েত পেলেও, সাহাবীগণের মধ্যে যারা বিলায়েত পাননি, তাঁদের মতও মর্যাদা পাওয়া যায় না, আবার সাহাবাগণ বা উম্মতগণ নবীগণের মত মর্যাদা

www.pathagar.org

পান না। সৎ কর্মের দ্বারা, জিহাদ দ্বারা ও রাসূলুলাহ (সাঃ) এর সাথী হিসাবে সাহাবাগণ বিপুল মর্যাদার অধিকারী।

আল্লাহু জাল্লা শানুহুর হাকীকতে ফানা-বাকা লাভ করাই আল্লাহ্তায়ালাতে ফানা-বাকা লাভ করা বোঝায়। এ ফানা-বাকা লাভ করাই হলো পরিপূর্ণ বিলায়েত লাভ করা-যা রাসূলুলাহ (সাঃ) কে আল্লাহ্তায়ালা খাস ভাবে দান করেছিলেন।

ক্বদমীয়া তরীকা পাক পানজাতনের সাথে সম্পর্কিত বলে ক্বদমীয়া তরীকার ইমাম সাহেব হজরত সৈয়দ আমজাদ আলী শাহ (র) এবং তাঁর পরবর্তী খলিফাগণ আল্লাহু জাল্লা শানুহুর মাকাম তায় না করলে কাউকে খিলাফত দান করেন নি। আমার শায়েখ হযরত আবদুল (রহঃ) আনসারী (র) এ নীতি কঠোর ভাবে পালন করে গেছেন। তরীকত স্রষ্ঠার সাথে কারবার, অনুমান কল্পনার মনগড়া কারবার এতে নেই। নবুওতের উপরের ফায়েজসমূহের উপর আমল হয়েছে। এবং সাফল্য অর্জিত হয়েছে, এ তরীকার অনেকে বিলায়েত লাভ করেছেন, একে অস্বীকারের উপায় নেই।

আমার শায়েখ বুযুর্গ সাহেবে বিলায়েত হযরত আবদুল (রহঃ) আনসারী (র) একদিন নিরিবিলিতে আমাকে তাঁর পাক জবানে ফরমালেন - "যারা ক্বদমীয়া তরীকার সাহায্যে বিলায়েত প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ তরীকতের সকল মাকাম তায় করে বিলায়েত পান), তাঁরা সমস্ত তরীকার তা'লীম দিতে পারেন। কারণ আল্লাহু জাল্লা শানুহুর হাকীকতে ফানা-বাকা হওয়ার পর তরীকাগুলোর মধ্যে আর কোন ব্যবধান থাকে না, সব এক হয়ে যায়। তখন যে কোন তরীকার ফায়েজ দ্বারা তা'লীম দেওয়া যায়। বিখ্যাত চার তরীকার ইমাম সাহেবগণ সহ আমাকে বহু তরীকার ইমামগণ তাঁদের তরীকার সাহায্যে তা'লীম দিতে অনুরোধ জানিয়েছেন এবং এজাযত দিয়েছেন। কিন্তু আমার ইমাম সাহেব, বড় সাহেব ও মেঝো সাহেবের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখে তরীকায় দাখিলের জন্য নতুন লোক এলে ক্বদমীয়া তরীকায় তা'লীম দেই। কারণ আমি তো এ তরীকারই রূহানী সন্তান। কিন্তু অন্য যে কোন তরীকার যে কোন মাকামের সালিক আমার কাছে এলে তার রিয়াযতকৃত তরীকার ফায়েজ দ্বারা তা'লীম দিতে পারি।"

www.pathagar.org

এখানে সাহেব কেবলা "আমার ইমাম সাহেব" বলতে ক্বদমীয়া তরীকার ইমাম মাহবুবে রহমানী হযরত সৈয়দ আমজাদ আলী শাহ (র), 'বড় সাহেব' বলতে ক্বদমীয়া তরীকার প্রথম গদিনশীন খলিফা ও ইমাম সাহেবের জেষ্ঠ্যপুত্র হযরত সৈয়দ আজমল আলী শাহ (র) এবং 'মেঝো সাহেব' বলতে হযরত সৈয়দ আজমল আলী শাহ (র) এর খলিফা এবং তরীকার ইমাম সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র হযরত সৈয়দ আবুল হাসান আহসান আলী শা'হ (র) সাহেবকে বুঝিয়েছেন। হযরত আবদুল (রহঃ) আনসারী (র) হযরত সৈয়দ আবুল হাসান আহসান আলী শাহ (র) এর মুরীদ ও খলীফা ছিলেন। ইমাম সাহেব ও তাঁর দু'পুত্রের মাযার মুনশীগঞ্জ জিলার সিরাজদিখান উপজিলার পাউসার গ্রামে অবস্থিত। আর হযরত আবদুল (রহঃ) আনসারী (র) এর মাযার সিলেট জিলার জালালপুর গ্রামের পূর্বভাগে অবস্থিত। সাহেবে বিলায়েত বলে তাঁদেরকে সংক্ষেপে সাহেব বলে সম্বোধন করা হত। পীর সাহেব বলা হতো খুবই কম। মুরীদগণ সাহেব বলেই সম্বোধন করতেন।

বোঝা গেল যে, আসল বিলায়েত হলো রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ছায়া ও তাঁর কদম মুবারকের নীচে অবস্থান নেওয়া। আর ছায়া বিলায়েত হলো নবুওতের ফায়েযে অন্যান্য উলুল আযম পয়গাম্বর সাহেবগণের পদতলে অবস্থান গ্রহণ। ছায়া বিলায়েত সামান্য অপরাধে ছুটে যেতে পারে। আর আসল বিলায়েত চলে যাওয়ার সম্ভাবনা কম, কারণ এতে বান্দার কোন আলাদা ইচ্ছা থাকে না, পূর্র সংশোধিত পরিশুদ্ধ আত্মার আবদাল হয়ে যায়। তবে কোন কিছুরই গ্যারান্টি নেই, বিলায়েত নিয়ে মরতে পারলেই গ্যারান্টি। মাহবুবুল্লাহ ও হাবিুল্লাহ্ একজনই। তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)। তবে তাঁর ওছিলায় তাঁর আওলাদ ও বিলায়েত প্রাপ্ত ওলীগণ মাহবুব উপাধী পান। তারা পরিপূর্ণ মানবতা অর্জন করেন বলে সিদ্দিকুল্লাহ্ উপাধী পেতে পারেন।

বিলায়েত ও দীদার-এ-ইলাহী সম্বন্ধে মোটামুটি বলা হলো, এতে বিশ্বাস করলে জ্ঞান হবে। আর জ্ঞান অনুযায়ী আখিরাতে মর্যাদা পাওয়া যাবে। জ্ঞানের মিষ্টতার সাথে আমলের তিক্ততা বরদাস্ত করতে পারলে তা নূরে পরিণত হয়ে আল্লাহ্তায়ালার নূরে ফানা হবে, নূর নূরকে আকর্ষণ করে বলে বিভিন্ন নূরের তাজাল্লী হবে, তা আত্মাতে গিয়ে মিশবে। আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলী লাভ করে আত্মা শক্তিশালী ও সৌন্দর্য মন্ডিত হবে। শ্রেষ্ঠ সাহাবীদের সাথে সম্পর্কিত

www.pathagar.org

তরীকাত ওলীগণ ইজতিহাদে ভুল করে নবুওতের ফায়েজকে সর্বশেষ ফায়েজ মনে করে নবুওতের নীচে বিলায়েত মনে করে আবদিয়াতকে বিলায়েতের শেষ বলেছেন। যার ফলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর শ্রেষ্ঠত্ব ম্লান হয়ে যায় এবং এ সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদীসসমূহের সাথে সামঞ্জস্য হয় না এবং নবুওতের মাকামের উপরের ফায়েজসমূহের অস্বীকারত্ব ঘটে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নবুয়ত ও অন্যান্য নবীদের নবুওতে সুক্ষ্ম ব্যবধান আছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নবুওতের নীচে উম্মতের বিলায়েত বললে অনেকটা সঠিক হয়। বিলায়েতের কারণে উম্মতে মুহাম্মদীর শ্রেষ্ঠত্ব আছে অন্যান্য নবীদের উম্মত হতে।

দাসত্বে গিয়ে আমল না করলে পাথরের উপর পতিত ধুলা-বালির মত ঝড়-ঝঞ্জায় উড়ে যাবে অর্থাৎ রোগে, শোকে ও মৃত্যু কষ্টে এ জ্ঞান টিকিয়ে রাখা মুশকিল হবে, প্রেম বজায় থাকবে না। ঈমান অনুযায়ী আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহ এবং জ্ঞান অনুযায়ী আখিরাতে মর্যাদা পাওয়া যাবে। জ্ঞান ও গুণকে আল্লাহ্র নূরে ফানা করে দিতে পারলে আল্লাহ্র জ্ঞানে জানা, আল্লাহ্র দেওয়া দৃষ্টিশক্তিতে আত্মা এর সৌন্দর্য দেখে শুনে তাঁর প্রেমে বিভোর হয়ে থাকতে পারবে।

এ অধ্যায় সমাপ্তির পূর্বে আবার সতর্ক হতে বলছি, আমরা যেন সাহাবীগণের মত নাযিলকৃত তরীকার ইমাম সাহেবগণ এবং তাদের অনুসারী বিলায়েত প্রাপ্ত স্বীকৃত আউলিয়াগণকে যেন ছোট-বড় মনে না করি। কারণ মৃত্যুর সময়ও আলাহ্তাআলা কাউকে পূর্ণ বিলায়েত নিয়ম মাফিক দিয়ে দুনিয়া হতে উঠাতে পারেন। আউলিয়াগণ দুনিয়াতে ঈমানের সাক্ষী। বিলায়েত প্রাপ্ত ওলীগণ আল্লাহ্তায়ালার মনোনীত পীর বা শায়েখ এবং স্বয়ং ঈমান।

এখন বিলায়েতের এবং কামালিয়াতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দু'টো ফায়েজ মুহব্বত ও ইরাদতের বর্ণনা দিয়ে এ পুস্তকের সমাপ্তি টানছি। সালিকগণের জন্য এগুলো জানা ও বোঝা অত্যাবশ্যক।

www.pathagar.org

মুহব্বত

সমগ্র তরীকতের সাধনার মধ্যে মুহব্বত এবং ইরাদতের অনুশীলনই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য দু'টো আলাদা অধ্যায়ে বিষয় দু'টোর বিস্তারিত আলোচনা করা হবে, যাতে সালেকগণের বিষয়টি বুঝতে সুবিধা হয়। তিনটি মাকামে মুহব্বত ও ইরাদতে ফানা হতে এবং সমস্ত মাকামে এর প্রভাব ও খিয়াল বজায় রাখতে হয়। ফানাফিশ শায়েখের মাকামে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মুহব্বত ও ইরাদায় ফানা হতে হয়। শায়েখ ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ইরাদায় বিলীন হওয়া আল্লাহ্তায়ালার মুহব্বত ও ইরাদায় বিলীন হওয়ার উপলক্ষ্য ও পূর্বশর্ত। আসল হলো ফানাফিল্লাহতে আল্লাহ্তায়ালার মুহব্বত ও ইরাদাতে ফানা হওয়া।

সকল আলিমগণ একমত যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল মকবুল (সাঃ) এর প্রতি মুহব্বত থাকা ফরজ। আল্লাহ্তায়ালার আদেশ-নিষেধ অবশ্য সে প্রেমের অনুসন্ধান করে। আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, "যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে দয়াময় তাদের জন্য সৃষ্টি করবেন ভালবাসা।" ১৯ঃ৯৬

বল! তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন।" ৩ঃ৩১। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্তায়ালা এ কথা পাক কোরআনে বলেছেন।

"আল্লাহ্ সৎ কর্মপরায়ণদের ভালবাসেন।" ৫ঃ৯৩। "তিনি তাদের ভালবাসেন, তারাও তাঁকে ভালবাসেন।"৫ঃ৫৪।

"আল্লাহ্তায়ালা তওবাহ্কারীকে ভালবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে, তাদেরও ভালবাসেন। ২ঃ ২২২।

আল্লাহ্তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে উদ্দেশ্য করে আরো বলেছেন- "বল, তোমাদের পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি, তোমাদের ভ্রাতাগণ, তোমাদের পত্নী, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, যে ধন সম্পদ তোমরা অর্জন করেছ, যে ব্যবসায় মন্দার ভয় কর এবং যে গৃহ তোমাদের সন্তুষ্টি দেয়, তা কি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের চেয়ে অধিক প্রিয় এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদের চেয়ে অধিক ভালবাস।" ৯ঃ২৪

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন- "আল্লাহ্ তোমাদের সম্পদের রিজিক দিয়েছেন, সে জন্য তাঁকে ভালবাস। আল্লাহ্ আমাকে ভালবাসেন বলে আমাকে ভালবাস।"

www.pathagar.org

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দোয়াতে বলতেন-"হে আল্লাহ্ চাই ! তোমার ভালবাসা, যে তোমাকে ভালবাসে তার ভালবাসা, যে বস্তু তোমার ভালবাসার নিকটবর্তী করে তাঁর ভালবাসা। তোমার ভালবাসাকে শীতল পানির চেয়েও আমার নিকট অধিক প্রিয় কর।"

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন- "যে ব্যক্তি বহু পরিজন নিয়ে সৎভাবে জীবন যাপন করে, আল্লাহ্ তাকে ভালবাসেন।"

হযরত নবী করিম (সাঃ) কে হজরত আবু রাজিন ওকাইলী (রাঃ) জিজ্ঞেস করেছিলেন- "ইয়া রসুলুল্লাহ! ঈমান কি? তিনি বললেন- ঈমানের অর্থ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে সর্ববিধ পদার্থের চেয়ে অধিক ভালবাসা।" এই ভালবাসা পরিপূর্ণ হওয়ার নাম বিলায়েত লাভ করা, আর এই ভালবাসা লাভ করার সুশৃংখল পদ্ধতির নাম তরীকত।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলে গেছেন- "তোমাদের ভিতর কেউ ঈমানদার হতে পারে না, যে পর্যন্ত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল অন্যান্য পদার্থ অপেক্ষা তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় না হয়।"

তরীকত যেহেতু সর্বোচ্চ ঈমান লাভ করার পদ্ধতি, সর্বোচ্চ ঈমান হলো, আল্লাহ্তায়ালাকে শেষ পর্যন্ত জেনে স্বয়ং ঈমান হয়ে যাওয়া। সে জন্য তরীকত মুহব্বতের উপর বেশী গুরুত্ব দেয়।

কোন কিছুর প্রতি যদি মনের ও নিজ স্বভাবের আকর্ষণ প্রবল হয়, তবে তাকে মুহব্বত বা ভালবাসা বলা হয়। সেই আকর্ষণ যদি শক্তিশালী দৃঢ় ও স্থায়ীভাবে প্রবল হয়, তখন তাকে ইশ্ক বা প্রেম বলে।

মানুষের ছয়টি জ্ঞান-ইন্দ্রিয় ছয়টি বিষয়ের উপর স্থাপিত। যেমন চোখ সুন্দর আকৃতি, দৃশ্য ও রং দেখলে পরিতৃপ্ত হয় বলে তা ভালবাসে। তেমনি কানের তৃপ্তি হয় সুমিষ্ট স্বরে, নাকের তৃপ্তি সুগন্ধির আঘ্রাণে, জিহবার তৃপ্তি সুস্বাদু খাদ্যে, ত্বকের তৃপ্তি সুকোমল স্পর্শে। এই পরিতৃপ্তি মানুষ ও পশু ভালবাসে। মানুষের বিশেষত্ব হলো ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কল্ব বা হৃদয়ের পরিতৃপ্তি। কল্বে বুদ্ধি ও নূর উৎপন্ন হয়। সেই নূরের দ্বারা সৌন্দর্য দেখে, সুমিষ্ট স্বর শুনে, সুগন্ধি পেয়ে হৃদয় অপার আনন্দ লাভ করে ও পরিতৃপ্ত হয়। আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্ব দেখে বা তাঁর কারুকার্য ও রং-বেরংয়ের সৌন্দর্য দেখে সে অভিভূত হয়, ফলে আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসায় তার মন-প্রাণ আপ্লুত হয়ে যায়।

মানুষ সব চেয়ে বেশী তার অস্তিত্বকে ভালবাসে, নিজকে ভালবাসে, তার জীবনকে ভালবাসে। যিনি বুদ্ধিমান, তিনি উপলব্ধি করেন, আল্লাহ্তায়ালার

www.pathagar.org

জন্যই তার অস্তিত্ব ও জীবন। তাঁর সুখ-দুঃখ, প্রতিপালন ও রিযিক দান ইত্যাদি যাবতীয় চরম উপকার আল্লাহ্তায়ালার দ্বারা ঘটছে। স্বভাবগত ভাবে মানুষ উপকারীর গোলাম। সে যদি গভীর চিন্তা করে, তবে বুঝতে পারবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া তার কোন উপকারী স্বত্তা নেই।

সবাই চায় নিজের ও পরিবারের তথা সন্তান-সন্ততির সুখ, নিরাপত্তা, সুস্থতা ও আর্থিক স্বচ্ছলতা। সে যা কামনা করে, তা দান করার একমাত্র মালিক আল্লাহ্তায়ালা। তাই বুদ্ধিমান মেধাবীর কাছে আল্লাহ্ ছাড়া কেউ ভালবাসার পাত্র হতে পারে না। অনেকে জ্ঞানের জন্য, গুণের জন্য, সৌন্দর্যের জন্য, ক্ষমতার জন্য অন্যকে ভালবাসে। কিন্তু জ্ঞান, গুণ, ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ্তায়ালা। কারো সাথে গুপ্ত সম্পর্ক থাকলে তাকে ভালবাসতে পারে। মানুষ আল্লাহ্তায়ালার সাথে সবচেয়ে বেশী গুপ্ত সম্পর্ক গড়তে পারে অন্তরের সাহায্যে, যার খবর ফিরিশতারা পর্যন্ত রাখে না।

যখন উভয়ের স্বভাব ও প্রকৃতি এক হয়, ব্যবধান না থাকে, তখন ভালবাসা ইশক বা প্রেমে রূপান্তরিত হয়। আল্লাহ্তায়ালার স্বভাব হলো রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর স্বভাব, এ স্বভাব-চরিত্র গ্রহণ করলে আল্লাহ্তায়ালার স্বভাবে মিলে যায়, তখন আল্লাহ্তায়ালাকে ভালবাসলে তা ইশকে রূপান্তরিত হয়। আল্লাহ্তায়ালা চান যে, বান্দা তাঁর স্বভাব গ্রহণ করুক, এটাই ইরাদত। মুহব্বত ছাড়া ইরাদত সম্পূর্ণ হয় না, আবার ইরাদত ছাড়া মুহব্বত পরিপূর্ণ হয় না।

যে আল্লাহ্তায়ালাকে চিনতে ও বুঝতে পারেনি, সেই কেবল আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যের সাথে বা ভিন্ন পদার্থের সাথে মুহব্বত রাখতে পারে। আল্লাহ্ সম্বন্ধে অজ্ঞতাই এ জন্য দায়ী।

আল্লাহ্ ভিন্ন সকল পদার্থই ধ্বংসশীল, ত্রুটিপূর্ণ ও মুখাপেক্ষী। আল্লাহ্তায়ালা ত্রুটিমুক্ত, মুখাপেক্ষীহীন ও অভাবমুক্ত, দুনিয়া ও আখিরাতে একমাত্র উপকারী সত্তা ও সাহায্যকারী। মানুষ দান বা অন্যের উপকার করে দুনিয়া বা আখিরাতের কোন স্বার্থের জন্য, আর আল্লাহ্তায়ালা বিনা উপকারে ও স্বার্থে দান করেন, দয়া করেন ও উপকার করেন, মানুষকে অন্যের উপকার বা দান করতে বাধ্য করেন। তিনি সকল উপকার, দান ও দয়ার মূল। তাই তিনি ভিন্ন আর কেউ মাহবুব হতে পারে না।

আল্লাহ্তায়ালার মা'রিফাত, ফিরিশ্তা, বেহেশ্ত, দোযখ ও আল্লাহ্র রাজত্বের গুপ্ত জ্ঞানে যে আনন্দ হয়, অন্য কোন জ্ঞানে সে আনন্দ হয় না। পাতাল হতে আরশ, আরশ হতে নূরে মুহাম্মদী পর্যন্ত, জড় জগত হতে নূরী

www.pathagar.org

জগতের শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্তায়ালার বিশাল সাম্রাজ্যের পরিচালনা জ্ঞান, সমস্ত জ্ঞান হতে শ্রেষ্ঠ। এর দ্বারা যে আনন্দ পাওয়া যায়, মৃত্যুর পর সে আনন্দ আরো বেড়ে যায় এবং জ্ঞানের আরো উন্নয়ন ঘটে। মা'রিফাতের আনন্দের সাথে আল্লাহ্র দীদার যুক্ত হয়ে আত্মাকে এত ঐশ্বর্য্যময় করে যে, বেহেশ্তের আনন্দ এর সামনে তুচ্ছ প্রেমাস্পদের দর্শনে প্রেমিকের মনে প্রেম উদ্বেলিত হয়ে উঠে, তখন হুশ হারা হয়ে যায়।

আল্লাহ্র প্রতি প্রেম অর্জনের উপায় হলো আল্লাহ্ সম্মন্ধে জ্ঞান লাভ করা, তার মত স্বভাববিশিষ্ট হওয়া এবং আল্লাহ্ ভিন্ন পদার্থ মন থেকে বের করে ফেলা। দুনিয়ার সকল ভালবাসার পদার্থ মন থেকে বের করে 'লা মাহবুবা ইল্লাল্লাহ্'-তে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করা। এ জন্য সূফীরা ফানাফিল্লাহ্ ও অন্যান্য কুরবত ও ওসলের অর্থাৎ নৈকট্য এবং মিলনের ফায়েযে লা মাহবুবা ইল্লাল্লাহ্র নফি-ইস্বাতের যিকির করেন এবং আল্লাহ্ ভিন্ন সকল ভালবাসা বিদূরিত করার চিন্তা-ফিকিরে থাকেন।

অন্তরে দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা থাকলে আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসা আসতে পারে না। দুনিয়া বলতে সন্তান, পরিবার-পরিজন, সংসার, ধন-দৌলত, আত্মীয়-স্বজন, জায়গা-জমি, বাড়ী-ঘর, গরু-ছাগল, ফল-ফুলের বাগান ও ভোগ-সম্ভোগের দ্রব্যাদি বুঝায়। আল্লাহ্ ভিন্ন সব কিছুই দুনিয়া। এই দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য বা অনাসক্তি আনতে না পারলে এ সবের চিন্তা-ভাবনা মন থেকে দূর না করতে পারলে শুধু যিকিরে আল্লাহ্ প্রেম আসেন না। অন্তর হতে এসব দূর করে যিকির ও আল্লাহ্ সম্মন্ধে চিন্তা-ভাবনার দ্বারা আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসার শক্তি বাড়াতে হয়।

সাংসারিক বন্ধন হতে মনকে মুক্ত করে আল্লাহ্র চিন্তা, তিনিই একমাত্র উপকারী সত্তা-এ উপলব্ধি আয়ত্তে আনা, অনবরত যিকির, অল্প কথা, মানুষের সাথে মেলা-মেশা নেহায়েত প্রয়োজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে শরীয়ত ও তরীকত মুতাবিক রিয়াযত-মেহনত করলে আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসা দৃঢ় হয়ে প্রেম সৃষ্টি হয়।

সর্বক্ষণ আল্লাহ্তায়ালা আমাদের দেখছেন, কথা শুনছেন, মনের কথা জানছেন এবং আমাদের সাথে আছেন, মু'মিনদের অভিভাবক এবং তিনি সব কিছুর নিয়ামক-এ সত্যগুলোকে সব সময় মনে এনে সর্বক্ষণ যিকির করতে হবে এবং সৃষ্টিতে আল্লাহ্তায়ালার নিদর্শন অন্বেষণ করতে হবে এবং এ সব থেকে উপদেশ নিতে হবে। আসমান-যমিনে তার রাজত্বের বিচিত্র কার্যাবলীর চিন্তা-

www.pathagar.org

গবেষণা করতে হবে। আল্লাহ্তায়ালা যেরূপ নিঃস্বার্থ ভাবে আমাদের ভালবাসেন, সেরূপ দুনিয়া-আখিরাত হতে নিঃস্বার্থপরায়ণ হয়ে আল্লাহ্তায়ালাকে ভালবাসতে হবে।

যে আল্লাহ্তায়ালাকে ভালবাসে, মৃত্যুর পর তার সুন্দর অনন্ত জীবন আরম্ভ হবে। দুনিয়াতে নাফ্স শয়তান তাকে বিপথগামী করতে পারবে না। যদি ইরাদত ঠিক রাখে, রোগ-শোক দ্বারা অভিভূত হবে না, আর্থিক ও সামাজিক ভাবে লোকজন দ্বারা কষ্ট ভোগ করলেও মন বিচলিত হবে না। ইরাদত পালনের মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালার সাথে তার যে সম্পর্ক ও প্রেম সৃষ্টি হয়েছে, তাতে সে নিরাপদে তার প্রেমাস্পদের সাক্ষাত লাভ করবে এবং দীদারে মস্ত থাকতে পারবে। প্রেম মজবুত হওয়ার লক্ষণ হলো মৃত্যুকে ভয় না করে সদা তার জন্য প্রস্তুত থাকবে এবং স্রষ্টার সাক্ষাতের জন্য উৎগ্রীব থাকবে।

আল্লাহতাআলা যে সকল কাজ ভালবাসেন, সেগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে আগে করতে হবে এবং দুনিয়ার স্বার্থজনিত কাজগুলোকে পরে করতে হবে এবং মহান স্রষ্টার জন্য বান্দার প্রিয় বস্তুকে কতওবাহ্নী দিয়ে দিতে হবে বা ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। এতে সাময়িক স্বার্থহানী হলেও আল্লাহ্ এ জন্য তাঁর বান্দাকে ধ্বংস করবেন না। মোহ, প্রবৃত্তির অনুসরণ ও অন্যান্য ত্যাগ স্বীকার করে আল্লাহ্র যিকির ও ইবাদতে নিমগ্ন থেকে তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য আগ্রাহান্বিত ও উদ্গ্রীব থাকতে হবে এবং তার সৃষ্টিকে ভালবেসে তাদের খিদমত করতে হবে। এতে প্রেম বৃদ্ধি পাবে।

যে লোক স্রষ্টাকে ভালবেসে তাঁর যিকির ও চিন্তায় বিভোর থাকে, সে আল্লাহ্তায়ালার সাথে সাথে তাঁর বাক্যাবলী কোরআনকে ভালবাসে। তাঁর প্রতিটি বাক্য বা কালাম মান্য করবে, মনে কোনরূপ প্রতিবাদ না এনে। এরই নাম ইরাদত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে আল্লাহ্তাআলা ভালবাসেন বলে তাঁকে মুহব্বত করতে হবে। আউলিয়াগণ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসেন বলে তাঁদের ভালবাসতে হবে। পূর্বকালের নবী-রাসূলগণ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর বন্ধু এবং সাহাবীগণ তাঁর শ্বশুর, জামাতা, আত্মীয় ও বন্ধু বলে তাদের ভালবাসতে হবে। পীর, দরবেশ ও আলেমগণকে আল্লাহ্র অনুসারী ও সালিকের পথের অনুসারী হিসাবে তাদের ভালবাসতে হবে। আল্লাহ্তায়ালার আজ্ঞাবহ লোক গরীব ও মূর্খ হলেও আল্লাহ্র জন্য তাদের ভালবাসতে হবে। এতে প্রেম বাড়বে ও স্থায়ীত্ব পাবে, এক সাথে হাশর হবে এবং আখিরাতে তাঁরা তার সাথী হবে। অনুরূপ পীর ভাইদের ভালবাসতে হবে এবং তাদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

www.pathagar.org

যিনি আল্লাহ্‌কে ভালবাসেন, তিনি নির্জনে যিকির ও নফল ইবাদত এবং মোনাজাত করতে ভালবাসেন এবং এসব ইবাদত তাঁর কাছে সুখকর বলে মনে হয়, ভারী বলে মনে হয় না। তিনি সর্বক্ষণ আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকির করেন, সর্বক্ষণ কোন কারণবশতঃ যিকির করতে না পারলে যে সময়টুকু নষ্ট হয় তার জন্য খুবই দুঃখিত হন, রাতে তা পুষিয়ে নেন বা দান-খয়রাত করে তা পূরণ করে নিতে চেষ্টা করেন। এ জাতীয় লোকদের অনুসরণ করতে হবে।

এ সব লক্ষণ যার মাঝে আছে, তিনি আল্লাহ্‌তায়ালাকে ভালবাসেন বলে মনে করতে হবে। এর মধ্যে যতটুকু অন্য পদার্থের মিশ্রণ হবে ততটুকু কম ভালবাসেন বলে ধরতে হবে। যার মধ্যে ভালবাসার কমতি ও মিশ্রণ আছে, তাকে আন্তরিকভাবে চিন্তা-ভাবনা করে মিশ্রণ বাদ দিয়ে আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসাকে অভ্যাসে পরিণত করতে হবে।

যিনি এভাবে আল্লাহ্‌তালাকে ভালবাসেন, আল্লাহ্‌তায়ালা তাকে ভালবাসেন বলে আশা করা যায়। তাঁর ভালবাসার খাটিত্ব পরীক্ষার জন্য আল্লাহ্ তাকে দুঃখ, বেদনা ও কষ্ট দিতে পারেন, তখন মনে প্রতিবাদ না এনে যদি ভালবাসা বজায় রাখতে পারেন, তাঁর বিধানে সন্তুষ্ট থাকেন, তবেই তার ভালবাসা খাঁটি বলে প্রমাণিত। স্তরে স্তরে পরীক্ষা করে ভালবাসা খাঁটি পেলে আল্লাহ্ তাকে মুহব্বতের উচ্চ স্তরে নিয়ে যাবেন এবং বান্দাকে ভালবাসবেন। স্রষ্টা যখন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন তাঁর যাতী সত্তার আদিম নূরে নিয়ে যাবেন যা সৃষ্ট নয়, যৌগিক নয়। তখন হাদীসে কুদসী অনুযায়ী বান্দার হাত, পা, চোখ, মুখ, অন্তর ও অঙ্গসমূহ আল্লাহ্‌তায়ালার তৎপরতায় পরিণত হবে। তাকে আল্লাতাআলার অদেয় বলে কিছু থাকবে না। এ অবস্থা মনের কল্পনায় ভাবলে হবে না, অন্তরচোখে দেখবে, কানে শুনবে, হৃদয় সাক্ষী দেবে। তখন বান্দা আল্লাহ্‌তায়ালার অদেয় বলে কিছু থাকবে না। এরূপ বান্দাকে কারো নৃশ্বংসতা হতে বাচাঁবার জন্য প্রয়োজন বোধে সমগ্র সৃষ্টি ধ্বংস করে দিতে প্রেমিক আল্লাহ্‌পাক পরোয়া করবেন না। সাবধান। আল্লাহ্ প্রেমিকের অনিষ্টের জন্য তার পিছনে কেউ লাগবেন না, তাঁর সমালোচনা হতে জিহবাকে সংযত রাখবেন, অন্তরকে সংরক্ষিত রাখবেন। এক বন্ধু না জানলেও অন্য বন্ধু সব জানেন, এক বন্ধু বদদোয়া না করলেও অন্য বন্ধু ছাড়বেন না, কঠিন ভাবে পাকড়াও করবেন। আল্লাহ্ প্রেমিককে ভালবাসলে আল্লাহ্‌তায়ালা তাকে ভালবাসবেন। তাঁর কোন প্রয়োজন পূরণ করলে আল্লাহ্ তার প্রয়োজ মিটাবেন।

www.pathagar.org

আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা লোকের নিকট গোপন রাখাই উত্তম-সর্বাবস্থায় ভালবাসার দাবী ত্যাগ করা উচিত। ভালবাসার গোপনীয়তা প্রেমের স্থায়ীত্ব আনে। তবে প্রেমাগ্নি বেশী প্রজ্বলিত হয়ে পড়লে, প্রেম-স্রোত আয়ত্তাধীন না থাকলে, বেইখতিয়ারীতে চলে গেলে আলাদা কথা। প্রাথমিক অবস্থায় এরূপ হতে পারে, শেষে সবর বক্‌শিশ করে আত্মাকে শক্তিশালী করা হয়। কিন্তু ইচ্ছা করে কেউ যদি আল্লাহ্‌র প্রতি তার ভালবাসা ব্যক্ত করে এবং লোকের নিকট আল্লাহ্‌র প্রতি ইংগিত করে বুঝাতে চায় যে, সে আল্লাহ্‌কে ভালবাসে, তবে সে এখনও খাঁটি প্রেমিক হয়নি বলে বুঝতে হবে। কেউ দুনিয়াতে কাউকে ভালবাসলে প্রেমাস্পদ ছাড়া কাউকে বলে না।

যিদি আল্লাহ্‌তায়ালাকে ভালবাসেন, তাঁর রসনা সংযত হয়, তাঁর চলাফেরা, আচরণ ও অংগ-প্রত্যংগই সাক্ষী দেয় যে, তিনি আল্লাহ্‌তায়ালাকে ভালবাসেন। তাঁর জীবনই অকথিত বাণী, তাঁর অবাক্ত বাণী তার আচরণে প্রকাশ পায়।

আল্লাহ্‌তায়ালার বন্ধুত্ব অন্য সকল বন্ধুত্বকে জ্বালিয়ে দেয়, পর্দাসমূহ জ্বলে যায়। আল্লাহ্‌র যিকিরকারী বন্ধু অন্য কিছুকে স্মরণে আনেন না, আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কিছুতে নিমগ্ন হন না, তাঁকে ছাড়া কোন কিছুর প্রতি মনের আকর্ষণ থাকবে না, আসক্ত হন না। আল্লাহ্ প্রেমিক নিজের সকল ইচ্ছাকে জ্বালিয়ে দেন, আল্লাহ্‌র ইচ্ছাই নিজের ইচ্ছার স্থান দখল করে। এরূপ খোদা প্রেমিক সর্বদা আল্লাহ্‌র যিকির করেন, বেশী ঘুম পেলে ঘুমান, বেশী ক্ষুধা পেলে আহার করেন, অতি প্রয়োজনে কথা বলেন, নিজ নাফ্‌সকে তিনি সর্বদা নসিহতে রাখেন। মানুষকে সৎপথে আহ্বান করেন এবং নির্জনে প্রেম-সুধা পান করেন। পাপকে ঘৃণা করে তা হতে বিরত থাকেন এবং আল্লাহ্‌র সব কাজে সন্তুষ্ট থাকেন। লোকে কি করে না ভেবে আল্লাহ্ কি করেন সে দিকে নজর থাকে। এ জাতীয় লোক লোকজনকে তোষামোদ করেন না। আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্যের জন্য সর্বদা উসিলা তালাস করেন। কোন উসিলায় আল্লাহ্ ভালবাসবেন সেই ফিকিরে থাকেন। যারা আল্লাহ্ প্রেমিকদের এ রীতিনীতি অভ্যাসে পরিণত করেন, তাঁর ইরাদত সঠিক হওয়ার কারণে তিনিও একদিন আল্লাহ্ প্রেমিকে পরিণত হয়ে যাবেন। মুহব্বত ও ইরাদত খালেস না হলে ইখলাস সঠিক হয় না, ইখলাস সঠিক না হলে ইবাদত কবুল হয় না।

যিনি আল্লাহ্‌তায়ালার সত্যিকার প্রেমিক হন, তিনি দুনিয়াতে রোগে, শোকে, দুঃখে ও দারিদ্র্যতার দ্বারা নিষ্পেষিত হলেও হাসি মুখে তা বরণ করেন, সবর করেন, আখিরাতে বেহেশ্‌ত, দোযখ ও দুনিয়ার পারোয়া করেন না। আল্লাহ্-

www.pathagar.org

তায়ালাই তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকির হতে শূণ্য থাকাকে দোযখ বলে মনে করেন। যিনি স্রষ্টাকে ভালবাসেন, তিনি সৃষ্টির চিন্তা করেন না। সাগর ও সূর্যের মত উদার, মাটির মত বিনয়ী ও সর্বক্ষণ যিকিরকারী এবং কৃতজ্ঞ বান্দাকেই আল্লাহ্তায়ালা প্রেম করেন। আল্লাহ্ প্রেমিক খোদার দীদার ব্যতীত কিছুতেই সন্তুষ্ট হন না। সৃষ্টির চঞ্চলতা আল্লাহ্তায়ালার আদেশে হয়ে থাকে, এ কথা যিনি জানেন এবং আল্লাহ্তায়ালাকে চিনেন, তিনি মানুষের নিকট আশা-ভরসা করেন না। আল্লাহ্তায়ালার দয়া ও ভালবাসা প্রকাশ্য, নইলে দুনিয়া ছাড়খার হয়ে যেত।

মা'রিফাত ও আল্লাহ্ প্রেমের ভিত্তি হলো দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য উৎগ্রীব না হয়ে আল্লাহ্তায়ালার সাথে প্রেম স্থাপন করা। অর্থাৎ দুনিয়া ও বেহেশতের আশা না করে সব সময় যিকির করা এবং ফরজ-সুন্নত আদায় ও দান-খয়রতা করা। মানুষ ও প্রাণীর চঞ্চলতা ও স্থিরতা আল্লাহ্তায়ালার আইন মাফিক ও তাঁর অনুমোদন ক্রমে হয়। এতে দৃঢ় বিশ্বাস না করলে মা'রিফাত ও প্রেম হাঁসিল হবে না। এ জন্য সর্বক্ষণ যিকির করতে হয় এবং নাফসের তাবেদারী হতে বিরত থাকতে হয়। যিনি দুনিয়া ও আখিরাতের সৃষ্টিকর্তা ও সার্বভোম ক্ষমতার মালিক, তাঁকে ভয় করা কর্তব্য। ভয় প্রেমের পথে বাঁধা স্বরূপ হয় না, বরং সাহায্য করে নাফ্সকে দমনের ব্যাপারে।

রোগ হলে যিনি আরোগ্য দেন, তওবাহ্ করলে কবুল করেন, বাদশাহকে যিনি ফকির করেন, ফকিরকে বাদশা করেন, আমাদের মনের খবর , যিনি সুখ-দুঃখ ও রিযিক দাতা, তার সাথেই বন্ধুত্ব করা উচিত। কারণ তিনি ছাড়া কেউ উপকার বা অপকার করতে পারেন না।

আল্লাহ্তায়ালা যা চান, খোদা প্রেমিক তাই চান, তিনি সুখ-দুঃখ যাই দেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকেন। স্রষ্টার খুশীতে তিনি খুশী থাকেন। দুনিয়া ও আখিরাতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ্তায়ালা, তিনিই প্রভূ, হুকুম দাতা ও সকল ইখতিয়ার একমাত্র তারই। এ সত্যে বিশ্বাস করে সীমা লংঘন হতে বিরত থাকতে হবে। আল্লাহ্র বন্ধু ও প্রেমাস্পদ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর পায়রবী ও নিজের আমিত্বকে কুরবানী করার মধ্যেই মুক্তি ও আধ্যাত্মিক মর্যাদা নিভর করে। আমিত্ব দূর না করা পর্যন্ত আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছা যায় না।

যা কিছু আল্লাহ্ থেকে দূরে রাখে তা ত্যাগ করতে হয়। সেগুলো ত্যাগ করলে বাকী থাকে স্রষ্টার আদেশ। সে আদেশ পালন করতে হয়। নিষেধ পালনে গযব-

www.pathagar.org

আযাব হতে বাঁচা যায়, আদেশ ও উপদেশ পালনে তাঁর নিকটে পৌঁছা যায়। আল্লাহ্তায়ালার সকল কাজে সন্তুষ্টি ও শোকর গোজারী তাকে আল্লাহ্ প্রেমিকে পরিণত করে। স্রষ্টার আদেশকে তিক্ত মনে করে পালন করার চেয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে পালন করার মধ্যে এ মর্যাদা লাভ হয়।

যিকির ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পায়রবীতে অন্তর পরিস্কার হলে কল্ব নূরানী হয় এবং আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টির আলামত জাহির হয়। এতে সালিকের প্রেম বর্ধিত হতে থাকে। ধৈর্য্য ও ইখলাস দ্বারা প্রেম পূর্ণতা লাভ করে। সিদ্দীক বা সত্যপরায়ণ হলে আল্লাহ্র প্রেম জাহির হয়, আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি তাকে সিদ্দীকের মর্যাদায় নিয়ে যায়।

খোদা প্রেমিকের নিন্দা বা প্রশংসা করলে তার কোন প্রতিক্রিয়া হবে না, দু'টোই তার নিকট সমান। মানুষের সাথে বন্ধুত্ব ও প্রেম আল্লাহ্-প্রেম হতে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। সত্য ছাড়া দুনিয়ার সব কিছু তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও তার ভয়ের কোন কারণ নেই। আল্লাহ্তায়ালাই তার জন্য যথেষ্ট। যারা সব কিছু হতে আল্লাহ্কে পছন্দ করেছেন, আল্লাহ্তায়ালাও তাদের সকল লোক হতে পছন্দ করবেন।

সালিক খোদা প্রেমে অস্থির হয়ে তাঁকে না পাওয়ার বেদনায় যে হা হুতাশ করে, তাতে তাঁর ও আল্লাহ্তায়ালার মধ্যকার পরদাসমূহ জ্বালাতে থাকে এবং সে প্রভূর নিকটবর্তী হতে থাকে। যে লোক আপদ-বিপদ হতে রক্ষা পেতে চায় এবং দেহ-মনের শান্তি, তৃপ্তি ও ধর্মের সাহায্যে নিরাপত্তা আকাঙ্ক্ষা করে, সে আল্লাহ্র নৈকট্য হতে দূরে থাকে।

যে খোদার প্রেমে নিমজ্জিত হয়ে নিজকে হারিয়ে ফেলে, সে সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকে। দুনিয়াদার কখনও আল্লাহ্তায়ালার প্রেম পায় না, নিজকেও প্রেমে নিমজ্জিত করতে পারে না। আল্লাহ্র পথে জান-মাল কুরবানী না করতে পারলে প্রেম হাসিল হয় না। নৈকট্য ছাড়া প্রেম আসে না। নৈকট্য হলো, যখন আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন বিষয় মনে আসে না, এলেও সে দিকে লক্ষ্য ও মনযোগ যায় না। আল্লাহ্ প্রেমিকের খোদার দীদার ছাড়া আর কোন আকাঙ্ক্ষা থাকে না, যা দীদার হতে বিরত রাখে সে সব জিনিস আশেক পরিত্যাগ করে।

আল্লাহ্ প্রেমিক অন্তর ও যিকির দ্বারা মুহূর্তগুলোকে কাজে লাগিয়ে জীবন যাপন করেন। তিনি মানুষের মেলামেশা হতে মুক্ত হয়ে যিকিরের স্বাদ লাভ করে মনে শান্তি পান এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর পায়রবীকে শক্তভাবে আকড়ে

www.pathagar.org

থাকেন। খাঁটিত্ব পরীক্ষায় বিপদগ্রস্থ হলেও মাহবুবের জন্য স্বার্থ ত্যাগের ভিতর দিয়ে তার প্রেম প্রকাশ পায়, দুঃখ-কষ্ট আল্লাহ্ প্রেমিকের অন্তরে আছর করতে পারে না।

যে ব্যক্তি সত্যিকার আল্লাহ্ প্রেমিক তাকে দুনিয়ার সমূদয় সম্পদ দান করলেও তা গ্রহণ করবে না, আল্লাহ্র দীদার ও মিলনের পরিবর্তে কিছুই গ্রহণ করবেন না। যিনি নিজ আস্তিত্ব ও কামনা-বাসনা ত্যাগ করেছেন, তিনি আল্লাহ্তায়ালাকে পেয়েছেন। তার জন্য দুনিয়া-আখিরাতের কি দরকার, আল্লাহ্তায়ালাই তার জন্য যথেষ্ট, তিনিই তার দুনিয়া- আখিরাত।

যিনি আল্লাহ্তায়ালাকে চান তিনি যেন আসক্তি নিয়ে অন্য কিছু তালাশ না করেন। প্রেমিকের কোন দাবী থাকবে না, সারা দুনিয়া তার বিরুদ্ধে গেলেও তিনি তাঁর উপর নির্ভর করে অবিচল থাকবেন। দীদার ছাড়া তাঁর কোন চাওয়া নেই। তাঁর ইবাদতের জাক-জমক কম হবে, ধ্যানে ও মনে মনে যিকির হবে বেশী। আল্লাহ্র উপর ভরসা থাকবে। এরূপ লোক মৃত্যুকালে আনন্দিত হবেন, প্রভূর দাসত্ব ও প্রেম ছাড়া এ মর্যাদা লাভ হবে না। সমস্ত কিছু ছেড়ে দুনিয়া হতে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহ্তায়ালার উপর নির্ভর করে তারই আশ্রয়ে বসবাস করবেন। তিনি সত্যনিষ্ঠ হবেন এবং নিজকে কখনও কারো চেয়ে বড় মনে করবেন না।

মুহব্বতের ফায়েজ হাসিল করতে হলে তরীকতের এ সব নীতিমালা পালন করে নফি-ইসবাত 'লা মাহবুবা ইল্লাল্লাহ' এ যিকির ও চিন্তা করলে ইনশাঅল্লাহ শায়েখের উসিলায় মুহব্বতের ফায়েজ হাঁসিল হবে।

এ ফায়েজ পরিপূর্ণ হলে ফানাফিল্লাহ্তে বান্দা মযযুব হয়ে যায়, আল্লাহ্র মুহব্বত ছাড়া কোন দিকে খিয়াল থাকে না, বুদ্ধি-বিবেচনার কোন ইখতিয়ার থাকে না। আল্লাহ্র মুহব্বতে ফানা হয় বলে তার থেকে অসংখ্য কারামত জাহির হতে পারে। রোযা, নামায ও শরীয়তের হুকুমের খিয়াল থাকে না। যতদিন খুশী আল্লাহ্ তাঁকে এরূপ রেখে দেন। মযযুব কোন পীর হতে পারেন না, তাঁকে ভালবাসতে হয়। কিন্তু কোন অবস্থায়ই তাঁকে অনুসরণ -অনুকরণ করা যাবে না, যদি কেউ তা করে, তবে পথভ্রষ্ঠ হয়ে যাবে। যিনি মযযুব হয়েছেন তিনি শরীয়তের হুকুম পালন করেই মযযুব হয়েছেন, আল্লাহ্তায়ালা কোন কারণে মযযুব করে রেখেছেন, তাঁর নাফসের সকল ইখতিয়ার বিলুপ্ত করে দিয়েছেন। ইরাদাতের ফায়েজ এলেই মযযুবী হাল কেটে যায়, প্রয়োজনীয় সারাংশ বজায় থাকে। আবার মুহব্বতের ফায়েজ ছাড়া ইরাদতের ফায়েজ আসে না।

www.pathagar.org

ইরাদত

আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছাই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং শায়েখের ইচ্ছা, সামান্য স্বাতন্ত্র আছে মাত্র। ফানাফিশ শায়েখ, ফানাফির রাসূল ও ফানাফিল্লাহ্তে নিজের প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার ইচ্ছাসমূহ পরিত্যাগ করে পর্যায়ক্রমে শায়েখের ইচ্ছা-যা ফরজ, সুন্নত, যিকির ও তরীকতের নিয়ম-কানুন ইত্যাদি, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ইচ্ছা-যা মূলতঃ সুন্নাহ এবং আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছা-যা কোরআনে ব্যক্ত হয়েছে, এ তিন ইরাদা গ্রহণ করে নিজস্ব ইচ্ছাকে ফানা বা বিলুপ্ত করে দিতে হয়। শায়েখের ইচ্ছা ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ইচ্ছা আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছাতে ফানা হয়ে আছে, তাঁদের আলাদা ইচ্ছা নেই।

ছোটবেলা হতে মানুষের যে কাজ ও চিন্তা করার অভ্যাস হয়ে যায় এবং সেই অনুযায়ী যে স্বভাব গঠিত হয় তা পরিত্যাগ করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধ আন্তরিকভাবে মেনে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর মত চরিত্র গঠনে প্রয়াস চালায় এবং শায়েখের নির্দেশ মত আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকিরে নিজকে নিয়োজিত করে আল্লাহ্ ভিন্ন সকল পদার্থ মন হতে বের করার প্রয়াসে লিপ্ত হয়, তখন তাকে বলা হয় ইরাদত। আল্লাহ্তায়ালাকে পাওয়ার জন্য এ গ্রহণ-বর্জনকে ইরাদত বলে সূফীগণ মনে করেন।

প্রথমে আল্লাহ্কে পাওয়ার ইচ্ছা জন্ম নেয়, তারপর এতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলে তা কার্যকরী করার জন্য তরীকতের পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং এ জন্য ত্যাগ ও পরিশ্রম করার দৃঢ় মনোবল নিয়ে কাজ শুরু করে, একে বলা হয় ইরাদত। সুষ্ঠুভাবে আন্তরিকতার সাথে প্রচেষ্টা চালালে নিজের ইচ্ছাকে বিলীন করে পর্যায় ক্রমে উপরোক্ত তিন ইচ্ছা বিসর্জন ও আল্লাহ্র ইচ্ছা গ্রহণে সাহায্য করে। এ ইরাদতে ফানা না হয়ে কেউ কামিল হতে পারে না।

আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কাউকে সমস্যা সমাধানের কর্তা বলে মনে না করে সব কিছুকে উপলক্ষ্য মনে করলে ইরাদত নষ্ট হয় না, কিন্তু আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কিছুকে উপলক্ষ্য বা উসিলা মনে না করে কাজ সমাধানের কর্তা মনে করলে ইরাদত থাকে না, শিরক হয়ে যায়।

প্রকৃতি ও মানুষের দ্বারা যে সব কার্যাবলী সংগঠিত হচ্ছে তার মূল কারণ অর্থাৎ কার্যকারণ সম্পর্ক সৃষ্টি করেছেন। সে সব কার্য ও কারণ তিনি সময় মত মিলিয়ে দেন। এমন কি প্রাণীর ইচ্ছা জাগ্রত হওয়ার উপায়-উপকরণ ও শক্তি

www.pathagar.org

তিনিই দান করেছেন। অভাব ও সমৃদ্ধি তিনি দান করেছেন। অভাবী লোক যে ব্যাপারে তার অভাব আছে তা পূরণের জন্য ইচ্ছা করবে। সম্পদশালী ব্যক্তি ধনের নিরাপত্তা ও তা ব্যয় করতে ইচ্ছা করবে, এ ইচ্ছাটা যদি শরীয়ত অনুযায়ী হয়, তবে তা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তথা আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছানুযায়ী হবে। অর্থাৎ অভাবী হলে জায়েয পথে অভাব পূরণের প্রচেষ্টা চালাবে। সম্পদ শালী হলে দান-খয়রাত ও সৎ কাজে ব্যয় করে আল্লাহ্র ইচ্ছা পূরণ করবে। এতে ইরাদত সঠিক হলো। আর প্রবৃত্তির ইচ্ছানুযায়ী নাজায়েয পথে আয়-ব্যয় করলে ও শক্তি অনুযায়ী অন্যের উপর জুলুম করলে ইরাদত বিনষ্ট হবে, কেননা এতে আত্মা কলুষিত হওয়ার কারণে শায়েখের দেওয়া ফায়েজ শয়তান ও নাফ্স্ খেয়ে ফেলবে। দুনিয়া ও আখিরাতে দু'স্থানেই আত্মার উপর যুলুমের ফলে বিপন্ন হবে।

সর্ব অবস্থায় আল্লাহ্তায়ালা ইচ্ছা করেন মানুষ তাঁর রাসূল (সাঃ)কে অনুকরণ-অনুসরণ করুক, তাঁর আদেশ নিষেধ মানুক, তাঁকে ভালবাসুক। এ ইচ্ছার মধ্যে সালিকের সকল ইচ্ছা বিলীন করতে হবে। শায়েখের ইচ্ছা অনুযায়ী তরীকতের নিয়ম-নীতিমালাতে নিজকে নিমজ্জিত করবে।

প্রকৃতি ও মানুষের দ্বারা যে সব কার্য-কারণ সংগঠিত হচ্ছে, সে সব কার্যকারণ আল্লাহ্তায়ালা সৃষ্টি করেছেন ও সময় মত মিলিয়ে সব কিছু পরিচালনা করছেন। সময় মত তিনি কারণের উদ্ভব ঘটান, তিনি অনুমতি দিলে ঘটে, নইলে ঘটে না। মেঘমালার সৃষ্টি হলেই বৃষ্টি হয় না, গাছে ফুল হলেই ফল হয় না। পরস্পর বিবাদ ও উত্তেজনা সৃষ্টি হলেই মারামারি বা সংগ্রাম শুরু হয় না। আল্লাহ্তায়ালা অনুমতি দিলে ঘটনাটি সংঘটিত হয়, নইলে অন্য কারণ বা উসিলা সৃষ্টি করেন, ফলে সেটি আর সংঘটিত হয় না। সমস্ত কাজ ও কারণ আল্লাহ্তায়ালার দ্বারা সংগঠিত হয়। তিনিই তা নিয়ন্ত্রণ করেন। তাই তাঁর সকল কাজে রাজী থাকা মানে তাঁর ইরাদত মেনে নেওয়া বোঝায়। অসন্তুষ্ট হলে ইরাদা ভংগ করা বোঝায়।

ইরাদত হাসিল করতে সর্বদা আল্লাহ্তায়ালার যিকির ও চিন্তায় নিজকে নিমজ্জিত রাখতে হবে, আল্লাহ্ ভিন্ন যাবতীয় সম্পর্ক হতে নিজকে মুক্ত রাখতে হবে, এটা শায়েখের ইচ্ছা অর্থাৎ তরীকতের দাবী। কোরআন-সুন্নাহর আদেশ-নিষেধ পালন করতে হবে, সব কিছুতে আল্লাহ্তায়ালার কুদরত নিহিত আছে বলে এসব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে, এটা আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছা বা ইরাদা। অযথা কথা-বার্তা বলা ও শোনা হতে দূরে থাকতে হবে, মিথ্যা, অশ্লীল বাক্য, অহংকার ইত্যাদি পরিত্যাগ করে হালাল খাদ্য গ্রহণ করে শরীয়ত মুতাবিক চলতে হবে। এটা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ইরাদা বা ইচ্ছা। আবার

www.pathagar.org

তিনজনের ইচ্ছাই প্রত্যেকের ইচ্ছা। নিজের ইচ্ছা বিসর্জন দিয়ে এ সব ইচ্ছাসমূহকে গ্রহণ করতে হবে।

সালিক যখন আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর যিকির বা স্মরণ না করে এবং কারো সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব ও আসক্তি না রাখে, তখন ইরাদত হাঁসিল হয়। একমাত্র আল্লাহ্তায়ালার প্রতি মুহব্বত হাঁসিল হওয়ার পরই ইরাদতের ফায়েজ হাঁসিল হয়। আল্লাহ্তায়ালার মুহব্বতের পাত্র হিসাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর নায়েব বা প্রতিনিধি হিসাবে শায়েখ আল্লাহ্তায়ালার মুহব্বতের উসিলা হিসাবে তাঁদের ভালবাসতে হবে।

বান্দার দেহ ও আত্মা বা জীবন রূপ রাজত্বে আল্লাহ্তায়ালার আইন-কানুন জারী করতে হয়, বিন্দুমাত্র যে অবশিষ্ট না থাকে। আপদ-বিপদ, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ধৈর্যশীল হয়ে সবর ইখতিয়ার না করলে কেউ লক্ষ্যস্থলে উপনীত হতে পারে না, সাধনায় নাফল্য লাভ করতে পারে না। কাশ্ফ- কারামতে সন্তুষ্ট হয়ে নিজকে বুযুর্গ মনে করে এ সব রিয়াযত বিসর্জন দিলে সালিকের উন্নতি ব্যহত হবে, লক্ষ্যস্থলে পৌঁছা দুষ্কর হবে।

আপন ইচ্ছাকে বিলীন করতে হলে নিজের অস্তিত্ব ও কামনা-বাসনা হতে উদাশীন হয়ে নাফসের বা প্রবৃত্তির কবল হতে বেরিয়ে আসতে হয়, এজন্য নিজের সব কিছু আল্লাহ্তায়ালার কাছে সমর্পণ করে দিতে হয়। কোরআন ও হাদীসে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) যা করতে আদেশ করেছেন এবং শায়েখ যা করতে বলবেন, তা করার জন্য অন্তরকে উত্তেজিত করতে হবে এবং যা করতে নিষেধ করেছেন তা যাতে অন্তরে প্রবেশ করতে না পারে, সেজন্য তাকে প্রতিরোধ করতে হবে। সব সময় অন্তরে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে প্রতিরোধ করতে থাকলে এবং সে সব কাজ হতে বিরত থাকলে সে সব ইচ্ছা ফানা হয়ে যায়। কিন্তু প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার অনুকূলে মনোভাব নিলে তা মনে স্থান লাভ করে, ফানা হয় না। সাধকের উচিৎ নাফসের কামনা-বাসনা মনে স্থান না দেওয়া।

আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছা, যা কোরআনে ব্যক্ত হয়েছে এবং তার ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হাদীসে দিয়েছেন। তা ছাড়া অন্য কোন ইচ্ছা বা ইরাদা করতে নেই, করলে ভুল হবে। চিরদিনের জন্য নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করতে হবে। সর্বক্ষণ আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকির বান্দাকে সাহায্য করবে।

ইহা-পরকালের কোন কিছুকে আল্লাহ্র চেয়ে বেশী পছন্দ করলে এবং আল্লাহ্ ভিন্ন পদার্থে মন নিবিষ্ট করলে তা শিরকের নামান্তর হলো। মনে কামনা-বাসনা, লোভ-লালসার উদয় হলে নিজের ক্ষুদ্রতা ও স্রষ্টার প্রতি মুখাপেক্ষীতার কথা স্মরণ করে তওবাহ্ ও অনুশোচনা করে তা ফানা করে দিতে হবে। পুনঃ

www.pathagar.org

পুনঃ এরূপ করতে থাকলে আশা করা যায় আল্লাহ্তায়ালা প্রবৃত্তির ইচ্ছা বিলীন করে তাকে নিজের ইচ্ছাতে মিশিয়ে নেবেন।

প্রাচীন কালে একদল সূফী মনে করতেন যে, বান্দার যখন নিজস্ব কোন ইচ্ছা থাকবে না, তখন দোয়ার কি প্রয়োজন? প্রভূ তার ব্যাপারে যা খুশী করবেন, তিনি প্রভূর ইচ্ছার সাথে নিজ ইচ্ছা মিলিয়ে তাতে খুশী থাকবেন, আর তকদীরে যা আছে তাতো ঘটবেই। তবে অধিকাংশ মনে করেন যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দোয়া করতে বলেছেন, তাতে দোয়া ইরাদতে পরিণত হয়ে গেছে। দোয়া কবুল ইউক না হউক ইরাদত তো হলো, আখিরাতে এর সওয়াব পাওয়া যাবে। হাত তুলে দোয়া করলে আল্লাহ্ খালি হাতে তা ফিরিয়ে দেন না।

দু'আ করার কথা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) যখন বলেছেন, তখন দোয়া করলে তা বান্দার ইচ্ছার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে না, ফলে দোয়াতে ইরাদতের ক্ষতি হয় না। আল্লাহ্তায়ালা যদি বান্দার দোয়াতে সাড়া দেন এবং প্রার্থিত বস্তু দান করেন, তবে বুঝতে হবে তকদীরে যা ছিল প্রভূ তা সময়োচিত ভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন। এতে দোয়াও কবুল হলো, পূর্ব নির্ধারিত তকদীরের সময় মত বান্দার চাহিদাও মিটানো হলো। এ কথা ঠিক যে, তকদীরে না থাকলে দোয়া কবুল হবে না, তবে এটা ইরাদত হওয়ায় প্রভূর নিকট দাসত্ব প্রকাশ করার কারণে আখিরাতে এর জন্য অন্য পুরস্কার পাওয়া যাবে। এ সব জেনেও শায়েখ বা আউলিয়াগণ লোকের জন্য দোয়া করেন, কারণ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন-"তুমি উহাদিগকে দোয়া করবে, তোমার দোয়া উহাদের জন্য চিত্ত স্বস্তিকর।" ৯ঃ১০৩

হাদীসে আছে - "দোয়া ছাড়া তকদীর খন্ডে না।" এ কথার অর্থ হলো, যে দোয়া যে তকদীর খন্ডাবার জন্য নির্দিষ্ট আছে, সে দোয়া ব্যতীত খন্ডিবে না। তকদীরে কি আছে, তা আমরা জানি না, তাই দোয়া করতে হবে। দোয়া কবুল না হলেও ইবাদত বলে পরকালে এর পুরস্কার পাওয়া যাবে।

'দোয়াতে তকদীর খন্ডে' বলে হুজুর (সাঃ) আমাদের বলে গেছেন, কিছুটা বুঝে আসার জন্য ব্যাখ্যা দিচ্ছি। আমাদের তকদীর বা অর্দৃষ্টলিপি লওহে মাহ্ফুযে লিখা আছে, তাকে কাযা বলা হয়। এই বিধিলিপি দু'প্রকারঃ একটিকে বলা হয়, কাযায়ে মুয়াল্লাকে বা পরিবর্তন যোগ্য অদৃষ্টলিপি, অন্যটিকে বলা হয় কাযায়ে মুবরাম বা অপরিবর্তনীয় অদৃষ্টলিপি। দোয়ার ফলে পরিবর্তনশীল অদৃষ্ট লিপি খণ্ডিত হতে পারে, কারণ তা শর্তযুক্ত অদৃষ্টলিপি, নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ হলে তা খন্ডিত হতে পারে। আমরা জানি না বলে তকদীরে বিশ্বাস করতে হবে এবং দোয়াও করতে হবে।

www.pathagar.org

ঈমান আনা, না আনাও তকদীরের অন্তর্গত। জন্মের সময় আল্লাহ্তায়ালা মানুষকে ঈমান ও কুফর-শিরক হতে মুক্ত করে জন্ম দান করেন এবং প্রকৃতির স্বভাব ধর্ম ইসলামের উপর রাখেন। মা, বাবা ও পরিবেশ তাকে ঈমান অথবা কুফর-শিরকের দিকে পরিচালিত করে। অধিকাংশের অদৃষ্ট-লিপিতে ঈমান ও কুফর পরিবর্তন যোগ্য কাযায়ে মুয়াল্লাকে নামক অদৃষ্ট-লিপিতে থাকে। বার বছর বয়সের পর তওবাহ্ করা ও ঈমান আনা অবশ্য কর্তব্য করা হয়েছে। বার বছর বয়সের পূর্বে এর জন্য কেউ শাস্তি প্রাপ্ত হবে না। বার বছরের পর মৃত্যুর পূর্বে কাফিরের ছেলে তওবাহ্ করে ঈমান আনলে এবং ঈমানের সাথে কুফর-শিরক মিশ্রিত না করে তাজা ঈমানের সাথে মরলে জান্নাতে যাবে। আবার মুসলমানের ছেলে ঈমানের সাথে কুফর-শিরক মিশ্রিত করে বেঈমান হয়ে মরলে দোযখে যাবে। এই শর্তের উপর তা কাযায়ে মুয়াল্লাকে নামক পরিবর্তনশীল ভাগ্যলিপিতে থাকতে পারে। ফেরেশ্তারা কাযায়ে মুয়াল্লাকে জানতে পারে এবং অনেক আউলিয়ারাও লওহে মাহফুয হতে তা জানতে পারেন। কিন্তু কে ঈমান নিয়ে মরবে, কে কুফ্র নিয়ে মরবে, তা একমাত্র আল্লাহ্তায়ালাই জানেন। তাই ঈমান মজবুত করার জন্য ইবাদত করতে হবে, বার বার তওবাহ্ করতে হবে। যে অদৃষ্টলিপি অকাট্য ও অপরিবর্তনীয় তা কাযায়ে মুবরাম, তা দোয়াতে খন্ডে না। কাযায়ে মুবরাম আবার দু'প্রকার। এক প্রকার আল্লাহ্তায়ালা ইচ্ছা করলে খন্ডিত করেন। অন্য প্রকার মোটেই খন্ডিত হয় না।

সূরা তওবাহ্তে আল্লাহ্তায়ালা ঘোষণা করেন যে, "মহান হজ্বের দিন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে মানুষের প্রতি এক ফরমান এই যে, আল্লাহ্র সাথে মুশরিকদের কোন সম্পর্ক রইল না, রাসূলের সাথেও নয়। তবে তোমরা যদি তওবাহ্ কর তবে তোমাদের কল্যাণ হবে, আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জেনে রাখ যে, তোমরা আল্লাহ্কে হীনবল করতে পারবে না এবং কাফিরদের মর্মান্তিক শাস্তির সংবাদ দাও।" ৯ঃ৩

"অতঃপর তারা যদি তওবাহ্ করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে তারা দ্বীন সম্পর্কে তোমাদের ভাই। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি নিদর্শন স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করি।" ৯ঃ২২

এতে এটা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে ঈমানের ব্যাপারে কাফির মুশরিকদের তকদীর কাযায়ে মুয়াল্লাক-যা তওবাহ্ ও ঈমান আনার উপর নির্ভরশীল। যদি কাযায়ে মুয়াল্লাকে না হতো, তবে বেহুদা দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য লক্ষাধিক নবী-রাসূলকে আল্লাহ্তায়ালা ধরা-পৃষ্ঠে পাঠাতেন না। তাই নিজকে সংশোধন না করে তকদীরের দোহাই দিয়ে চুপ করে বসে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছা বা ইরাদা হলো বান্দা তওবাহ্ করুক, দোয়া করুক,

www.pathagar.org

ঈমান মযবুত করুক, নিজে সংশোধন হউক, অন্যকে সংশোধন করার জন্য দ্বীন প্রচার করুক। দয়ালু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা-তিনি দয়া দেখাবেন, মানুষ তার দয়া পাওয়ার শর্তসমূহ মানুক, পালন করুক। এই হলো আল্লাহ্‌র ইরাদা। গযবের শর্ত পালন করে দয়া চাইলে কি ফল হবে।

কেবল মাত্র দোয়ার দ্বারা দুঃখ-কষ্ট, আপদ-বিপদ দূর হয় না, প্রচেষ্টার সাথে সাথে দোয়া করতে হয়। প্রচেষ্টায়ও ফল হবে না, তকদীরে বা কাযায়ে মুবরামে যা আছে তা ঘটবেই। তকদীরে আল্লাহ্‌তায়ালার বিধান ও ইচ্ছা-তাই সংগঠিত তকদীরে সন্তুষ্ট থাকা মানে আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছাতে নিজের ইচ্ছা মিশানো বা ফানা করা।

দোয়া কবুল না হলে বিরক্ত হতে নেই। দোয়া কবুল হতে দেরী দেখে আল্লাহ্‌তায়ালার সাথে মনে মনে ঝগড়াকারী হতে নেই। তাঁর প্রতি অসন্তুষ্টি ও প্রতিবাদ একেবারে পরিত্যাগ করে কৃতজ্ঞতা, ধৈর্য ও সন্তুষ্টি অবলম্বন না করলে ইরাদত সঠিক হয় না। এ সব পরিত্যাগ না করতে পারলে বুঝতে হবে বান্দা পাপে লিপ্ত আছে বলে তার নাফ্‌স দুষ্টমি করছে। কুধারণা আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি আরোপ না করে নিজ নাফসের প্রতি আরোপ করা দরকার। এ অবস্থায় আল্লাহ্‌র পক্ষ হয়ে নাফসের সাথে শত্রুতা ও সংগ্রাম করা বান্দার উচিৎ।

এ কথা ভাবা উচিৎ নয় যে, আমার অদৃষ্টে যা আছে তা আসবেই, দোয়া করলেও আসবে, না করলেও আসবে। তাই দোয়া করব না, তাঁর কাছে চাইব না-এ ধারণা সঠিক হয় না। আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে চাইতে হবে তাঁর সৃষ্ট বিধান অনুযায়ী। চাইবার রীতি হলো আর্থিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্য কৃষি কাজ, শিল্প বা কল-কারখানা স্থাপন করে বা চাকুরী করে চাইতে হবে, সন্তান চাইলে বিয়ে করতে হবে, রোগ মুক্তির জন্য ঔষধ খেয়ে আরোগ্য চাইতে হবে, দোয়া করতে হবে। আখিরাতে আল্লাহ্‌র দীদার চাইলে শরীয়তের পক্ষে নাফ্‌সের বিরোধীতা করতে হবে ও সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র যিকির এবং তাসওউফের নীতিমালা পালন করতে হবে। এ সবের সামর্থ না থাকলে তার তওফিক দেয়ার জন্য দোয়া করতে হবে।

দোয়া কবুল না হলে এরূপ ভাবা উচিত নয়, অনেক চাইলাম কবুল হলো না; আর চাইব না। প্রার্থিত বস্তু তকদীরে থাকলে দোয়ার পর বান্দার নাগালে আসবে, তকদীরে না থাকলে তাকে সন্তুষ্টির হালে থাকতে দিবেন। কর্জ পরিশোধের ব্যাপার হলে পাওনাদাররা হয়ত সদয় হবে, সময় পাওয়া যাবে।

আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন, 'আমার কাছে দোয়া কর, আমি কবুল করব।' 'আল্লাহ্‌র কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষা কর।' রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন-"আল্লাহ্‌র কাছে হাত তুলে দোয়া কর।

www.pathagar.org

আল্লাহ্তায়ালার দয়া সবার প্রতি বর্ষিত হচ্ছে। কেউ দাসত্ব ও মুহব্বত দ্বারা সেই দয়াকে আহ্বান করে ও শোকরিয়া আদায় করে। কেউ সেই দয়াকে অস্বীকার করে অস্বীকারকারী ও অকৃতজ্ঞ হলেও তিনি রিযিক তকদীর অনুযায়ী সরবরাহ করেন। কেউ পাপের পথে তা পায়, কেউ বা ঈমানের সাথে তা পায়। সে যেভাবে পেতে চায়, তাকে সে ভাবই দেওয়া হয় তার জীবন পদ্ধতি মুতাবিক।

দোয়া করতে হয় নিজের অতীত দিনের পাপের মাফের জন্য, আগামী দিনের সম্ভাব্য পাপ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য, তাঁর আদেশ-নিষেধ পালনের তওফিক দেওয়ার জন্য, তকদীরে সন্তুষ্ট থাকার জন্য, বালা-মুসিবতে সবর করার শক্তি দেওয়ার জন্য, ধন-সম্পদের জন্য, কৃতজ্ঞ থাকার জন্য, ঈমানের সাথে যাতে মরতে পারা যায় এবং নবী, সিদ্দীক ও আওলিয়াগণের দলভুক্ত থাকার জন্য। এতে বান্দার ইচ্ছার সাথে আল্লাহ্র ইচ্ছার কোন বিরোধ হয় না।

আল্লাহ্র পরীক্ষায় ধৈর্য্য ধরে উত্তীর্ণ হওয়া এবং নিজের ইচ্ছাকে যেন আল্লাহ্তায়ালা তাঁর ইচ্ছাতে হেফাযতে রাখেন, সে জন্য দোয়া করা উচিৎ।

আমরা জানি না আপদ-বিপদ, অভাব-অনটন বেশী উপকারী, না দুনিয়ার সচ্ছলতা, স্বচ্ছন্দ ও নিরাপত্তা বেশী মঙ্গলজনক। সামগ্রীক জীবন আমাদের জানা নেই। তা' আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছা ও তকদীরে তৃপ্ত থাকাই বেশী মঙ্গলজনক। সামগ্রীক জীবনের মঙ্গল-অমঙ্গল আল্লাহ্তায়ালাই ভাল জানেন, আমরা জানি না। জীবন শুধু দুনিয়াতে আবদ্ধ নয়, আখিরাতেই এর অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হবে।

দুনিয়াতে নিজের ইচ্ছা ও নাফসের কামনা শূন্য হওয়ার সাধনা করলে আল্লাহ্তায়ালা জীবনের নিরাপত্তা ও শান্তি দিবেন। এসব চিন্তা-ভাবনা করে নিজ ইচ্ছাকে আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছাতে বিলীন করতে হয়। বান্দার প্রতি আল্লাহ্তায়ালা খুবই মেহেরবান।

ইরাদত হাসিল করতে পারলে এবং এ ফায়েজ পরিপূর্ণ হলে বান্দা আবদাল হয়ে যায়, যদি আল্লাহ্তায়ালা খাস ভাবে মেহেরবানী করেন। আবদাল হওয়া মানে আল্লাহ্তায়ালার এক মহাদানে বিভূষিত হওয়া। ফানাফিল্লাহতে ইরাদতের ফায়েজ পূর্ণ হলে যাকে খুশী আল্লাহ্তায়ালা আবদাল করেন এবং এতে পীরের মধ্যস্থতা লাগে না।

প্রবৃত্তির অনুকূলে গড়ে উঠা স্বভাব পরিত্যাগ করে আল্লাহ্তায়ালার স্বভাব অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর অনুকরণে স্বভাব গঠন করা এবং নাফসের ইচ্ছার

www.pathagar.org

বদলে আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছা গ্রহণ করাই ইরাদত। মুহব্বত ও ইরাদত ছাড়া শুধু যিকিরে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছা যায় না। তার যিকির না করলে মুহব্বত ও ইরাদতের তওফিক হয় না বা ইরাদত হাসিল হয় না।

"যে ব্যক্তি নিজ আত্মার সংশোধন করেছে, সে ব্যক্তি সাফল্য লাভ করেছে।" ৯১ঃ৯।

ইলাহী! আমাদের সর্বক্ষণ তোমার দাস করে রেখ, যাতে সব সময় তোমার গোলামীতে আবদ্ধ থাকতে পারি। তোমার প্রভূত্বের সম্মান করার তওফিক দান করা। যা কিছু তোমার নিকটবর্তী করে তা আকড়ে থাকার তওফিক দাও, যা তোমার থেকে দূরবর্তী করে, তা বর্জন করার শক্তি দাও। পদস্খলন থেকে দূরে রাখ, তোমার নৈকট্য ও মিলন দ্বারা আমাদের জীবন ধন্য কর।

ইলাহী! তোমার প্রেমাস্পদের উম্মত করে আমাদের যেমন সৌভাগ্যবান করেছ, তেমনি তাঁর নির্দেশিত সহজ-সরল পথে পরিচালিত করে হেদায়েত, ঈমান ও য়াকিনের নূর দ্বারা আমাদের বক্ষকে প্রসারিত করে তোমার ভালবাসার দ্বারা ভরপুর করে দাও।

হে আল্লাহ্ তোমার মুহব্বত ও ইচ্ছা ছাড়া সকল মুহব্বত ও ইচ্ছাকে বিলুপ্ত করে দাও। আমাদের অভিলাষকে তোমার অভিলাষে ফানা করে দাও। আমাদের প্রতি তোমার অবতীর্ণ তকদীরে সন্তুষ্ট থাকার তওফিক দাও। রহম কর, দয়া কর।

হে আল্লাহ্! তোমার হাবিবের উসিলায়, পাক পানজাতনে, নবী-রাসূলগণের এবং আউলিয়াগণের উসিলায় ঈমানের সাথে মৃত্যু দাও। তোমার সন্তুষ্টি ও তোমার প্রতি সন্তুষ্টির সাথে দুনিয়া হতে উঠিয়ে তোমার হাবিবের কদম মুবারকের নীচে স্থান দান কর।

ইলাহী! যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, পাক পানজাতনের প্রতি, হযরত সৈয়দ আমজাদ আলী শাহ (র) সাহেবের প্রতি ভালাবাসা পোষণ করেন এবং এই পুস্তক পাঠ করে এ অধমের দোষত্রুটি ক্ষমা করার জন্য এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কদম মুবারকের নীচে স্থান দেওয়ার জন্য তোমার দরবারে দোয়া করে, তাদের দোষত্রুটি মাফ করে এই পুস্তকে বর্ণিত ফায়েজসমূহ অল্প রিয়াযত-মেহনতে তাদের বখশীশ কর, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের নিরাপত্তা দান কর। তোমার দয়া ও রহমত কোন কারণে অধীনে নয়, তুমি যাকে ইচ্ছা দান করতে পার, যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত করতে পার, তুমিই একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। আমরা তোমার করুণা প্রার্থী। আমিন! ছুম্মা আমিন!

www.pathagar.org